সীরাতে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন

[প্রবন্ধ সংকলন]

www.pathagar.com

উৎসর্গ

দ্বীনের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক
সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)
ও
যুগে যুগে দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গকৃত
মর্দে মুজাহিদগণকে–

www.pathagar.com

শুভেচ্ছার নির্দশন স্বরূপ
গ্রন্থখানি উপহার দিলাম।

প্রতি,

নাম ______________________

ঠিকানা ______________________

____

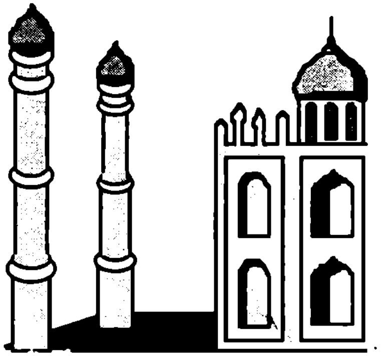

www.pathagar.com

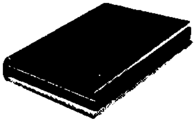

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ
اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ
اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের উপর খুবই কঠোর, পরস্পর তারা সহানুভূতিশীল, আপনি তাঁদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় মস্তকাবনত ও আভূমি আনত দেখতে পাবেন। –সূরায়ে ফাতহ্, আয়াত-২৯।

www.pathagar.com

সীরাতে
রাহমাতুল্লিল আ'লামিন
[প্রবন্ধ সংকলন]

সম্পাদক মণ্ডলী

মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন

এম, এম; বি,এ , (অনার্স); এম,এ

অধ্যক্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

মুফতী মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান

কামিল ঃ হাদীস, ফিক্‌হ, তাফসীর, আদব

বি, এ (অনার্স); এম, এ; এম, ফিল

পি, এইচ, ডি গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্বাহী সম্পাদক

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন

কামিল (ডাবল); এম,এ, (১ম শ্রেণী ২য় স্থান); এম, ফিল

পি, এইচ, ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবেশক

ইখওয়ান লাইব্রেরী

৩৪/২, নর্থব্রুকহল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

সীরাতে রাহমাতুল্লিল আ'লামিন
(প্রবন্ধ সংকলন)

প্রকাশক ঃ মাওলানা মহিউদ্দিন
আইডিয়াল লাইব্রেরী
আমানুল্যাহপুর, বেগমগন্জ, নোয়াখালী।

প্রকাশ কাল ঃ অক্টোবর, ২০০০ইং।
শাবান, ১৪২১ হিজরী।

[স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
এস্ আলম প্রকাশনা শিল্প (কম্পিউটার বিভাগ)
৩৪ নর্থব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

Sirath-E-Rahmatullil Alamin (Article's Collection) **Editor's:** Mohammad Zaynul Abedin & Muftee Mohammad Syeedur Rahman. **Exicutive Editor:** A.Y. M. Nesar uddin. **Published By :** Md. Mohiuddin.

Price: Tk- 200 only. U.S.$— 6 (Six)

Distributor :
Ikhwan Library
34/2, North Brook Hall Road Bangla Bazar
Dhaka—1100.

www.pathagar.com

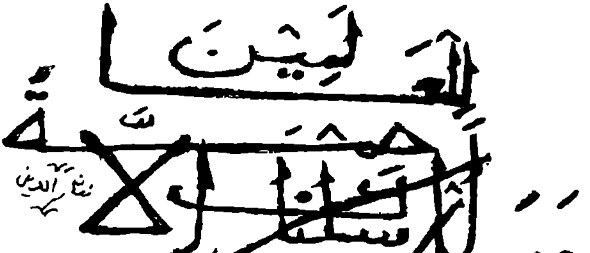

"আমি আপনাকে সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

www.pathagar.com

অভিমত ও দোয়া

হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক
খতিব, বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

স্নেহাস্পদ মাওলানা আ, ই, ম, নেছার উদ্দিন দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টার মাধ্যমে সীরাতে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন নামে যে সীরাত সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। এ ধরনের কাজ অতীব গুরুত্বপূর্ন। নবীর (সঃ) জীবনী নিয়ে প্রচার প্রকাশনা ও গবেষনার মত মহৎ কাজে যারা সময় ব্যয় করলেন- লেখক সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। আল্লাহ তাদের এ পরিশ্রম কবুল করুন।

(ওবায়দুল হক)

অভিমত ও দোয়া

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা ও
বিশিষ্ট সীরাত গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ।

সংগঠক, লেখক, স্নেহাস্পদ মাওলানা আ, ই, ম, নেছার উদ্দিনের সম্পাদনায় দীর্ঘসময়ের সংগ্রহের আলোকে সীরাতে রাসুলের উপর একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি । সময়ে সময়ে এসব কাজে আমি তাঁদেরকে নানা পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছি। কারণ সীরাতে রাসুলের উপর যত বেশী আলোচনা, পর্যালোচনা হবে ততই মুসলমানদের উপকার হবে।

প্রচার প্রকাশনার দায়িত্ব পালন খুবই কঠিন বিষয়। তবুও যাঁরা এ কাজে সার্বিক কুরবানী দান করেছেন- আমি সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁদের এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

(মুহিউদ্দীন খান)

www.pathagar.com

অভিমত ও দোয়া

হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম, পি ।
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছিরে কোরআন, ঢাকা ।

মাওলানা আ, ই, ম, নেছার উদ্দিন সহ কতিপয় ব্যক্তিবর্গের পরিশ্রমের বদৌলতে একটি সীরাত গ্রন্থ (সংকলন) প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। এধরনের একটি কাজে যারা সময় ও শ্রম ব্যয় করলেন, আমি তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই । লেখক, সম্পাদক সহ অন্যান্য সকলের দু' জাহানের কামিয়াবীর জন্য মহান বারী-তায়ালার দরবারে দোয়া করছি ।

এ গ্রন্থ খানির বহুল প্রচারও কামনা করছি ।

(দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী)

অভিমত ও দোয়া

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী.আল কাদরী আল চিশতী
পীর সাহেব.বাইতুস সাইফ দরবার শরীফ, মটবী, লক্ষীপুর।

সীরাতে রাসুলের উপর বিভিন্ন লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরামগণের লেখায় একটি সংকলন প্রকাশ পাচ্ছে জেনে আমিই সত্যিই আনন্দিত হয়েছি। হুযুর (সঃ) এর মহান জীবনের নানা দিকের উপর গবেষণাধর্মী প্রকাশনা খুবই জরুরী। কেননা এতে নবীজির জীবনের মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার ও প্রকাশ পাবে। সমাজের নারী ও পুরুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। সমাজের অপসংস্কৃতি দূর করার জন্য এটি অন্যতম মাধ্যম বলে আমি মনে করি।

আমি উদ্যোক্তাদের জন্য দোয়া করি ও প্রকাশনার সফলতা কামনা করি।

স্বাক্ষরিত

(মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী)
আল-কাদরী, আল-চিশতী

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

" তিনি সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সত্য দ্বীন ও হেদায়াত নিয়ে প্রেরন করেছেন যেন তিনি অপরাপর ধর্মের উপর একে বিজয়ী করতে পারেন , যদিও মুশরিকরা একে পছন্দ না করুক "- (আল -কোরআন ,সূরা-আস -সফ)

বাংলাদেশে সীরাত চর্চার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলা ভাষার পূর্বে এদেশে অন্য ভাষায়ও সীরাত চর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে এক সময় আমাদের দেশে সীরাতে রাসুল কবি সাহিত্যিকদের কল্পনা দ্বারা রচিত হয়েছে, পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়েছে নবী (সঃ)-এর জীবনী নিয়ে, যা কোরআন ও হাদিসের নিরীখে সঠিক ছিল না বললেই চলে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এ উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী নিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। এ ধারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে সীরাত বিষয়ক গ্রন্থের অত্যন্ত চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন লেখকগণের লেখা বা গ্রন্থ সমূহ পড়ার বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এটা নিঃসন্দেহে আশার কথা ও আনন্দের বিষয়।

বক্ষমান **সীরাতে রাহমাতুল্লিল আ'লামিন** সংকলটিতে মোট ৮৯টি প্রবন্ধ পাঠক সমাজে পেশ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতিটি বিষয়ের উপর এক একটি পুস্তক রচিত হওয়ার দাবি রাখে। ফলে বিশাল বিষয় গুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে এক জায়গায় করার ফলে এটি মূল্যবান একটি প্রকাশনা- সন্দেহ নেই। এ প্রকাশনা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।

নবীজীর জীবনীর উপর বাংলা ভাষায় এত বেশী লেখা নিয়ে অন্য কোন সীরাত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তাই একে আমরা একমাত্র না বললেও অন্যতম সীরাত সংকলন বলতে পারি। পাঠক সহ সকল মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতা দ্বারা এ ধরণের একটি মহৎ উদ্যোগের সফলতা আসে। আমরা তাই সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

(মোঃ আবদুল খালেক)
অধ্যক্ষ,
মিজিমিজি পাইনাদি সিনিয়র মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ।

(আ.ন.ম. আবদুল কাইয়ুম খন্দকার)
অধ্যক্ষ,
আদমজী সিনিয়র মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	তাঁর মত আর কেউ নয়	—মুহিউদ্দীন খান	১৭
২।	শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নীতিবিদ রাসুলুল্লাহ (সঃ)	—অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ	১৯
৩।	মানবতা ও রাসুলুল্লাহ (সঃ)	—মোহাম্মদ ইয়াকুব শরাফতী	২৭
৪।	হযরত মুহাম্মদ ও পাশ্চাত্য জগৎ	—আবদুল মওদুদ	৩৪
৫।	হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও মানবাধিকার	—ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	৩৯
৬।	মহানবীর আবির্ভাব সংস্কার কর্ম ও আধুনিক বিশ্ব	—এডভোকেট মাওলানা রুহুল আমীন	৪৩
৭।	মহান রাষ্ট্র নায়ক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	—মোঃ আকতার হোসেন	৪৯
৮।	সমাজ উন্নয়নে ইসলামী শিক্ষার আবশ্যকতা	—মুহাম্মদ তাহের হোসেন	৫৩
৯।	মানুষের নবী	—ব্যারিষ্টার তমিজুল হক	৫৮
১০।	বিদায় হজ্বের ভাষণ	—মুহিউদ্দীন খান	৬৪
১১।	আদর্শ সমাজের স্থপতি মহানবী (সঃ)	—মুহাম্মদ সেলিম মিয়া	৬৮
১২।	মহানবী (সঃ)-এর আচার ব্যবহার	—মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম মিফতাহ	৭৪
১৩।	বারই রবিউল আউয়ালঃ বার সংখ্যার তাৎপর্য	—অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মফিজুল ইসলাম	৭৯
১৪।	উসওয়াতুন হাসানাহ	—ব্যারিষ্টার তমিজুল হক	৮২
১৫।	পরিবেশ রক্ষায় ইসলামী আদর্শ	—মুহাম্মদ তাহের হোসেন	৮৮
১৬।	হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শই ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি	—আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন	৯৪
১৭।	বিশ্বের দরবারে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	—ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	৯৮
১৮।	মানব মর্যাদার উন্নয়নে মহানবী (সঃ)-এর অবদান	—মাওলানা আমিনুল ইসলাম	১০১
১৯।	হযরত মুহাম্মদ ও মুক্ত বুদ্ধি	—অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	১০৫
২০।	প্রিয় নবী (সাঃ) এর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা	—উবায়দুর রহমান খান নদভী	১১০
২১।	ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংস্কৃতি ও আজকের প্রেক্ষাপট	—আ. ন. ম. আবদুল কাইয়ুম খন্দকার	১১৬

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
২২।	হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম	—ডাঃ শাহ মুহাম্মদ এমদাদুল হক	১১৮
২৩।	ইসলামে শ্রমের মর্যাদা	—মুহাম্মদ তাহের হোসেন	১২১
২৪।	ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেন্টে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পরিচয়	—ইব্রাহিম মদিববো উমার	১২৪
২৫।	সর্বোত্তম আদর্শ	—মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ	১২৯
২৬।	মণীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	—মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	১৩২
২৭।	হাদীসে রসুল ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	—মুহীউদ্দীন খান	১৩৭
২৮।	সত্যের সাধনায় নবী মোস্তফা	–আবদুল্লাহ সাঈদ	১৪২
২৯।	আখেরী নবীর (সঃ) উল্লেখযোগ্য মর্যাদা	–জি. এম. এ. হামিদ	১৪৫
৩০।	নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	—মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	১৪৯
৩১।	শিশু অধিকার বিধানে রাসুল (সাঃ)	—মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম মিফতাহ	১৫৩
৩২।	রাসুলের বিপ্লবী দাওয়াত	—অধ্যক্ষ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন	১৫৮
৩৩।	রাসুল্লাহ (সঃ)-এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আজকের বিশ্ব	—আহমেদ সেলিম রেজা	১৬৫
৩৪।	রাসুল (সঃ)-এর ব্যবহৃত পোষাক ও দ্রব্য সামগ্রী	–আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	১৭১
৩৫।	অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব নবী (সঃ)-এর অবদান	—ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ	১৭৫
৩৬।	ওয়াকিয়াহে হাররা ও আমাদের শিখনীয়	—আ. ন. ম. আবদুল কাইয়ুম খন্দকার	১৮১
৩৭।	মহানবীর (সঃ) কতিপয় সুমহান মর্যাদা	—আ. ন. ম. আবদুস শাকুর	১৯০
৩৮।	স্বাস্থ্য রক্ষায় রাসুলের (সঃ) আদর্শ	—ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত	১৯৪
৩৯।	প্রিয় নবীর জন্মভূমি	—মুহিউদ্দীন খান	২০১
৪০।	ঈদ-ই মিলাদ-উন-নবী (সঃ)	—দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	২০৯
৪১।	পবিত্র কোরআন ও হাদীস বিজ্ঞানের আকর	—আমিরুল ইসলাম মিফতাহ	২১১
৪২।	মহানবী (সঃ)-এর মানব প্রেম	—ডঃ আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন	২১৫
৪৩।	১২ই রবিউল আউয়ালে আমার ভাবনা	—ডঃ মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসাইন	২২০
৪৪।	প্রিয় নবীজির স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা	—উবায়দুর রহমান খান নদভী	২২৫
৪৫।	মদীনা মুনাওয়ারার প্রিয়তম নবীর (সঃ) স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ সমূহ	—মুহিউদ্দীন খান	২৩০
৪৬।	ভাষা চর্চায় মহানবী (সঃ)-এর আদর্শ	—এ. জেড. এম. শামসুল আলম	২৪১

www.pathagar.com

ক্রঃ নং•	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
৪৭।	নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ	—মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ	২৪৬
৪৮।	বর্তমান প্রেক্ষাপটে আশুরার তাৎপর্য	—মুহাম্মদ ইলিয়াস মজুমদার	২৫৭
৪৯।	মহানবী'র (সঃ) মি'রাজ	—এ. জেড. এম. শামসুল আলম	২৬১
৫০।	হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গীতি	—ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	২৬৭
৫১।	বাংলা ভাষায় নাতিয়া	—আবদুল কাদির	২৭০
৫২।	মধ্য যুগীয় বাংলা সাহিত্যে রসুল প্রসঙ্গ	—আবুল কাশেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন	২৯৭
৫৩।	ইসলামে মেয়েদের অধিকার ও কর্মসংস্থান	—ইসরাত জাহান নাসিমা	৩০৩
৫৪।	শান্তির দূত	—ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল বারী	৩১১
৫৫।	মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য	—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩১৪
৫৬।	রাষ্ট্র নায়ক মুহাম্মদ	—চৌধুরী শামসুর রহমান	৩১৮
৫৭।	মানব কল্যাণে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবদান	—আ. ন. ম. আবদুল কাইয়ুম খন্দকার	৩২৪
৫৮।	মহানবী (সঃ)-এর মহান আদর্শ ও আজকের প্রেক্ষাপট	—ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত	৩২৮
৫৯।	বাংলা ভাষায় নবী চরিত	—আবদুস সাত্তার	৩৩৬
৬০।	বাংলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	—মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	৩৪১
৬১।	মাদকাশক্তি ও অপসংস্কৃতি মুক্ত সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	—মুহাম্মদ রেজাউল করিম ইসলামাবাদী	৩৫২
৬২।	ইলমে হাদীস ঃ পরিভাষা সংজ্ঞা ও পরিধি	—অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল খালেক	৩৬০
৬৩।	হাদিস প্রচার ও প্রসারের সেই স্বর্ণ যুগ	—আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন	৩৭৭
৬৪।	ইত্তেবাউস সুন্নাহ	—ডঃ এ. বি. এম. ছিদ্দীকুর রহমান	৩৮৪
৬৫।	হাদীস সংরক্ষণের ইতিকথা	—আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন	৩৮৯
৬৬।	মহানবীর জীবনাদর্শ	—প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ	৩৯৭
৬৭।	সকল মানুষের নবী	—আবুল ফজল	৪০০
৬৮।	বালাগাল উলা বে-কামালিহি	—ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	৪০৪
৬৯।	আল কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ	—আমিরুল ইসলাম মিফতাহ	৪০৮
৭০।	বিশ্ব জনীন পয়গাম নিয়ে প্রিয় নবী (সঃ) আরবে এলেন কেন?	—উবায়দুর রহমান খান নদভী	৪১৪

www.pathagar.com

ক্রঃ নং	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
৭১।	রাসুল্লাহ (সঃ)-এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা	—মুহিউদ্দীন খান	৪২১
৭২।	নবী দিবসের আহবান ঃ বিশ্বাসের ঐক্য গড়ে তুলুন	—আবদুল ওয়াহিদ	৪২৮
৭৩।	সুব্যবস্থাপক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও দায়িত্ব পালনকারী সাহাবায়ে কেরাম	—আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন	৪৩১
৭৪।	মদীনা সনদ ঃ আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র	—মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ	৪৩৫
৭৫।	শান্তি ও কল্যাণমুখী পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে মহানবীর ভূমিকা	—এডভোকেট আবদুল মোবিন	৪৩৮
৭৬।	একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সঃ)-এর ভূমিকা	–অধ্যাপক সিরাজুল হক	৪৪০
৭৭।	আমাদের জাতি সত্ত্বার রূপকার মহানবী (সঃ)	—মাসুদ মজুমদার	৪৪৬
৭৮।	মহানবী (সঃ) ও যুব সমাজ	—এ. জেড. এম. শামসুল আলম	৪৫১
৭৯।	হায়াতুন্নবী (সঃ) ঃ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য	—মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	৪৫৮
৮০।	মহানবী (সঃ)-এর মি'রাজ	—এম. এস. এম. আবদুল কাদের রহমানী	৪৬১
৮১।	বিশ্বনবী (সঃ)-এর মু'জিযা	—মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী	৪৭২
৮২।	ঐতিহ্যবাহী হিজরী সনের ইতিহাস	—মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান	৪৭৯
৮৩।	হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দর্শন	—ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আঃ বাছেত	৪৮২
৮৪।	ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)-এর জীবন ও তাঁর হাদিস চর্চা	—আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন	৪৮৫
৮৫।	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব	—অধ্যাপক ইউসুফ আমীন	৪৮৯

পরিশিষ্ট

ক্রঃ নং	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
৮৬।	মহানবী (সঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী		৪৯৬
৮৭।	মহানবী (সঃ)-এর পরিবারবর্গ ও বিবিগণের তালিকা		৫০৭
৮৮।	হুজুর (সঃ)-এর বংশ পরিক্রমা		৫১৩
৮৯।	মহানবীর যুগে আরব দেশ		৫১৫

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, রহমতে দু' আলম, নবীয়ে মুহতারাম, নুরে মোজাচ্ছাম, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী উচ্চারিত হয়েছে। আলোচনা হয়েছে সবচাইতে বেশী। আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সে কারণে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ এরশাদ করেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

অথ্যাৎ "আমি আপনার আলোচনাকে সর্বোচ্চ করে দিয়েছি"। (ইনশিরাহ - ৪)

আমরা যে গ্রন্থের এখানে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছি, তা সর্বাংশেই মুহাম্মদ (সঃ) এর মহান জীবনের নানা দিকের আলোচনা দ্বারাই লিখিত। মূলত এই গ্রন্থটি একটি সংগ্রহ মূলক গ্রন্থ। মহানবীর (সঃ) মহান জীবনীর উপরে লেখা বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীগনের প্রবন্ধ এবং নিবন্ধকে এক সাথে প্রকাশ করার মহান ব্রত নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ১৯৯৫ সন থেকে ছয় বছর যাবত ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদের 'সীরাতুন্নবী স্মারক' নামে প্রকাশিত সাময়িকীতে এর বেশ কিছু প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া উনিশ'শ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের এদেশের খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীগনের কয়েকজনের বেশ কয়েকটি লেখা এখানে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ স্থান দেয়া হয়েছে। (প্রকাশের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে)। ইতোপূর্বে হুযুর (সঃ)-এর নামে আয়োজিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত প্রবন্ধ/নিবন্ধ গুলোকেও এখানে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী মহাসাগর তুল্য। মহাসাগরের যেমন সঠিক পরিমাপ অসম্ভব, মহানবীর (সঃ) জীবন চরিত ঠিক তেমনি। তবুও নবী প্রেমিকদের দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা চলবে। বিশেষ করে মহানবীর (সঃ) জীবন এমনি বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, একই বিষয়কে বার বার আলোচনায় নতুন ধারণা তথা নবতর নির্দেশনার জন্য প্রযোজ্য হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন লেখকগনের লেখায়, একই বিষয় বার বার উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিজন লেখকের লেখায়ই যেন ভিন্ন ভিন্ন ফুলের গন্ধ গ্রহনের মতই মনে হয়। তাছাড়া নবী (সঃ)

www.pathagar.com

জীবনের নানা দিক ও বিভাগের উপর লেখাগুলোকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনে নবীজীর আলোচনায় গ্রন্থটি একটি তাৎপর্যময় গ্রন্থ হিসাবে আমরা পাঠক মহলে উপস্থাপন করছি বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহর দ্বীন তথা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী নিয়ে গবেষণাই সত্যিকারের গবেষণা। কারণ এতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই কল্যাণ নিহিত। সেজন্য এখানে যেসব লেখা স্থান পেয়েছে, তাতে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক মণ্ডলী ও গবেষকদের বিরাট উপাত্ত হিসাবে এ গ্রন্থ কাজে আসবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। সীরাতে রাসুল আমাদের বাংলা ভাষায় নীরবচ্ছন্নভাবে মিশে গেছে। বাংলা ভাষার মান মর্যাদাকে সীরাতে রাসুল কিভাবে ধন্য করেছে, কয়েকজন লেখকের লেখায় তা দলীল প্রমানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধরণের লেখা বর্তমান সময়ের দাবী। কেননা এক সময় সীরাতে রাসুলের আলোচনায় পুথি বিদ্যার ও কাব্য রচনার প্রভাব ছিল। তাতে অনেক লেখক নবীজীকে নিয়ে অতিরঞ্জিত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বর্তমান প্রজন্ম এসব ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানার জন্য এ গ্রন্থ সুযোগ করে দেবে।

মুহাম্মদ (সাঃ) একজন অসাধারণ মহামানব। তাঁর জীবনী কোন ক্রমেই দলীল প্রমাণ বা সূত্র উল্লেখ ব্যাতিত উপস্থাপন বা প্রকাশ করা ঠিক নয়। আমরা এখানে যাঁদের লেখা সন্নিবেশন করেছি, তারা দেশের তথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উঁচু মাপের লেখক। তাঁদের লেখার স্বাভাবিক ধারাই হচ্ছে, রেফারেন্স সহকারে বিষয় বস্তুর উপস্থাপন। সে কারণে এ দিকটি দ্বারা জ্ঞান পিপাসুদের সহায়তায় এ গ্রন্থ যথেষ্ট কাজে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। হাদীসে রাসুল নবী জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। তাই কয়েকটি প্রবন্ধ এ বিষয়েও উপস্থাপন করা হয়েছে।

নবীন প্রবীণ মিলিয়ে সর্ব পর্যায়ের লেখকগনের লেখা এতে ছাপা হয়েছে। যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আর যাঁরা বারী তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন, তাঁদের জন্য আমরা এ খেদমতের জাযা হিসেবে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দানের জন্য মহান রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে মুনাজাত পেশ করছি।

শেষে মুদ্রণ বিভ্রাট বা নানা ধরণের ক্রুটির জন্য পাঠক মহলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি এবং আগামীতে সংশোধনের নিমিত্তে পরামর্শ কামনা করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে এ মহামানবের সীরাত আলোচনায় যাবতীয় ক্রুটির জন্য ক্ষমা করার আরজি পেশ করছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র মেহনত কবুল করুন। আমিন ॥

সম্পাদক বৃন্দ

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বে-কামালিহী
কাশাফাদ্ দোজা বে-জামালিহী
হাসুনাত্ জামিউ খেসালিহী
সাল্লু-আলাইহি ওয়া-আলিহী।

তাঁর মত আর কেউ নয়

মুহিউদ্দীন খান

প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সীরাত বা জীবন চরিত এমন একটি মহাসাগরের সাথে তুলনীয় হতে পারে, যা মন্থন করার কথা কারো কল্পনায়ও আসতে পারে না। উম্মত জননী হযরত আয়েশা(রাঃ) পবিত্র কোরআনকেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সীরাত বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন তাজদারে মদীনা আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী সাত-সাগরের পানি যদি কালি হয় আর সৃষ্টি জগতের হাতে ধরার মত সব কিছুই যদি কলমে রূপান্তরিত হয়, তবুও যেমন কোরআন তথা আল্লাহর কালামের মাহত্ম লেখে সাগরের কালি শুকিয়ে যাবে, বার বার শুকিয়ে যাবে, কিন্তু সে মাহাত্ম শেষ হবে না, তেমনি কোরআনের বাহক, বাস্তব প্রতিচ্ছবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (সাঃ) গুণ মহিমা বলে বা লিপিবদ্ধ করে শেষ করা কোন কালেও সম্ভব হবে না।

বলা এবং লেখা শুরু হয়েছে, প্রিয় নবীজীর (সাঃ) ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানের সময়কাল থেকেই। সে সবের মধ্যে উম্মে মা'বাদ নাম্নী জনৈকা বেদুঈন মহিলার বর্ণাঢ্য বর্ণনা যেমন সর্বকালের আরবী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা হয়ে রয়েছে, তেমনি হাস্সান (রাঃ), আব্বাছ (রাঃ), আবু বকর (রাঃ), উম্মত জননী আয়েশা (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রমুখ অগণতি ভক্তজনের কাব্যিক বর্ণনাও আরবী সাহিত্যের অক্ষয় কীর্তিরূপে বিবেচিত হয়। সেই প্রথম যুগ থেকে শুরু করে আজতক চৌদ্দ শতাধিক বছর ধরে এ পর্যন্ত সীরাতে রাসুল সম্পর্কিত যে সব বর্ণনা কালোত্তীর্ণ রচনা সম্ভার হয়ে আছে, এক সাধারণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে সবের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশী।

তারপরও সীরাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত আলোচনা শেষ হয়নি, পাঠকের রুচিতে পুনরাবৃত্তি জনিত ক্লান্তির ছাপ ফেলতে পারেনি। বিশ্বব্যাপী এখনও পর্যন্ত প্রতিদিনই বিভিন্ন ভাষায় যেসব সীরাত গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, তার সংখ্যা শতাধিক বলে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। তারপরও কিন্তু তৃষ্ণার শেষ হচ্ছে না।

www.pathagar.com

আলোচনার বিষয়বস্তুতে একঘোয়েমীর ছাপ পড়ছে না। নতুন নতুন প্রেক্ষিত সামনে আসছে। বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী গবেষক শ্রেনী এগিয়ে এসেছেন। রচিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রন্থ । এ বিপুল আয়োজন, এ অকল্পনীয় আকর্ষণ নিজেকে কোন না কোনভাবে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) জীবন চরিত আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে শীর্ষ স্থানীয় জ্ঞানী-গুণী ও গবেষকগণের ব্যাকুলতা, এসব কিছুই শুধু উপলব্ধি করার মত বিষয়। এ সবের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ভাষা মোটেও যথেষ্ট নয়। একজন অসহায় নিঃস্ব মানুষ যখন তাঁর কথা ভাবে, তখন দেখতে পায়, তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা আপনজন। শাহান শাহীর বিরল ভাগ্য পায়ে ঠেলে ভুখা-নাঙ্গা মানুষের কাতারেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! একজন রাষ্ট্রপ্রধান যখন তাঁর কথা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি দেখতে পান, আট লক্ষাধিক বর্গমাইল পরিমিত একটি বিশাল রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি একজন বিনীত বান্দা। সাধারণ মানুষের সর্বাধিক ভক্তি ভালবাসা সিক্ত একজন সফল শাসক এবং একই সাথে সর্বাধিক নির্মল আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা রূপে অধিষ্ঠিত। একজন ধনাঢ্য বণিক যখন তাকে স্মরণ করতে চায় তখন দেখতে পায়, মক্কার সেই আদর্শ ব্যবসায়ীকে যার পায়ের নীচে সমর্পিত হয়েছিল অকল্পনীয় ধন রত্নের ভান্ডার। তিন মহাদেশে বিস্তৃত বাণিজ্য -কাফেলায় সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য যে নামটি ইতিহাস অম্লান করে রেখেছে, তিনি ছিলেন মক্কার সেরা ধনী মহিলা খাদীজাতুল কোবরার (রাঃ) স্বামী যুবক মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর হাতেই আবর্তিত হচ্ছিল বিপুলায়তনের একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। বহু রণজয়ী একজন গর্বিত সেনানায়ক, একজন পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, একজন সুখী গৃহকর্তা। এক কথায় জীবনের যত দিক রয়েছে, সব দিকের আদর্শ মানুষেরাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁকে দেখতে পায়, তিনি সবারই কত আপন জন! কত মহোত্তম এবং অনুসরণীয় তাঁর জীবনধারার প্রতিটি পদক্ষেপ।

সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা জামী (রাহঃ) দীর্ঘ রচনার শেষে বলেছিলেন-

যতটুকু প্রশংসা করা দরকার, ততটুকু বলার ক্ষমতা কে রাখে?

সংক্ষেপে শুধু এতটুকু বলা চলে যে, মহান সৃষ্টিকর্তার পর সর্বোচ্চ স্থানটি চিরকালের জন্যই একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে!! আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ !!

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নীতিবিদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্

কুল মাখলুকাতের সেরা সৃষ্টি মানবতার পরিপূর্ন আদর্শ আল্লাহর পরে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন সাঈয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদু রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। তিনিই কুল আলমের শ্রেষ্ঠ। তার শানে আল্লাহ জাল্লাহ জালালুহু ইরশাদ করেছেন ঃ "**অরাফায়ানা লাকা যিকরাকা** অর্থাৎ আপনার মর্যাদা, আপনার সম্মান, আপনার যিকির, আপনার আলোচনা আপনার নীতি ও আদর্শ, আপনার ব্যক্তিত্ব আমি আপনার উদ্দেশ্যেই শীর্ষ স্থানে উত্তোলন করেছি। তাঁকেই আল্লাহ তায়ালা "সর্বোত্তম চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে চারিত্রক সনদ প্রদান করেছেন।

"**ইন্নাকা লা আলা খুলূকিন আযীম**" নিশ্চয়ই আপনিই মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁকেই মানবতার সর্বোত্তম আর্দশ বলে ঘোষণা করে আল্লাহ সুবানাহু তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন।

"**লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা।**" নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার রাসুলের (জিন্দেগীতেই) মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে তাঁকেই রাহমাতের উৎস বলে ঘোষনা দিয়ে বলেছেন ঃ ওয়া নুনাযযিলু মিনাল কুরআনে মা হুয়া শিফায়ূও রাহমাতুন। কুরআনুল করীম আমি নাযিল করেছি, যার মধ্যেই একমাত্র জীবনের সকল বেদনা মুসীবত ও সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে।

করআনুল কারীমের রাহমাতের দৃষ্টিতে জীবন্ত প্রতীক ও বিশ্বজনীন শান্তির বাস্তব নিদর্শন হচ্ছে একমাত্র রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর আদর্শের অনুসরনের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি জগতের শান্তি ও কল্যান মুক্তি এবং কামিয়াবী নিহিত রয়েছে। কুরআনে করীমের অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ ওয়ামা আরসালানকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন। আমি আপনাকেই একমাত্র সমগ্র আলমের রহমাত হিসেবে প্রেরণ করেছি।

আল-কুরআনের বাস্তব অনুসরণের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ একমাত্র প্রিয় নবী (সাঃ) জীবনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) কে কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনের ক্রিয়াকাণ্ড, আচরন ও সীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর মা আয়েশা (রা) তদুত্তরে বলেছিলেন, 'খলূকুহুল কুরআন' প্রিয় নবীর পূর্ণ জীবন ছিল আল কুরআনের জীবন্ত প্রতীক।

আল-কুরআন দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি রাহমাত ও কল্যান এবং সাফল্যে

www.pathagar.com

একমাত্র নির্ভূল পরিকল্পনা ব্লুপ্রিন্ট। আর বিশ্বনবী (সাঃ) এর জিন্দেগীই হচ্ছে তার বাস্তব ইমারত।

প্রিয়নবী (সাঃ) মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট, চরিত্র, আচার-আচরন, বিবাহ শাদী, বুনিয়াদী ইবাদাত, ব্যবসা বাণিজ্য, বিচার শাসন, যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি বেশ-ভুষা, ক্রয়-বিক্রয় তথা গোটা জিন্দেগীর একমাত্র নিখুঁত ও নির্ভূল আদর্শই তিনি। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ শাসক, শ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠ সমরকৌশলী, শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাশীল, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিক, শ্রেষ্ঠ সৈনিক, শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী। আল্লাহ তায়ালার পরে তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকূলের সেরা– শুধু তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাঁর উম্মাত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসুলদের উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মাত।

তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের সাথে যারা সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছে। সকল স্তরে সকল যুগে একমাত্র নবী রাসুল ব্যতীত সকল মানব কূলের সে সকল সাহাবায়ে কিরামই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ।

মহানবী (সাঃ) পূর্ন জীবনধারা একটি উম্মুক্ত গ্রন্থের মত কিয়ামত পর্যন্ত মানব কুলের আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহনের জন্য সংরক্ষিত। বিশ্বনবী (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমান হলো দুনিয়ার কোন দার্শনিক, শাসক বা নেতার জীবনের সকল দিকে পরিপূর্ন বিবরন চিত্র এমনি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত নেই যেমন আল কোরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ। বিরবনের মধ্যে আবেগ বা কিংবদন্তীর লেশমাত্র নেই বরং ঐতিহাসিক সত্যের রুদ্রালোকে তা স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সমুজ্জল।

এ নিবন্ধে মহানবী (সা) এর পজ্ঞা, দূরদর্শিতা, কৃশল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষনতা ও নিপূনতার কতিপয় সংক্ষিপ্ত ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

১. মদীনার সনদ ঃ

মদীনার সনদ মহানবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সবচেয়ে বড় প্রমান। তিনি এক ব্যক্তি যিনি একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ছাড়া দুনিয়ার কোন উস্তাদের নিকট একটি বর্ণও শিখেননি। আল্লাহর প্রদত্ত অহীর অসীম জ্ঞানে মদীনার সনদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীকে সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান উপহার দেন।

যে সংবিধান আভ্যন্তরিন ও আন্তজার্তিক প্রতিরক্ষা ও ন্যয়বিচার, সকল নাগরিকের ধর্মীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকারী

সকল নিশ্চয়তা ব্যবস্থা সংরক্ষিত ছিল। অপরদিকে অত্যন্ত কৌশল, দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞার সাথে সাথে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিরক্ষা, বিচার ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহর (সা) শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট বিধানের স্বীকৃতিও লিপিবদ্ধ ছিল।

২. হুদাবিয়ার সন্ধি ঃ

ষষ্ট হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদাবিয়ার সন্ধি ছিল মহানবী (সাঃ) রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার অন্যতম ঘটনা। হযরত উমর (রাঃ) এর মতো সুশাসক ও প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিও সে বছর উমরা ছাড়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন, পরবর্তী বছরে উমরা কালীন তিনদিন মাত্র মক্কায় অবস্থান, একটি মাত্র কোষবদ্ধ তরবারী নিয়ে মক্কানগরীতে প্রবেশ, মক্কা থেকে যারা মদীনায় যাবে তাদেরকে মক্কায় ফেরৎদান, মদীনা থেকে যারা মক্কা আসবে তাদেরকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনে সুযোগ প্রদান না করা ইত্যাদি শর্তে ঐক্যমত পোষন করেননি। অথচ মহা প্রজ্ঞাশীল শ্রেষ্ঠ কূশলী বিশ্বনবী (সাঃ) এমনকি রাসূলুল্লাহ শব্দ কর্তন করে সন্ধি পত্রে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ শব্দ লিখে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআনে করীমে এ সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবীন'-প্রকাশ্য বিজয় ঘোষনায় রাসুলে করীম (সাঃ) এর দূরদর্শীতার প্রশংসা করেন।

প্রকৃত পক্ষে এ সন্ধির ফলেই সে অবস্থায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এ সন্ধির ফলেই আরব সমাজে নেতৃস্থানীয় ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুক্ত ও স্বচ্ছ অন্তরে ইসলামের মহান দাওয়াতকে বুঝার, মূল্যায়ন করার ও কবুল করার সুযোগ লাভ করেছে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সহ অনেক সুধী ও বিজ্ঞ যোদ্ধা ও কূশলী ব্যক্তির ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহনের সুযোগ লাভ করেছে।

এ সন্ধির ফলেই ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে দু' বছর পর ৮ম হিজরীতে মক্কা অভিযানের ও বিজয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

৩. বদরের যুদ্ধে রাসুলের দূরদর্শীতা ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর রমজানুল মুবারকের ৮ম তারিখে মহানবী (সা) তিন শতাধিক সাহাবা ও মাত্র ৭০টি উট নিয়ে বদর উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা দেন। ১৬ই রমজান রাত্রে বদর প্রান্তে উপনীত হন। ইসলামের ইতিহাসে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী এ যুদ্ধ হুজুর (সাঃ) এক অভিনব কৌশল ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করে।

এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সঠিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে মুসলিম শক্তি অজ্ঞাত মুসলমানদের অবস্থান যুদ্ধের জন্য খুব উপযোগী ছিল না। আল্লাহ তায়ালা রাহমাতের

বৃষ্টি বর্ষন করে অবস্থান স্থলকে সুসংহত করার ব্যবস্থা করেন। সাহাবায়ে কিরাম বৃষ্টির পানিকে সংরক্ষন করার ব্যবস্থা করেন।

গভীর রাতে চুপিসারে কুরাইশ পক্ষের জনৈক ক্রীতদাস সংরক্ষিত পানি নেওয়ার জন্য আগমন করলে পাহারারত মুজাহিদরা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। প্রিয় নবী (সা) এ সংবাদ জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ভাবে তার বন্ধন মুক্তির নির্দেশ করেন। তাকে অত্যন্ত আদর যত্নে নিজের কাছে বসিয়ে মক্কার কাফিরদের জনশক্তির পরিসংখান জানতে চান। দাস বললো, আমি একজন ক্রীতদাস মাত্র। কুরাইশদের জনশক্তি সম্পর্কে আমি আদৌ কিছু জানিনা। যুদ্ধের কৌশলের কারনে বা সত্যিই তার অজ্ঞতার কারনে শত্রুসংখ্যা সম্পর্কে তার অপারগতা প্রকাশ করলে প্রিয়নবী তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। তুমি কি তাহলে আমায় বলতে পারো তারা দৈনিক কয়টি উট জবাহ করে খায়? তদুত্তরে ক্রীতদাস বলল, ১০টি করে উট খায়। তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা) সাহাবাদের সন্দেহাতীত ভাবে জানিয়ে দিলেন তাদের সংখ্যা কোন ক্রমেই এক হাজারের বেশী হবে না। সুবহানাল্লাহ! কতবড় প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী। দৈনিক উটের জবাইয়ের সংখ্যা দিয়ে তিনি শত্রু পক্ষের সংখ্যা নিরুপণ করলেন। [আসাহুস সিয়ার ৮৮ পৃঃ দ্রঃ আরদুর রউফ দানাপুরী (রাঃ)]

৪. মক্কা বিজয়কালীন অভিনব কৌশল অবলম্বন ঃ

অস্টম হিজরীতে মক্কা অভিযানে শত্রু পক্ষের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে রক্তপাতহীন বিজয়ের ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরীর রাসূলুল্যাহ অসাধারন প্রজ্ঞা ও বিস্ময়কর কৌশল অবলম্বন করেন। ১০ই রমজান অষ্টম হিজরীতে মদীনা থেকে শাণ ও শওকতে রওয়ানা দিয়ে ১০,০০০ (দশ হাজার) মুজাহিদের কাফেলা নিয়ে মক্কা অভিযানে রওয়ানা দেন। মাআয যাহবান যা বর্তমানে ওয়াদিয়ে ফাতেমা নামে পরিচিত তথায় রাত্রিকালে তাবু স্থাপন করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবাদের বিস্তীর্ন ময়দানে ছড়িয়ে তাবু স্থাপনের এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথক চুলো জ্বালিয়ে খাদ্য প্রস্তুত ও পায়খানা পেশাবখানা কম করে তৈরীর নির্দেশ দেন। রাতের অন্ধকারে কুরাইশগন মুসলিম জনশক্তির পরিসংখ্যান জানার উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করেন। তারা দূর হতে দাঁড়িয়ে চুলোর সংখ্যা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করে যে, তোমরা গিয়ে দেখে এসো তোমাদের ভাতিজা মুহাম্মদ (সা) কত বড় হয়েছে। তার সৈন্যের সংখ্যা গননা করা তো দূরের কথা ওদের চুলোর সংখ্যা গুনে আমরা শেষ করতে পারিনি। এ সংবাদ পেয়ে মক্কার কাফিরদের যুদ্ধের আকঙ্খা মিটে গেল। তাদের মনোবল ভেঙ্গে তারা নিরাশ ও হতাশ

www.pathagar.com

হয়ে রাতের শেষ ভাগে সোবহে সাদেকের সময় আবার কতিপয় গুপ্তচর মুসলিম জনশক্তির পর্যবেক্ষনের জন্য পাঠালে এবারও তারা রাসুলুল্লাহ দশ হাজার সেনা বাহিনীর জন্য স্বল্প সংখ্যক পেশাব খানা ও পায়খানা প্রস্তুত করায়, সাহাবায়ে কিরাম সালতের জামায়াতে উপস্থিত হওয়ার জন্য পেশাব, পায়খানার কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রেরিত গুপ্তচরেরা এবারও কুরাইশ সরদারের নিকট সংবাদ পরিবেশন করলো যে, মুসলিম জনশক্তির সঠিক পরিসংখ্যান তো দুরের কথা তাদের পেশাব পায়খানার সামনে অপেক্ষমান কাতার গুনেই আমরা শেষ করতে পারিনি। কাতারের আড়ালে তাদের প্রকৃত জনশক্তি যে কি পরিমান তা আন্দাজ করাও কঠিন। মহান কূশলী প্রজ্ঞাশীল সমরনায়ক রাহমাতুল্লিল আলামীন বিনা রক্তপাতে কুরাইশদের মনোবল ভেঙ্গে বিনা যুদ্ধেই মক্কা বিজয় করলেন।

এ ঐতিহাসিক অভিযানে কুরাইশদের মধ্য হতে মাত্র ৬ ব্যক্তির প্রান হানির মধ্যে ৪ জন ছিলেন যাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা, কবিতা রচনার ও আবৃত্তির মাধ্যমে মহানবী (সা) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার কারনে তাদের অনুপস্থিতিতেই ইসলামী আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড ঘোষনা করা হয়েছিল। এক ব্যক্তিকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ভুলক্রমে হত্যা করেন ও অপর ব্যক্তি সশ্রস্ত্র মুকাবিলার কারনে নিহত হয়।

৫,. রাসুলুল্লাহর সমর কৌশল ঃ

(১) রাসুলুল্লাহর (সা) রন কৌশল ছিল যুদ্ধ বা রক্তপাত না ঘটিয়ে শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পনের পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে করে তারা নিরুপায় হয়ে বিরোধিতা বর্জন ও সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়।

(২) তিনি কখনও শত্রু পক্ষকে নির্মূল ও উৎখাত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন না। তাদের হৃদয়ে ঈমানের নূর পয়দা করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহনের কৌশলই তিনি অবলম্বন করতেন।

(৩) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বদা মজবুত রাখতেন, যাতে শত্রুপক্ষ মুসলিম শক্তির উপর আক্রমনের মনোভাব চিরতরে ভেঙ্গে যায়।

(৪) যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ নিপূন সেনা নায়কের মতো সেনাবাহিনীকে মুক্দম (অগ্রগামী দল) খালফ (পশ্চাত প্রতিরক্ষা দল) মায়মাকা (রাইট ফোর্স) মায়সারা (লেফট ফোর্স) ও ক্বালব (সেন্টার ফোর্স) পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতেন।

(৫) যুদ্ধ কালীন সময়ে নিরস্ত্র, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা গৃহে আবদ্ধ নর-নারী, অবুঝ শিশু কিশোর মন্দির ও গীর্জার প্রতি আক্রমন করতে নিষেধ করতেন।

www.pathagar.com

৬. বন্দীদের উপর নির্যাতন চালাতে কঠোর ভাবে নিষেধ করতেন।

৭. অভিযানের প্রস্তুতি গোপন রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করতেন।

৮. মুকাবিলা শুরু করার পূর্বে ইসলাম গ্রহন অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা বর্জনের আহবান করতেন।

৯. পরাজিত শত্রুর প্রতি সর্বদা উদারতা ও ক্ষমা করে দিতেন। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে পরম নিষ্ঠার সাথে দোয়া করতেন।

১০. খায়বারের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলেছেন " তোমার হাতে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার চেয়ে একজন মানুষও যদি তোমার দ্বারা হিদায়েতের পথে আসে তবে এটি তোমার জন্য তোমার রবের এক মস্ত বড় নিয়ামত।

৬. আন্তর্জাতিক নীতি বিশারদ মহানবী ঃ

আন্তর্জাতিক নীতি কৌশলের ক্ষেত্রে মহানবী (সা) বিশ্বের **সর্বশ্রেষ্ঠ** ও **সর্বোত্তম পররাষ্ট্র নীতিবিদ।**

(১) মানব কল্যান ও মানুষের প্রতি প্রেমই ছিল মহানবী (সা) এর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য

(২) বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার পরিবর্তে ইসলামের প্রতি আকর্ষন, আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতের **সম্প্রসারণই ছিল মহানবী (রা)** এর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য।

(৩) ভিন্ন ধর্মের দেব দেবীর প্রতি নিন্দাবাদ করা, গীর্জা ও ধর্ম মন্দির ধ্বংস থেকে বিরত রাখা ছিল মহানবী (সা) এর পররাষ্ট্র নীতির আরেক উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৪) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মজলুমের সহযোগিতা ও যালিমের যুলুমের **প্রতিরোধ ছিল মহানবীর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম কৌশল।**

(৫) সকল শ্রেনীর মানব সমাজের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান, জীবন, সম্পদ ও ইযযতের নিরাপত্তা বিধান ছিল রাহমাতুল্লিল আলামীনের পররাষ্ট্র নীতির আরেক প্রধান মূলনীতি।

(৬) ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রনায়কদের সাথে সৌজন্যমূলক মার্জিত আচরন, প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সম্বোধন ও উপস্থাপন, সমাজপতি ও ধর্ম নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ছিল বিশ্বনবীর (সঃ) পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য।

(৭) ইসলামকে এক ও আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সরওয়ারে আলম (সঃ) এর পররাষ্ট্রনীতির সর্বাধিক উলোখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ লক্ষ্যেই আন্তজাতিক পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্যোগ গ্রহন করেন। মানব জীবনে মানব রচিত সকল মতবাদেব প্রাধান্যকে ক্ষুন্ন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

www.pathagar.com

ও ইসলামী জীবন দর্শনের বিজয় প্রতিষ্ঠাই মহানবী (সঃ) এর পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর প্রায় দু'বছর সকল প্রকার যুদ্ধ -বিগ্রহ বন্ধ থাকার ফলে তিনি তদানীন্তন দুই বৃহৎ শক্তি, গ্রীক ও পারস্যের বাদশাহের দরবারে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে দূত প্রেরণ করেন।

যাদের নিকট যে সকল দূতদেরকে পাঠান ঃ

(১) রোম তথা গ্রীকের অধিপতি সায়ের (কাইজার) নিকট হযরত দাহিয়া কলবী (রাঃ) কে। (২) পারস্য অধিপতি খসরু পারভেজ (কিসরা)-এর নিকট হযরত আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাঃ) কে। (৩) মিশর অধিপতি আযীয মিসর এর নিকট হযরত হাতিব বিন আবি বালতায়া (রাঃ) কে। (৪) ইয়ামামার গভর্নরের নিকট হযরত সালত বিন আমর (রাঃ) কে। (৫) ও সিরিয়া সীমান্তে গাযনের গভর্নর হারিসের নিকট হযরত শাহজাহ বিন ওয়াহাব আল আসাদীকে (রাঃ) দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।

আন্তজার্তিক নীতি তথা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোন পত্রে (ক) প্রেরক ও প্রাপকের পরিচিতি (খ) প্রাপকের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন। (গ) প্রাপকের নিকট প্রেরকের আদর্শের সুস্পষ্ট প্রকাশ (ঘ) প্রাপকের নিকট আদর্শের আহবান (ঙ) দূত মারফত প্রেরিত শীলমোহর লাগানো। (চ) প্রেরক প্রাপকের নিকট ও প্রাপক প্রেরকের স্বীয় মর্যাদা ও মান সম্পন্ন উপঢৌকন প্রেরণ, আন্তর্জাতিক নীতির অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য। আমরা তদানীন্তন রাষ্ট্রপতিদের নিকট মহানবীর দূত ও পত্র পেরণের মধ্যে উল্লেখিত সকল বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই।

গ্রীক অধিপতিকে মহানবী (সঃ) শুধু গ্রীক সম্রাট হিরাকলের নিকট রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত পত্রের ভাষা দূত প্রেরণের মধ্যে উল্লেখিত সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। প্রেরিত পত্রের ভাষা ছিল "আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ পত্র আবদুল্লাহর পুত্র আল্লাহর রাসুল-মুহাম্মদ (রাঃ)-এর নিকট হতে গ্রীকদের মহান অধিপতি হিরাক্লিয়াসের নিকট। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুণ, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আপনার.কারণে গ্রীক বাসীরা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকে তবে তার অপরাধ আপনার উপর বর্তাবে। অতঃপর তিনি আল কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করেন।

" হে কিতাবী সম্প্রদায়, আসুন। আমরা এক এক মহান বাক্যকে সম্মিলিতভাবে স্বীকার করে নেই। আমাদের আপনাদের মধ্যে মহামিলন ও ঐক্যের সেতু বন্ধন সৃষ্টি

করবে। আর তা হচ্ছে এই যে, কেউ এক আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তির বন্দেগী করবোনা।

প্রিয় নবী (সঃ) আন্তজার্তিক নীতিতে দূত প্রেরণের মত উদার নীতি অবলম্বন করেছেন। মহানবী (সাঃ) -এর প্রেরিত তার এক পত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পত্রে তিনি "মালিকির রুম' শব্দ ব্যবহার না করে অর্থাৎ গ্রীকের অধিপতি শব্দ ব্যবহার না করে মালিকে আযীমির রুম" অর্থাৎ গ্রীকের মহান অধিপতি হিরাক্লিয়াস বলে সম্বোধন করেছেন।

অতঃপর ঐ দিনই রোপ্যের একটি আংটি তৈরি করেন যার মধ্যে " আল্লাহর রসুল শব্দটি মাঝখানে ও মুহাম্মদ শব্দটি নিম্নে অংকিত ছিল। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব সর্বোপরি আল্লাহর রাসুল হিসেবেই মুহাম্মদ (সঃ) স্তর বিন্যাস সুন্দর ভাবে প্রমাণিত ছিল। এ সীল মোহরই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দূত মারফত সকল পত্রে সীল মোহর হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কেউ কেউ রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে পাশ্চাত্যের রাষ্টদর্শনের পরিভাষায় কুটনীতিবিদ বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে পরিভাষাগত দিক দিয়ে "কুট" শব্দটি ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। রাষ্ট্রদর্শনে কুটনীতির ব্যবহার দুনিয়ার সর্বাধিক ধূর্ত রাষ্ট্র দার্শনিক ম্যাফিয়াভেলী প্রবর্তন করে। রুশোও তার 'সামরিক চুক্তি' গ্রন্থে তার অনুসরণ করে।

আর ইসলামের ইতিহাসে কুটনীতির উদ্ভব করেছেন কোন কোন উমাইয়া শাসক। যদিও প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কুটনীতি শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তথাপিও আমাদের প্রিয়নবী (সঃ) সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী পাশ্চাত্য ম্যফিয়াভেলী রাষ্ট্রদর্শনের পরিভাষার অর্থে নিছক কোন কুটনীতি বিশারদ ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়নীতি ও আন্তজার্তিক নীতি বিশারদ সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিচারক।

রূপের সৌন্দর্য্যে ও গুনের সৌন্দর্যের পুরিপূর্ন আঁধার ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয়নবী মুহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ)।

তথ্য পঞ্জী ঃ

(১) সিরাতুন্নবী-শিব্বির আহমদ উসমানী ও শিবলী নোমানী (রহঃ)।

(২) আসাহুস সিয়ার-আবুদর রউফ দানাপুরী (রহঃ)।

(৩) মুহসিনে ইনসানিয়াত-নয়ীম সিদ্দিকী ও বিভিন্ন গ্রন্থরাজী।

[সীরাত স্মারক '৯৭ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মানবতা ও রাসুলুল্লাহ (সঃ)

মোহাম্মদ ইয়াকুব শরাফতী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মনোনীত ইসলামও তার প্রচারক নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর জীবন-চরিতকে তাঁর অনুগামীদের জন্য অনুকরণযোগ্য আদর্শ পথ বলে নিদের্শনা দিয়েছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অনুসরণকে নিজের অনুসরণ বলে ঘোষনা দিয়েছেন, "যদি তোমরা মহান আল্লাহকেই ভালবাস বলে দাবি কর তবে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন।" (আল ইমরান-৩)

তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে " আমি তোমাদের মতই মানুষ যার উপর ওহী নাযিল হয়।" আর এটাই ঠিক যে, ওহী কোন সাধারণ মানুষের উপর নাযিল হয় না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, "আমি তোমাদের কারও মত নও, আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে রাত যাপন করি এবং তিনি আমাকে পানাহার করান।

তিনি যেমন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তেমনি এত গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে ছিল যে, ইতিহাসে কোন মহা-পুরুষের মধ্যে তাঁর গুনের কাছাকাছি গুণের অধিকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের একটিও লক্ষ্য করা যায় না। যা কখনও ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক ভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি এমন এক ব্যক্তি যার জীবনীতে ভুল নামক শব্দটির সংযোগ হয়নি।

তিনি ছিলেন এমন এক সম্রাট যাঁর করতলগত ছিল বিশাল সাম্রাজ্য। যাঁর আদেশ অমান্য করলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হত অথচ সেই তিনি ছিলেন নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপনকারী কপর্দকহীন একজন সহজ-সরল মানুষ। সবকিছু থাকার পরও তিনি ভাবতেন তাঁর নিজের যেন কিছুই নেই, সব কিছুই মহান আল্লাহর হাতে। সম্পদ বোঝাই মালবাহী উটের সারি রাজধানীর পথে আসত, রাজ্য- কোষাগার ভরে যেত। অথচ এসব কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তাঁর ঘরে চুলা জ্বলতো না। এভাবে চলে যেত দিনের পর দিন। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র সেনাপতি যিনি নিরস্ত্র মুষ্টিমেয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন হাজার হাজার অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর উপর। তিনি এমন বীর হওয়া সত্বেও নিঃশব্দে স্বাক্ষর করেন সন্ধিপত্রে। শান্তি প্রিয় দয়ালু নবী এমন ছিলেন যে, স্বহস্তে কখনও কারও রক্ত ঝরাননি। ব্যক্তিগত কারনে তিনি কখনও কোন অত্যাচারী শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেননি বরং হেদায়েতের জন্য দোয়া করেছেন, মঙ্গল কামনা করেছেন। একমাত্র আল্লাহর গজবের ভয় দেখিয়ে হুশিয়ার ও ধমক দিয়েছেন তাদেরকেই। আল্লাহ ও ইসলামের শত্রু তাদের তিনি ক্ষমা করেছেন। সর্বদা

www.pathagar.com

তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্তক করেছেন, বুঝাতে চেয়েছেন আলো আর আঁধারের মধ্যে পার্থক্য কি?

ইতিহাস যখন তাঁকে একজন তেজস্বী সফল সেনা নায়ক বলে অভিহিত করে তখনি অভিহিত করে রাত্রি জাগরণকারী, ক্রন্দনশীল, এক আবেদ জাহেদ রূপে। ঐতিহাসিক যখন তাঁকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ী বীর বলে চিহ্নিত করে তখনি তাঁকে দেখা যায় খেজুর চোবড়ার তৈরী বালিশে মাথা রেখে খালি চাটাইয়ে শায়িত। দু'জগতের বাদশাহ্‌কে এমনভাবে যে কখনও তার শরীরে পাতার ছাপ অংকিত হয়ে যেত। অথচ তখন তার ভয়ে বিদ্রোহী আরবদের রাতে ঘুম হয়েছিল নিষিদ্ধ। চতুর্দিক থেকে দাম্ভিকতার আত্নসমর্পন ছিল নির্ধারিত। তপ্ত আরবের দিকদিগন্ত থেকে যখন আগত দ্রব্য সম্ভারে নবীর মসজিদ প্রাঙ্গণ পাহাড়সম উচু হত তখনও দেখা যেত নবী পরিবারকে উপবাস যাপন করতে। যখন যুদ্ধবন্দীরা মুসলমানেদের ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল অথচ তখন নবী তনয়া ফাতেমা (রাঃ) গমের যাতাঁ পিষতে পিষতে এবং পানির মশক টেনে হাতে ফোস্কা আর শরীরে দাগের চিহ্ন নিয়ে পিতার দরবারে একটি দাসীর জন্য উপস্থিত হয়ে খালি হাতে ফিরে যান।

মানব-দরদী এই মহান ব্যক্তি অতি অল্প বয়স থেকেই মানুষের দুঃখ কষ্ট অসহায়তাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, তাদের দূর্দশাকে নিজের মনে করতেন, এতিম অসহায়দের আদর করতেন আপন শৈশবকে উপলব্ধির মাধ্যমে। আর সে উপলব্দি থেকে তিনি কৈশোরেই গঠন করেন মানবতার সেবার লক্ষ্যে একটি সাহায্যকারী সংস্থা, যার নাম "হিলফূল ফুযুল"। একদল যুবক নিয়ে গঠিত এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ১. নিঃস্ব-অসহায় ও দুর্গতদের সেবা দান করা ২. অত্যাচারীদের প্রানপণে বাধাদান করা ৩. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ৪. অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করত। এ সংস্থা আজ আধুনিক বিশ্বের সমাজ কল্যাণকামী সব সংস্থারই মডেল হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র নবী যাকে সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে এবং এক অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষ। যাঁর জীবনেতিহাস পুরিপূর্ণ ভাবে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। এ ব্যক্তির শুধুমাত্র জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নয় বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি দিক প্রতিটি মুসলমানের জন্য পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার লক্ষ্যে পালনের নির্দেশ রয়েছে। কেননা তাঁর অনুসরনকেই ইসলামের অনুসরণ তথা আল্লাহকে পাবার একমাত্র পথ বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা এজন্য যে, তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ, উপদেশ, ইশারা, চলাফেরা ইত্যাদি

www.pathagar.com

নানাবিধ ক্রিয়াকর্মসহ এই ব্যক্তির বিশদ বিবরণ অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও অসামান্য যত্ন ও শ্রদ্ধার সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেখানে সংসার এবং সমাজ জীবনের কোন অংশই বাদ পড়েনি।

মানব জীবনের এমন কোন দিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বিষয়ে তিনি চিন্তা করেননি এবং এর ফলাফল সম্পর্কে উপদেশ ও সতর্কতা প্রদান করেননি। প্রতিটি মানুষের একথা অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসুল (সা) শুধুমাত্র এক আল্লাহর প্রেরিত নবীই ছিলেন না, পাশাপাশি একজন সংসারী ও সমাজসেবীও ছিলেন।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি জনসাধারণকে সৎ, শিষ্টাচার, দয়ালু এবং ন্যায়-পরায়ন হওয়ার শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর এ শিক্ষানীতি মসজিদ ভিত্তিক সীমাবদ্ধ রাখেননি এবং সংসার গৃহ হাট-বাজারে তিনি তাঁর আদর্শ নীতি মালা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। কোন বিদেশী প্রতিনিধি দল সাক্ষাতে আসলে তাদের সাথে তিনি আন্তঃ রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এবং এর লক্ষ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ পূর্বক ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর এই পররাষ্ট্র বিষয়ক ধারণাকে কেন্দ্র করেই ইসলামে আইনও পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধের সময় তিনি আবিষ্কার করতেন যুদ্ধ ও শান্তির জন্য বিশেষ নিয়ম-কানুন। তাঁর সহচরদের মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তিনি তার সমাধান করতেন সঠিক যুক্তি, বাস্তব পরিস্থিতি ও ন্যায়নীতির মাধ্যমে। ফলে তাঁর বিচারবিষয়ক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ইসলামের দেওয়ানী আইন ভিত্তি রূপ লাভ করে এবং রাষ্ট্রের ব্যক্তি নাগরিক ও সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সংরক্ষরণের ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত মৌলিক আইনগত সিদ্ধান্ত গুলোকে কেন্দ্র করে রচিত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সাবংবিধানিক আইন।

অতএব, তাঁর জীবনাচরণ সর্বকালের সকল স্তরের সকল পেশার নারী-পুরুষের জন্য এক অত্যন্ত অনুসরণযোগ্য আদর্শ, যেখানে কোন ভুলের অবকাশ নেই। যে সদাচার, সততা ও মহানুভবতার গুণাবলী অর্জন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জীবন যে কোন মানুষের জন্য পূনাঙ্গ আর্দশ ও দৃষ্টান্ত। নৈতিক ও আত্মিক জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে পূর্নতা লাভের সংগ্রামে তাঁর জীবনের এই দুটি দিক সর্ব যুগের নর-নারীর জন্য পথনির্দেশের এক চিরকালীন উৎস। বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যে মহৎ ও উচ্চতম আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন তা সর্বক্ষেত্রে সকল মানবের পক্ষ্যে এক অনুপম জীবন-দর্শন হিসাবে অপরিহার্য অনুসরযোগ্য।

বিনয় ও নম্রতা ঃ রাসুলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নম্র মার্জিত

www.pathagar.com

রুচিবোধ সম্পন্ন ও সদাচারী ছিলেন। সর্বদা সকলের প্রতি ছিল তাঁর একই ব্যবহার তিনি সব সময় হাসি-খুশী ও উৎফুল্ল চিত্তে থাকতেন। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে 'আল বারা' কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মুহাম্মদ (সা) এর মুখমন্ডলের উজ্জ্বল দেখতে তলোয়ারের দীপ্তির মত ছিল কিনা? জবাবে তিনি বলেন তা ছিল বরং চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বর্ণনা করেছেন রাসুলুল্লাহ কখনও খারাপ বা অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করনেনি। এমন কি অসতর্কভাবেও কখনও কোন অশালীন শব্দ তাঁর মুখ থেকে বের হয়েনি। বরং রাসূল (সা) বলতেন " এই পৃথিবীতে বিনয়কে খুব হাল্কা মনে হলেও শেষ বিচারদিনে সগুণ হিসাবে এর ওজন অত্যন্ত ভারী হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস বলেন, " হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় বিনয়ী ব্যক্তি তার চোখে কখনও পড়েনি"। যে কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে রাসুলই (সা) প্রথম সালাম দিতেন। আগন্তুককে সুযোগ না দিয়ে এরপর কুশলবার্তা জিজ্ঞেসা করতেন। কোন লোক একান্তে যদি তার সাথে কথা বলতে চাইত তবে তিনি তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং সেচ্ছায় সে প্রস্থান না করলে তিনি তার থেকে ফিরে আসতেন না।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন "প্রতিটি উত্তম বাক্যই দানশীলতা এবং প্রতিবেশীদের সাথে তোমাদের বিনয় নম্রতা সেই নিখুত দৃষ্টান্ত। আর মহানবী (সা) হলেন বিনয় নম্রতার সেই নিখুত দৃষ্টান্ত। রুক্ষ অমার্জিত ও অশিক্ষিত আরবদের তিনি আপন চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা হাতে কলমে শিক্ষা দেন, যার ফলে মুসলমানরা বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়।

দয়া ও সহমর্মিতা ঃ রাসুলে করীম (সা) ছিলেন বিনয় ও নম্রতার পাশাপাশি অতিশয় দয়ালু ও শ্রেষ্ঠ সহধর্মী হৃদয়ের বিশালতায়। তাঁর তুলনায় দ্বিতীয় কেউ হতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টিতে দয়া ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে সবাই ছিল সমান। এমন কি শত্রুরা কখনও বঞ্চিত হত না তাঁর দয়া ও সহানুভূতি থেকে। আনাস (রা) বলেন "দশ বছর আমি আল্লাহর নবীর সেবা করেছি কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনও তিনি একটি বারের জন্য কোন দোষত্রুটির কারণে আমাকে কিছু বলে তিরস্কার করেননি বা কেন তুমি এ রকম কাজ করলে অথবা কেন তুমি এমন কাজ করলে না, এ ধরনের কোন অভিযোগ তোলেননি।

তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি মদীনায় রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন কালে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঘোর দুশমনসহ আটক ও যুদ্ধ

www.pathagar.com

বন্দীদের প্রতি অতি উদারতা ও এক সহৃদয়তাপূর্ন আদর্শ মানবের আচরণের পরিচয় দেন।

দারিদ্রদের প্রতি ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক দিন আমি নবীর মসজিদে বসেছিলাম আর দরিদ্র মুহাজিরগণ মসজিদের এক কোণে গোল হয়ে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর রাসুল (সাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তাদের মাঝখানে গিয়ে বসলেন। তা দেখে আমি দাঁড়ালাম এবং মুহাজিরদের সন্নিকটে গিয়ে বসলাম। তখন রাসুল (সাঃ) - বললেন " দরিদ্র মুহাজিরদের সুসংবাদ দাও, ধনীদের চল্লিশ বছর আগে তারা বেহেশতের বাগিচাসমূহে প্রবেশ করবে। "আমি লক্ষ্য করলাম আর ইচ্ছে হল ঐ সময় যদি আমি তাদের মধ্যে থাকতে পারতাম বা তাদের একজন হতাম।

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল (অভাবগ্রস্ত) আমাকে তাদের খোঁজ-খবর নিতে দাও। কারণ তারা তোমাদের মধ্যে আছে বলেই তোমাদেরকে খাদ্যের সংস্থান ও সহায়তা দেয়া হয়েছে।

ক্রীতদাসদের প্রতি রাসুল (সা) -এর সব সময়ই ছিল সহানুভূতিশীল ও সদয় দৃষ্টি। তিনি তাদের সম্পর্কে বলতেন 'তারা তোমাদেরই ভাই।" একবার এক ব্যক্তি রাসুল (সা) -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- "হে আল্লাহর রাসুল (সা) ক্রীতদাসদের অপরাধ কতবার আমার পক্ষে ক্ষমা করা উচিত?" রাসুলে করীম (সা) তার কথার জবাব না দিয়ে চুপ থাকলেন, এরপর লোকটি পর পর একই প্রশ্ন করলে তৃতীয়বার রাসুল (সাঃ) জবাব দিলেন "প্রতিদিন অন্তত সত্তর বার তাদেরকে ক্ষমা করবে।"

নারীদের প্রতিঃ নারী-পুরুষদের মধ্যে কোন পার্থক্যের অবকাশ রাখেনি। উভয়কে সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর (রা) বলেন, "মক্কায় অবস্থানকালে স্ত্রীলোকদের প্রতি আমাদের তেমন কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। কিন্তু মদীনায় তাদের প্রতি অত্যন্ত সদ্ভাব পূর্ণ আচরণ করা হত। কেননা, রাসুল (সা) তাঁর কথা ও নির্দেশ দ্বারা মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে তাদের স্থান সমাজ মর্যাদাশীল আসনে উন্নীত হয়। ইসলাম যে ভাবে নারীর স্থান, সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা আর কোন মতবাদই করতে পারেনি। মহানবী (সা) নারীদের সম্পর্কে বলেন "তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন শাসনকর্তা, কাজেই আল্লাহ প্রত্যেককে তাদের প্রজাদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।" (মেশকাত) তিনি আরও বলেন "তোমাদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ যারা

www.pathagar.com

তাদের স্ত্রীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করে। কোন মুসলিম তার স্ত্রীকে ঘৃনা করবে না। সে যদি একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য আর একটি গুনের জন্য তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের স্ত্রীদেরকে সদুপদেশ দাও, ক্রীতদাসীর মত তোমাদের সম্ভ্রান্ত স্ত্রীকে প্রহার করো না। তোমরা যখন খাবে স্ত্রীদেরও তখন খেতে দিবে, তোমরা যখন নতুন কাপড় পরবে তখন তাদেরকেও নতুন কাপড় দিবে।

ইসলাম নারীকে সম্মানিতা স্ত্রী, মর্যাদাশীলা মা ও স্নেহশীল বোন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারকে ইসলাম ইবাদতের পরেই স্থান দিয়েছে। এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইল, " হে রাসুল (সা)! সকল আত্মীয়দের মধ্যে কে আমার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য বা সাহচর্য পেতে পারে? নবী করীম (সা) বললেনঃ তোমরা মা। " লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, এর পর কে? নবী (সা) বললেন, "তোমার মা"। লোকটি আরার জিজ্ঞাস করল, এর পর কে? রাসুল (সা) বললেন "তোমার মা"। তার পর লোকটি আবার প্রশ্ন করল এর পরে কে? রাসুল (সা) বললেন, তোমার পিতা"। (বোখারী ও মুসলিম)।

ইসলাম পিতার চেয়ে মাতাকেই তার অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। মুহাম্মদ (সা) বলেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। "সন্তানের শিক্ষক হিসাবে তিনি নারীকে শুধু ঘরে আবদ্ধ রেখে দেননি, বরং তিনি নারীকে তার যোগ্যতার মাধ্যমে সমাজের সমস্ত কর্মকান্ডে শরীয়ত সম্মতভাবে অংশগ্রহনের অধিকার নিশ্চিত করেন। শুধু জ্ঞান আর উপদেশ বিতরণই নয় তিনি যুদ্ধের সময় মহিলা স্বেচ্ছাসেবী দলও গঠন করেন।

মহানবী(সা) ইসলামের প্রাথমিক সময় থেকেও বিপদ সংকুল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সচেতন ও উপযুক্ত নারীদেরকে শুধু সংসার আর সামাজিক ক্ষেত্রে নয় বরং যুদ্ধক্ষেত্রেও সেবিকার কাজে নিয়োগ করেন। তিনিই প্রথম প্রমান করেন যে দৈহিক সামর্থ ও যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে নারী-পুরুষের কাজ যেমন গৃহে আছে তেমনি আছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে। একমাত্র ইসলামই সমাজ-সংসারে নারী-পুরুষ দুটি দেহের এক অবেচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নারীকে দান করে নিশ্চিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাসুলে করীম (সা) বলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি দুই শ্রেণীর দুর্বল লোকদের হক অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি– এতিম ও নারি। (নাসাঈ)

আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ঃ মহান আল্লাহর প্রেরিত নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) সব সময় তার আত্মীয়স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত বিনয় ও সদয় ব্যবহার করতেন এবং লোকদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ ও সতর্ক করতেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু

www.pathagar.com

হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা) বলেন, তিনটি বিষয় কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকলে আল্লাহতা'লা তার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দিবেন এবং স্বীয় রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রশ্ন করা হল, সে তিনটি বিষয় কি? তিনি বলেন যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়বে এবং যে তোমার প্রতি জুলুম করে তুমি তাকে মাফ করে দিবে। তুমি এসব করলে আল্লাহপাক তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (তিবরানী, হাকেম, আল আদাবুল মুফরাদ) রাসুলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, " মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমার নাম রহমান, আমি আমার নামকে 'রেহেম' থেকে উদ্ভুত করেছি। যারা এই রেহেম তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে আমি তাদের সম্পর্ক রক্ষা করব। আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। (তিরমিযী আবু দাউদ)

রাসুল (সা) সকল মুসলমানের দেহকে একই দেহ মনে করতে বলেছেন এমন ভাবে যে, দুঃখ কষ্টে সবাই যে সবার প্রতি সহানুর্ভতিশীল সাহায্যকারী হতে পারে। যেমন দেহের এক অংশ কেটে গেলে অন্য অংশ ব্যথাবোধ করে রাত জাগ্রত থাকে।

অনাথ অসহায়দের প্রতি ঃ রাসূল (সাঃ) ছিলেন অনাথ এতীমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবকই তিনি নিজে যেমন এদের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল ছিলেন তেমনি তাঁর সাহাবী (রা) অনুগামীদেরকে সব সময় এসব অনাথ অসহায়দের প্রতি তত্ত্বাবধান ও দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে সর্তক করতেন।

রাসূল (সা) নিজেও ছিলেন এক পিতৃমাতৃহীন এতীম বালক। তাই আপন অভিজ্ঞতা থেকে এসব অসহায়দের দুঃখকষ্ট গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। আর একজনই তিনি বলেছেন, যে ঘরে কোন এতিম বালক-বালিকার সাথে সদ্ধ্যবহার করে সে ব্যক্তির গৃহটি সর্বোত্তম। আর মুসলমানদের জন্য সে গৃহটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যেখানে একজন অনাথ শিশু বাস করে যার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়।

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসে অনাথ অসহায়দের প্রতি সদয় আচরণের কথা বলা হয়েছে। এদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা এতীমদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে তাদের কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে তাদের মুখ থেকে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে।

প্রিয় নবী (সা) তাঁর কথা ও কাজে এসব অসহায়দের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নমুনা পেশ করেছেন। একাজের ফজিলত কত বড় সে বিষয়ে তিনি তাঁর সহচর ও অনুগামীদের সর্বদা শিক্ষা দেন। সমাজে ছিন্নমূল হিসাবে এসব সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহন এবং তাদের প্রতি।

[সীরাত স্মারক '৯৭ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হযরত মুহম্মদ ও পাশ্চাত্য জগৎ

আবদুল মওদুদ

বর্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর মতে বিংশ শতকে সাতটি শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ ধর্ম প্রচলিত-তিনটি বৌদ্ধধর্ম ঃ সিংহল ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রচলিত হীনযান বৌদ্ধধর্ম, পূর্ব-এশিয়া, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধ-উত্তর যুগের হিন্দু ধর্ম; তিনটি ইহুদী সম্বন্ধীয় ধর্ম, যেমন–ইহুদী ধর্ম,খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম। আর আছে জুরায়স্ত্র ধর্ম দক্ষিণ পুর্ব ইরানে ও পশ্চিম-ভারতে। এগুলির মধ্যে ইসলাম সর্বশেষ ধর্ম । ইসলাম দাবী করে প্রত্যাদৃষ্ট ধর্মের শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল। এজন্যে ইসলামকে বলা হয় ধর্ম-ইতিহাসের উত্তরাধিকার।[১]

টয়েনবী আরও বলেনঃ প্রফেটদের মধ্যে আধুনিক হচ্ছেন মুহম্মদ।তিনি ইতিহাসের পূর্ণালোকে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও দাবী করেননি নিজেকে অতি মানব (superhuman)হিসেবে। তাঁর দাবী ছিল, তিনি কেবল মাত্র সর্বশেষ নন, প্রফেট ধারা বাহীদের তিনি শেষ প্রতিনিধি, এবং তাঁর পরে আর প্রফেট নেই। তিনি আরও দাবী করতেন যে, দেবদূত প্রধান জিবরাইলের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বাণী প্রাপ্ত হতেন এবং শব-ই-মেরাযে (Night of pwer) তিনি বেহেশতে আরোহণ করেন ও সপ্তম জান্নাতে ('ছিদরা-তুল-মন্তাহা) আল্লাহর সান্নিধ্য (দিদার) লাভ করেন।[২]

টয়েনবীর কিছুদিন পূর্বে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ পন্ডিত গীব লিখেছেনঃ ইসলাম নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পূর্ণলোকে বর্ধিত হয়েছে। কোরআন অক্ষত অবস্থায় বিকশিত হয়েছে এবং পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক কাঠামো নিয়েই টিকে আছে।

কিন্তু পরিষ্কার ঘটনা ও তার আশ্চর্য ফলাফল, এবং কার্য ও কারণ মধ্যে যে ফাঁক থেকে যায়, তারও পূরণের প্রয়োজন হয়। এজন্যে দেখা যায়, মুহম্মদের যত জবিনীকার আছেন তত বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কেউ তাঁকে চিত্রিত করেছেন মৃগীরোগী হিসেবে, কেউ করেছেন সমাজ বিদ্রোহীরূপে, আবার কেউ করেছেন মোরমনের ভূমিকায়।[৩]

এ সব চরম মতবাদ বহু পন্ডিতদের সূক্ষ্ম আলোচনায় মিথ্যা হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। তবুও তাঁর জীবনী ও কৃতকর্ম সম্বন্ধে নতুন নতুন বিষয় আমদানী করার প্রবণতাও অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

প্রত্যেক সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তির মতো হজরত মুহম্মদ একদিকে বাহ্যিক অবস্থার চাপ ও পীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন, অন্যদিকে সমসাময়িক যুগ ও জগতের চিন্তাধারা এবং প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে নতুন পথ কেটে চলেছেন। ঐতিহাসিক গবেষকের কর্তব্য হচ্ছে, এই প্রতিভা ও পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত নিরাসক্ত মন দিয়ে অধ্যয়ন করা, আলোচনা করা ও তার যথাযথ ব্যাখ্যা করা ও তার একটি নিঃসন্দেহে বাস্তব সত্য এই যে, মুহম্মদের যতো আকর্ষণ, যতো আবেগ ছিল ধর্মের দিকে ,তার মধ্যে এতোটুকু ফাঁকি ছিল না। তাঁর ভূমিকার প্রথম থেকেই মানুষ ও ঘটনাসমূহের মুল্যাবোধে ছিল আল্লাহর অমোঘ ইচ্ছা অনুধাবন করা এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের উদ্দেশ্য অনুসরন করা। মদিনায় তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা, তাঁর পারিবারিক জীবন এবং তাঁর বহুবিবাহ এক পক্ষের হাতে কঠোর বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়েছে, আবার অন্যপক্ষের দ্বারা প্রবল অন্ধভাবে সমর্থিত হয়েছে। হাদিসে তাঁর নারী জাতির প্রতি আকর্ষণের কথা মোটেই গোপন করা হয়নি। কিন্তু তাঁর বিরূপ সমালোচকেরা প্রায় ভুলে যান যে, দারুণ উত্তেজনার ক্ষেত্রেও তিনি কি অপূর্ব ধৈর্যের ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, সব শ্রেণীর নারীর দুঃখেও বেদনায় তিনি কতোখানি স্পর্শকাতর হয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, তাদের দুঃখভার লাঘব করেছেন, এবং এজন্য আইনের বিধান-কালেও তাদের অবস্থা পরিবর্তনের দিকে তৃক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন।

আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, হজরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁর সাহাবাদের অনুরুক্তি, ভক্তির অকুণ্ঠ ও অবারিত প্রকাশের অধিকারী হয়েছিলেন নিজেরই ব্যক্তিত্বের প্রসাদগুণে ও তাঁর প্রভাবে। এ গুণ টুকু না থাকলে তাঁরা তাঁর নবুয়াতের দাবীতে মোটেই কর্নপাত করতেন না। তাঁর বলিষ্ঠ ও আশ্চর্য নৈতিক চরিত্রের গুণের জন্যই মদিনা বাসীরা দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করেছিল, কেবলমাত্র তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে নয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর সাহাবাদের চক্ষে তাঁর জীবনের এই দু'টি মহৎ দিক একাকার ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী মুসলমান সমাজেও তাই হয়ে আছে। অতএব এটা স্বাভাবিক যে, তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তিরোধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবন কাহিনী অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, এবং বাহিরের বহু বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করাও হয়েছে। পরবর্তীকালেও নতুন সাহিত্যিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাবে মুসলিম সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত হওয়ার সময় মুহম্মদের ব্যক্তি সত্ত্বাও নতুন চিন্তা ও আদর্শ অনুযায়ী ক্রমশঃ যুগোপযোগী করে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং আজও হচ্ছে। তাঁর একটি দৃষ্টান্ত হলো, সুফীদের ধ্যান-ধারণা ভিসারী মরমিয়া তত্ত্বেও গুরুপূজা পদ্ধতিতে মুহম্মদের স্থান

www.pathagar.com

নির্দেশ। কালক্রমে তাঁর পয়গাম্বর কল্পিত আদর্শ নৈতিক ক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় জীবনের আদর্শেই সীমিত হওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সেদিকে তার বিস্তার যতই হোক, মুসলমানদের চিন্তা ও লক্ষ্য কখনও মক্কার মানুষ মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর মানবীয় সত্তার মহৎ দিক থেকে ভ্রষ্ট হয়নি, হতে পারে না।[৪]

গীব সাহেবেরও আগে এই শতকেরই একজন 'রিলিজিওন' বা বিশ্বধর্ম বিশ্লেষণকারী পন্ডিত ন্যাথনীল মিকলেম কি দৃষ্টিতে হযরত ও ইসলাম দেখেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য। ন্যাথনীল মিকলেন বলেনঃ ইসলাম সবার শেষে আবির্ভূত হলেও প্রত্যদিষ্ট ধর্ম হিসেবে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত । মোহাম্মদ এক সময়ে খৃষ্টান ও ইহুদীদের নিবিড় সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠেন তীব্র ভাবে; তখন তিনি তাদেরকে বলতেন,'তারা গাধার মতো অর্থ না বুঝে শুধু কেতাবের বোঝা বয়ে বেড়ায়।....মোহাম্মদ অন্যকে তাঁর মত গ্রহণ করতে বাধ্য করলেও নিজের মতে থাকতেন দৃঢ় বিশ্বাসী এবং নিজের মতবাদের উত্তম সাফল্যে দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে তিনি মৃত্যু আলিঙ্গন করেন।[৫]

সুফিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা কালে এই লেখক আরও বলেছেনঃ সুফীরা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র দশাপ্রাপ্তি উৎসাহী ছিলেন না, তাঁরা দার্শনিক মতবাদও প্রচার করতেন তাহলো, পরম জ্ঞান ও বিশ্বজনীন যুক্তি যা একমাত্র ঈশ্বর থেকে উৎসারিত হয়, তার সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সংযোগ বিধান করা। মানুষের এই শ্রেষ্ঠ দিকটাই বিশ্বাস-চেতন নীতির সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং শেষ মোহাম্মদের মধ্যে চিহ্নিত। এজন্য মোহাম্মদকে বলা হয়, আল্লাহ্‌র আলোক। পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও তাঁর অস্তিত্ব ছিল, এ মতও কীর্তিত, এবং বাস্তব ও সম্ভাব্য সব জীবনের মূলধারা রূপে তিনি পূজিত । তিনি কামেল মানুষ (perfect man) এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত ঐশীগুণ বিরাজিত ও প্রকটিত। আর সুফীদের মধ্যে প্রচলিত একটি হাদিসও রয়েছে যে, তিনি নিজেই বলে গেছেন, "যে আমায় দেখেছে সে আল্লাহকেও দেখেছে।"[৬]

'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্‌' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা উইলিয়াম হান্টার ইসলাম সম্বন্ধে বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে কোনও পুরোহিত সমাজ নেই। মুসলমান পরিবারের প্রত্যেককেই ধর্মীয় বিধি বিধান শিখতে হয় এবং নিজের পরিবারের পৌরহিত্যও করতে হয়। মসজিদে অবশ্য ইমামতিতে নমায পড়া যায়, কিন্তু ইসলামের গৌরবই হলো এই যে, আল্লাহ্‌র যমীনে ও আসমানের নীচে যে আদিম পার্থক্য, সে পার্থক্যটাই সর্বকালের ও সকল জাতির বহুত্ববাদী ও একেশ্বরবাদীদের মধ্যে প্রাচীর তুলে রেখেছে। বহুত্ববাদের সুবিধা এই যে, আরধ্য দেবতার সংখ্যা

www.pathagar.com

বাড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রতি বিশ্বাসের দাবীও ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। গীবন গ্রীকদের সম্বন্ধে সুন্দর করে যা বলেছেন, তার মূল কথাটি আরও জোরের সঙ্গে হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে বিশ্বাসী মনকে গ্রাস করবার মতো এক অবিভাজ্য ও নিয়মিত জীবন ব্যবস্থার বদলে গ্রীক পুরাণ হাযারো রকম শিথিল অনির্দিষ্ট ও সুবিদাজনক ভাবে বিভক্ত ছিল। আর এজন্যে দেবতার ভক্তরা ইচ্ছামতো তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পারতো।[৭] মুসলমানদের এ স্বাধীনতা নেই। তাদের ধর্ম চায় শর্তহীন, সচীব, এমনকি অসহনশীল ও অকুণ্ঠ আকিদা বা আস্থা। অতএব ধর্মীয় নীতিহীন কোন, শিক্ষা প্রণালীই ইসলামের অনুসারীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।[৮]

বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সুরসিক নাট্যকার জর্জ বার্নাডশ' ইসলামের সাম্য নীতি ও সমাজতান্ত্রিকতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্যজগৎ এবং বিশেষতঃ ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ করবে।[৯]

উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বর্তমান শতকের পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় চিন্তানায়ক ও প্রতিনিধিমূলক প্রাচ্যবিদ পন্ডিতদের বিশ্ব নবী ও ইসলাম সম্বন্ধে মনোভাবের একটা মোটামুটি পরিচয় মিলবে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হযরত ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত শত্রুতামূলক মনোভাবে বিকৃত। এটা যেন কতকটা ইউরোপের অতীতেরই উত্তরাধিকার। ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাসখ্যাত জাতি গ্রীক ও রোমানরা কেবল নিজেদেরই মনে করতো 'সুসভ্য'। আর এজন্যে যা কিছু বিদেশী, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের সঙেগ সংশ্লিষ্ট, তাকে তারা বর্বর হিসেবে ঘৃণার চোখে দেখতো। তখন থেকেই পাশ্চাত্যের জাতি সমূহের মনে এ ধারনা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মানবজাতির অবশিষ্টাংশ থেকে তাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব একটা অবধারিত সত্য। আর তার দরুন ইউরোপ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ ও জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা স্থায়ী বৈশিস্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, যখনই ইসলাম বা রাসুলে-করিম সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখনই পাশ্চাত্যের মানস ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং তার বিদ্বেষ-প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে। এই কারণেই দেখা যায়, খুবই নগণ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদই ইসলাম ও হযরত সম্বন্ধে বিকৃত রুচি ও মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, এবং পূর্ব-নির্ধারিত বিদ্বেষ ও পক্ষ-পাতমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েই এসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু হযরত মুহম্মদ ও মুসলমানরা প্রথম থেকেই এ বিষয়ে আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা যদি আন্তরিকতা সহকারে সেই উদারতার অনুসরণ করেন, তাহলে হযরত মোহাম্মদের অসামান্য জীবন-সাধনা ও চরিত্র-মাহাত্ম্য যথাযথ অনুধাবন ক'রে পাশ্চাত্য জগৎ তার আজকের বহু জটিল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান খুঁজে পাবে।

---

১. An Historian's Approach to Religion, P. 274.
২. Ibid. P. 129.
৩. যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামখ্যাত নতুন খৃষ্টধর্ম প্রবর্তক, তিনি জাল বাইবেলও সৃষ্টি করেছিলেন।
৪. Mohammedanism by H. A. R. Gibb, pp. 23-34.
৫. Religion by Nathancil Micklem, O. U. P. P-119-21.
৬. Ibid, P-162.
৭. Rise and Decline of Holy Roman Empire, Vol. II P. 360. Quarto Ed. 1786.
৮. Indian Musalmans, P. 175.
৯. preface to 'Getting Married'.

['মাসিক জাহানে নও' পত্রিকার সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ও মানবাধিকার

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আজ থেকে চৌদ্দ শ'বছর আগে দুনিয়া একেবারে অনাচারে অত্যাচারে ডুবে গিয়েছিল। কোথাও ধর্মের নামে নরহত্যা ও ব্যাভিচার চলত; কোথাও ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধবাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত; কোথাও সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে গরু-ছাগলের মত ব্যবহার করত; কোথাও জ্যান্ত মেয়ে-শিশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হত; কোথাও পুরুষ যত খুশি মেয়ে বিয়ে করে তাদের দাসীর মত রাখত। কোথাও বিমাতা বা সহোদরা ভগ্নীকেও বিয়ে করত। নারী জাতি ছিল অভিশপ্তা। তাদের কোনও অধিকার ছিল না। রাজারা প্রজাদের দণ্ডমুন্ডের কর্তা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমস্ত আইন-আদালতের উর্ধ্বে। জাতিতে জাতিতে; গোষ্ঠীতে নিরাপদ থাকত না। চারিদিকে অশান্তি বিরাজ করত। তার উপর মানুষ; সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, চরম আধ্যাত্মিক অধঃপতনে পতিত হয়েছিল। আল্লামা ইকবাল এই দূর্গতির কথা কেমন মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

হমসে পহলে থে আজব তেরে জহাঁ কা মনযর,
কহীঁ মসজূদ থে পথর কহী মা'বুদ শজর।
খুগরে পয়করে মহসূস থী ইনসান কি নযর;
মানতা ফির কোঈ অন দেখে খুদা কো কীউঁ কর।

এর অনুবাদ–

পূর্বে তোমার বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি হাস্যকর,
কেউ পূজিত গরু বানর, কেউ পূজিত গাছ পাথর।
সাকার পূজায় নিত্য রত নিখিল বিশ্ব চরাচর,
কে পূজিত কে মানিত আর বিহীন এক ঈশ্বর?

মোটকথা, তখন আল্লাহর প্রতিনিধি এই মানুষ হয়েছিল পশুরও অধম, নরকের ঘৃন্য কীট।

ছেলের দুর্গতি দেখে বাপের অন্তরে করুণা ফুটে ওঠে। সেইরূপ মানুষের এই চরম দুর্গতি থেকে পরম করুণাময় রব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তা'আলা দয়ার্দ্র হলেন। তাই তিনি জগতে পাঠালেন 'রহমাতুললিল আলামীন' জগতের প্রতি করুণাস্বরূপ মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওসাল্লামকে।

তাঁর সম্বন্ধে কুরআন পাকে আল্লাহর উক্তি (বাংলা অনুবাদ) হচ্ছে "সে তাদেরকে (লোকদেরকে) ভাল কাজে আদেশ করে, খারাপ কাজে মানা করে, ভাল জিনিস

www.pathagar.com

হালাল (বৈধ) করে, অপবিত্র জিনিস হারাম (অবৈধ) করে। তাদের থেকে তাদের উপর যে বোঝা আর বেড়ী আছে, দূর করে।"- সূরা'আরাফ,১৫৭ আয়াত)

কুরআন পাকে সমুদয় মানবজাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন (বাংলা অনুবাদ)- "নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক রসূল(ধর্ম-প্রবর্তক) এসেছে, তোমাদের যা কষ্ট দেয়, তা তার জন্যে অসহ্য, তোমাদের হিতের জন্য সে লালায়িত, ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি কোমল হৃদয়, পরম দয়ালু (সূরা তওবা, ১২৮ আয়াত)

হযরত (দঃ) ঘোষনা করেন, "হে মানবজাতি! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক আর নিশ্চয় তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলে আদমের সন্তান এবং আদম, মাটি হতে । নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত , যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধার্মিক। ধার্মিকতা ভিন্ন আরবের অনআরবের উপর কোনও প্রাধান্য নেই।" - (হুজ্জাতুল বিদ'আর খুতবা।)

রাজা-প্রজা সম্পর্ক সম্বন্ধে আঁ-হযরতের (দঃ) শিক্ষা হচ্ছে -"খাদিমুল কওমি রঈসুহুম"-অর্থাৎ "জাতির সেবক হবেন জাতির নেতা।" তিনি আরও বলেছেন, "শেষ বিচার (কেয়ামতের) দিনে আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে ক্রোধগ্রস্থ আর সকলের চেয়ে ঘৃণিত হবে সেই ব্যক্তি, যাকে বলা হ'ত রাজাধিরাজ। আল্লাহ ব্যতীত কোনও রাজা নেই-"লা মালিকা ইল্লাল্লাহ।" -(হাদীস-মুসলিম শরীফ।) হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং খলীফা চতুষ্টয়ের জীবনী দেখুন। তাঁরা রাষ্ট্রনেতা ছিলেন কিন্তু রাজা ছিলেন না। সাধারণ লোকের জীবনী থেকে তাঁদের জীবন-যাত্রায় কোনও তফাৎ ছিল না।

এখন প্রভূ-ভৃত্যের কথা। হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন মহান ধর্ম-প্রবর্তকদের কেউ-ই দাসত্ব প্রথা রহিত করেননি। এ ছিল প্রাচীন জগতের একটা অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা । রসূলে করীম (দঃ) এই প্রথাকে এমন কৌশলে রহিত করেছেন যে, পুরাতন প্রথার লোপ লোকে সহজে বুঝতেই পারেনি। প্রথমে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, মানুষ মানুষের ভাই-"আল ইনসানু আখুল ইনসান।" কেউ যেন কোন পুরুষকে দাস এবং মেয়েকে দাসী না বলে। খাওয়া-পরায় মনিব-চাকরের কোন ভেদ থাকবে না। আর আকার যখন মনিবকে ছেড়ে যেতে চাইবে, তার জন্য সেটা ভাল জানলে, তাকে মনিব ছেড়ে দিতে হবে। যদি কিছু মুক্তি মূল্য দিতে হয়, তবে মুসলমানের কর্তব্য হবে তাকে অর্থ সাহায্য করা, কিংবা সরকারী তহবিল থেকে তাকে অর্থ সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ

www.pathagar.com

বলেন-"তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা মুক্তি পত্র চায়, তাদেরকে মুক্তিপত্র লিখে দাও, যদি তোমরা তা তাদের জন্য ভাল জান, এবং আল্লাহর মাল থেকে যা তিনি তোমাদের কে দিয়েছেন, তাদেরকে দাও।" (সূরা নূর,৩৩ আয়াত)। এখানে তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাদের মালিক হয়েছে বাক্যের অর্থ (১) তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বা ক্রয়সূত্রে যাদেরকে পেয়েছো। কেননা ইসলামের নিষেধ বিধানের পূর্বে দাসত্ব প্রথা ছিল, কিংবা (২) যুদ্ধের বন্দী। 'যদি তোমরা তা তাদের জন্য ভাল জান'- এর অর্থ হল, চাকরদের মধ্যে অন্ধ, আতুর থাকতে পারে, তাদেরকে ছেড়ে দিলে তারা কোথায় যাবে, কি খাবে। সুতরাং তাদেরকে ঘরে রেখে ভরণ-পোষণ করতে হবে। স্বাধীন ব্যক্তিকে কিনে দাস করা বা দাস ব্যবসায় ইসলাম নিষেধ করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর উক্তি একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন-"আমি (আল্লাহ) কিয়ামতের দিনে তিন ব্যক্তির শত্রু হব-যে আমার নাম নিয়ে অঙ্গীকার ক'রে ভঙ্গ করে, যে স্বাধীন লোককে বিক্রী ক'রে তার মূল্য খায়, আর যে মজুরকে কাজে লাগিয়ে কাজ পুরো ক'রে তার মজুরী দেয় না। " (হাদীস-বুখারী শরীফ)

'সে যুগে অক্ষম খাতককে গোলাম করবার দস্তুর ছিল। এখনও ইংরেজের আইনে তাদের জন্যে সিভিল জেলের বিধান আছে। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে, "যদি সে (খাতক) কষ্টে পড়ে, তবে তার সুসার না হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দেওয়া চাই, আর তোমরা রেহাই দিয়ে দাও,তবে তা তোমাদের জন্যে ভাল, যদি তোমদের জ্ঞান থাকে।"(সূরা বাকারাঃ২৮০ আয়াত)। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন,-"যে দিন (কিয়ামতে) আল্লাহের আরশের (সিংহাসনের) ছায়া ভিন্ন কোন ছায়া থাকবে না সে দিন তিনি তাকে তাঁর সিংহাসনের ছায়ায় স্থান দিবেন, যে তার অভাবগ্রস্ত খাতককে সময় দেয় কিংবা তাকে রেহাই দেয়।"(হাদীস-মুসলিম শবীফ।)

হিন্দু,বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল প্রাচীন ধর্মেই পৌরহিত্যবাদ আছে। হায়! মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রভুর কাছে যাবে, তার জন্যেও একজন মধ্যস্থের প্রয়োজন। একমাত্র ইসলাম পৌরহিত্যবাদের কলঙ্ক থেকে মুক্ত। আল্লাহ বলেন-"আমাকে ডাক, আমি জবাব দিব।" (কুরআন, সূরাঃ মু'মিনঃআয়াত ৬০।)পুনশ্চ,"যখন আসার সেবকগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (হে মুহম্মদ) বলে দাও, আমি নিকটে আছি। আমি জবাব দেই, যখন কেউ আমাকে ডাকে। " (কুরআন,সূরাঃ বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬।)

নারী জাতি সম্বন্ধে পুরাতন ধর্মমতে কোন মঙ্গলজনক ব্যবস্থা দেখা যায় না। নারী ছিল দায়ভাগ রহিত। এমনকি কোনও ধর্ম মতে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার

www.pathagar.com

বাঁচবার অধিকার ছিল না, বহু বিবাহ কোনও প্রাচীন ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল না। একমাত্র ইসলাম নারীকে তার উপযুক্ত স্বত্ব দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের উপর পুরুষের যে হক আছে, তাদেরও পুরুষের উপর সেইরূপ ন্যায্যমত হক আছে। (সূরা ঃ বাকারা ঃ আয়াত ২২৮) তবে পুরুষকে স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের জন্যে যে কায়ক্লেশ করতে হয় এবং সংসার পরিচালনার জন্যে একজনকে কর্তা করা আবশ্যক বিধায় পুরুষকে নারীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এইজন্যে তারপরে কুরআনে উক্ত হয়েছে, " এবং তাদের (নারীদের) উপর পুরুষের জন্য একটি মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ হন পরমপরাক্রান্ত পরমজ্ঞানী।" (কুরআন ঐ।)

যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে নারীর সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রয়োজন বিবেচনা করে ইসলাম বহু বিবাহকে চারি বিবাহে সীমাবদ্ধ করেছে। কিন্তু এক বিবাহকে শ্রেয় বলেছে। ইসলামের আইনে স্বামীর অন্য বিবাহ বা তালাকের অধিকার স্ত্রী ইচ্ছা করলে বিবাহের শর্ত হিসাবে নিজে নিতে পারে । একে বলা হয় 'তফবীয' । এরূপ স্থলে তালাক দিতে পারে না, বরং স্ত্রী স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তালাক দিতে পারে, কিংবা অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি পারার জন্যে নিজ তালাক নিতে পারে। এইরূপ স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে পারে। হযরত (দঃ) নিজেও বলেছেন, "সমস্ত ইচ্ছাধীন(মুবাহ) কাজের মধ্যে আল্লাহর নিকটা সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ হচ্ছে তালাক।" (হাদীস আবু দাউদ।)

ইসলামে নারী পূজা নেই। কিন্তু নারীকে উপযুক্ত ইয্যত (সম্মান) দান করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, মায়ের পায়ের নীচে স্বর্গ। ইসলামে নারী পুরুষের ড্রেস রেগুলেশন বা উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদ্বারা মনুষ্য জাতির কলঙ্ক স্বরূপ নিউডিইজম বা প্রকাশ্য নগ্নতাকে রোধ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে অবরোধপ্রথা প্রচলন করে নাই। হযরতের এক অনুবর্তিনী বলেন, "আমরা (যুদ্ধকালে) পীড়িতদের সেবা করতাম আর আহতদের চিকিৎসা করতাম।" (হাদীস বুখারী।)

এইরূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) পৃথিবীতে মানবাধিকার স্থাপন করে এক শান্তির রাজ্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন।

[জাহানে নও পত্রিকা অবলম্বনে]

www.pathagar.com

মহানবীর আবির্ভাব, সংস্কার-কর্ম ও আধুনিক বিশ্ব

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন

অসীম আকাশের অপরিসীম উদারতা, বেহেস্তের অমিয় প্রশান্তি, আর জগৎবাসীর মুক্তি বার্তালয়ে যে সকল ক্ষণজন্মা মহামানব ও মহান সত্যসাধক ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিভু, নির্যাতিত মানবতার মুক্তির অগ্রদূত, প্রতিশ্রুত বিশ্বনবী, হযরত মুহম্মদ (সা) (৫৭০-৬৩২খৃঃ) তাদের সকলের মাঝে শ্রেষ্ঠতম। আবার মরু নন্দন, আবদুল্লাহ-আমেনা তনয়, কোরেশ গোত্রের মেষ-পালক মুহম্মদ (সাঃ) শুধুমাত্র মানব মণ্ডলীর জন্য মনোনিত শ্রেষ্ঠ-নবী বা ধর্ম প্রবর্তকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'রাব্বুল আলমীনের' নিকট হতে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যই রাহমাতুল্লিল আলামিন' বা রহমতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ ও সর্বোত্তম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা)। জ্ঞান, পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় মহিমান্বিত মহানবী ছিলেন, জগতের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের স্থপতি, মজলিশে শুরা ভিত্তিক ইসলামী আর্থ-রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতির প্রবর্তক মহান রাষ্ট্রনায়ক দক্ষ প্রশাসক, সুদক্ষ সমন্বয়-কুশলী বিজ্ঞ-আইনবেত্তা, বিচক্ষণ ন্যায়-পরায়ন বিচারক এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। আরবের উম্মী-নবী, সত্য উপাসক, মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলা হয় সকল প্রকৃত অপ্রকৃত, দৃশ-অদৃশ্য ঐশী জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রজ্ঞার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। মানব জীবনের এমন কোন দিক, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এমন কোন দিক, জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন কোন শাখা, জাগতিক ও পাবিত্রিক উৎকর্ষতার এমন কোন অংগন ছিলনা, যা তাঁর মহা-জ্ঞান-প্রজ্ঞার পরশে সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত হয়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহা-নবীর মহা-জীবনের মহা-বিস্ময় এই যে স্বীয় জীবনে কঠোরভাবে অনুশীলন না করে কোন প্রত্যাদেশ, কোন সংস্কার কর্মই তিনি জগদ্ববাসীকে উপহার দেননি। কিংবা ধর্মকে তিনি কখনই নিছক ব্যক্তিগত গণ্ডি সর্বস্বতায় সীমাবদ্ধ করেননি। বরং ইসলামকে সমগ্র জগদ্ববাসীর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও মানবিক নৈতিক ও বৈষয়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক উৎকর্ষতার শীর্ষ মর্যাদায় উন্নত করেছেন এবং এভাবেই তিনি ধর্মকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সুষম নিবন্ধক রুপে এবং ইসলামকে সর্ব যুগোপযোগী এবং জাগতিক ও মুক্তির সনদ-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আইয়্যামে জাহেলীয়া (৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী) বা আঁধার যুগের পংকিলে নিমজ্জিত, বহুবিভক্ত, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, লুণ্ঠন-প্রিয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, উশৃংখল, বর্বর , আরব পৌত্তলিক সমাজকে, অসীম সাহসিকতা, অপরিসীম ধৈর্য, দূরদৃষ্টি ও সত্য-নিষ্ঠার সাথে যে ভাবে তৌহিদের পতাকা তলে সমবেত করে ধর্মাশ্রত, সংঘবদ্ধ , সুশৃঙ্খল ও

সুসভ্য জাতিতে পরিনত করেন, তার উপমা বিশ্বের ইতিহাসে অতি বিরল ও বিস্ময়কর। ধর্মের যে সংজ্ঞা, সত্যের যে স্বাক্ষর, নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত, তৌহিদের যে মহিমা স্বীয় জীবনে কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আরবের আল-আমীন' যা রচনা করে গেলেন তাহাই ভূ-গোলকের তাবৎ অক্ষাংশ জুড়ে ইসলামকে সমগ্র মানব-মণ্ডলীর ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে সমাজ ও সামষ্টিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন-বিধান রূপে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে।

বলাবাহুল্য, প্রাক-ইসলামী যুগে সমগ্র আরব উপদ্বীপ, এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা সমেত গোটা বিশ্বজুড়ে আত্মিক ও মানবিক নৈতিক বৈষয়িক, জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় অধঃপতন ও বিধ্বংসের ধস নেমেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধি ন্যায় ও সত্যের আলো নিভে বাতিল পন্থা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতায় বর করেছিল। জগতের সকল মহান দর্শন ও ঐশী গ্রন্থ বিকৃত হয়ে তৌহিদ বা এক আল্লাহর বিশ্বাসের স্থলে পৌত্তলিকতা ও বহু-উপাস্য স্থলে স্থির হয়েছিল। মানব, দানব, বস্তু –নীছক বহু অলীক, কাল্পনিক জড়-জৈব প্রজাতি ও প্রকৃতিতে দেবত্ব স্থির হয়েছিল। একমাত্র একেশ্বর বাদী 'হানিফ্ গোত্র' ছাড়া গোটা আরব উপদ্বীপের আরবরা ছিল পরস্পর বৈরী, বহু গোত্র, বংশ ও উপগোত্র বিভক্ত, সংঘাত-প্রিয় জাতি। তীব্র-শক্তি, কুরুচিপূর্ন কবিত্ব-শক্তি অসীম সাহসিকতা, অতিথি পরায়নতা বাদ দিলে, মদ, জুয়া, নারী, দস্যুতা এবং গোত্রে গোত্রে রক্ত ও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ছিল আরব বেদুইনদের প্রধান পরিচয়। নরবলী, শিশু কন্যা হত্যা, খুন, রাহাজানি, ব্যভিচার, নারী, নির্যাতন, সুদ, দাসপ্রথা, অন্যায় যুদ্ধ, পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতার মত পরিবেশের বিপর্যস্ততাই বিশ্ব-নবীর মত একজন জগৎশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও মহান ত্রাণ-কর্তার আবির্ভাব এবং ইসলামের মত বিশ্বজনীন মহান ধর্মমতের প্রবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলে।

নিখিল মানবের পরিত্রান-কর্তা মুহাম্মদ (সা) কৈশোরেই পতিত মানবতার তীব্র-ভীষন দুর্গতি, দুর্দশা দৃষ্টিতে শিউরে উঠেন। বিশেষতঃ মক্কার কায়েস ও কোরেশ গোত্রের মধ্যে সংগঠিত দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী হরবুল ফুজ্জার (৫৮৫খৃঃ) বা অন্যায় যুদ্ধের বিভৎস ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে মানব দরদীর মন দারুনভাবে পীড়িত হয়। তাই তার বিগরিত বিমুন্ধ উদার-চিত্ত, কৈশোরেই নির্যাতিত মানবতার উদ্ধারে ব্যাকুল ও উম্মাদ হয়ে উঠেন এবং মাত্র ১৭ বছর বয়ঃকালে তিনি হিলফুল ফজুল (৫৮৬খৃঃ) নামে একটি সেবা ধর্মী সংগঠন গড়ে তোলেন। পুত পবিত্র যৌবনে (২৫) বাণিজ্য ব্যাপদেশে সংস্পর্শে আগত খাদিজা তুহরা নাম্মী এক পূর্নবতী, পৌঢ়-প্রায় (৪০) ধনাঢ্য আরব্য মহিলার সাথে তিনি পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সতী-সাধব সহ-ধর্মীনীর

www.pathagar.com

সুবিপুল বিত্ত--বৈভব মহা-মানবের উদার হস্তে সমর্পিত হয়। কিন্তু স্বর্গের মহিমা জ্যোতি যে অন্তর আত্মা উদ্ভাসিত জগতের কোন বন্ধন, ধনেশ্বর্যের কোন মোহ তাঁর দৃঢ়-বলিষ্ট দৃষ্টি চিত্তের কোন আকর্ষণে তাঁর অচঞ্চল বিরাট-বিপুল-হিয়া বিচলিত ও উম্মাদ হয়ে উঠে। মরুবাসী, সত্য-সন্ধানী মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার অদূরে নূর পাহাড়ের নির্জন হেরা গিরি কন্দরে, গভীর ধ্যান-তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে চিরবাঞ্চিত মহা সত্যের সন্ধানে নিজেকে সমর্পন করেন। দীর্ঘ প্রায় তিন বছর প্রতিক্ষার পর একদা শেষ রমজানের গভীর নিশিথে সত্যের মহাসাধক তার প্রত্যয়ী চিরন্তর মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেন। সেটা ছিল রাব্বুল আলামীনের নকট নবুয়তের গৌরবদীপ্ত প্রথম প্রত্যাদেশ (৬১০খৃঃ) । স্বর্গীয় দূত জিবরাইল (আ) নির্জন হেরা গিরি গুহায় গভীর ধ্যানমগ্ন প্রতিশ্রুত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর সমীপে মহা-প্রভুর প্রথম প্রত্যাদেশ বাণী উদ্বোধন করলেন– পাঠ করুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃজনকারী (সুরা ৯২ আলাক ১,২) । বর্ন পরিচয়হীন উম্মী নবী স্বর্গীয় দূতের আগমনে বিচলিত, অবিভূত হয়ে পঠন অক্ষমতার কথা জানালেন। স্বর্গীয় দূত পর পর তিন বার সত্যের প্রথম সবক, প্রথম ঐশী-বানী পাঠ করলেন এবং ধীরে ধীরে আধার যুগের প্রচলিত বাতিল মতাদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে সত্য-ন্যায়, যুক্তি-বুদ্ধি ঈমান-ইনসাফ ও ইনসানিয়াতের-অম্লান দীপশিখা চিরতরে প্রজ্জ্বলিত করে প্রবর্তিত ইসলামকে সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্য মনোনীত ধর্ম বলে ঘোষনা করা হয় এবং সমকালীন বিশ্ব ও ভবিষ্যত বিশ্ব প্রজন্মকে ঈমান ও ইনসানিয়াতের পতাকা তলে,ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হয়ে শান্তি ও মুক্তির রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারন করার জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হয়।

কিন্তু জগতের কোন মহৎ সাধনা মহান সংস্কার কর্মই বেদনাহীন ছিল না। তপ্তরূঢ় মরু-প্রকৃতির দুস্তর কঠোরতা নিষ্ঠুরভাবে মহা-নবীর মহান সংস্কার কর্মের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। উগ্র মানুষগুলোকে প্রতিহিংসার দাবানল ছড়িয়ে সত্যের অমলিন শিখা নির্বাপিত করতে উদ্যত হল। কিন্তু মহা-পরাক্রমশালী মহা প্রভু যে সত্যের শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন তা নির্বাপিত করে সাধ্য আছে কার? হিংস্র-কুটিল চক্রান্তের বেড়াজাল ভেদ করেই মহা সত্যের কাফেলা, সংযমী মহা-পুরুষকে অবিচল সত্য সাধনা থেকে মানবতার মুক্তির দিশারী আরব মরুভাস্কর, তৌহিদের ঝাণ্ডা হাতে, বৈরী প্রকট মরু প্রান্তরে উল্কার বেগে ছুটে বেড়ালেন। সংকটে প্রজ্ঞা, বিপদে ধৈর্য, বৈপরীত্বের সাথে সহ অবস্থান, পরমতের প্রতি পরম সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ও মহামানব নির্বোধ পৌত্তলিকদের নিষ্ঠুরতা ও তীব্র নিঃশংস প্রতিরোধ থেকে কিছু মাত্র পরিত্রান পেলেন না। আরব 'আল -আলামীন' এর পাক -মোবারক দেহ

www.pathagar.com

তায়েফ অভিভাষণে ক্ষত বিক্ষত হল(৬২০খৃঃ)। সে আরব উপত্যকায় নওমুসলিম ও স্বজন-পরিজন সমেত মানব দরদী মহানবী প্রায় তিন বছর কাল খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। মক্কার বিভিন্ন গোত্রের ১২ জন দুধর্ষ ঘাতক-দুর্বৃত্ত কর্তৃক আল্লাহর রাসূল স্বগৃহে অন্তরীন হলেন। অবশেষে মহান আল্লাহর কুদরত ও মহিমায় অতি সন্তর্পনে, মৃত্যুভীতি উপেক্ষা করে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে পা বাড়ালেন। পথে পথে সশস্ত্র শত্রু পরিবেষ্টিত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব হযরত আবু বকর সমভিব্যহারে গারে সাওরের গিরি গুহায় আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেন। পথের দুঃখ, মৃত্যুভীতি মর্মজ্বালা উপেক্ষা করে ৬২২ খৃঃ ২২ শে জুলাই মক্কাবাসী মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিযরত সম্পন্ন করেন। এক আল্লাহর এবাদত ও সংস্কার কর্ম পরিচালনার জন্য তিনি মদিনার বনু নাজজার গোত্রের দুটি শিশুর ভূমি খরিদ করে, মসজিদ-ই নববীর ভিত্তি পত্তন করেন। মদিনার তৎকালীন শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায়ের সাথে ৫২ দফা সম্বলিত শান্তি চুক্তি যা ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে সুখ্যাত, সম্পাদিত হয়। এভাহে জগৎ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়কের বরকতময় হাতে মসজিদই নববী কেন্দ্রিক জগতের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত রচিত হয়। (৬২২ খৃঃ)

মক্কা হতে প্রায় ২৫০ মাইল দূরবর্তী মদীনায় হিযরত করেও নিখিলের শ্রেষ্ঠ মহামানব বিধর্মীদের অহেতুক আক্রোশ, রোসানল, ও প্রতিহিংসা থেকে কিছু মাত্র নিষ্কৃতি পেলেন না মদিনায়। নও মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধিতে মক্কার পৌত্তলিকদের দ্বারা উপর্যপুরি মদীনা আক্রান্ত হল। পর পর সংগঠিত হল বদর (৬২৪খৃঃ), ওহুদ (৬২৫ খৃঃ) ও খন্দকের যুদ্ধ । নিখিল মানবের নয়নমনি 'সাইয়্যেদুল আম্বিয়া' গুরুতরভাবে আহত হলেন। পবিত্র দন্ত মোবারক ভেঙ্গে গেল। খাইবার যুদ্ধ, (৬২৮ খৃঃ) মুতার যুদ্ধ, (৬২৯ খৃঃ) হুনায়েন যুদ্ধ, তায়েফ অভিযান, তাবুক অভিযান সমেত প্রায় ২৭টি ধর্মযুদ্ধ সুদক্ষ সমরকুশলির নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। নয়টি যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষরূপে তিনি সরাসরি অংশগ্রহন করেন। জন্মভূমি মক্কার কাবা গৃহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পর পর দুটি অভিযান পরিচালিত হয়। তের শত সহচর সমভিব্যহারে প্রথমোক্ত অভিযানে হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়। মিথ্যা ও পৌত্তলিকতা পরাভূত হয় এবং সত্য ও তৌহিদের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। মূলতঃ ক্ষমা ও মহত্বের মহিমায় ভাস্বর সত্য ও তৌহিদের যে, বিজয়পতাকা সেদিন মক্কার মরু-ভুয়ে সগৌরবে উড্ডীন হল, তাহাই সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে বসনিয়া -হার্জগোভিনিয়া অবধি ইসলামের গৌরব-দীপ্ত মহান বিজয় এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

সত্য, সুন্দর ও তৌহিদের পূঁজারী মহা-সাধকের বৈপ্লবিক সংস্কার কর্মের পরশে

www.pathagar.com

আরব উপদ্বীপ ও গোটা বিশ্বের প্রচলিত অমানবিক আর্থ-রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতির ভিত প্রবলতাবে নড়ে উঠে। নির্যাতিত মানবতা এই প্রথম মুক্তির আশ্বাস লাভ করে। পুরুষ শাসিত সমাজের জৈব-যৌন-রসনার নিগড়ে বন্দি, অধিকার বঞ্চিতা নির্যাতিতা নারী জাতি এই প্রথম মুক্তি সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। বিকৃত যৌনচার, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি ও বঞ্চনা থেকে নারী সমাজকে উদ্ধার করে তাদের পুরুষের অঙ্গশায়িনীর বদলে সহধর্মীনির মর্যাদায় আসীন করা হয়। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শৈশবে মাতৃহারা নবী ঘোষণা করেন, " মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত"। নারী জাতির ইতিহাসে এটা ছিল সম্মান ও মর্যাদার একটা সর্বোচ্চ গর্বিত আসন এবং প্রথম স্বকীয় স্বর্গীয় স্বীকৃতি।

স্বর্গীয় বা কোরানিক নির্দেশনার আলোকে নারী জাতির সম্মান, মর্যাদা, ও শুচিতা রক্ষার্থে পর্দাপ্রথার প্রবর্তন এবং কড়াকড়ি নীতিমালা আরোপ করে পারিবারিক, বৈবাহিক ও যৌন শৃংখলা সুবিন্যস্ত করা হয়। নরবলিসহ কন্যা শিশু হত্যা, খুন, রাহাজানি, দস্যুতা, পরসম্পদ অপহরণ, ব্যভিচার, মদ জুয়া, সুদ, ঘুষ উৎকোচ অবৈধ উপার্জন, চুক্তি ভঙ্গ মিথ্যাচার, দাসপ্রথা, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি সকল প্রকার অনাচার হারাম বা নিষিদ্ধ করে সমাজে শান্তি -শৃঙ্খলা, সদাচার, সুনীতির অবারিত দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ও মন্দ স্বভাব, কু -প্রভৃত্তি, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত করার জন্য জ্ঞানার্জনকে গবেষণা, আবিস্কার ও উদ্ভাবনকে সর্বাত্মক উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। ইসলাম কখনই মানব জীবনকে নিছক দুর্ঘটনা, মামুলী বিবর্তন, প্রাকৃতিক অবলীলা, কিংবা পার্থিব নশ্বরতায় আবদ্ধ বা অবগুণ্ঠিত করে নাই। মানবাত্মাকে সর্বময় মহা প্রভুর মহা অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। নশ্বর দেহ, সদ্য ভঙ্গুর পরিবেশ, নিথর প্রকৃতি, নিভিড় পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে, অভিনশ্বর মানবাত্মা, নিঃসীম মহাসত্য, সদা প্রভুর সমীপে উপনীত হয়। মহাসত্যের অভিযাত্রী মানব আত্মা আদি ও চিরন্তন পরিকল্পক উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। নিরীশ্বরবাদী কপটচারীতা থেকে (নাস্কিতকতা) উদ্ধার করে 'মানবাত্মাকে অর্থবহ, তাৎপর্যমণ্ডিত উদ্দেশ্য উজ্জীবিত করেছে।

আঁধার যুগে আরব উপদ্বীপে কোন সুবিদিত, সুবিন্যস্ত আর্ত-সমাজ বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বা বিদ্যমান ছিল না। উষ্ণ মণ্ডলীর ধূসর মরুতে কর্ষনযোগ্য ভূমি ছিল দুষ্পাপ্য। ফলে প্রাথমিক কৃষি, মৌলিক শিল্প, আদিম উৎপাদনে ক্ষণাত্মক প্রবণতা ও মৌলিক চাহিদার ঘাটতি প্রটকতর হয় এবং পেশাবৃত্তি, লুণ্ঠন, দস্যুতা, দাসপ্রথা, সুদ, কুসীদ, বা মনুষ্য বিকি কিনির মত অমানবিক কুৎসিৎ জীবিকার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

www.pathagar.com

পশু পালন, পশু ও মৎস্য শিকার ও বাণিজ্য ছিল সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের প্রধান উপজীবিকা। মহানবী বিদ্যমান নোংরা, কুৎসিত পেশা ও অমানবিক বৃত্তি (উপজীবিকা) নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করে, কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক কল্যাণমুখী মানবিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সর্বপ্রকার প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মানবিক সম্পদে আল্লাহর সার্বভৌম এখতিয়ার ও মালিকানা আরোপিত হয়। মানুষকে বৈধ বা হালাল পন্থায় আল্লাহ্ প্রদত্ত, সম্পদ বা নেয়ামত থেকে সম্পদ আহর"নর অধিকার ও উপ-মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে সম্পদ কুক্ষিগত করা, অবৈধ পন্থায় ধন-উপার্জন, মওজুদ, চোরা কারবারী, কালোবাজার, অতি মুনাফা, ওজন ও পরিমাপে তঞ্চকতা, সুদ, ঘুষ, উৎকোচ, দুর্নীতি ইত্যাদিকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সুদ বিহীন বাণিজ্য, করজে হাছানাকে উৎসাহিত করা হয়। শ্রমজীবি মহামানব 'শ্রমের মর্যাদা' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গায়ের ঘাম শুকাবার আগে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী পরিশোধের পরামর্শ দেন। স্বকর্ম উদ্যোগেকে উৎসাহিত এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেন। সমাজে এতিম, দুস্ত, পঙ্গু, অসহায়, প্রতিবন্ধি, দরিদ্রদের প্রতি সদয় দৃষ্টি নিবন্ধ করে যাকাৎ, ফিৎরা, দান ছদকাকে পূণ্য সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঘোষণা করা হয়, 'বিত্তবানের বিত্তে, বিত্তহীনের অংশ রয়েছে।' যাকাত, গণিমত, জিজীয়া, খারাজ ও উসর রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আয়ের মুখ্য উৎসে পরিণত হয়। সৎকর্ম-হালাল রুজির পাশাপাশি আল্লাহর স্মরণ, সংযম, সাধনার জন্য ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতকে ফরজ করা হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক-রীতি এবং সর্বভূয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইসলামী মানবিক অর্থব্যবস্থা, সর্বোতভাবে ইসলামী আইনের অনুভূতি। ইসলামী আইনের মূল স্তম্ভ হলো ঃ আল কুরআন, আল হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। এ স্তম্ভ চতুষ্টয়ের যুগপৎ উপযোগীতা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সুদূর প্রসারী সর্বকালের ও বলয় উত্তীর্ণ। জগতের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর সংস্কার কর্মের তাবৎ বিধি ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হয়েছে এক সুনির্দিষ্ট ঐশী নীল নক্শা। এই ঐশী নীল নক্শার চূড়ান্ত রূপদান সম্পন্ন করে, ইসলাম প্রবর্তক, এক আল্লাহর উপাসক, আখেরী নবী, মুহাম্মদ-আহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। প্রায় চৌদ্দশ বছর পূর্বে (৬৩২ খৃঃ) ইহধাম ত্যাগ করে প্রত্যয়ী মহাপ্রভুর সান্নিধ্য গ্রস্থনা করেছেন এক অনন্ত সহচরে।

[সীরাত স্মারক '৯৬ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

মোঃ আকতার হোসেন

এই ধরার বুকে আজ পর্যন্ত যত ধর্ম প্রবর্তক, রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক ত্রান কর্তার আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে একমাত্র সার্বিক সফল এবং অনাগত কালের মহত্তম আদর্শ হিসাবে আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাই (সাঃ) শ্রেষ্ঠতম। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, "রাসুল (সাঃ) এর জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য অনুসরনীয় আর্দশ (সূরায়ে মুমতাহিনা) তাঁর ব্যক্তি জীবন, পরিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন যেমন আমাদের জন্য আদর্শ ঠিক তেমনি তার রাষ্ট্রীয় জীবনও আমাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। প্রিয়নবী (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত মদীনা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রই ছিল বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ন্যায়ভিত্তিক নিয়মাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি গুলোর মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র নিবিশের্ষে সকল নাগরিকের রাষ্ট্রিয় অধিকার ভোগের সমান হক থাকবে, ধর্ম পালনে সকল ধর্মের অনুসারীদের সমান স্বাধীনতা ও অধিকার থাকবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সকলকে সাধ্যানুসারে অংশগ্রহন করতে হবে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বা গোত্রগুলোর কারুর সাথে বিদ্বেষ নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ইত্যাদি অবলম্বন করা হবে প্রধান। তাইতো প্রখ্যাত দার্শনিক ও সমালোচক জর্জ বার্নার্ড'শ বলেন–

If all the world was united under one leader than Muhammad would have been the best fitted man to lead people of verious cruds, dogmas and ideomas to peace and happiness."

যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সভ্যতার নিম্নতর স্তরে নিমজ্জিত ছিল, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাপাচার ও কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল সেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আলোকে রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (সাঃ) আমূল পরিবর্তন করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন করেন। যার জন্য তিনি বিশ্বের বুকে আজও মহান ও সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির কারনগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলঃ

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাঃ মহান আল্লাহ পাকই হচ্ছেন নির্ভূল ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং তিনিই সার্বভৌম শক্তির একমাত্র আধাঁর। তিনিই মানবজাতীর জন্য সঠিক ও কল্যাণকর দিক নির্দের্শনা দিতে পারেন, আর হুকুম বা বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র তিনি। মানুষ যেহেতু নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী নয় সেহেতু সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহরই হওয়া একান্ত-আবশ্যক। রাসুল (সাঃ) কর্তৃক প্রবতির্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিপূর্নভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেন। পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য"।

২.আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত রাষ্ট্রে পরিপূর্ন ভাবে কুরআন সুন্নাহর শাসন কায়েম ছিল। ছিলনা কোন ধর্মনিরপেক্ষতা কিংবা সমাজতান্ত্রিকের ছোঁয়া বা তথাকথিত গণতন্ত্র। এটি ছিল একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। ধনী দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না। ছিল না কোন শ্রেণী সংগ্রাম। এই রাষ্ট্রে মানবতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হয়।

৩. পরামর্শ ব্যবস্থা ঃ পবিত্র কোরআনের রাসুল (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কোন সমস্য সম্পকে পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহন করুন (ওয়া শাওয়েরহুম ফিল আমরে) " রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাসুল (সাঃ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। বদরের যুদ্ধে সাহাবীদের পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে রাসুল (সাঃ) বন্দীদের মুক্তিপনের মাধ্যমে মুক্ত করে দেন।

৪.সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, কোন মুসলমান যদি অমুসলিমের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তবে কাল কেয়ামতের দিন আমি ঐ অমুসলিমের পক্ষে দাড়াব।" একথা শুধু মুখেই বলেননি বাস্তবেও দেখিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন অমুসলমানের উপর জুলুম করা হত না এবং স্বাধীনভাবে তাদের স্বীয় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অধিকার দেয়া হত। অমুসলিম নাগরিকদের জান এবং সম্মানের নিরাপত্তা ধর্মীয় স্বাধীনতা মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ-মর্যাদা দিয়েছেলেন তিনি। মুসলমানদের জন্য যে সব মৌলিক অধিকার ছিল অমুসলমানদের জন্যও তাই ছিল।

৫। সুবিচার প্রতিষ্ঠা ঃ বিশ্বনবী (সাঃ) ছিলেন নিরপেক্ষ বিচারক। তাঁর বিচারে আপন-পর ধনী-দরিদ্র মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বনী মখযুম গোত্রের জনৈক মহিলার চুরির অপরাধ ক্ষমা করার অভিযোগ মর্জনার জন্য প্রার্থনা করলে মহানবী (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আমার কলিজার টুকরা ফাতেমাও যদি অভিযোগে অভিযুক্ত হত, তাহলে তাঁকেও আমি ক্ষমা করতাম না বরং শাস্তি দিতাম। ন্যায় বিচারের প্রতীক রাহমাতুল্লীল আলামীন সুবিচারের যে দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করে গেছেন বর্তমানে বিচার বিভাগে যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে দেশে শান্তি বিরাজ করত। একমাত্র তার আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ফিরে আসতে পারে।

www.pathagar.com

৬, **অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ** ইসলামী হুকুমতের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন। কোরআনের আলোকে ঘোষণা করেন" ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম। "শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি বলেন, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মুজুরী আদায় করে দাও"। সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য যাকাত ফিৎরা সদকা-খয়রাত প্রভৃতি ব্যবস্থাকে বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন বলেই হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে যাকাত গ্রহীতা পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছিল।

৭. **প্রথম লিখিত সংবিধান ঃ** মদীনায় ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান এ ত্রিজাতির মধ্যে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা, ধর্মীয় সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতার উৎখাত, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে ৫৭টি শর্ত সম্বোলিত যুগান্তকারী এক সনদ প্রণয়ন করেন, যা 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে মানবাধিকার নীতি নিরাপত্তার বিধান ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রবর্তন করা হয়। Hitty এর মতে " Our to the religion commniuty of Medina the later and larger state of Islam arose" ঐতিহাসিক আমীর আলীর মতে মদীনা সনদ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় বহন করে।

৮. **প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ** মসজিদে নববী ছিল তৎকালীন সময়ে প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু। বিচারালয়, সম্মেলন কক্ষ, রাষ্ট্রের সচিবালয় ও বৈদেশিক দূতদের মিলনকেন্দ্র।

সুষ্ঠুভাবে প্রসাশনিক ব্যবস্থা পরিচলনার জন্য প্রত্যেক অঞ্চলে উপযুক্ত প্রশাসক নিযুক্ত করেন। শহর ও বাজারে অবৈধ ক্রয় বিক্রয় যাতে না হয় তার জন্য একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন যার দায়িত্বে ছিলেন হযরত ওমর (রা)।

৬. **অধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ** মহানবী (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে প্রত্যেকের বাকও বিবেকের স্বাধীনতা উম্মুক্ত ছিল। নারী ও ইয়াতীমের প্রতি তিনিই প্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীদার। জান, মাল ও সম্মানের অধিকার প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে "ঘোষণা দিয়েছিলেন" নিশ্চয়ই তোমাদের জান, মাল ও সম্মান এমনি পবিত্র, যেমনি আজকার এ দিন তোমাদের জন্য পবিত্র।

১০.**পররাষ্ট্র নীতি ঃ** মহানবী (সাঃ) এমন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল বিশ্বমানবতার কল্যানমুখী রাষ্ট্র, যেখানে ছিল না কোন সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কোন জাতির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তা রক্ষা করতেন। অযথা রক্তপাত নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানই ছিল তাঁর কাম্য। হুদায়বিয়ার সন্ধিই এর জ্বলন্ত প্রমান। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারস্য রাজা খসরু হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসী ও মিসর রাজা মুকাউকাসের পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌছান।

www.pathagar.com

১১. সেনাবাহিনী ঃ মহানবী (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনীর প্রধান কাজই ছিল দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা। আর এর মূল অস্ত্র ছিল আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান। তাইতো বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী হাজার কাফেরদের উপর বিজয় অর্জন করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আর্বিভাবের পূর্বে আরবজাতি শিক্ষিত ছিল না। অথচ রাসুলে আকরাম (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রত্যেক নর-নারী জন্য জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক (ফরয) করেন। বায়তুল আরকাম এ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। নবী করিম (সাঃ) কোরআনের আলোকে সারা দুনিয়াকে তাঁর নীতি ও আদর্শ দ্বারা সুশোভিত করে গেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভাবের পূর্বে আরবজাতি ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। যাকে বলা হত আইয়্যামে জাহেলিয়াত। অথচ তাঁর জ্ঞান,দক্ষতা প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি সেই জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত করেন। বিশ্ব মজলুমের বেদনা বিধ্বস্ত হৃদয়ে তিনি অনির্বাণ প্রদ্বীপের জ্বলন্ত শিখা, যুগান্তরের অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেয়ে পতংগের মত চারদিক থেকে মানুষ তাঁর দিকে ছুটতে লাগল। কুরআনে ধ্বনিত হল সমগ্র মানবতার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে। হে রাসুল! সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আপনাকে কল্যাণ হিসাবে অবতীর্ণ করেছি।" বিশ্বনবী (সাঃ) এর আবির্ভাব ছিল যেন আঁধারে সুর্যোদয়ের মত। তিনি মানবজাতির মুক্তিদূত হিসাবে বিশ্ব শিক্ষক রূপে শুভাগমন করেছিলেন। যাঁর সংস্পর্শে এসে অত্যন্ত বর্বর লোকগুলো সেরা মানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি গভীর বিচক্ষনতার সাথে যুগ যুগ ধরে লালিত পৌত্তলিকতাও কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙ্গে ধর্মাশ্রয়ী এক রাষ্ট্রে ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যবধি কোন রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদের (সাঃ) মত এত দূরদর্শিতার সাথে এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি। তাই ঐতিহাসিক Stanly handepol এর মতে "ধর্মপ্রচারক হিসাবে মুহাম্মদ ছিলেন যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি রাষ্ট্রনায়ক হিসাবেও।"

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

সমাজ উন্নয়নে ইসলামী শিক্ষার আবশ্যকতা

মুহাম্মদ তাহের হোসেন

প্রানীকূলের অবয়ব যেভাবে দেহ কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, তেমনি শিক্ষার শাখা-প্রশাখার উপর ভর করে সমাজের তথা জাতির উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটে। শিক্ষা মানব জীবনে বহুমাত্রিক সমৃদ্ধি এনে থাকে। মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান , সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নৈতিকতার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈল্পবিক পরিবর্তন আনার সহায়ক হিসাবে একমাত্র সার্বজনীন শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা রাখে। সার্বজনীন শিক্ষা , কারিগরী শিক্ষা ও মৌলিক শিক্ষা -এই তিন ধারার সমন্বিত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন মানব জীবনকে সুন্দর ও সৌরভের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। শিক্ষা ছাড়া সামাজিক উন্নয়ন কল্পনা করা অবাস্তব। সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব বিষয়সমূহকে বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে শিক্ষাই একমাত্র সকলের কাছে গ্রহন যোগ্যতা অর্জন করেছে। একটি বীজ যেমন পুংকুরিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিপূর্নতা লাভ করে তেমনি শিক্ষা আলোকিত করে সমাজ জীবন।

মানুষের বিবেক ও বিবেচনার বিকাশের জন্য সর্বস্তরে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা একটি সমাজের জন্য অপরিহার্য। এজন্য শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড হিসাবে আজো সমাজে চিহ্নিত ও বিবেচিত।

ইসলামী শিক্ষার পরিচিতি

ইবনে সীনা, ইবনে মজিদ, ইবনে খালদুন প্রমূখ ইসলামী বিজ্ঞগনের ধ্যান ধারণা বিশ্বাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং তাদের পরহেজগারীতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। ইসলামের পরিপূর্নতা, সার্বজননিতা, মানবতাবোধ এবং জীবনবোধকে এত ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ করে রাখার বিষয় নয়। তাই মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামের অবাধ বিচরণ ছিল। বর্তমানে এই অবস্থার জন্য দায়ী মুসলমানদের দৃষ্টিভংগি , মুল্যায়ন ক্ষমতা এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কিত সীমিত জ্ঞান বা ধারনা। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো কুরআন-হাদীস থেকে সংগ্রহ করে সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করাই ছিল ইসলামী পন্ডিতদের প্রকৃত কাজ। এই বিষয়টি যথাযথ ও গুরুত্বের সাথে জনজীবনে উপস্থাপিত না হওয়ার কারনেই ইসলামী শিক্ষা একটি গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ মানব জীবনে ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা তুলে ধরার আগে ইসলাম সম্পর্কে ধারনা অর্জন করা অনস্বীকার্য। ইসলাম সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক বলেছেনঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ন করলাম, তোমাদের জন্য ইসলাম (শান্তি) ধর্ম মনোনীত করে দিলাম (কুরআনঃ ৫ঃ৩)। সমগ্র মানব সমাজের কল্যানে ইসলাম ধর্মের শাশ্বত নীতি অত্যন্ত বাস্তব ও কার্যকর। মহান আল্লাহতে আত্ম সমর্পন ও আল্লাহর বিধানে অবিচল আনুগত্য প্রকাশ এবং মানব জীবনে তা বাস্তবায়নই হচ্ছে ইসলাম। আর এই বাস্তবায়নের জন্য কুরআনের জ্ঞান জানা প্রতিটি মুসলমানদের জন্য জরুরী। এটাই ইসলামী শিক্ষা। মানুষের সমাজ জীবন, সংসার জীবন, দেশ বা জাতির যাবতীয় বৈধ কল্যাণের প্রতিটি বিষয়গুলো কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা আছে। আমাদের একটি কু-ধারনা আছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের কোন নির্দেশনামা নেই। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। কুরআন পাকে ১৫০-এর অধিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আয়াত রয়েছে। গবেষনা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মানব সৃষ্টি ও এর রহস্য, জীব বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল, জোতিবিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র, খনিজ বিজ্ঞান, তাপ ও আলো বিজ্ঞান, স্থাপনা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ বিজ্ঞানমুখী হতে পারে। এই হল ইসলামী শিক্ষার বিশালতা ও ব্যাপকতা। এভাবে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ সফলকাম হতে পারে। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "যে নিজেকে কলুষিত করেছে, সেই অকৃতকার্য হয়েছে। তাই ইসলামকে সঠিক ও যথার্থ উপলদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা সংগ্রহ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তার মধ্যে মানবিক ও সামাজিক গুণাবলী বিদ্যমান আছে। সমাজ গুণাবলীর বিকাশ সাধন অনস্বীকার্য। মানুষের গুনাবলীর চেতনা থেকেই সামাজিক উন্নয়নের আদর্শবাদ সূচিত হয়েছে। এই আদর্শবাদ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ (কুরআন–৩৩ঃ২১)। সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই আদর্শবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন-হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষা ও অনুশীলনীর দ্বারা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বৃদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন ঘটে। ইসলামের জবিনাদর্শ ও দৃষ্টিভংগি মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বলেই এর প্রভাব সমাজে অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শান্তিও নিরাপত্তার লক্ষ্যেই মানুষকে সামাজিকীকরণ, উপকরণ, নিয়ম-কানুন, নীতি, প্রস্থা কৃষ্টি বা রেওয়াজকে পূনর্গঠন করার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তো অন্ধকার যুগের সকল পাপাচার, অপকর্ম, ব্যভিচার, অশুভ

www.pathagar.com

দৃষ্টিভংগি, কুশিক্ষা, অশিক্ষাকে দূরীভূত করে এক নতুন সামাজিক নীতি প্রবর্তন করেন ইসলামী জ্ঞানের বাস্তবায়নের মাধ্যমে । সমাজে এভাবেই ইসলাম প্রতিটি বিষয়কে বৈধ ও মানুষের কল্যাণের দৃষ্টিতে মুল্যায়ন করে। সভ্যতার মুল্যায়নের জীবন দর্শনের পর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে জীবনের মূলনীতি ইসলামের আলোকে সূচিত হয়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) নিষ্ঠা ও দায়িত্ব এবং ঐকান্তিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে সহজে সুখ,শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে এনেছেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা, ঐক্য, সংহতি, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, পরোপকার, ন্যয়-বিচার, সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হয়। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুমিন ব্যক্তিগণের দ্বারা এসব বিষয়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ থাকে । তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এদের অগ্রণী ভুমিকা গুরুত্বপূর্ন। ইসলামী শিক্ষায় দুটি বিষয় আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। আল্লাহর একত্ববাদকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি এবং অন্যটি হল নৈতিকতা। ইসলাম কখনো বিজ্ঞানকে বা নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে না। তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিকতাকে প্রধান্য দেয়া হয়ে থাকে। কারণ নৈতিকতা বিহীন সমাজ ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় অশিক্ষা , বিশৃঙ্খলা ও হিংসা-প্রতি হিংসা এবং সর্বত্র বিরাজ করে পাপাচার। এজন্য ইসলামী বিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষার হার যদি ১০০% হয়ে থাকে তাহলে সমাজ উন্নতি হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের নৈতিকতার হার সমান পর্যায়ে না আসে। সমাজের সুখও শান্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞানের সাথে নৈতিকতার শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। গবেষণা করে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক সভ্যতায়ও মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। সিগারেট পান করার কারণে মদ-মাদক সেবন করে মনুষ্যত্য লোভ পায়। বিজ্ঞান তো সভ্যতার চরম চুড়ান্ত শীর্ষে অবস্থান করছে, তারপরেও সমাজে অশান্তি, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, সন্ত্রাস, লোভ-লালসা পরিহার করা সম্ভব হচ্ছেনা। কারণ মানুষকে পাপমুক্ত করতে হলে বিজ্ঞান চর্চা করা যেমন প্রয়োজন তেমনি নৈতিকতার শিক্ষাও গ্রহন করা জরুরী। এজন্য মানুষের মধ্যে নৈতিকতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উন্নত গুনাবলী ছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজের উন্নয়ন ও সুস্থতার জন্য নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত অপরিহার্য। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে দাঁড়াতে পারবে।" তাই সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সমাজে ইসলাম সৎ কর্ম প্রতিষ্ঠার প্রতি সর্বাধিক জোর দিয়েছে, সমাজ থেকে অন্যায় কাজ পরিহার করার জন্য। সমাজে বসবাসরত মানুষগুলো একে অন্যকে

www.pathagar.com

সৎকর্ম করা এবং দাওয়াত দেয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "মুমিন পুরুষগন ও মুমিন নারী গন এক অন্যের বন্ধু। তারপর ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" এই বিষয়ে আরো বলা হয়েছেঃ "নিশ্চয় সকল লোক অবশ্যই ধ্বংসে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কার্য করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের পরামর্শ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" তাই ইসলামী শিক্ষায় মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করতে বলা হয়েছে এজন্য যাতে এগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

কুরআন হাদীস শিক্ষার গুরুত্ব

তাওহীদ বা মহান আল্লাহ পাকের একত্ববাদ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি। বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি মানুষকে একথা বিশ্বাস করা অপরিহার্য। মানুষের প্রয়োজনীয় বৈধ চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত রেখেই মহান আল্লাহপাক কুরআন পাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ আলোকপাত করেছেন। জ্ঞান ও শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পৃথিবীতে মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তার বিধান সমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করার জন্য। তাই ইসলাম কুরআনের জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে মানব সভ্যতার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করেছে। এজন্য মানব জাতির নিকট মহান আল্লাহ পাক শিক্ষা অর্জনের প্রথম বাণী নাযিল করেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ" পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়. আর তোমার প্রভু মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতনা (কুরআন ৯৬ঃ১-৫)। সুরা আর রাহমানে বলা হয়েছে ঃ "তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন, ভাব প্রকাশ করতে।"

মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য। রাসুলে করীম (সাঃ) এর আদর্শবাদ অনুসরণের মাধ্যমে চরিত্রকে সমুজ্জল রেখে, মানুষের সুখ ও শান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুনিয়াকে আবাসযোগ্য অবস্থানে সুদৃঢ় রেখে সর্বস্তরের মানুষের সমৃদ্ধির জন্য। মানুষ তার শিক্ষা ও জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে। এই মানবীয় গুনাবলীর বিকাশের মাধ্যমে, প্রতিটি মানুষকে তার শিক্ষা অর্জনের তাৎপর্যকে প্রকাশ করে। জ্ঞান ও শিক্ষাকে মন্দের পরিবর্তে ভাল কাজে প্রকাশ করার জন্য কুরআন-হাদীসে সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ ''হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞানের বৃদিধ সাধন কর (কুরআন ২০ঃ১৪৪)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সব সময় কল্যাণ সাধনের জ্ঞান আহরণের জন্য উম্মতগণকে অসিয়ত করেছেন। এমন কোন জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জন করতে বলা হয়নি যা করলে ব্যক্তির মনুষত্ব লোপ পায় এবং সমাজ নিমজ্জিত হয় অন্ধকারে, কুসংস্কারে তথা কুশিক্ষায়।

www.pathagar.com

সমাজের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে ইসলামী শিক্ষ :

মহান আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি সত্তা, প্রজ্ঞা ও কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ কারণে সে যাতে মানুষ তার সকল প্রয়োজন সুন্দর সুষ্ঠভাবে মিটাতে পারে। একজন মানুষ যখন সমাজে বসবাস করে তখন তার প্রয়োজন বোধের সূত্রপাত ঘটে। মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য মানুষের জন্মগত অধিকার। সামাজিক নিরাপত্তা, সম্মানবোধ, মতামত ব্যক্তের অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পাড়া প্রতিবেশির হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, পিতা-মাতার হক, দাস-দাসিদের হক প্রভৃতি পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে উৎপতি হয়েছে। সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ মানুষের মধ্যে ঐক্যতা, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। ইসলামী শিক্ষা এমন ভাবে পরিব্যপ্ত যে, এসব প্রতিটি বিষয়ে সুন্দর সমাধান দেয়া হয়েছে। মানব সমাজে সৎ ও সমাজ দরদী মন তৈরীর জন্যই কুরআন ও হাদীস আমাদের জীবনে সক্রিয়। হাদীসে আছে ঃ " ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।" বলা হয়েছে "নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার ও সৎকর্ম করতে এবং আত্মীয়দের দান করতে নির্দেশ দেন" (কুরআন ঃ ১৬ ঃ ১০)। কুরআন পাকে আরও বলা হয়েছে ঃ নিকট আত্মীয়দের যা প্রাপ্য তা তাদের দাও"(কুরআন ঃ ১৭ঃ২৬) রাসুলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন " নিজে যা খাবে, দাস দাসীকেও তাই খেতে দাও, নিজে যা পারবে, ওদের তাই পরতে দাও। " তিনি আরও বলেছেনঃ যে দাস-দাসীদেরকে প্রহার করে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন প্রহার করবেন।

[লেখক গবেষক ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের একজন পরিচালক]

www.pathagar.com

মানুষের নবী

ব্যরিষ্টার তমিজুল হক

ঈদে মিলাদুন্নবী আমাদের নিকট একই সাথে আনন্দ ও বেদনার কারন । এই দিনে মহানবী মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) ধারায় আবির্ভূত হন ও বিদায় গ্রহণ করেন। এর দ্বারা আল্লাহ্ বুঝাতে চেয়েছেন যে, পরিবারের কোন শিশুর আগমন একটি আনন্দের বিষয়। সেই শিশু বয়োপ্রাপ্ত হয়ে জীবন যাপন করতে থাকে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে পরলোকে ফিরে যেতে হয় অনন্ত জীবনে । আজকে মহানবীকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃষ্ট প্রন্থা হল তিনি ইসলামের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা অনুধাবন করা এবং সেই সব গুনের অধিকারী হওয়া, যার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। বিশেষভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী জীবনে। মহানবী রাজনীতি ও ধর্মকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যেই রাষ্ট্রের অবিভাজ্য মৌলনীতি হিসাবে তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি রাজনীতির পদ্ধতিগত দ্বন্দের সকল উৎস নির্মূল করেছেন। মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী এবং তাঁর বাণী সম্পূর্ন এবং সার্বজনীন-যা সমগ্র মানব জাতীকে উপহার দেওয়া হয়েছে। অনুসারীদের নিকট তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, মহান আল্লাহ মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা এবং তার কোন অংশীদার নাই। মহানবী মানব জাতির জন্য অপার শান্তির বানী বহন করেছেন। তাঁর শিক্ষা ও জীবন বিধান কোন বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইসলামের নবীর শিক্ষার সাথে অন্তর্নিহীত রয়েছে জাতীয় সংহতি ও উন্নতি।

কোন অবস্থায় কি করনীয় তা বিচার করার ক্ষমতাই তাঁর প্রথম গুন ছিল। জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির পরিপূরক বিষয়ে তিনি নীতি নির্ধারন করেছেন ও তদানুযায়ী-ই করেছেন নির্দেশ-ফলে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মবিশ্বাসের মূল সত্য অক্ষুন্ন থেকে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ নিঃসন্দেহে ইসলামের নবী একজন গঠনশীল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। দেশ ও সমাজের প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি বাস্তব নীতি চালু করেছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের অশেষ দক্ষতা তাঁকে একজন যোগ্য প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মহানবীর ও পরবর্তী দু'শতাব্দীর মধ্যে কিভাবে মদিনার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একটি বিশ্ব জনীন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞ প্রশাসকের সমস্ত গুনাবলীর অধিকারী নবী নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের যুক্ত করেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে ভয়, অভাব, অত্যাচার হতে মুক্ত করেন। নতুন অনুসারীদের উন্নত ধর্মীয় নীতিকে

www.pathagar.com

সংগঠিত করা ছাড়াও তিনি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো রচনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে সরকার ও রাষ্টের সুসংহত নীতি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) সময়ে হযরত (সঃ)এর নির্দেশ প্রতিপালিত ও ইসলামের আইন সহজ ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

আমি সংক্ষেপে মহানবীর রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা বলছি। ইসলাম ও ইসলামের প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার বিষয়ে আগ্রহী পাঠকগনের জন্য এর প্রয়োজনীয়িতা অনস্বীকার্য।

১. রাজনীতি ও ধর্মকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে অভিন্নভাবে মহানবী (সঃ) রাষ্ট্রের মৌলনীতি রূপে উপস্থাপিত করেছেন।

২. সামাজিক ন্যায়বিচার, ধৈয্য ও ক্ষমতার প্রবর্তন করে তিনি মানব ইতিহাসে একে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তিনি বিচারকে সহজলভ্য, দ্রুত করেন এবং ইসলমী রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মের সাথে পৌর জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং চুক্তি ও মৈত্রী পালনের শিক্ষা দান করেন।

৩. তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদি, অহেতুক কাজ, দ্বৈত্য ভূমিকা ও স্বেচ্চাচারিতা হতে সরকারকে মুক্ত করেছেন। তিনি সরকারকে মানব জাতীর জন্য সুখের আবাসে পরিগণিত করার কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলেন। তিনি জনগনকে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন ও প্রয়োজনবোধে সমালোচনা করার অধিকার দান করেন।

৪. মহানবী (সঃ) সেই সময়ের বাইজেনটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাচারিতায় উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি শাসকদের জনগনের নিকট দায়ী রেখেছিলেন। তিনি আইন করেছিলেন দায়িত্ব ছাড়া কাউকেও ক্ষমতা দেওয়া যাবে না।

৫. ইসলামের নবীর প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত জনগণ সে দেশের সম্পদ ও পরিশ্রমলব্ধ ফলের অংশীদার হবে। তিনি ধনীদের নিকট থেকে গরীবদের জন্য কর আদায় করেছেন।

৬. ইসলামের নবী (সঃ) সরকারকে বিভিন্ন বিভাগে সংগঠিত করেন এবং নিধারির্ত গুণাবলী যথা, খোদাভক্তি, দক্ষতা, সংশ্লিষ্ট বিষয় ও মানুষের সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালক নিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

৭. নবী মোহাম্মদ (সঃ) উপদেষ্টা পরিষদ অর্থাৎ "মজলিস উসা সুরা" প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে সরকারের কাঠামো ও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্থায়ী অবদান রাখেন।

৮. ইসলামের নবী মানুষের জীবনকে সবকিছুর উর্দ্ধে স্থান দেন। সেনাবাহিনীতে তিনি শৃংখলা আনয়ন করেন এবং সহিষ্ণুতা ও উদারতায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন অন্যায় ভাবে রক্তপাত করা যাবে না।

৯. স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অধিকতর উপলব্ধির মাধ্যমে ইসলামের নবী শুধু আল্লাহ্‌র একত্বই নয় মানব জাতির একত্বও প্রচার করেন। এর সাহায্যে তিনি প্রকৃত সার্বজনীন কর্তৃত্বের বিকাশে অবদান রাখেন।

তিনি মানুষের দ্বারা মানুষের সকল প্রকার শোষনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অলসতা, অকর্মন্যতা, বিশ্বাস ও অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি অবাধ ভিক্ষা ও কুঁড়োনি অপছন্দ করতেন। সকল প্রকার উৎকোচ নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মুসলমান একে অপরের কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে পারেন। শ্রম সম্পর্কে মতবাদের চেয়ে তিনি কর্মের বাস্তব দিকের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভিক্ষা বৃত্তিকে তিনি এই বলে নিন্দা করেন যে, শ্রমিক ও বিভিন্ন সুস্থ ও উৎপাদনমুখী পেশায় নিযুক্তকর্মীর জীবন অধিকতর সম্মানজনক। একদা তাঁর সহচরদের তিনি বলেন, "নিজের পরিশ্রম লব্ধ রুটির চেয়ে অধিকতর সুস্বাদু খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি। আল্লাহর সর্ব ধর্ম প্রচারক, তাঁর ঐশী বাণী প্রচারের পূর্বে নিজেরাই নিজেদের আহারের সংস্থান করতেন। সুতরাং নবীদের ধর্মপ্রচারের পূর্ব শর্ত ছিল যে, খাদ্যের জন্য তারা অন্যের মুখাপেখী হতে পারে না। কি ধরনের কাজ তিনি করবেন তা তৎকালীন বিরাজমান অবস্থার উপর নির্ভর করত। " ছাগল চরানোর কাজকে তখন সম্মানজনক কাজ হিসাবে ধরা হত। মহানবী তাঁর শৈশবে একাজ করেছেন এবং তাঁর সাহাবাগন মজদুরের কাজকেও ঘৃনা করতে না।" আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন একজন নবীও পাঠান নাই যিনি ছাগল চরান নাই। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর আপনিও কি তা করেছেন? জওয়াবে মহানবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ , আমি মাত্র কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে মক্কার লোকদের ছাগল চরাতাম।

তিনি নির্দেশ দেন ইসলামে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের শ্রমের প্রাপ্য তুল্য না দেওয়া চাকুরীর অধিকার ও সুবিধার বরখেলাফ । চাকুরী ও শ্রমজীবিদের উপর সকল প্রকার

www.pathagar.com

অবিচারকে তিনি ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করেন ও নিম্নলিখিত ঘোষনা দেনঃ "শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তাকে মজুরী দাও"।

একদা তিনি এক সাহাবীকে নিম্মলিখিতভাবে বলেন, আল্লাহ বলেন, শেষ বিচারের দিন বিশেষভাবে তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করবেনঃ

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ও সহজেই তাহা ভঙ্গ করে;

২. যে ব্যক্তি দাসে পরিণত করে এবং মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে নিজের জন্য খরচ করে;

৩. যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার কাছে থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করার পর তার পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার জানায়।"

রাসুল (সঃ) ও খলিফাগন শ্রমিকের কর্মের বিষয়ে একমাত্র শর্ত আরোপ করেন যে, কাজের প্রকৃতি কোন আবস্থাতেই ইসলামের মৌলনীতির ও স্বার্থের পরিপন্থী হবে না।

কোরআনের শিক্ষা অনুসারে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা পৃথিবী সৃষ্টির সময় হতেই ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সময় সময় এই ধর্মের অবনতি ঘটে।

যখন মানুষ প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের নীতি ভুলে যেত তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ তাঁর অশেষ দয়ায় তার রাসুল বা বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি জনগণকে পথনির্দেশ ও সজাগ করতে পারেন। মোহাম্মদ (সঃ) এইরূপ একজন বার্তাবাহক এবং তিনিই ইসলামের শেষ নবী।

ইসলাম বস্তুতঃই তৌহিদবাদী বা এক আল্লায় বিশ্বাসী ধর্ম। আল্লাহর এই একত্ববাদ প্রাচীন আরবের বহু দেব-দেবীর সরাসরী পরিপন্থী।

ইসলামের তৃতীয় নীতি ভ্রাতৃত্ব। বাস্তবিকই ভ্রাতৃত্বের যে নীতি ইসলাম প্রচার করেছে ও প্রকৃত রূপ দিয়েছে সেটাই তার সর্বোৎকৃষ্ট গৌরবের অন্যতম । প্রায় সব ধর্মে ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে কোন ধর্মই দৈনন্দিন মানুষের ভ্রাতৃত্বের এমন বস্তুনিষ্ঠ করে উপস্থাপিত করতে পারেনি।

বিদায় হজ্জের বানীতে মহানবী (সঃ) জনগনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "কাজের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। বর্ণ ও গোত্রের অহংকার সম্পূর্ণরুপে তিরোহিত হল। আরবেরা অনারবীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, অনারবীয়রাও আরবদের অপেক্ষা নয়, তোমরা সকলে আদম সন্তান এবং আদমকে মাটি হতে সৃষ্টিকরা হয়েছে। অবশ্যই প্রত্যেক মুসলমান এক অপরের ভাই, একজন বিকলাঙ্গ কাফ্রী কৃতদাসও যদি শাসকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

থাকে এবং তিনি আল্লাহর বিধান (কোরআন) অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালিত করেন তখন তাঁকে মান্য করবে।

ইসলামে কোন ব্যক্তি সারা জীবন অবিবাহিত থাকবে এই মতবাদ বিশ্বাস করে না যেমনটি দেখা যায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারক, চার্চের পুরহিতদের বেলায়। আমরা দেখতে পাই, মহানবী (সঃ) ২৫ বছর বয়সে হযরত খাদিজা (রাঃ) বিবাহ করেন। এই মহিয়সী মহিলা নবীকে (সঃ) বন্ধুরূপে বরণ করেছিলেন যখন নবীর কোন ধন-সম্পদ ছিল না এবং তাঁকে অল্প জেনেই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি তাঁকে বুঝেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক অন্বেষায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বস্তুত ঃ তিনি একজন ত্রুটিহীন মহিলা, বিশ্বাসিদের মাতা। হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে মহানবীর (সঃ) যৌবনের একমাত্র বিবাহ। তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং স্ত্রীদের মধ্যে ও সর্বশ্রেষ্ঠ। নবুয়ত প্রপ্তির ১৫ বছর আগে তাঁদের এই বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহিত জীবন ২৫ বছর স্থায়ী হয়। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিবেচনায় একের প্রতি অপরের অপরিসীম আস্থা ছিল। হযরত খাদিজার জীবদ্দশায় মহানবীর (সঃ) আর কোন স্ত্রী ছিল না, যা সেই সমাজের নবীর মত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্য নিতান্তই অস্বাভাবিক ছিল। নবীর (সঃ) বয়স যখন ৫০ তখন হযরত খাদিজা (রা) ইন্তেকাল করেন। এই অবস্থায় হয়ত তিনি কখনও পূর্ণবিবাহ করতেন না বাস্তব কারন না থাকলে, যেহেতু তিনি তার যৌন জীবনে ছিলেন একান্ত স্বেচ্ছাসংযমী।

এবার আমরা মহানবীর (সঃ) পবিত্রতার স্ত্রীদের বিষয়ে আসি। তাঁদের অবস্থা অন্য সাধারণ মহিলা বা স্ত্রীর মত ছিলনা। তাঁরা বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছিলেন। যে দুটি বিবেচনায় তিনি পরবর্তী বিবাহ করেছিলেন তা হলো(১) অসহায় বিধবা মহিলাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তখনকার সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যাদের অন্য কোন ভাবেই কাজে নিয়োগ করা যায় না যেমন 'সাওদা" -র আগের স্বামীর সন্তান ছিল- সামাজিক পূনর্বাসনের জন্য (২) নেতৃত্বের কর্তব্যে নবীকে সহায়তা প্রদানে ও মহিলাদের শিক্ষার জন্য। বড় পরিবারের একত্রে বসবাসের তাগিদে সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের এই সামাজিক অধিকার স্বীকৃত। হযরত আবু বকরের (রাঃ) কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) বুদ্ধিমতী ও তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন এবং হাদিসে তিনি মহানবীর জীবনীর একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। হযরত খোজাইমার (রাঃ) কন্যা হযরত জয়নাব দরিদ্রের প্রতি ছিলেন সংবেদনশীল। তিনি চামড়ার কাজে পারদর্শিনী ছিলেন। যার আয় দ্বারা তিনি গরীবদের সহায়তা করতেন। কিন্তু মহানবীর (সঃ) ধর্মিনীর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁদের সকল উম্মতের মাতা হিসাবে কাজে সহযোগিতা করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

হেরেমের ক্রীতদাসীদের মত তাঁদের নিজেদের অথবা স্বামীদের চিত্ত বিনোদনের জীবন ছিল না। তাঁদেরকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যদি তারা শুধু আরাম-আয়েসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসে থাকেন, তবে নবীর (সঃ) সহধর্মিনীর পবিত্র অধিকার তাদের জন্য নয়, এক্ষেত্রে তেমন অবস্থায় যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ সহকারে তাঁদেরকে তালাক দেওয়া যেত।

শিক্ষা ঃ মহানবী (সঃ) চেয়েছিলেন তাঁর উম্মত বা অনুসারীরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করুন যাতে তাঁরা তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তিনি সর্বদা তাঁর সহচরদের শিক্ষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরামর্শ দিতেন। মহানবীর (সঃ) শিক্ষা হতে আমরা দেখতে পাই তিনি সর্বদা চাইতেন যে, তাঁর অনুসারীরা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হোন এবং ইসলামের নীতি অনুসরণের পূর্ন পরিচয় লাভ করুন।

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জের ভাষণ

মুহিউদ্দীন খান

হিজরী দশম সনে হযরত নবী করীম সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হজ্ব করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক মদীনায় সমবেত হন। এ বিপুল সংখ্যক সঙ্গী-সাথীর কাফেলা নিয়ে হযরত নবী করীম (সাঃ) ২৬ শে যিলক্বাদ তারিখ মদীনা থেকে রওয়ানা হন এবং ৫ই যিলহজ্জ তারিখে মক্কা শরীফে উপনীত হন। প্রথমেই কাবার তওয়াফ করেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করতঃ সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্যে সাফায় পৌছেন। সেখানে পবিত্র কাবার দিকে রুখ করে এরশাদ করেন ঃ

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তার কোন শরীক নেই। একমাত্র তার সত্ত্বাই প্রশংসার যোগ্য। সব কিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান। নিশ্চয়ই এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সকল বৈরীশক্তিকে পরাভূত করেছে।

৯ই যিলহজ্জ হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) আরাফাতে পৌছেন। দ্বিপ্রহরের পর কাওওয়া নামক উষ্টিতে আরোহন করে জাবালে রহমতের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে সমবেত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীর সামনে তিনি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদাণ করেন, তাই বিদায় হজ্জের ভাষণ রূপে পরিচিত হয়ে আছে। এ ভাষণটিতে এমন কিছু গুরুত্বপুর্ণ উপদেশ এবং মৌলিক বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে, হজ্জের এ খুতবা সীরাত বিশেষজ্ঞগণ ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহ আর্ন্তজাতিক বিধিমালা রুপে আখ্যায়িত করেছেন। খুতবাটি এভাবে শুরু হয়ঃ

সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য। আমরা কেবল মাত্র তাঁরই প্রশংসা করি। কেবল তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। একমাত্র তারই নিকট অপরাধের ক্ষমা চাই। তাঁর সামনেই অনুতাপ প্রকাশ করি। স্ব স্ব অন্তর কুমন্ত্রনা এবং প্রবণতার মোকাবেলায় একমাত্র তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করি।

আল্লাহ তা'য়ালা যাকে সৎপথে চলার তাওফীক দান করেন তাকে কেউ ভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে হেদায়েতের তাওফীক না দেন তাকে সৎপথে আনা করো পক্ষে সম্ভব নয়। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। আল্লাহর বান্দাগন! আমার কথা মনেযোগ দিয়ে শোন। আজ আমি তোমাদের কে সুস্পষ্ট কিছু কথা বলতে চাই। কারণ, ভরসা হয় না যে, এরপর এই স্থানে এরূপ কোন সমাবেশে আমি তোমাদের সাথে একত্রিত হতে পারব।

www.pathagar.com

লোক সকল! তোমাদের পরস্পরের জান এবং মাল (রক্ত ও সম্পদ) পরস্পরের নিকট তেমনি মর্যাদার বস্তু, যেমন আজকের এ হজ্জের দিন এবং আরাফার ময়দান। আর এ মর্যাদা আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকবে।

সর্তক হও! আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। যা বলার ছিল তা পৌঁছে দিয়েছি। কারও জিম্মায় যদি অন্যের কোন আমানত থেকে থাকে তাকে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। সুদের সকল প্রাপ্য আজ থেকে বাতিল বলে গণ্য। রবীয়া ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালেবের খুনের দাবী রহিত করছি।

জাহেলী যুগের সকল সম্মান ও পদ মর্যাদা বাতিল করে দেওয়া হলো। তবে কাবার তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব যাদের উপর রয়েছে, তাদের সে দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে যে হত্যা সংঘটন করা হয় তার জন্য অবশ্যই কেসাস গ্রহণ করা হবে। যে হত্যাকান্ড লাঠি কিংবা পাথরের আঘাতে ঘটানো হয়েছে, তার দিয়াতে এক শত উট নির্ধারর্ণ করা গেল। এর মধ্যে যদি কেউ কিছু বাড়ায় তবে সে জাহেলী যুগে বর্বর আচারণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শয়তান এ ব্যপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এই জমিনের বুকে পুনরায় শয়তানের এবাদত হবে। তবে ওর পক্ষে এরূপ সন্তুষ্টির বিষয় হতে পারে যে, এমন সব বিষয়ে তা অনুসরণ করা হবে যে গুলিকে তোমরা হালকা বিষয় বলে মনে করবে।

লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদেরও কিছু অধিকার রয়েছে তেমনি তোমদেরও তাদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে। তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হবে তোমাদের শয়ন কক্ষে অন্য কাউকে প্রবেশাধিকার না দেওয়া। এমনকি তোমাদের পছন্দ নয় এমন কোন লোককে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়া কর্তব্য। সর্বোপরি কোন প্রকার অশ্লীলতার মধ্যে যেন তারা কখনও লিপ্ত না হয়। যদি কেউ এ ধরনের কোন অপরাধ করে ফেলে তবে আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়েছে তাদের সংশোধনের জন্য নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পার, তাদের শয্যা পৃথক করতে পার, এমনকি হালকা শাসনও করতে পার। তবে এমন প্রহার করা যাবে না, যাতে শরীরে আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে যদি তারা বিরত হয় এবং তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের পূর্ণ ভরণ পোষন তোমাদের দায়িত্বে এসে যায়। তোমাদের মোকাবেলায় মেয়েরা অবলা। তারা তোমাদের সহযোগিতা ছাড়া নিজেদের ভরণ-পোষণেও সক্ষম নয়। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে আলাদা স্বরূপ তোমাদের সঙ্গীনীরূপে গ্রহণ করেছ। আল্লাহ তায়ালার আইন

www.pathagar.com

মোতাবেকই তাদের দেহ নিজেরদের ভোগে এনেছ। সুতরাং স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। উত্তমরূপে তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে। সতর্ক হও। আমি আল্লাহর হুকুম তোমাদের কান পর্যন্ত পৌছে দিলাম। হে আল্লাহ , তুমি সাক্ষী থেকো। লোক সকল! মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, কারো পক্ষে ভাইয়ের সন্তুষ্টি ব্যতিত তার মালের মধ্য থেকে কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

সর্তক হও। আমি আল্লাহর হুকুম তোমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ তুমি সক্ষী থাকো। আমার অবর্তমানে তোমরা যেন বর্বর যুগের আচরণের ন্যায় একে অপরের রক্তপাত করতে শুরু করোনা। তোমাদের মধ্যে আমি এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যার উপর সুদৃঢ় থাকলে আর কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তা এক। তোমাদের আদি পিতাও এক সবাই তোমরা আদমের সন্তান। আর আদম মাটির দ্বারা সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে কেবল মাত্র তারাই বেশী মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে, যারা পরহেজদগারীতে অগ্রনী।

অনারবের উপর আরবের কোন প্রাধান্য নাই । তেমনি, অনারবেরও আরবের উপর কোন প্রাধান্য নাই। প্রাধান্যর একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে খোদাভীরুতা। শুন! আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। বল, তোমরা তখন কি জবাব দিবে? সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর হুকুম যথাযথ ভাবে আমাদের নিকট পোঁছে দিয়েছেন। আমাদের জন্য সকল কল্যাণের উপদেশই আমাদের কে দিয়েছেন। কোন কথাই গোপন রাখেননি। আল্লাহর তরফ থেকে সমর্পিত আমানত যথাযথ ভাবে আপনি আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক! আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক!! আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক!!!

শুন! যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তারা এসব কথা অনুপস্থিতদের পর্যন্ত পোঁছাবে। আশ্চর্য কিছু নয় যে, যারা এখানে উপস্থিত নেই তাদের অনেকেই যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের চাইতে উত্তমরূপে এসব কথা অনুধাবন ও কার্যকর করবে।

লোক সকল! আল্লাহ তাআলা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রত্যেক অংশীদারদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশীতেও ওসিয়ত করা বৈধ নয়। প্রসবকারিনী যার বিবাহধীন, সন্তানের পিতৃত্ব তার জন্যই সাব্যস্ত হবে। ব্যভিচারিনীর জন্য রয়েছে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি । কেউ যদি নিজের জন্ম দাতা পিতাকে অস্বীকার করে অন্য কাউকে পিতৃত্বে বরণ করে, তবে তার উপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। হাশরে তার

www.pathagar.com

কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তোমাদের সবার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আরাফাতের পরবর্তী দিবস মিনাতে পৌঁছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলৃহি ওয়া সাল্লাম আর একটি মূল্যবান খুতবা প্রদান করেন। তাতে বলা হয়েছিলঃ

স্মরণ রেখো! আমার পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। তোমাদের পর আর কোন নতুন উম্মতও সৃষ্ট হবে না। সুতরাং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুন এবং পরওয়ারদিগারের এবাদতে নিয়োজিত থাক।

পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করবে। রমযান মাসের রোযা রাখবে। আগ্রহভরে মালের যাকাত প্রদান করবে। আল্লাহর ঘরে হজ্ব করতে আসবে। আর তোমাদের শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকবে যেন আল্লাহ তাআলার জান্নাতে স্থান লাভ করতে পার।

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

আদর্শ সমাজের স্থপতি মহানবী (সাঃ)

মুহাম্মদ সেলিম মিয়া

ঘোর অমানিশা। জাহেলী যুগের অভিশাপ। মানুষের চারপাশে ঘিরে ছিল বিশৃংঙ্খলা, অশান্তি আর অশান্তি। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি মোট কথা সকল কিছুই জাহিলিয়াতের যুগকাষ্ঠে বন্দী। মানুষের সমাজতো এভাবে চলতে পারেনা; মানুষতো স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং প্রতিনিধি। শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিনিধিত্বের দায় দায়িত্ব তো মানুষকে পালন করতে হবে। এই জন্যই প্রয়োজন ছিল রাসূলের। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে সেই ঘোর অমানিশা পূর্ণ আরবের জাহেলী সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মহা মানব হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। তাঁর আবির্ভাব ছিল মানব জাতির রহমত স্বরূপ। তিনি পতিত মানব জাতিকে সঠিক সুন্দর ও সীরাতুল মুসতাকিমের পথে পরিচালনা করে বিশ্বে নির্ভেজাল শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনাবিল শান্তির সমাজ এমনি এমনি হয়ে যায়নি, সে জন্য মহানবী (সাঃ) সহ সাহাবীবৃন্দ অনেক কুরবানী স্বীকার করেছিলেন । বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে যদি সেই অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা হলে রাসুলের (সাঃ) আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা করতে হবে। রাসুলের (সাঃ) আদর্শ প্রতিষ্ঠা ছাড়া তা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

১২ই রবিউল আওয়াল সেই মহামানবের জন্ম দিন। যিনি সমগ্র মানব জাতির রহমত স্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই মহা মানব হযরত মুহম্মদ (সাঃ) জগতে এমন এক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, যা অনুসরন করলে মানব জাতি সর্বাধিক মঙ্গলময় ও উন্নত হতে পারে।

এই দিন প্রতি বছরই আসে। কিন্তু আজকের এই সংকটপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষনে এই দিনের গুরুত্ব এত বেশি যে, সমগ্র মানব জাতি সেই মহাপুরুষের নিদের্শিত পথের সন্ধান লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ' বলেছেন ঃ আজ যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুনিয়ার "ডিক্টেটর" হতেন তাহলে জগতে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হত"। মিঃ বানার্ড'শ" তাহার অন্তর অন্তরাই প্রতিধ্বনি করেছিলেন কিনা জানিনা। তবে তাঁর উক্তি যে মোক্ষম সত্য তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 'বার্নাডশ' অপেক্ষা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমি বলব যে, যদিও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আর ইহ জগতে নেই, তবুও তার প্রচারিত আদর্শ ও রীতি-নীতি শাশ্বত হয়ে আছে। আমরা যদি তাঁর সে আদর্শ ও রীতিনীতিকে আমাদের কর্ম জীবনের ডিক্টেটর বানিয়ে লই, তাহলে যে সমস্ত ফেৎনা ফাসাদ আজ গোটা পৃথিবীকে একটা জাহান্নাম বা নরক কুন্ডে পরিণত করেছে তার অবসান হয়ে এখানে পূর্ণশান্তি, সম্প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশ গড়ে উঠবে।

আজ হতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানবতার মুক্তিদূত রাহমাতুল্লিল আলমিন সাইয়্যেদুল মুরসালিন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কিংবদন্তীর নায়ক। বিশ্ব নবী হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী গোত্র কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম বিবি আমিনা। হযরতের দাদা ছিলেন তৎকালে কাবা ঘরের মুতোয়াল্লী জনাব আব্দুর মুতালেব। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন দুনিয়ায় পদার্পন করেছিলেন, তখন তাহার স্বীয় জন্মভূমি নৈতিক অধঃপতন, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশান্তির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। সামাজিক অবক্ষয় এত নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল যে মানুষ আর পশুর মধ্যে বিবেকের দিক দিয়ে তেমন কোন পার্থক্য ছিলনা। মদ্য পান, জুয়া, লুটতরাজ, সুদ, ব্যবিচার, যেনা, নারীহরণ, লাম্পট্য, দুশ্চরিত্র, পুংমৈথুন, নারীমৈথুন ও পশু মৈথুনের মত কাজ আরব সমাজকে কলুষিত করে তুলেছিল। এ মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধ বিবর্জিত মানব সমাজ যখন মুক্তির জন্য পাগল পারা হয়ে উঠেছিল ঠিক তখনই মহান রাব্বুল আলামীন মানব দরদী মহানবী (সাঃ)কে ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন সহ সমাজ সংস্কার ও সামাজিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন।

মহানবী (সাঃ) প্রথমে মদ, জুয়া হারাম সম্পর্কে আল্লাহর বানী শুনালেন; সাবধান মধ্যপান, জুয়া খেলা শয়তানের কাজ। এ অসামাজিক কাজ হতে নিজেদেরকে দূরে সরে আসতে হবে। যেনা, ব্যভিচার, চুরি, খুন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আল্লাহর কঠোর বাণী শুনালেন; "ব্যভিচার একটি জঘন্য অপরাধ, যার নিকটবর্তী হয়োনা।" যেনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বাণী শুনালেন যে, যেনাকারী পুরুষ এং যেনাকারিনী নারী উভয়কে একশত ডোরা প্রদান করতে হবে। সমাজ থেকে জুলুমকে অপসারিত করার লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ) এ শিক্ষাপ্রদান করলেন যে, জালিমকে তার জুলুম হতে বিরত রাখ এবং মজলুমকে সাহায্য করো। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের ঘোষনার পর সমাজ হতে ধীরে ধীরে মদ্য পান, জুয়া, যেনা, ব্যভিচার চুরি, ডাকাতি, হত্যা লণ্ঠন, জুলুম ইত্যাদি চির তরের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং সমাজের সার্বিক কল্যাণের দিক নিয়েই ছিল হযরত (সাঃ) এর সামাজিক শিক্ষা।

গোত্রীয় যুদ্ধের অবসান ঃ গোত্র কলহের বিষ বাস্পে অন্ধকার যুগে আরব ছিল কলুষিত। গোত্রের মান সম্মান রক্ষার্থে তারা রক্তপাত করতে কুণ্ঠাবোধ করতোনা। তৃণভূমি, পানির ঝর্ণা, গৃহপালিত পশু নিয়ে সাধারণত রক্তপাতের সূত্রপাত হত। সামান্য মাদী উটকে প্রহার করার ফলে আরবে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গ্রথিত করে সকল গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের অবসান করেছেন।

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ঃ মহানবী (সাঃ) সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন অন্যায় অপরাধে কাউকে ক্ষমা করা হবেনা, এব্যপারে আমার কন্যা ফাতেমা হলেও ক্ষমার যোগ্য হবেনা।

www.pathagar.com

শিশু হত্যা প্রতিরোধ ঃ তদানীন্তন আরব সমাজে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। মহানবী (সঃ)-এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে কোরানের নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন, "তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা, আমিই তো তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি"।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ঃ পাক ইসলাম যুগে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে সাধারণ আসবাব পত্রের মত মনে করা হত। নারী যত্রতত্র তার দেহ হস্তান্তর করতে পারত। পুরুষ যত ইচ্ছা তত নারী গ্রহণ করতে পারত। স্ত্রীর স্বামীর সম্পত্তিতে এবং কন্যার পিতার সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিলনা। এ অবস্থা দেখে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন, যে সমাজে পুরুষের নারীর উপর অধিকার থাকবে না সেটা আদর্শ সমাজ হতে পারে না, তাই আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহর বাণী ঘোষণা করলেন,

"নারীরা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা নারীদের ভূষণ। নারীর উপর নরের যতটুকু অধিকার রয়েছে ঠিক নরের উপরও নারীর ততটুকু অধিকার রয়েছে।" তিনি নারী জাতির মর্যাদার জন্য ইসলামী পারিবারিক আইন ঘোষণা করলেন, নারী তার স্বামীর সম্পত্তির দু' আনা অংশ পাবে এবং কন্যাা তার পিতার সম্পত্তির ভাইদের অর্ধেক প্রাপ্ত হবে। নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিবাহে স্বামীর নিকট হতে স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা ধার্য করলেন এবং বিবাহ ও তালাকের সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি জারি করলেন। এভাবে তিনি নারী জাতিকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

দাস-দাসীদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান ঃ তদানীন্তন আরব সমাজে দাস-দাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদেরকে পণ্য-দ্রব্য ও পশু-পক্ষীর ন্যায় হাটে বাজরে বিক্রি করা হত। তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হত, স্বাধীনতা এবং অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিল না। মহানবী (সঃ)-এ দাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি এদেরকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন, "দাস-দাসীদেরকে আযাদ করে দেওয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠতম পূণ্যের কাজ আল্লাহ পাকের নিকট আর কিছুই নেই।" এ ছাড়া তিনি সমাজে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক এতিম, মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। সুতরাং মহানবী (সঃ) এর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ সমাজ গঠন করা।

সুনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কার তৎকালীন আরব সমাজে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। প্রাক ইসলামী যুগে কোন সুসংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না। অর্থের আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন নিয়মনীতি ছিল না। সুদ, লুটতরাজ, অন্যায় অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হত। মহানবী (সঃ) পবিত্র

www.pathagar.com

কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক একটি সুনিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুর্বর আরব মরুভূমির দেশে কৃষির তেমন কোন সুব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ লোক লুটতরাজ করে অর্ত সংগ্রহ করত। পুঁজিপতি ইহুদীরা অত্যন্ত চড়াহারে সুদের ব্যবসা করত। ফলে জাতীয় সম্পদের প্রায় সবটকুই তাদের কুক্ষিগত ছিল।

ক. হালাল উপাজ্যন ঃ মানব দরদী আল্লাহর নবী (সঃ) অর্থনৈতিক এরূপ শোষণ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এ সমাজে এহেন বলগাহীন অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। মহান প্রভু পরোয়ার দিগার ঐশী নির্দেশ জারী করলেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা অপরের জন সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে আত্মসাৎ করোনা। এ আয়াত নাযিলের পর পর পুঁজিপতিদের চিরাচরিত প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করার প্রবণতা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) ঘোষণা করলেন, "যারা ঘুষ খাবে এবং ঘুষ দিবে উভয়ের স্থান নরকে।" এ সতর্ক বাণী শ্রবণ করার পর সমাজ থেকে ঘুষ প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। এছাড়া মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করবে এবং কিভাবে তাহা খরচ করবে সে সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা প্রদান করলেন। তিনি হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের কথা বললেন এবং মানবতা বিরোধী বিভিন্ন পন্থাগুলো যথা- ওজনে কম দেয়া, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, প্রতারণা ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে এগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। ফলে অর্থ উপার্জনের অবৈধ পন্থাগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

খ. ব্যয় ঃ সম্পদ ব্যায়ের ব্যাপারে কালামে পাকে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে- তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপাকের সত্যিকারের বান্দা যারা খরচ করার সময় কোনরূপে অপচয় কিম্বা কৃপণতা করবে না বরং মধ্য পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

গ. সঞ্চয় ঃ বৈধভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে মহানবী (সঃ) নিষেধ করেননি। তবে ব্যক্তিগতভাবে উপার্জিত অর্থ ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর কল্যাণে খরচ না করে শুধু সঞ্চয় করা ইসলাম অনুমোদন করে না। অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষাগুরু মহানবী (সঃ) যাকাত প্রথার প্রবর্তন করেন। পবিত্র কোরআনের ৮২ বার যাকাত প্রদান সম্পর্কে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

যাকাত বিত্তবানদের করুণা নয়, ইহা গরীবদের ন্যায্য প্রাপ্য। ইহা ইসলামী রাষ্ট্রের উৎস যা সঞ্চয় হিসাবে বায়তুলমালে জমা রাখা হয়। এছাড়া সাদকা, জিযিয়া, খারাজ, ওশর, ইত্যাদি উৎস হতে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহের একটি ব্যবস্থা মহানবী (সঃ) প্রবর্তন করেন।

সঞ্চিত অর্থ খরচের ব্যাপারে কালামে পাকে ৮টি খাতে ব্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা- দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের জন্য, যাকাত উসুলকারী কর্মচারীদের জন্য,

www.pathagar.com

প্রয়োজনবোধে ইসলামের প্রতি মন আকৃষ্ট করার জন্য, দাসত্ব মোচনের জন্য, ঋণমুক্ত করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য ব্যায়িত হবে। প্রকৃত পক্ষে মহানবী (সঃ) অর্থনৈতিক শিক্ষার যে নীত নির্ধারণ করেছন, তা গোটা মানব জাতির ব্যক্তি জীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত সার্বিক মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ মহানবী (সঃ) আরবের বুকে যে রাজনৈতিক শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে। আরবে তখন কোন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিলনা। নৈরাজ্য পূণ্য আরব ভূমিতে, "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই ছিল প্রচলিত। তিনি সেখানে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ঃ মহানবী (সঃ) সর্বপ্রথম নৈরাজ্য পূণ্য আরবভূমিতে, "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতির পরিবর্তে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। এ হুকুমতের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই তিনি ছাড়া তাঁর রাজ্যে কারো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই। মানুষ কেবল মাত্র তারই রাজ্যে বিধি বিধান কায়েম করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ সম্পর্কে কালামেপাকে এরশাদ হয়েছে, "যদি জনগণ জিজ্ঞাসা করে আল্লাহর রাজ্যে হুকুমদানে আমাদরে কোন অধিকার আছে কি? হে নবী! আপনি বলে দিন, মহান আল্লাহর রাজ্যে হুকুমদানের সার্বোভৌম ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের।"

কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন ঃ সমাজের দুর্বল অসহায় মানুষদের প্রতি অত্যাচার নিপীড়ন, অনাচার দূর করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সঃ) "হিলফুল ফুজুল" সংঘ নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন; যাতে গোত্রীয় শাসন দূরীভূত হয় এবং কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। "হিলফুল ফুজল" সংঘ গঠনের দ্বারা আমরা মহানবী (সঃ)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। মহানবী (সঃ) এর দুরদর্শিতা ছিল দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য, "কেন্দ্রীয় মৌলিক অধিকার" সুনিশ্চিত করা।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ ঐতিহাসিকদের মতে মহানবী (সঃ) সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি ঐশী তন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে শত ধারায় বিভক্ত আরব গোত্রগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এনেছিলেন। ফলে গততান্ত্রিক সরকারের অধীনে সকল শ্রেণীর নাগরিক তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা সহ স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার লাভ করল। মহানবী (সঃ) গোটা আরব জাতির জন্য তথা বিশ্বের মানব জাতির জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার দুরদর্শিতা নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে একটি কল্যাণকামী আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ) তাঁর অনুপম চরিত্রের মাধ্যমে কর্মের দৃঢ়তা, সদব্যবহার, সদাচার ও ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ মেহমানদারী, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা, সাদকা গ্রহণে আপত্তি, তোহফা গ্রহণ, কারো অনুগ্রহ ভাজন না হওয়া, বল প্রয়োগ বিরোধী নীতি, আত্মপীড়ন এ অপছন্দনীয় অপরের প্রচার ও অযথা প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সারল্য ও অনাড়ম্বরতা, কর্তৃত্বের বড়াই, ও লোক দেখানো ভাব থেকে দূরে অবস্থান, সাম্য নম্রতা, অপাত্রে সম্মান ও প্রশংসার প্রতি বিরূপ লজ্জাশীলতা, সহস্তে কাজ করা, হিম্মত ও দৃঢ়তা, সাহসীকতা, সত্যবাদীতা, প্রতিজ্ঞা, মিথ্যাচার ও অল্পে তুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্য্য, শত্রুদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, ও সদব্যবহার, কাফির মুশরিকদের সাথে সদব্যবহার, গরীবদের প্রতি ভালবাসা ও সমবেদনা, জানের দুশমনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, শত্রুদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মহিলাদের সাথে ববহার, পশুর প্রতি দয়া, সাধারণভাবে সকলের জন্য করুণা ও ভালবাসা প্রকাশ, অন্তরের কোমলতা, পিড়িতদের দেখাশোনা, মৃতের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, নম্র মেজাজ, ন্যায় বিচার, সন্তানদের প্রতি ভালবাসা ও নিজের বিবিদের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূল (সঃ) যে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা ইতিহাসের স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে।

এ দুনিয়ার বুকে নবী রাসুলগণের আবির্ভাবের ফলে সমাজ জীবনে যে নানা পরিবর্তন দেখা যায় তা অনস্বীকার্য। প্রত্যেক ধর্মের উৎপত্তি ও প্রচারের সঙ্গে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলেও এবং প্রাথমিক পর্যায়ে অনুসারীগণ সংখ্যালগিষ্ঠ হলেও কালে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হন। সে সব ধর্মাবলম্বীগনের দ্বারাই সামাজিক রীতি-নীতিতে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। হযরত (সঃ) তদ্রুপ সমাজে একটি ক্ষুদ্র কনা থেকে উঠে এসে সমগ্র আরবকে সত্যের স্রোতের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন।

পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহানবী (সঃ) তদানীন্তন আরব সমাজে শিক্ষা ও সংস্কারে যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। তিনি গোটা সমাজকে বর্বর ঘৃণিত পশুর আচরণ হতে প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তাই, আজও আমাদের সমাজে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহানবী (সঃ)-এর শিক্ষা ও সংস্কারের একান্তই প্রয়োজন।

[লেখক ঃ দৈনিক দিনকালের ময়মনসিংহ প্রতিনিধি]

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ)–এর আচার ব্যবহার

মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম মিফতাহ

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ
لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ
بعد از خدا بزرگ توهى قصه مختصر

হে সৌন্দর্যময়! হে মানব সর্দার। আপনার উজ্জল্যময় মুখমন্ডল থেকে চন্দ্রকে উজ্জলতা দান করা হয়েছে। আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে, আল্লাহর পরে আপনিই মহান।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবন চরিত্র আলোচনা করে শেষ করা যাবেনা। কিয়ামত পর্যন্ত এ আলোচনা চলবে। আমরা এখানে হুযুরের আচার ব্যবহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

নবী করীম (সাঃ)–এর পবিত্র মজলিসঃ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মজলিস ছিল সহনশীলতা, জ্ঞান চর্চা, ধৈয্য ও স্নিগ্ধ-চিত্ততার অপরূপ নমুনা । এ মজলিসে কেউ উচ্চস্বরে কথা বলতোনা, কারও ইজ্জতে কলংক আরোপ করা হতনা এবং কারও ভুল ভ্রান্তি সম্প্রচার করা হতনা। তাঁর মজলিসের সদস্যগণ খোদাভীতের কারনে একে অপরের প্রতি বিনয় নম্র ব্যবহার করতেন। তারা বড়দের সম্মান করতেন. ছোটদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। অভাব গ্রস্থদেরকে সাহায্য করতেন ও বিদেশী মুসাফিরদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। (নশরুত্তীব)

হযরত যায়েদ বিন হায়েছা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি রাসুলে করীম (সাঃ) এর প্রতিবেশী ছিলাম। যখন তার প্রভি ওহি নাযিল হত, তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি উপস্থিত হয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করে নিতাম। রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের মন রক্ষা করতেন এবং আমদের সাথে কাজে-কর্মে মেলামেশা করতেন। আমরা যে ধরনের আলাপ আলোচনা করতাম, তিনিও সে ধরনের আলাপ আলোচনা করতেন। (অর্থাৎ তিনি আমাদের সাথে কবর আখেরাতের কথা বার্তাই কেবল বলতেন না, কিংবা দুনিয়ার কথা বার্তা শুনতে অনিহা প্রকাশ করতেন না। আমরা যখন আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হতাম, তখন তিনিও আখেরাতের আলোচনা করতেন, আখেরাতের অবস্থার বিশদ বিবরণ পেশ করতেন। পানাহারের কর্থাবার্তা শুরু হলে তিনিও পানাহারের রীতিনীতি, উপকারিতা, সুস্বাদু খাদ্যের কথা এবং ক্ষতিকর খাদ্যের বিষয়ে আলোচানা করতেন। (খাসায়েলে-নববী) তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে মজলিসে উপবেশন করলে স্বাতন্ত্র্য

www.pathagar.com

সৃষ্টি হবে আশংকা করে স্বীয় সঙ্গীদের অগ্রে বাড়তে দিতেন না। (যাদুল-মা'আদ) কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং তাকে অবাক দৃষ্টিতে দেখতেন। কেউ কোন অভাবের কথা তাঁকে জানালে তার অভাব দূর না করে অথবা নম্রভাবে জবাব না দিয়ে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সদা হাসিমাখা মুখ ও সৌজন্য সকল মুসলমানের জন্য সমভাবে বিরাজমান ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন সকলের আধ্যাত্মিক পিতা, মানুষ হিসাবে সকলের অধিকার তাঁর কাছে সমান ছিল। তবে তাক্‌ওয়া তথা খোদাভীতির ভিত্তিতে আচরণে কিছুটা তারতম্য হতো। অর্থাৎ তাক্‌ওয়ার তারতম্য অনুযায়ী তিনি একজনকে অন্য জনের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। অন্য সব ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে সাম্যের নীতি কার্যকর ছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সব সময় তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে সম্পূর্নরূপে মুক্ত রেখেছিলেন। যথাঃ (১) রিয়া তথা লোক দেখানো মনোভাব থেকে (২) বেশী কথা বলা থেকে এবং (৩) অর্থহীন বিষয়াদির মধ্যে জড়িত হওয়া থেকে। অনুরূপ তিনটি বিষয় থেকে মানুষকেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন (১) তিনি কারও নিন্দা করতেন না। (২) কাউকে লজ্জা দিতেন না এবং (৩) কারও ছিদ্রান্বেষণ করতেন না। তিনি সেই কথাই বলতেন, যাতে দুনিয়াতে বা আখেরাতের কোন না কোন কল্যাণ নিহিত আছে। অপরদিকে তিনি যখন কথা বলতেন তখন সমবেত সাহাবীগণ এমনভাবে মাথা নত করে বসতেন, যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে রয়েছে। তিনি বাক্যলাপ থেকে পরিপূর্ণ রুপে বিরত হওয়ার পরই কেবল তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তাঁরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করতেন না। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর সমীপে কোন ব্যক্তি কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত সকলেই নিশ্চুপ থাকত। (অর্থাৎ একজনের কথার মাঝখানে অন্য কথা বলত না।) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মুখের উপর কেউ প্রশংসা করুক তিনি তা পছন্দ করতেন না।

কৃপা গুন ঃ নবী করীম (সাঃ) নিজেকে বাজে কথা-বার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। তিনি মানুষের মন জয় করতেন এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দিতেন না। তিনি প্রত্যেক কওমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মান করতেন এবং তাকে সেই কওমের সরদার নিযুক্ত করতেন। জনগণকে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকতে তাকিদ করতেন এবং সেটির অনিষ্টকারিতা থেকে নিজেও আত্নরক্ষা করতেন। তিনি পরিচিতদের হাল হাকিকত জিজ্ঞাসা করতেন এবং চলতি ঘটনাবলী সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিতেন, (যাতে মজলুমের সাহায্য ও দুস্কৃতিকারীদের দমন হতে পারে)। তিনি ভাল কাজের প্রশংসা ও মন্দ কাজের নিন্দা করতেন। (নশরুত্তীব)

আগে সালাম করা ঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর খেদমতে যে কেউ আসত, তিনি আগে সালাম করতেন এবং আগন্তুকের সালামের উত্তর দিতেন।

www.pathagar.com

এখানে তাঁর রওজা যিয়ারত কারীদের জন্য সুসংবাদ এই যে, তিনি যখন জিবদ্দশায় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করার সময় এই গুনে গুনান্বিত ছিলেন, তখন প্রত্যেক যিয়ারতকারী এখনও হয়তো তাঁর সালামের জবাব লাভে ধন্য হয়। এমনও কিছু সংখ্যক নৈকট্যশীল ব্যক্তি ছিলেন, যারা কারামত স্বরূপ নিজেদের কর্ণদ্বারা রাসুলে আকরাম (সাঃ) এর সালাম শ্রবন করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি উম্মতের জন্য এই পার্থিব জগতের ও রহমত এবং দুনিয়ার পৃষ্ঠদেশ থেকে তিরোহিত হওয়ার পরেও রহমত। (মাদারেজুন্নবুওয়ত)

কথা বলার ভঙ্গি ঃ হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা পরকাল ও পরকালের বিষয়াদির চিন্তায় থাকতেন। কোন সময়ই তাঁর স্বস্তি ছিলনা। তিনি অনাবশ্যক কর্থা-বার্তা বলতেন না। তিনি দীর্ঘসময় নিশ্চুপ থাকতেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিস্কার ও সারগর্ভ কথা বলতেন, যাতে শব্দ কম ও সারগর্ভ বেশী থাকত। তিনি সত্য মিথ্যার মধ্যে [illegible] কথা বলতেন, যা অনাবশ্যক দীর্ঘ কিংবা দুর্বোধ্য ধরনের ছিলনা আবার [illegible]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মেজাজে কঠোরতা ছিলনা। তিনি সম্বোদিত ব্যক্তি[illegible] অবমাননা করতেন না। নেয়ামত সামান্য হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন, খাদ্যবস্তুর নিন্দা ও প্রশংসা কোনটাই করতেন না। (নিন্দা না কারণ এই যে, সেটা নেয়ামত এবং প্রসংশা না করার কারণ এই যে, অধিকাংশ সময় এই প্রশংসার কারণে লোভ-লালসা হয়ে থাকে)।

নবী করীম (সাঃ) এর অধিকাংশ হাসি ছিল মুচকী হাসা। এতে যে সব দাঁত দেখা যেত, সেগুলো মনে হতো যেন বৃষ্টির শিলা। (শামায়েলে তিরমিজী) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসুলুল্লাহ্ -এর বাক্যাবলী অত্যন্ত সুস্পষ্ট হত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তিনি এমন ভাবে কথা বলতেন যে, 'কেউ তাঁর শব্দবলী গণনা করতে চাইলে অনায়াসে গণনা করতে পারত। কথা বলার সময় তিনি মুচকী হাসতেন এবং অত্যন্ত প্রফুল্ল বদনে কথা বলতেন।

শৃঙ্খলা ঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর প্রতিটি কাজ সমতা ও শৃংখলার সাথে হত। কোন সময়ই বিশৃংখলভাবে কোন কাজ করতেন না। জনগণকে তাদের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দিলে তাদের কেউ হয়ত দ্বীনের প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে এবং কেউ দ্বীনের কাজে মাত্রাতিরিক্ত মশগুল হয়ে পড়বে- এরূপ আশংকা করে তিনি জনশিক্ষার প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দিতেন।

গৃহাভ্যন্তরে সময়সুচী ঃ হযরত হাসান (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে (আহার নিদ্রার জন্যে) গৃহাভ্যন্তরে গমন করতেন। এর জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন। গৃহে গমন

www.pathagar.com

করলে তিনি তাঁর গৃহাভ্যন্তরে থাকার সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন ঃ (১) এক ভাগ আল্লাহ তা'আলার এবাদতের জন্যে, (২) এক ভাগ পরিবার-পরিজনের মানবিক প্রাপ্য পরিশোধ করার জন্যে (এতে তাদের সাথে হাস্যালাপও শামিল ছিল) এবং (৩) একভাগ বিশ্রাম ও আরামের জন্যে। মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে আসত এবং কিছু না কিছু খেয়ে ফিরে যেতনা, (অর্থাৎ তিনি যেমন জ্ঞান দান করতেন তেমনী কিছু না কিছু খাওয়াতেনও) এবং প্রয়োজনীয় এলেম শিক্ষা করে তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আসত। (নশরুত্তীব)

নির্জনতার সময় ঃ নবী করীম (সাঃ) কখনও হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করতেন না; বরং এভাবে আসতেন যে, গৃহের লোকজন পূর্ব থেকে তাঁর আগমনে কথা জানতে পারত। খাবার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেসা করতেন এবং মাঝে মাঝে চুপ থাকতেন। অবশেষে যা উপস্থিত থাকত, তা পেশ করে দেওয়া হত। আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি গৃহে আগমন করার পর খাওয়ার দোয়া পাঠ করতেন। আলহামদু হিল্লাজি আতআমানী আসাকানী আলহামদু হিল্লাজী মান আলাইয়া আস আলূকা আন তুজিরানী মিনান্নার।

হযরত আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত মা আয়েশা (রাঃ) -কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসুল্লাহ (সঃ) ঘরে এসে কি কি কাজ করতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি ঘরের লোকজনের খেদমত করতেন। অর্থ্যাৎ গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অংশ গ্রহণ করতেন। সেবার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন না। তিনি ঘরের সব কাজ করতেন। যেমন ছাগলের দুধ দোহন করা, নিজের জুতা সেলাই করা ইত্যাদি। রাসুলে আকরাম (সাঃ) ঘরের লোকজন ও খাদেমের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন এবং কখনও কারও সাথে কোন কঠোর আচরন করতেন না। কারও কোন প্রকার কষ্ট না হয় সে বিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান থাকতেন। তিনি স্ত্রীদের কাছে থাকার সময় নম্রতা ও খবরদারী করতেন এবং মন খুলে হাস্যালাপ করতেন। (ইবনে-কাসির)

তিনি খাদেমের সাথে মিলে মিশে কাজ করতেন, আটা গুলতেন। তিনি নিজে সওদা করার জন্য বাজারে যেতেন এবং কাপড়ে বেঁধে সওদা নিজেই বহন করে নিয়ে আসতেন। (যাদুল-মাআদ)

তিনি রাতের শুরু ভাগে নিদ্রা যেতেন এবং অর্ধরাতের শুরুতে জাগ্রত হতেন। গাত্রোখানের পর মেসওয়াক করে ওযু করতেন, অতঃপর যতটুকু সম্ভব নামাজ পড়তেন।

আরাম-শয্যা ঃ হযরত হাফসা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার গৃহে নবী করীম (সাঃ) এর বিছানা কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আমি একটি চটকে দিগুন করে তাঁর নিচে বিছিয়ে দিতাম, একদিন আমি সেটিকে চতুরগুন করে বিছিয়ে দিতে চাইলাম, যাতে বিচানাটা একটু নরম হয়। তাই করলাম। প্রত্যুসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলেন ঃ তুমি রাত্রে আমার নিচে কি বিছিয়েছিলে? আমি আরয করলাম, সেই ছিল, তবে একে চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম, যাতে আপনার একটু আরাম হয়। তিনি বললেন, নরম বিছানাটা রাত্রিতে আমার তাহাজ্জত না াাজে প্রতিবন্ধক হ য়েছে। -(শামায়েলে-তিরমিজী)

একাধিক হাদিসে বলা হয়েছে যে, সাহাবায় কেরামগণ যখন নরম বিছানা তৈরী করার আবেদন করতেন, তখন তিনি বলতেন পার্থিব আরাম আয়েশ আমার কি প্রয়োজন? একজন পথিক যে চলতে চলতে পথিমধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বৃক্ষের ছায়ায় বসে যায় এবং কিছুক্ষণ বসে পুররায় সম্মুখে অগ্রসর হয়। (খাসায়েলে নববী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন, একবার আমি উপস্থিত হয়ে দেখি রাসুলুল্লাহ (রাঃ) খেজুর পাতার মাদুরের উপর আরাম করছেন। মাদুরের চিহ্ন তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছিল। এই দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন ; ব্যাপার কি? কাঁদছ কেন? আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রোম ও পারস্য সম্রাটরা তো রেশম ও মখলমের গদীর উপর ঘুমায়। আর আপনি খেজুর পাতার মাদুরের উপর ঘুমান। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ দেখ, এতে কাঁদার কি আছে? তাদের জন্যে দুনিয়া আর আমাদের জন্যে হয়েছে আখেরাত। (খাসায়েলে নববী)

অন্যান্য আচরন ঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কখনও চিত হয়ে এবং পায়ের উপর পা রেখে শয়ন করতেন। কিন্তু দেহের গুপ্ত অংশ খুলে যাবার মতো করে নয়। গুপ্ত অংশ খুলে যাবার আশংকা থাকলে-এরূপভাবে শয়ন করতে তিনি নিষেধ করেছেন।-(যাদুল-মা'আদ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কখনও এশার আগে ঘুমাতেন না। নাপাক শরীরে নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি প্রথমে নাপাক স্থান ধৌত করে ওযু করতেন, অতঃপর প্রত্যহ নিদ্রার সময় তিনি চোখে সুরমা লাগাতেন। তাঁর সুরমাদানী ছিল কাল রঙ্গের। (যাদুল মা'আদ)

[সীরাত স্মারক '৯৯-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

বারই রবিউল আউয়াল ঃ
বার সংখ্যার তাৎপর্য

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মফিজুল ইসলাম

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) জন্ম ও ওফাতের পবিত্র মাস রবিউল আউয়াল প্রতি বছরই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়। গোটা মানব জাতির জন্য মাহে রবিউল আউয়াল তথা ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুমূর্ষ প্রায় জগতবাসীকে নতুন প্রাণ দেয়ার জন্য, যুগ-যুগান্তরের পঞ্জীভূত কালিমা বিদূরিত করার জন্য, অন্যায় অধর্মের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য, আখেরী নবী, নবীকুল সম্রাট হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ১২-ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৫৭০ খৃস্টাব্দে এই ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। বিশ্ব নবীর জন্ম দিবস মুসলিম মিল্লাতের নিকট অতীব তাৎপর্যমন্ডিত। অবশ্য পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস এলেই এতদাঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্টির মাঝে মিলাদুনবী (সাঃ) না সিরাতুন্নবী (সাঃ), এ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও দুটি কথাই হযরতের (সাঃ) শানে ব্যবহৃত হওয়া অযৌক্তিক নয়। মিলাদুন্নবী (সাঃ) কথাটি রাসূলের (সাঃ) এর জীবনের নির্দিষ্ট সীমাতেই ব্যাপৃত থাকে, পক্ষান্তরে সীরাতুন্নবী (সাঃ) কথাটি হযরত (সাঃ)-এর জীবনের সার্বিক দিককেই বুঝায়। অর্থাৎ মিলাদুনবী (সাঃ) কেবলমাত্র জম্ম বৃত্তান্তকেই সীমাবদ্ধ রাখে। আর সীরাতুন্নবী (সাঃ) ব্যাপকার্থে পর্যালোচনা করলে এই সমস্যার আর কোন বিরোধ থাকে না। মনে রাখা দরকার, মাহে রবিউল আউয়াল শুধুমাত্র রাসুল (সাঃ)-এর মিলাদুন্নবী (সাঃ)-ই পালন নয় ওফাতুন্নবীও (সাঃ) এ মাসেই স্বীকৃত আছে। সেহেতু ১২ই রবিউল পবিত্র মিলাদুন্নবী ও ওফাতুন্নবী (সাঃ) দিবস মুসলিম মিল্লাতের নিকট বড়ই তাৎপর্যপূর্ন । কিন্তু কেন মহান আল্লাহ তাবারকও তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব দু'জাহানের সরদারের আগমনের - প্রস্থানের জন্য ১২তারিখকে বেছে নিলেন? অন্য কোন তারিখকেও এ জন্য নির্ধারণ করতে পারতেন, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক ।

প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল স্বরূপ এবং হযরত ঈসা (আঃ)- এর সুসংবাদ স্বরূপ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) পবিত্র কাবা শরীফের ভিত্তি উত্তোলনের সময় যে তিনটি দোয়া করেছিলেন তম্মধ্যে তৃতীয় দোয়াটি পবিত্র কুরআনের ভাষায়ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে এমন একজন রাসুল প্রেরণ করুন যিনি তাদের নিকট তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞানের কথা শেখাবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, নিশ্চয়ই তুমি প্রতাপশালী মহাজ্ঞানী। হাদীসের সাথে পবিত্র কালামের সাদৃশ্য প্রমাণ করে, রাসুল (সাঃ) তার পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশ থেকে আবির্ভূত।

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই ছেলে হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাইল (আঃ)। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর ছেলে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বার ছেলে ছিল। আর হযরত ইসহাক (আঃ) থেকে হযরত ইয়াকুব তথা বনী ইস্রাইল বংশের মধ্যে নবুওয়াতের ধারা হযরত ইসা (আঃ) পর্যন্ত চলে। অন্যদিকে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী-প্রিয় নবী আমিনার দুলাল, রহমতে দু'আলম, নূরে মোজাচ্ছাম, নবীয়ে মোহতারাম, স্রষ্টার প্রেমাস্পদ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। পবিত্র কুরআন মজীদে হযরত ইসমাইল (আঃ) এর নাম বার স্থানে উল্লেখ আছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব (সাঃ) কে বারই রবিউল আউয়াল ধরাধামে প্রেরণ ও গমনের ব্যবস্থা করেছেন, সে জন্যই হযরত যার বংশে তিনি। সে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর পবিত্র নাম বার স্থানে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম মানুষ প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এর দেহে রূহ (আত্মা) প্রবেশ করার সাথে সাথে তিনি আরশ পাকের দিকে তাকায়ে ২৪ টি বর্ণ সমষ্টির দুটি অংশে বিভক্ত একটি বাক্য দেখতে পান। বাক্যটি হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ"। এই বাক্যটির প্রথম অংশ তাওহীদ (একত্ববাদ) ও দ্বিতীয় অংশটি রেসালাত (নবুওয়াত) সম্পর্কিত। দুটি অংশেই মহান আল্লাহ আরবী বর্ণের ১২টি করে বর্ণ সংখ্যার মিল রেখেছেন। তাছাড়া আরবী ভাষায় বর্ণ (হরফ) সমূহ দুই ধরনের। (এক) নুকতা যুক্ত বর্ণ (দুই) নুকতাবিহনি বর্ণ, উল্লেখিত বাক্যটির দু'টি অংশেই নুকতাবিহীন রয়েছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে, এই নশ্বর জগতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আঃ) হতে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যত নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন তাঁরা সবাই এই বাক্যটির প্রথম অংশ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু দিয়ে তাদের মিশন আরম্ভ ও সমাধা করেছেন। প্রথম অংশটির বেলায় সকল নবী-রাসুলগণের মিল পরিলক্ষিত হয়। এতে একথা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, সত্য পথের সন্ধান দাতার এতত্ববাদ সংক্রান্ত দাওয়াত সম্পর্কে ব্যবহৃত বাক্যটির প্রথম অংশের বর্ণ ছিল–বার। তাছাড়া প্রথম অংশটির সাথে প্রত্যেক নবী রাসুলগণ তাদের নিজ নিজ নামসহ খোদা পাকের নির্দেশে দ্বিতীয় আরেকটি অংশ সংযুক্ত করে বাক্যটি পরিপূর্ণ করেছেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) -এর বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি নিজ নাম সহ যে দ্বিতীয়াংশটুকু ব্যবহার করেছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সেটি প্রথামাংশের ন্যায় নুকতা বিহীন ও ১২ বর্ণের সমষ্টির। প্রথমাংশে যেরূপ নুকতাবিহীন ১২ বর্ণ, দ্বিতীয়াংশেও ঠিক তদ্রুপ নুকতা বিহীন ১২ বর্ণের সাদৃশ্য। এই মিলটা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সর্বশেষ নবী তার আরেকটি উৎকৃষ্ট ও জ্বলন্ত প্রমাণ। এতেই কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে ভ্রান্ত আকিদায় বিভ্রান্ত, তার সঠিক ও নির্ভুল সমাধান মেলে। মহান আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু 'বার' বর্ণের মাধ্যমে তাঁর প্রেরীত দূতগণের কাজের সূচনা করেন এবং

www.pathagar.com

সেই "বার" বর্ণের মাধ্যমেই প্রাধান্য দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সাাইয়্যেদুল মোরসালীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে এই পৃথিবীতে প্রেরণ ও সেই একই তারিখে নবীজীর (সাঃ) -ওফাতের ব্যবস্থা করেছেন। 'বার' সংখ্যাটি আল্লাহর পছন্দনীয় বিধায় ১২ সংখ্যায় তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবের আগমন-প্রস্থান একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ রেখেছেন।

পবিত্র কুরআনের বিবিধ স্থানে এবং কয়েকজন (উলূল আজমী) বড় বড় পয়গাম্বরগণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে ১২ সংখ্যার প্রয়োগ দেখা যায়। আবহমানকাল থেকে পৃথিবীর সকল স্থান ও গোত্র এবং সকল ভাষায় মাসের সংখ্যা হল- ১২। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে তাওবায় উল্লেখ করা হয়েছে " নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস ১২ টি।" সারা বিশ্বে ১২ মাসে ১ বছর ও ১২ বছরে এক যুগ পালন যেন কুরআন পাকের ঘোষণার একটি স্বীকৃত বাস্তব রূপায়ণ। তাছাড়া ইসলামী পরিভাষায় (আস-হাবুল ফারায়েয) মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর সংখ্যা -১২। সাধারণতঃ পার্থিব জগতে বিবিধ পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ১২ সংখ্যার অসংখ্য প্রচলন আছে। যেমন-কলম-১২টিতে এক ডজনও ১২ ডজন এক গ্রুস। এমনিভাবে পেন্সিল, ম্যাচ ইত্যাদি। সূরায়ে আল-ইমরানে বর্নিত "হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘনিষ্ট বন্ধু (হাওয়ারী) বা শিষ্যের সংখ্যা ছিল-'১২"। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে "মুসা (আঃ) যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইলেন, তখন আমি (আল্লাহ্) বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপর, অতপর তা থেকে প্রবাহিত হয় ১২টি প্রস্রবন।

মুসা (আঃ) যখন আল্লাহর নির্দেশে ভূমধ্য সাগরের (নীল নদ) দিকে রওয়ানা হন, তখন সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তিনি সমূদের পানিতে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেই ১২টি সড়ক তৈরী হয়ে যায়, তিনি ও তাঁর দল নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে যান। নবী (সঃ) এর আগমন প্রস্থানের তারিখ ১২-ই রবিউল আউয়াল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। সেহেতু পবিত্র কোরআন ও বিবিধ কাজে ১২ সংখ্যার বহুল ব্যবহার আমাদের সামনে স্পষ্ট। ১২ সংখ্যা ব্যবহারের সময় হোক নবী (সাঃ) এর স্মরণ ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুকরণ। আর এতেই রয়েছে আমদের সকল কাজের সম্পৃক্ততা ও ১২-ই রবিউল আউয়ালের সার্থকতা।

[সীরাত স্মারক '৯৭ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

উস্ওয়াতুন হাসানাহ

ব্যারিষ্টার তমিজুল হক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ১২ ই রাবিউল আউয়াল মোতাবেক ইংরেজী ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগস্ট সোমবার মক্কার কোরাইশ বংশের অভিজাত বনি হাশিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়। মক্কার অভিজাত পরিবার সমূহের ঐতিহ্য অনুযায়ী হালিমা নামক এক মহিলাকে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। হযরত তাঁর পালক মাতা-পিতার কাছে তাদের গ্রামে কয়েক বছর কাটান। এ সময়ে তাঁকে বেশ কয়েকবার মক্কায় নিয়ে আসা হয় তাঁর মাতা হযরত আমিনার সাক্ষাতের জন্য । ৪ কি ৫ বছর বয়সের সময় তিনি স্বীয় জননীর কাছে স্থায়ীভাবে ফিরে আসেন। ৬ বছর বয়সের সময় হযরতেকে তাঁর মাতা মদিনায় নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পথে মাতা আমিনা ইন্তেকাল করেন। এরপর উম্মি আয়মন নামের এক ক্রীতদাসী মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -কে মক্কায় নিয়ে যান।

রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মাতার মৃত্যুর পর তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিব তাঁর অভিভাবকের দায়িত্ব নেন। হযরতের বয়স যখন ৮ বছর তখন তাঁর দাদাও ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন এবং তাঁর অভিভাবক হন।

১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত হযরতের মুহাম্মদ (সাঃ) মেষপালকের কাজ করতেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) প্রায়ই বলতেন 'মহান আল্লাহর প্রিয় রসুলদের সবাই প্রথম জীবনে মেষপালক ছিলেন'। ইসলামের মহানবীর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) শৈশবে খুবই শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। চাচা হযরতকে তাঁর নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগলেন। হযরতও তাঁর চাচাকে পিতার মত জ্ঞান করতেন। ঐ সময়ে ও তিনি বিশেষ গরীব , দুঃস্থ, বিধবা এবং এতিমদের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন।

চাচা আবু তালিব অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি হযরতকে তাঁর নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগলেন। ১২ বছর বয়সের সময় হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এক বাণিজ্য সফরে তাঁর চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। এই সফর কালে বাহিরা নামের এক খৃষ্টান ধর্মযাজক আবু তালিবকে বলেন, 'আপনার ভ্রাতুস্পুত্র আল্লাহর নবী হবেন।' তিনি দেশে ফিরে হযরতের দিকে নজর দেয়ার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। কয়েকটি গ্রন্থের মতে, আবু তালিবের কাফেলা সিরিয়া অভিমুখে আসার সময় হযরতকে

www.pathagar.com

সুর্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা কারার জন্য একটি ঘন মেঘের ছায়া আলৌকিকভাবে মাথার উপর দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে আসছিল। এই দৃশ্য দেখেই বাহিরা বুঝতে পেরেছিলেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কোন সাধারণ ব্যক্তি নন-তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী যুবক । তিনি তাঁর জীবিকা উপার্জনের জন্য যে কোন সৎ কাজ করতে আগ্রহী ও প্রস্তুত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল আয়ত্ত্ব করেছিলেন এবং একজন ভাল ও সৎ বণিকদের মর্যাদা লাভ করেন। পরে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন এবং সবার সঙ্গে তাঁর লেন-দেন ছিল খুবই সুন্দর এবং সৎ। এ কারণেই ধনী-গরীব নির্বিশেষে মক্কার সকল লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি–আল্‌-'আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

যুবক বয়সে তিনি একেশ্বরবাদের প্রতি কঠোর বিশ্বাসী এবং বহু ঈশ্বরবাদকে ঘৃণা করতেন। তিনি জীবনে কখনও কারও কাছে ওয়াদার বরখেলাপ করেননি। এ কারণে শত্রু-মিত্র সবার কাছে তিনি কেবল বিশ্বাসীই ছিলেন না-আস্থাভাজনও ছিলেন।

তিনি খুবই সাধারণ জীবনাযাপন করতেন এবং দাম্ভিকতা ও গরীমাকে ভীষণ ঘৃণা করতেন। গরীব-দুঃখী, বিধবা ও এতিমদের সমব্যাথী হতে ভালবাসতেন। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় সাধারণভাবে তিনি সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

উসওয়াতুন হাসানা মানে-উত্তম আদর্শ। সত্যিই এমন মহৎ আদর্শবান মানুষ উত্তম আদর্শ ব্যাতিত আর কি হতে পারেন! আল্লাহ্ তাই বলেছেন-লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। যুবক বয়সেই তিনি এলাকায় শান্তি, সুনিশ্চিত, সংঘাত-সংঘর্ষ ও অবিচার রোধ এবং দুর্বল, দরিদ্র ও বাস্তুহারা লোকজনের অধিকার সমুন্নত করার জন্য মক্কার বিভিন্ন উপ-জাতিদের নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ নেন।

ফারাহ্ উপত্যাকার একেবারে শেষ প্রান্তে কাবাহ্ শরীফ অবস্থিত থাকায় বৃষ্টির পানিতে প্রায়ই তা ভেসে যেত। এতে কাবাঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় অধিবাসীরা কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং মক্কার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় গোত্রের মধ্যে কাবা ঘরের এক এক অংশ নির্মাণের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়। কিন্তু 'হাজরী আসওয়াদ' (কালো পাথর) স্থানান্তর প্রশ্নে গোত্র প্রধানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কারণ প্রত্যেকেই পবিত্র ঐ পাথরটি যথাযথ স্থানে স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যস্থতায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। তিনি প্রস্তাব দেন, আগামীকাল ভোরে সবার আগে যিনি কাবা

www.pathagar.com

ঘরে প্রবেশ করবেন তিনিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন। পরদিন ভোরে দেখা গেল সবার আগে যিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করবেন করছেন তিনি আর কেউ নন, মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। হযরত প্রথমেই যেখানে ঐ পবিত্র পাথর সরিয়ে নেয়া হবে, সেই স্থান নির্ধারণ করলেন। এরপর তিনি গোত্র প্রধানদের একটি চাদর নিয়ে আসতে বলেন। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) চাদরটি মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে তার মাঝখানে কালো পাথরটি বসিয়ে দেন। এরপর গোত্র প্রধানদের সবাইকে চাদরটির চারকোণা ধরতে বলেন। যথার্থ স্থানে পৌছার পর মহানবী (সাঃ) পাথরটি উঠিয়ে নিজ হাতে বর্তমান স্থানে রাখেন।

যৌবনকাল ও বিবাহ ঃ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গুণাবলী ও ন্যায়পরায়নতার কথা পবিত্র মক্কা নগরী ও এর পাশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই স্বীয় গোত্রে একজন সৎ ধার্মিক লোক হিসেবে তার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নিজের খ্যাতি বা মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও চারদিকের কলুষিত সমাজ এবং নানান ধরনের দেব-দেবীর পূজা দেখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি জবল-ই-নুর' (হেরা পর্বত) -এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এই পর্বতে গিয়ে তিন আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল হন।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -এর বয়স যখন ২৫ বছর খাদিজা বিন্‌তে খুয়াইলিদ নামে ৪০ বছর বয়স্কা একজন বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত বিধবা তাঁর সততায় মুগ্ধ হন। দু'বার বিধবা এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি হযরতের সঙ্গে বিবাহের এই প্রস্তাব দেন। হযরত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই সুখী। হযরতের ওপর সব কাফেরের উৎপাত বেড়ে যায়। তারা তাঁকে খেলে নোংরা আবর্জনা ছুঁড়ে মারতো এবং চীৎকার করে অশ্লীল গালিগালাজ দিত। এত কিছুর পরও হযরত মুহম্মদ (সাঃ) দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

আবুসিনিয়ায় হিজরত ঃ আল্লাহর রসুল এবং তার সাহাবীদের ওপর নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রায় ৮০জন মুসলমানকে লোহিত সাগরের ওপারে আবুসিনিয়ার অভিবাসন গ্রহণের অনুমতি দেন। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী এই দেশটির শাসক ছিলেন খৃস্টান রাজা নাজ্জাশী। ভদ্র ও বিশ্বস্ত এই রাজা পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুসলমান হন।

এই পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুরাইশ বংশের সকল দলপতিকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রাথমিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থা হিসেবে তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বনি হাশিম পরিবারকে বর্জন করে। ফলশ্রুতিতে 'বনি হাশিম' পরিবারের সদস্যরা খাদ্য ও পানির সংকটে পড়েন। দিনের পর দিন তারা খাদ্যাভাব এবং পানির কষ্ট ভোগ করতে থাকেন। নবুয়তের সপ্তম থেকে দশম বর্ষ পর্যন্ত এই বর্জন অব্যাহত থাকে।

মক্কায় থাকাকালে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহর দীদার লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি মিরাজে গমন করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে 'বনি ইসরাইল সূরায় বর্ণিত আছেঃ "পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমা তিনি তার প্রিয় রাসুলকে রাতের এক প্রহরে পবিত্র মসজিদ 'কাবা শরীফ' থেকে দূরবর্তী 'আল-আকসা' মসজিদে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

এক রাতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) ইসলামের মহা নবীকে জেরুজালেমে আল আকসা মসজিঁদে নিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি বেহেশতে আরোহন করেন। সেখানে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের অনেক বিস্ময়কর ও আলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

আকাবার চুক্তি ও মদীনায় হিজরত ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির একাদশ বছরে মদীনা থেকে হজ্জব্রত পালনের জন্য ছয় ব্যক্তি মক্কায় আসেন এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পরের বছর আরো ১২ জন হজ্ব যাত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য মক্কায় আসেন। নবুয়ত প্রাপ্তির এয়োদশ বছরে মদীনা থেকে আরো ৭২ জন মুসলমান হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মক্কা ত্যাগের চিন্তা-ভাবনা করছেন জানতে পেরে তারা তাঁকে মদীনায় আমন্ত্রণ জানান এবং আশ্বাস দেন যে, তারা তাঁকে সর্বোত ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। মক্কার গোত্র প্রধানরা হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাঁর এবং সাহাবীদের মক্কায় তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে নবী করিম (সাঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর মারফত শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। জিব্রাইল (আঃ) ঐ রাতেই তাঁদেরকে মক্কা ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। এ সম্পর্কে ৮ম সূরায় ৩০ আয়াতে বর্ণনা রয়েছে ঃ

এতে বলা হয়েছে, 'স্মরণ কর, কাফেররা কিভাবে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা করে। এর প্রেক্ষিতে খোদাও পরিকল্পনা করেন। সর্বো পরিকল্পনাবিদ হচ্ছেন তিনিই।' ঐ রাতেই মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এবং তার সাহাবী তিনি দিন তিন রাত সউর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। এই ঘটনা পবিত্র কোরআনের নবম সূরায় ৪০ আয়াতে বর্ণিত আছে। মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দিন থেকে ইসলামি বর্ষপঞ্জি গণনা শুরু হয়। ইংরেজী ৬২২

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট চন্দ্র মাসের (মহরম) প্রথম দিন থেকে এই গণনা শুরু হয়। হিজরতের পরবর্তী ১২ বছর ইসলামের বিস্তার নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সাঃ) গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি হাতে নেন সেটি হচ্ছে, একটি মসজিদ নির্মাণ। এই মসজিদ মুসলামানদের সব ধরনের ধর্মীয় , সামাজিক ও অন্যান্য তৎপরতার স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পবিত্র কোরআনের নবম সূরায় ১০৮ আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে ঃ

ভ্রাতৃত্ববোধ ঃ হযরত মুহমামদ (সাঃ) মক্কা থেকে আগত মুহাজির এবং মদিনার সেবকদের (আনসার) মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এতে উদ্বাস্তু সমস্যার আংশিক সমাধান এবং দুই এলাকার জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার হয়। -(কুরআন ৮ঃ৭২)।

নগরীর প্রতিরক্ষা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রতিবেশী ইহুদী উপজাতিদের সংগে চুক্তি করেন। এই চুক্তিতে তিনটি প্রধান লক্ষ্য অর্জিত হয়। এতে মুসলমান ও ইহুদীদের প্রার্থনা এবং নিজস্ব ধ্যান-ধারণার স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। এই চুক্তির ফলে মদীনা রাজ্যে কার্যতঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।

রোজার ফরয হওয়ার নির্দেশ ও কিবলাহ্ পরিবর্তন ঃ হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সকল মুসলমানের জন্য পুরো রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করা হয়। এরপর সকল ধনী মুসলমানের জন্য যাকাত প্রদান ফরজ করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় আসার পর জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদের পরিবর্তে মক্কায় 'কাবার' দিকে ফিরে নামাজ আদায় করার জন্য তাঁর প্রতি নির্দেশ আসে। এরপর হযরত তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বদর, ওহুদ ও আহ্যাবের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর পর পরই মক্কা বিজয় করেন মুসলমানরা। মক্কা বিজয়ের পর সারা আরব জাহান থেকে প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে থাকেন ইসলাম গ্রহণের জন্য।

এভাবেই হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন হয় এবং সমগ্র আরব ভূখন্ডে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মহানবী হিজরী দশম বর্ষে শেষ বারের মত তাঁর হজ্ব যাত্রার প্রস্তুতি নেন। এক লাখেরও বেশী মুসলমান ঐ বছর হজ্বব্রত পালন করেন। 'জবল-আল রাহমতের' কাছে এ সব হজ্বযাত্রী দলের উদ্দেশ্যে তিনি বিদায়ী ভাষণ দেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাষণে সাম্য, ন্যায় বিচার এবং প্রতিটি মুসলমানের জান-মালের পবিত্রতার প্রয়োজনের উপর জোর দেন। তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম সমাজ থেকে অবৈধ তেজারতি-ব্যবসা অবসানের উপর জোর দেন।

www.pathagar.com

পরিশেষে হজ্বযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবন ধারার রেকর্ড (সুন্নাহ্) রেখে যাচ্ছেন। যদি তারা কঠোরভাবে তা অনুসরণ এবং অনুশীলন করে, তবে তারা কখনও অন্যায়ের পথে পরিচালিত হবে না।

পবিত্র হজ্ব থেকে ফেরার দু'মাস পর হযরত মুহম্মদ (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার নবুয়ত প্রাপ্তির ২৩তম বর্ষে হিজরীর একাদশ বর্ষের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মোতাবেক ইংরেজী ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) যে দিনে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন-ঠিক একই দিনে তিনি ওফাত যান। কাজেই দিনটি একদিকে যেমন আনন্দের ঠিক তেমনি বেদনার। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাঁর প্রিয় নবী যে দিনে জন্ম নিয়েছিলেন- সেই দিনেই এই পৃথিবী ছেড়ে যাবেন। আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা এই দিনে মহানবীর রহমত কামনা করেন। তাঁর জন্য রহমত কামনা এবং সার্বিকভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করার জন্য নবীজীর উম্মতের প্রতিও আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে।

[লেখক ঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী]

www.pathagar.com

পরিবেশ রক্ষায় ইসলামী দর্শন

মুহাম্মদ তাহের হোসেন

সুচনা কথা ঃ আল্লাহর সৃষ্টির কৌশল, নিপুনতা ও মার্ধুয্য এতই বিস্ময়কর যে, মানুষ তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে অবিভূত না হয়ে পারে না। মানুষের জীবন রক্ষার্থে সুপরিমিত পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। মানুষের আভ্যন্তরীন অংগ-প্রত্যংগ এমনভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে করে মানুষের কোন অসুবিধা না হয়। এই পরিবেশ যদি বিনষ্ট বা বিপর্যয় হয় তাহলে মানুষ অসুস্থ্ হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীন অংগ প্রতংগ বিকল হলে বা নষ্ট হলে তখন মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আবার সময়ের আবর্তনে যদি এসব অংগ প্রত্যংগে কার্যক্রম ক্ষমতা হ্রাসপায় বা অকেজো হয়ে পড়ে, তখনও মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মানুষের শারীরিক-আভ্যন্তরীরন পরিবেশকে সুন্দর ও সুপরিমিত রাখার জন্য চিকিৎসকগণ মানুষের চিকিৎসার বন্দোবস্তু করে থাকেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আল্লাহর এই সৃষ্টির কৌশল দেখে আশ্চান্বিত হয়েছেন। তাই মানুষের শারীরিক অংগ প্রত্যংগে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা যেমন জরুরী, তেমনি বিনষ্ট হলে এর চিকিৎসারও জরুরী প্রয়োজন।

আল্লাহপাক মানুষের সুবিধার্থে পৃথিবীকে আবাস্থল করে তৈরী করা হয়েছে। এমন কোন বিষয়কে অবশিষ্ট রাখেননি, যা মানুষের প্রয়োজন আছে, অথচ পৃথিবীতে নেই। এমন সুন্দর , প্রয়োজনীয় উত্তম এবং মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেই পৃথিবীতে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন ঃ বাতাস, পানি, গাছ-গাছালি, নদ-নদী, সাগর-মহাসগর, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, আগুন, মাটি-জীব-জানোয়ার কীট-পতংগ, জীবানু প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এভাবে পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে প্রানীকূলের জন্য এক মনোরম পরিবেশ। এই বিষয়ে কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আমি সেখানে প্রত্যেক বস্তি উদগত করেছি সুপরিমভাবে।" তিনি আরো বলেছেনঃ "তিনি (আল্লাহ) ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার উপর সওয়ার হও এবং ওদের মাধ্যমে তোমাদের জীবনের উজ্জ্বল হয়"। তাহলে দেখা যায় যে, মানুষের জীবন ধারনের জন্যও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। বিষয়টি কুরআন পাকে প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে, নানান ভংগিতে। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ মেঘমালা থেকে অবিরাম করে বর্ষণ করেছি যাতে এর সাহায্যে ফসল শাক-সব্জি ও ঘন বাগান উৎপাদন সম্ভব হয়। " সৃষ্টি থেকে মানুষ তার কল্যানার্থে প্রয়োজনীয় উপাদান

www.pathagar.com

অর্জন করতে পারে। তাই কুরআন পাকে বার বার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করো এবং বলো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি করনি।" এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন আশু প্রয়োজন।

মানুষের জন্য যে পরিবেশ মহান আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন সে পরিবেশ দূষণ হলে মানুষের জীবনে বিভিন্ন দূর্যোগ নেমে আসতে বাধ্য। মানুষ বিপর্যয়ে পতিত হবার জন্য এই পরিবেশকে সংরক্ষণ করা অন্যতম দায়িত্ব। যেহেতু মানুষ পৃথিবী সৃষ্টি করেনি, সেহেতু এর আমুল পরিবর্তন করে পরিবেশ দুষণ করার কোন অধিকার মানুষের নেই। কারণ মানুষ তো জানেনা, পৃথিবীকে ভারসাম্যপুর্ণ করে তৈরীর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পাকের কদুরত ও অপার মহিমার কথা। সুতরাং তার যে কোন অসর্তকতামুলক কার্য্য দ্বারাও এই পরিবেশকে সুন্দর রাখা। পৃথিবীতে বিদ্যমান সুন্দর ও প্রয়োজনীয় পরিবেশ মানুষ কর্তৃক বিনষ্ট না হয় সেজন্য কুরআন-হাদীসে নানা বিধান রাখা হয়েছে। মানুষের অজানা এমন জিনিস রয়েছে রয়েছে যা মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এই সম্পর্কে সুরা নাহলের ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জাননা।" তাই মানুষ কখনো জানতে পারেনা, কোন সৃষ্টি কিভাবে তৈরী করা হয়েছে, একটি সৃষ্টির সাথে অন্যটির সম্পর্কে কি রকম বা এগুলোই কেমন পরিবেশ বিদ্যমান আছে। এই অজানার কারণেই মানুষের কার্যকলাপ পরিবেশকে সুপরিমিত ভাবে রাখা সম্ভব হয়না। মানুষ নির্বিচারে যখনই এসব সৃষ্টির রুপান্তর ঘটাতে থাকে তখন প্রকৃতির বিরোধিতার কারনে তার জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে সীমাহীনভাবে। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ নিজেদের কৃতকর্মের দরুন(সুরা আর-রুমঃ৪১) তাই ইসলাম সৃষ্টির পরিবর্তন আনয়নের ঘোর বিরোধী। আর এই কর্মকান্ডে যারা জড়িত নিশ্চয়ই তারা পাপকর্মে নিমজ্জিত।

নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবেশের মৌলিক উপাদান সমূহ আলোচনা করা হচ্ছেঃ

বায়ু ঃ মহান আল্লাহপাক বায়ু সৃষ্টি করেছেন। এই বায়ুতে রেখেছেন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেন। এই অক্সিজেন গ্রহণ করে মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে আছে। মানুষের শরীরের ফুসফুস, হৃদপিন্ড, রক্ত এসব অক্সিজেনকে শরীরের সর্বত্র সরবরাহ করে থাকে। তাই মহান আল্লাহপাক শরীরের এসব অংগ প্রত্যংগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাহলে দেখা যায় মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য অক্সিজেন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এই অক্সিজেন হতে হয় বিশুদ্ধ, সজীব ও দূষণ মুক্ত। মানুষ অক্সিজেনকে কিনতে হয়না বা এর জন্য বাড়তি কোন কষ্ট করতে হয় না। মানুষের শরীরের ভিতরে সৃষ্টি কার্বনড্রাই অক্সাইড শরীর থেকে মানুষ নিঃশ্বাস ফেলার মাধ্যমে বের করে দেয়। কারণ কার্বনড্রাই অক্সাইড মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ

বিভিন্ন কঠিন ও জটিল রোগের উৎপত্তির প্রধান কারণ। এই কার্বনড্রাই অক্সাইড মানুষ ত্যাগ করার কারণে বাতাসে কার্বনড্রাই অক্সাইড জমতে থাকে। এই বিষাক্ত গ্যাস যাতে মানুষ গ্রহণ করতে না পারে সে জন্য গাছ-গাছালি তৈরি করা হয়েছে এবং এরাই কার্বন ড্রাই অক্সাইড গ্রহণ করে বায়ুকে দূষণ মুক্ত রাখে। আর গাছই অক্সিজেন ত্যাগ করে আমাদের বায়ুকে মুক্ত ও সজীব রাখে। তাই গাছ হল অক্সিজেনের ফ্যাক্টরী। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "তিনটি বস্তু আমার অতি প্রিয়। নামায, স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুত এবং সুগন্ধি"। উম্মুক্ত বায়ুতে বাসস্থান এবং প্রশস্ত বাগানের কথা কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বায়ুকে অপবিত্র করা যায় না।

পানি ঃ বায়ুর পরই মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় পানির। পানি ছাড়া মানুষের নানাবিধ কার্য্য যথার্থ ভাবে সম্পাদন হয়না। মানুষের শরীরে ৭৫% ভাগ হল পানিয় উপাদান। পানির স্বল্পতা বা আধিক্যতা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । তাই মাটি ও পানিকে অত্যন্ত ভারসাম্য পূর্ণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন পাকে পানির গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে । কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ "পানি দ্বারা আমরা সমস্ত বস্তুর জীবন দান করেছি"। পানির মাধ্যমে মানুষের শরীরের অংগ প্রত্যাংগ সচল রাখতে হয়। কিডনীতে পানির অভাব থাকলে কিডনী নষ্ট হতে পারে-এটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় । আরো এরকম উদাহরণ দেয়া যাবে যা পানির অভাব সংক্রান্ত বিষয়। তাই মানুষের জীবনে পানির গুরুত্ব অধিক। এই পানিকে কখনো অপবিত্র, দুর্গন্ধময় ও কদর্য করা যায়না। নির্মল ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা মানুষের জন্য প্রয়োজন। পানির গুরুত্ব এত বেশী যে, একে জীবন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । তবে পানি পরিস্কার ও জীবানুযুক্ত হলে তা মৃত্যুর কারনও হতে পারে ।গ্রামাঞ্চলে বদ্ধ বা দূষিত পানিতে মানুষ গোসল করে, গরু-ছাগল গোসল করায়। আবার এই পানি খাবার ও রান্নার কাজেও ব্যবহার করা হয়। শিশুরা পানিতে খেলা করে, আবার এ পানি পানও করে। ইসলামে পানির সদ্ব্যবহার, অপচয়রোধ এবং পানি বিশেষ করে বদ্ধ পানি নষ্ট না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "যদি তুমি প্রবাহমান নদীর ঘাটেও থাকো, তবুও পানি ব্যবহারে অপচয় করোনা।" পানি সম্পর্কে মহানবীর (সাঃ) সুস্পষ্ঠ দৃষ্টিভংগি ছিল। তিনি কোন ভাবে পানিকে অবহেলার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেননি। পান করার পানিতে যাতে জীবানু প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তিনি সব সময় পানিকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা পানিকে ঢেকে রাখ'। রাসুল বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের গোসলখানায় পেশাব না করে, । পানি দুষিত হলে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি হয়। বিশেষ করে পানি বাহিত জীবানু দূষিত পানির মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং রোগের বাসা বাধে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ "পানির মধ্যে কোন ময়লা পতিত হলে যদি এর রং গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন হয়, তাহলে ঐ পানি অপবিত্র বলে গণ্য হবে। (বোখারী)

বৃক্ষাদি ঃ সমগ্র কুরআন পাকে গাছ-পালা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। বৃক্ষের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে কুরআন পাকের মাধ্যমে জ্ঞাত করা হয়েছে। বৃক্ষের সংগে

www.pathagar.com

মানুষের জীবন -মরণ সম্পর্কে রয়েছে। মানুষ নিঃশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা গাছ সরবরাহ করে। আর মানুষও নিঃশ্বাস ফেলার মাধ্যমে যে বিষাক্ত কার্বণ ড্রাই অক্সাইড ত্যাগ করে তা গাছ গ্রহণ করে পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখে। এ থেকে প্রমাণিত গাছ মানুষের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মানুষের চিকিৎসার জন্য ঔষধ তৈরী, ফলমূল আহার, গাছের কাঠ জ্বালানী, আসবাবপত্র তৈরী প্রভৃতি মানুষ গাছ থেকে পেয়ে থাকে। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে।ঃ "আমি আকাশ হতে কল্যাণ বর্ধক বারি বর্ষণ করি, তৎপর আমি তদ্বারা উদ্যান ও পরিপক্ক শয্যরাজী সমুৎপন্ন করি, এবং সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর, আমার বান্দাগণের জীবিকা স্বরুপ এবং বৃষ্টি দ্বারা মৃতপ্রায় ভূমিকে সঞ্জীবিত করি, এরূপেই পুনরুত্থান ঘটবে (সুরা ক্বাফঃ ৯-১১)। বৃক্ষাদি সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ "তিনি তোমাদের জন্য ভুমন্ডলে শয্যা করেছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের জন্য চলবার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা বিভিন্ন হয়ে যেতে পারে। আর তাতে বিলুপ্ত হতে পারে প্রায় ১৫০ বর্গের উদ্ভিদ এবং বিপুল সংখ্যক প্রজাতির প্রানী। তাই কুরআন পাকে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির কথা সুন্দর করে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, পরে উহাকে খাল, ঝর্ণা ও নদীসমূহ দ্বারা যমীনের অভ্যন্তরে প্রবাহিত করে ? পরে তিনি পানির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপাদন করেন। (সুরা যুমার ঃ ২১)

চাঁদ-সুরুজ ঃ চাঁদ বা সুরুজ থেকে মানুষ বহুবিধ কল্যাণ অর্জন করে। সুর্য্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার জন্য ওজন স্তর ও মহান আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন। দিবা ও রাত্রি সুর্য্যের কারণে হয়ে থাকে। সুর্য্যের তাপের কারণে মানুষ, জীব জন্তু, গাছ-পালা প্রভৃতি পৃথিবীতে বেঁচে আছে। এছাড়া সুর্যের তাপ বৃদ্ধির কারণে পাহাড়-পর্বত বা এন্টারটিকা বরফরাশি গলতে শুরু করেছে। এই কারণে সমূদ্রের পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তলায় সংকুলান না হওয়ার স্থলভাগের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ "তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সুর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে (১৪ ঃ ৩৩)।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ ইসলামে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই কুরআন-হাদীস পবিত্রতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অবলম্বন কারীদের ভালবাসেন (সুরা বাকারা ঃ ২২২)। এই ঘোষাণা শারীরিক, মানসিকসহ সর্বক্ষেত্রে প্রজোয্য। মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'লা পবিত্র, তিনি পবিত্রতা

www.pathagar.com

পছন্দ করেন তিনি পরিস্কার পরিচ্চন্নতা ভালবাসেন।" পবিত্রতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ছাড়া দৈহিক সুস্থতা যেমন হয়না তেমনি আল্লাহর নিকট এবাদত বা বন্দেগীও গ্রহনযোগ্য হয় না। রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আমোঘ রহমত ঐশীবাণী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক সময় তাঁর প্রতিও পবিত্রতা থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ " হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি (মুহাম্মদ) উঠুন, লোকদের সর্তক করুন, আপনার প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন, আর নিজের পরিধানের কাপড় পবিত্র রাখুন (সুরা মুদ্দাসসির ঃ ১-৪) মায়েদার ৬নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র। (পরিস্কার পরিচ্ছন্ন) রাখতে চান।" পরিচ্ছন্ন লোকজন সবসময় ঈমানী কাজে উৎসাহ বোধ করে। ঈমান ও আমলকে সুসংহত করার লক্ষ্যে সুস্থ জীবনের কোন বিকল্প নেই। রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের দিকে আহবান করে, আর ঈমান তার অধিকারীর সাথে বেহেশতে বসবাস করবে।"

(ক) পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা ঃ মহান আল্লাহ্পাকে প্রথমে তাঁর প্রিয় হাবীব রাসুল (সাঃ)-কে তাঁর পোষাক পরিস্কার রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ময়লা কাপড় চোপড় অনেক রোগের সুত্রপাত। সুরা মুদ্দাসসির ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "হে রাসুল। আপনার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র পরিস্কার রাখুন।" সুরা আরাফের ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিস্কার পরিধেয় গ্রহণ কর।" রাসুল (সাঃ) সব সময় সাদা পোষাকের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা তোমাদের জন্য তা হলো সর্বোত্তম পোশাক।" তিনি আরো বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে যেন প্রত্যহ পরিধানের কাপড় দু'খানা ছাড়া জুমআর দিনের জন্য আরও এক জোড়া কাপড় রাখে।"রাসুল (সাঃ) একবার ময়লা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি দেখে বলেছিলেন, "এই লোকটি কি তার কাপড় ধৌত করার মত কোন পানি পায়না।"

(খ) হাত-মুখ পরিস্কার রাখা ঃ বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, হাত-মুখ অপরিস্কার থাকলে আর মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তাই চিকিৎসকগণ মানুষকে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বার বার হাত-মুখ পরিস্কার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছেন। ভোর রাতে উঠেই মানুষ অযুর মাধ্যমে হাত, পা, নাক, কান, মুখ প্রভৃতি পরিস্কার করে এবং এভাবে সে দৈনিক পাঁচবার পরিস্কার করে। তাই মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের যে কেউ

www.pathagar.com

ঘুম থেকে উঠে (প্রথমেই) যেন হাত ধুয়ে নেয়। " আসলে অযু হল শরীরের প্রধান প্রধান প্রত্যংগ পরিস্কার রাখার এক বাস্তবমূখী বিধান। কুরআন পাকে সংক্ষিপ্তভাবে অযুর কথা উল্লেখ আছে। বলা হয়েছেঃ "নামাযের জন্য মুখ,কনুই পর্যন্ত উভয় হাত, টাক্নু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত কর এবং মাথা মোসেহ্ কর (কুরআনঃ সুরা মায়িদাঃ ২য় রুকু)।

(গ) দাঁত ও নাকের পরিচ্ছন্নতা ঃ যেসব লোক দাত পরিস্কার রাখে না তাদের দাতের নানা রোগ হয়ে থাকে। দাতের ময়লা পেটে গিয়ে ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি এবং পীড়া হয়ে থাকে। তাই ইসলাম দাঁত পরিস্কার রাখার জন্য নির্দেশ জারী করেছেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "মেসওয়াক করলে যেমন মুখ পরিস্কার হয়, তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়"। তিনি আরো বলেছেন ঃ "যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় (পাঁচবার) তাদের জন্য মিসওয়াক করা অপরিহার্য করে দিতাম।

অযুর সময় নাকে পানি নিক্ষেপ করতে হয় এবং বা হাতের আংগুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে উত্তমরূপে ময়লা বের করে পরিস্কার রাখার বিধান ইসলামে রাখা হয়েছে। এভাবে তিনবার নাক পরিস্কার করতে হয়। যিনি নামাযী তিনি দৈনিক ১৫ বার নাক পরিস্কার রাখতে পারেন।

(ঙ) চুলের ও চোখের যত্ন ঃ চুলের যত্ন না করলে মাথায় বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি হয়। খুসকি, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগ হয় চুলের যত্ন না নিলে। তাছাড়া চুল না আচড়ালে চেহারার সৌন্দর্য্যে হানি ঘটে। এ জন্য ইসলামে চুলেরও যত্নের কথা বলা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "যার মাথায় চুল আছে সে যেন তা পরিস্কার রাখে- তার পরিচর্যা করে।" এ দৃষ্টিতে কেশ বিন্যাস, চুল আচড়ানো ও সিথি কাটা সুন্নত। চোখ মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। যার চোখ নেই তার জন্য পৃথিবী বিষাদময়। চোখের যত্ন না নিলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। তাই ইসলাম চোখের যত্ন নিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসুল (সাঃ) তিনি নিজেও চোখের যত্ন নিতেন । তিনি চোখে সুরমা লাগাতেন। তিনি ঘুমাতে যাবার পুর্বে তা উভয় চোখে তিনবার করে লাগাতেন।

শেষকথাঃ ইসলাম পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষ যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে আল্লাহ্ এবাদতে মশগুল থাকে তখন তার জীবন হয়ে উঠে পবিত্রময়। এরূপ জীবনে সাধারনত ঃ কোন রোগ আসে না।সে সুস্থ্ভাবে আল্লাহর এবাদত করতে পারে। তাই ইসলাম এদিকের প্রতি লক্ষ্য করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিধান আরোপ করেছেন, যাতে মানুষ সুস্থ ভাবে পৃথিবীতে চলতে পারে এবং পরিবেশ রক্ষা করতে পারে।

[সীরাত স্মারক '৯৯-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শই ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি

আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন

আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত প্রথা সমকালীন চাহিদাকে পূরনের জন্য চিত্ত বিনোদনকে বস্তুবাদের সংজ্ঞায় সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভৌগে লিক সীমারেখা এবং জীবনমানের আংগিকে বস্তুবাদী সংস্কৃতির ধরন পৃথক হয়ে থাকে। বাস্তবায়নের ধরনও ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা এর সাথে আংশিক সমার্থবোধক, অনেকাংশে বস্তুবাদী সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতি সংগতিপূর্ন নয়। কারন বস্তুবাদী সংস্কৃতির ক্ষেত্র কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ইসলামী সংস্কৃতি বলতে মানুষের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানকে বুঝায়, তথাকথিত সংস্কৃতি বলতে নির্দিষ্ট কয়েকটি আনুষ্ঠানিকতাকে বুঝানো হয়। বস্তুবাদী সংস্কৃতির নির্দিষ্ট কোন ভিত্তি নেই, ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি সর্বকালে সর্বযুগে এক এবং অভিন্ন। বাস্তবায়নের জন্য হয়তো ভৌগলিক সীমারেখা ও সামাজিক প্রথা কিছুটা ভূমিকায় থাকতে পারে। তবে মৌলিকতায় কোনরূপ ভিন্নতার অবকাশ নেই। ইসলামী সংস্কৃতির রূপকার মহান আল্লাহ। এ সংস্কৃতির বিধান হচ্ছে আল-কোরআন । যেহেতু আল-কুরআনই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিশ্লেষণ যোগ্য, গবেষণাধর্মী ও মূল বিধান সম্বলিত মহাগ্রন্থ। সেহেতু এর বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব নমুনা থাকা বাঞ্চনীয়। আর তা হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা)। এজন্যই হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল রাসুলের জীবন চরিত্র সম্পর্কে, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল-কুরআনই তাঁর জীবন চরিত্র। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোরআনের বাস্তবায়িত প্রতিচ্ছবি হচ্ছে রাসুলের (সাঃ) জীবন। শিশুকাল থেকে এমন সব অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রাসুলের জীবনে ফুটে উঠেছিল, ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় সকলের নিকট তা আদর্শিক নমুনা হয়ে আছে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি এমন একটি দর্শনের নাম যা পরিপূর্ণ ও অকাট্য। কারণ রাসুলের জীবনাদর্শের চাইতে ভাল কোন জীবনাদর্শ এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আসেনি, আর ভবিষ্যতেও আসবেনা। যে সংস্কৃতি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তা নিখুত, কল্যানময় ও যথার্থ, এতে কোন সংন্দেহের অবকাশ নেই। এর বাইরে রয়েছে নিছকতা, প্রতিক্রিয়া ও মনগড়ার খোলা আক্রমণ। রাসুলের জীবনী ভিত্তিক আলোচ্য সংস্কৃতির পরিসর মহা-সমুদ্র তুল্য। সংক্ষেপে কয়েকটি দিকের আলোচনা এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ রাসুলের জীবনে যে গুনটি তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র। শিশুকাল থেকে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। যে সমাজে চরিত্র বলে কোন গুনের পরিচয় ছিল না, রাসুল ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক।

www.pathagar.com

কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে চরিত্রের মাধুর্যতার এই ধারাবহিকতায় তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পর চরিত্রবান করে গড়ে তুলেছিলেন একদল সঙ্গী সাথীকে। এই প্রসঙগে রাসুল (সঃ) নিজে ঘোষনা করেন যে, 'আমি চরিত্রকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি'। তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত'। চরিত্রের উৎকর্ষতায় তাঁর জীবনে লজ্জাশীলতা ও সততায় মুগ্ধ বিভিষিকাময় সমাজের পাপে পাপিষ্ট মানুষেরা মুহাম্মদ (সা) কে আল-আমীন বলে ডাকতো। প্রতিশোধ নেয়ার হীনমন্যতা থেকে রাসুল (সাঃ) ছিলেন মুক্ত। মক্কা বিজয়ের পর তিনি অকুন্ঠ চিত্তে ঘোষনা করেন, আমি আজ আমার ভাই ইউসুফ (আ) এর মত। কারো প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। একবার এক সাহাবী রাসুলের নিকট আরজ করে বললেন, মুর্তি পূজকদের ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর নিকট অভিসম্পাৎ করুন। জবাবে তিনি বললেন, আমাকে রহমত স্বরূপ প্রেরন করা হয়েছে অভিস্পাৎ করার জন্য নয়। (মুসলিম) হযরত আনস (রা) বর্ননা করেছেন, আমি ১০ বছর রাসুলের সান্নিধ্যে ছিলাম। কোন দিন তাঁকে এটা কেন করেছো ওটা কেন করনি- বলতে শুনিনি।

মানবতা ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শ্রেনী বিভেদ সৃষ্টির জন্য মানুষকে সক্রিয় করে শ্রেনীস্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে বা সংগ্রামরত অবস্থায় মারা যায়, সে আমার উম্মত নয়। বর্ণ বৈষম্যপূর্ন তথা গোষ্ঠিবাদ-শ্রেণীবাদকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করে বহুধা বিভক্ত তৎকালীন মক্কাবাসীকে একজাতিতে পরিনত করেছেন। তিনি ঘৃনিত দাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য দাসদাসীর ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করতে, তাদেরকে হেয় চোখে না দেখতে বহু মুল্যবান বানী উচ্চারন করেছেন। ছোটদেরকে আদর-স্নেহ করতেন এবং বড়দের সম্মান করতে আদেশ দান করে ঘোষনা করেছেন, যে এ কাজটি করেনা সে আমার দলভুক্ত নয়। এ বানীর বাস্তবায়ন করে তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ন সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। পরোপকারে আত্মনিয়োগ করতে তিনি ঘোষনা করেছেন যে, যে পরোপকারে নিজেকে নিয়োজিত করে, আল্লাহ তার উপকারে অন্যকে নিয়োজিত করে দেন। অপরের ক্ষতি সাধন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি আদেশ দান করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে (বোখারী ও মুসলিম)। আতুপীড়িতের সেবায় এগিয়ে আসার জন্য রাসুলের বানী সম্ভার রয়েছে। যাতে আত্মনিয়োগ করার জন্য তাগিদ করেছেন। নারী মুক্তিতে রাসুল (সা) অগ্রপথিক। নারী মুক্তির জন্য রাসুল যে, তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন তা নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

১. কন্যা সন্তানের জীবন্ত প্রোথীত করার জঘণ্য পাপাচারকে তিনি রোধ করেন। ২. মাতৃ জাতিকে সম্মানিত করার জন্য তিনি ঘোষনা করেন, মায়েদের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত। ৩. নারী জাতি কেবল-ভোগের বস্তু–এ কুধারনাকে তিনি রোধ করে পর্দা প্রথা চালু করে নারী জাতিকে সম্মানিত জাতিতে পরিনত করেন। ৪. স্বামীর, পিতার অবস্থা ভেদে ভাইয়ের সম্পত্তিতে নারীদের অংশীদার করে মর্যাদাবান হওয়ার বিধান চালু করেন। ৫. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে তিনি ফরমান জারী করে নারীদের ক্ষেত্র বিশেষে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষা ঃ রাসুল (সাঃ) শিক্ষার অনিবার্যতা কেবল স্বীকারই করেননি বরং তিনি বলেছেন শিখতেই হবে যদি তা সুদূর চীন দেশেও হয়। তিনি শিক্ষার ব্যাপকতা উপলব্ধি করে বলেছেন দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিখ। তিনি আরও বলেছেন, "শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আমার ও তোমাদের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পার্থক্যের ন্যায়।" তবে রাসুলের শিক্ষা বলে ঐ শিক্ষাকেই বুঝানো হয়েছে, যে শিক্ষা কখনো ঈমান-আকিদাকে লুণ্ঠন করে না। তাঁর বাস্তবায়িত শিক্ষানীতির মূল কথা হচ্ছে ঈমান বিল্লাহ-এ শক্তিশালী হওয়া। ইহকালীন কল্যান ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করার জন্য আহরিত শিক্ষা যেমনি ভাবে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, যারা বিদ্যায় পারদর্শী তারা বলে, হে আমাদের রব আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, জাহান্নামের অগ্নী থেকে আমাদের বাঁচাও। এ হিসাবে ঈমানহারা বিদ্যাকে ইলম বা জ্ঞান হিসেবে ইসলাম অনুমোদন করেনা । সে বিদ্যা যতই উচ্চ বলে কথিত হউক।

সাহিত্য ঃ সাহিত্যিক দিক ইসলামের এত প্রাঞ্জল যে, সাহিত্যের তৎকালীন স্বর্ণযুগের সাহিত্যিকরা হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। ইসলামী সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো কুরআনুল কারীম। ভাষা লালিত্য ছন্দ প্রকরণ গদ্য-পদ্যের সমাহার ও পান্ডিত্যের তথা বিজ্ঞানের সমন্বিত উপস্থাপনা এক অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থ। কুরআনের ধারায় রাসুল (সা) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কথা ও কাজের এবং সম্মতির অসংখ্য ঘটনাবলীর উপস্থাপনায় হাদীস শাস্ত্র নামে একটি ইসলামের সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। একে উপলক্ষ্য করে হাজার হাজার ইমাম, মুফতি, মোফাসসির ও দার্শনিক সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসের এই জ্ঞান ভান্ডারকে উপলক্ষ্য করে আসমাউর রিজাল বা বর্ণনাকরীদের জীবনী গ্রন্থ, অসুলে হাদীস সহ কয়েকটি শাস্ত্র ইসলামের সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারকে সাহিত্য সাগরে পরিনত করে দিয়েছে। এতে রচিত হয়েছে অগনিত গ্রন্থ সম্ভার যা চিন্তা শক্তির বাইরেই বলতে হয়।

চিত্ত বিনোদন ঃ কোন হারাম বা কবিরা গুনাহ সংগঠিত হতে পারে এমন সব

www.pathagar.com

কার্যাদি দ্বারা চিত্তের খোরাক ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক গান, কবিতা, গল্প বা কৌতুককে আল্লাহর নবী নিজেও ভালবাসতেন কবি সাহাবীগনের কবিতা তিনি দীর্ঘ সময় ধরে শুনতেন। সাহাবীগন কখনো কখনো জাহেলী যুগের কতিপয় প্রথাকে (কৌতুক জাতীয়) পালন করা কালে রাসুল নিষেধ করেননি। তিনি নিজে শিশুদের নিয়ে শরিয়ত সম্মত খেলাধূলা করতেন। হযরত হাসান হোসাইনকে (রা) তিনি পিঠের উপর নিয়ে ঘোড়ার দৌড় সাদৃশ খেলায় উৎসাহ দিতেন।

গবেষণা ঃ

ইসলাম একটি গবেষনার উত্তম প্রতিষ্ঠান। কুরআনুল কারীমে একাধিক স্থানে "তোমরা চিন্তা করনা- তোমাদের জ্ঞান নেই? যেন তোমরা বুঝতে পার" ইত্যাদি উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, গতানুগতিক পন্থায় ইসলামী জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহর নবী (সা) এর নবুয়তী জীবন শুরু হয়েছে হেরা গুহায় দীর্ঘ গবেষনা দিয়ে। এর পর গবেষনার আঁধার হিসাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর কুরআনুল কারীম নাজিল করে গবেষনার দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সাহাবী, তাবেয়ীগনের গবেষনার ফসল সরূপ আমরা ইসলামী শরিয়তের তাৎপর্যপূর্ন বিধি বিধান লাভ করেছি।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, কুরআনুল কারীমের নিরিখে রাসুল জীবন এমন ভাবে গঠিত হয়েছে যে, কোন দিক ও বিভাগেই রাসুলের জীবনাদর্শ অনুপস্থিত নয়। একে কেন্দ্র করে একটি বাস্তব নমুনা দুনিয়াবাসীর জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। একেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়। এ সংস্কৃতি প্রথমে আরবে-মধ্যপ্রাচ্যে তারপর পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায় এমনকি এ উপমহাদেশে এসে পৌছায়। আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে বিভিন্ন আরব বনিক, অলী বুজুর্গের আগমনের ফলে ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠে। কিন্তু কালক্রমে ভৌগলিক অবস্থানের সুযোগে এবং নানাভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে ব্রাহ্মন্যবাদী ও পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে আমাদের পূর্ব ঐতিহ্য বিকৃত রূপ নেয়ার উপক্রম। এ কথাকে উপলব্ধি করে আমাদেরকে সাংগঠনিক ঐক্যের মাধ্যমে যাবতীয় অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করা দরকার। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

[প্রবন্ধটি ১৯৯৭ সনের সীরাতুন্নবী সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়]

www.pathagar.com

বিশ্বের দরবারে হযরত মুহম্মদ (সঃ)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

শেষ নবীর (দঃ) পূর্বে যত নবী বা ধর্মপ্রবর্তক আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতির জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এমনকি মহাত্মা যীশুখৃষ্ট পর্যন্ত বলিয়াছেন,"I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel" (Matthew, 15:24) অর্থাৎ আমি ইস্রাইল বংশের হারান মেষদের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, ইহা ভিন্ন নহে। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহর আদেশে ঘোষণা করিয়াছেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"কুল ইয়া আইয়্যু হান্নাসু ইন্নী রাসুলুল্লাহি ইলায়কুম জমী'আন।" অর্থাৎ বল-হে মানুষ্যজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহের রসূল বা প্রেরিত দূত। (৭ ঃ১৫৮)

তাঁহার সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষায় জীবনী লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত জীবনী-লেখকগণের অধিকাংশ খৃষ্টান। কিন্তু তাঁহাদিগকে হযরত মুহম্মদের (দঃ) মহত্ত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে । তবে যাঁহারা বিদ্বেষ-বশে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আঁ-হযরতের এই সমস্ত জীবনী সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশ করা মুসলমান সমাজের কর্তব্য। আমি এখানে কয়েকজন অমুসলমান লেখকের রসুলুল্লাহ সম্বন্ধে প্রশংসা-উক্তির অনুবাদ দিতেছি।

ফরাসী লেখক Alfred de Lamartine তাঁহার Histoire de la Turquie পুস্তকে বলেন–

"দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন-প্রণেতা, যোদ্ধা, মতবাদ বিজয়ী, ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা-পদ্ধতির পুনঃ স্থাপক,কুড়িটি পার্থীব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্ম সাম্রাজ্যের সংস্থাপন কর্তা এই দেখ মুহম্মদ। যে সমস্ত মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় মহত্ত্ব মাপ করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা তাঁহাকে মাপিলে কোন মনুষ্য তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর ছিল?"

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বীর Napoleon Bonaparte তাঁহার সম্বন্ধে বলেন- "মুহম্মদ ছিলেন একরূপ রাজা। তিনি তাঁহার স্বদেশ -বাসিগণকে তাঁহার চতুপার্শ্বে সমবেত করেন। মুসলমানগণ পৃথিবীর অর্ধাংশ জয় করে। উহারা ১৫ বৎসরে অধিকতর আত্মাকে মিথ্যা দেবদেবী হইতে ছিনাইয়া আনে, অধিকতর দেবমূর্তি ধূলিস্মাৎ করে, অধিকতর পৌত্তলিক মন্দির ধ্বংস করে, যাহা পনর শত বৎসরেও মূসা

www.pathagar.com

এবং যীশুখৃষ্টের অনুসরণকারিগণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ একটি ঈশ্বর বলা যাইতে পারিত, যদি তিনি যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন,তাঁহার প্রস্তুতি ঘটনাচক্র দ্বারা না ঘটিত । যখন তিনি আবির্ভূত হন, আরবগণ বহু বৎসর ধরিয়া ঘরোয়া যুদ্ধে জর্জরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অন্য জাতিরা যাহা কিছু বড় দেখাইয়াছে, তাহারা সেই সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া তাহাই দেখাইয়াছিল,যাহারা তাহাদের দেহ ও আত্মা সমভাবে পুনরায় নবীনত্ব লাভ করিয়াছিল।" (Bonaparte L'Islam,পৃঃ-১০৯)।

জর্জ বার্নাড'শ বলেন, " মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ, তাহাদের অজ্ঞতা কিংবা গোঁড়ামির কারণে, মুসলমান ধর্মকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে মানুষ মুহম্মদ এবং তাঁহার ধর্মকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের কাছে মুহম্মদ ছিলেন দজ্জাল (Antichrist) আমি তাঁহাকে অধ্যয়ন করিয়াছি, আশ্চর্য মানুষ তিনি,এবং আমরা বিশ্বাস, তাঁহাকে দজ্জাল না বলিয়া বরং মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁহার মত কোন ব্যাক্ত আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করিতেন, তবে তিনি ইহার সমস্যাগুলির এরূপভাবে সমাধান করিতে পারিতেন, যাহাতে বহু আকাঙিত শান্তি ও সুখ ইহাতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন।"

পাদরী বসওআর্থ স্মিথ বলেন, "ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে মুহম্মদ একাধারে তিনটির স্থাপয়িতা - একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম" Mohammed and mohammedanism)

টমাস কার্লইল বলেন, "এই আরবগন, মুহম্মদ মানুষটি এবং সেই এক শতাব্দী- ইহা কি নয় যে একটি স্ফুলিঙ্গ পাড়িয়াছিল, মাত্র একটি স্ফুলিঙ্গ, এমন পৃথিবীর উপর যাহাকে মনে হইয়াছিল কাল চিহ্নের অযোগ্য বালি; কিন্তু সেই বালি প্রমাণিত হইল বিস্ফোরক বারুদরূপে আর দিল্লী থেকে গ্রানাডা আসমান পর্যন্ত উচ্চ হইয়া সে শিক্ষা বিস্তার করিল। আমি বলিয়াছি,মহাপুরুষ সকল সময়ে যেন আকাশের বিদ্যুৎ । অপর লোক জ্বালানী কাঠের ন্যায় তাঁহার অপেক্ষায় ছিল। তাঁহার পর তাহারাও ধূ ধূ করিয়া কাঠের জ্বলিয়া উঠিল।" (Hero and Hero-worship, Hero as a prophet)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "তাহার পরে আসেন সাম্যের দূত মুহম্মদ। তুমি প্রশ্ন কর, তাঁহার ধর্মে কি ভাল আছে? যদি তাহাতে ভাল না থাকে, তবে কিরূপে সে বাঁচিয়া থাকে? কেবল ভালই বাঁচে, কেবল তাহাই টিকিয়া থাকে। এক অপবিত্র

www.pathagar.com

লোকেরা জীবন, এমনি এই জীবনেও, কত কাল? পবিত্র লোকের জীবন কি দীর্ঘতর নয়? নিঃসন্দেহে, কারণ পবিত্র শক্তি সৎস্বভাব শক্তি। মুসলমান ধর্ম কিরূপে বাঁচিয়া রহিল? যদি তাহার শিক্ষায় কিছুই ভাল না থাকে? তাহাতে অনেক ভাল আছে। মুহম্মদ ছিলেন, পয়গম্বর সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের।" (Swami Viekanada's works,Vol.IV, The Great Teachers of the world.pp 129-130.)

মহাত্মা গান্ধী আঁ-হযরত (দঃ) সম্বন্ধে বলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সে যুগের জীবনধারায় ইসলাম যে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা তরবারির বলে নয়। ইহা ছিল নবীর কঠোর সরলতা, সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপ, অঙ্গীকার পালনে একান্ত যত্নশীলতা, তাঁহার বন্ধু অনুবর্তী জনগণের প্রতি প্রত্যয় অনুরোধ, তাঁহার সাহসিকতায় তাঁহার নির্ভীকতা, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার নিজের নিয়োজিত প্রচার কার্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাস। তরবারি নয়, এই সকল গুণেই সর্ব-বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাফল্য দান করিয়াছিলেন এবং সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম করিয়াছিল। (Quoted in the vindication of the prophet of Islam.pp.26.27)

[জাহানে নও পত্রিকা অবলম্বনে]

www.pathagar.com

মানব মর্যাদার উন্নয়নে মহানবী (সঃ)'র অবদান

মাওলানা আমিনুল ইস্‌লাম

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে, মানব-মর্যাদার উন্নয়নে, তথা-বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে মহানবী (দঃ)-র দান অতুলনীয় অপরিমেয়। কেননা, মানবতা যখন অবহেলিত, উপেক্ষিত, এমনকি অপমানিত-জুলুম, অত্যাচার অন্যায় অবিচারের ঘনান্ধকারে যখন সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন, পৌত্তলিকতা ও ভোগবাদের জহর পান করে যখন সকলেই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত এবং সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, বিশ্ব-প্রতিপালকের অবাধ্য হয়ে, তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে মানুষ যখন পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত, মানবতার ঠিক এমনি দুর্দিনে আবির্ভাব হয়েছিল শান্তিদূত, মুক্তিদূত, মহানবী হযরত রসূলে আকরাম (দঃ) এর। তিনি মরণোন্মুখ মানবতাকে নব জীবন দান করলেন। বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করলেন। বিভ্রান্ত মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন। তিনি পরিবেশন করলেন বেহেশ্‌তী-নূর মানুষের শিরায় শিরায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এমনিভাবে মহানবী (দঃ) মানুষকে তার উচ্চ মর্যাদায় আসীন করালেন। তিনি বললেনঃ ওরে আত্মবিস্মৃত মানুষ, তুমি ছোট নও, তুমি তুচ্ছ নও, তুমি-মহান, তুমি শক্তিমান, তুমি দুনিয়ার বুকে শক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের খলিফা বা প্রতিনিধি। অতএব তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ। তুমি সষ্টির সেরা। তাই, সকল সৃষ্টি তোমার অনুগত, করতলগত এবং সর্বক্ষণ তোমার সেবায় নিয়োজিত। কেননা, যমিন, আসমান, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র. সুর্য, গ্রহ,তারা বৃক্ষ, তরুলতা, এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, সবার উপরে মানুষের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ "তিনি সেই আল্লাহ্ তায়ালা, যিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-নিখিলের সর্বস্ব, তোমাদের উপকারার্থে' –(সুরায়ে বাকারাহ)।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ "তোমরা কি দেখনা? যে, আল্লাহ্ তায়ালা আসমান ও যমিনের সমস্ত বস্তুকেই তোমাদের অনুগত এবং করতলগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য নেয়ামত-সমূহ্ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে মানুষের উচ্চ মর্যাদার ঘোষনা করে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ "আমি মানব জাতিকে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন করেছি, এবং জল ও স্থলভাগে তাদেরে আরোহণ করিয়াছি, এবং উত্তম জিনিসগুলো থেকে তাদের উপজীবিকা প্রদান করেছি এবং আমার বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে ফজিলত ও মর্যাদা দিয়েছি।"

বস্তুতঃ, মহানবী (দঃ) -ই সর্বপ্রথম মানব মনে তার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করলেন. মানুষ স্রষ্টার খলিফা বা প্রতির্নিধি, এবং সমগ্র সৃষ্ট জগৎ মানুষের সেবায়

www.pathagar.com

অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দন্ডায়মান– একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনিই ঘোষণা করলেন। যখন দাসত্ব, নির্যাতন এবং চরম অধঃপতন ও অশান্তির মহা-রাহুর গ্রাসের মুখে মানব জাতি প্রকম্পিত, বিশ্ব মানবতা নির্বিচারে উৎপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় মানবতার ফরিয়াদ শ্রবণের জন্য, বিশ্ব জগতের বুকে কেউ নেই, মানবতার এমনি সঙ্কটময় মুহূর্তে মহানবী (দঃ) ঘোষণা করলেন মানুষের উচ্চ মর্যদার কথা। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে, তাই মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "মানবমণ্ডলী আজকের এই পবিত্র দিন, আজকের এই পবিত্র মাস, আর এই পবিত্র মক্কানগরী যতখানি পবিত্র, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তোমাদের রক্ত, সম্পদ, এবং তোমাদের মান-মর্যাদা ততখানি পবিত্র।" এমনি ভাবে মহানবী (দঃ) বিশ্ব মানবের রক্ষা কবচ, বিস্ব-শান্তি অক্ষুন্ন রাখার একমাত্র পন্থা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে, সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত বলে তিনি ঘোষণা করেছেন, এখানে সাদা কালোর প্রশ্ন অবান্তর, ধনী নির্ধনের তফাৎ বা বৈষম্য অবাস্তব অচিন্তনীয়, সকলেই এখানে সমান। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ " হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন নারী অর্থাৎ আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে এজন্য বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরষ্পর পরস্পরের পরিচয় পাও।"

বস্তুতঃ মহানবী (দঃ) এর আদর্শ, পবিত্র কোরআনের এই মহান শিক্ষা শুধু যে দুনিয়ার বুকে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, এবং মানব-মনে তার শেষ্ঠত্বের অনুভূর্তি জাগিয়েছে তাই নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি আন্তজার্তিক মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, বি্শ্ব-শান্তি অক্ষুন্ন রাখার একটা নিখুঁত পরিকল্পনা পেশ করেছেন, অসাম্য অসমতা এবং অকল্যানের কলঙ্ক চিরতরে মুছে দিয়েছেন, ঘুমন্ত তন্দ্রাহত মানুষকে জাগ্রত করেছেন।

বস্তুতঃ মানব মর্যাদার উন্নয়নে মহানবী (দঃ)-এর অবদান শুধু যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, বরং অতুলনীয়ও বটে। কেননা, মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কথা তিনিই সর্ব প্রথম ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে মানুষের শক্তি সম্ভাবনার কথা, মানুষের অমরত্বের কথা তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বলিষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। মহানবী (দঃ) স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তথা –আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন এবং ঘনিষ্ঠতর করেছেন। মানুষকে তার স্রষ্টা ও পালকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবার, ও তাঁর সমীপে মনের আকুতি মিনতি প্রকাশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্বের বুকে যে সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম বিশ্বয়কর পরিবর্তন হলো এই যে, আজ বিশ্বের ভৌগলিক দূরত্ব সম্পূর্ণ দুরীভূত, ভৌগলিক সীমা-রেখার প্রাচীন মানব জাতিকে আর বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারছেনা না। দিকে দিকে আজ এক পৃথিবীর

স্বপ্ন। সকলেই যেন একথা অনুভব করেছে, যে, আমরা সকলেই এক পৃথিবীর নাগরিক।

কিন্তু আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে সর্বপ্রথম মহানবী (সঃ)-ই বিশ্ববাসীকে এই বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বর্ণ, বংশ এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ যে এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য, মহানবী (সঃ) -ই সর্বপ্রথম এই মতবাদ পেশ করেছিলেন।

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রে অবতরণের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছেন, অথচ শুধু চন্দ্রে অবতরণই নয়, সমগ্র নভোমণ্ডল বা সৌরজগৎ পরিভ্রমণ করে মে'রাযের সময় আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে যিনি পৃথিবীর বুকে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তিনি আমাদের পেয়ারা নবী হযরত রসুলে আকরাম (সঃ)। সৌরজগৎ যে মানুষের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে, নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ যে আদৌ অসম্ভব কাজে নয়, একথা সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে মহানবী (সঃ)-ই জানিয়েছেন। অর্থাৎ আধুনিককালে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যদি মানব-মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তার অগ্রনায়ক বা অগ্রদূতও হলেন মহানবী হযরত রসূলে আকরম (সঃ)। পবিত্র কোরআনের সুরায়ে বনি-ইসরাইলের প্রথম আয়াতে মহানবী (সঃ)-এর মে'রায তথা নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হবার যে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা আমাদের একথার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তদুপরি সমাজ-জীবনে মহানবী (সঃ) যে অভূতপূর্ব ইন্‌কেলাব এনেছেন, মনের জগতে, নৈতিক জগতে, যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন, তাও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রমের মর্যাদা দান, নারী জাতির উন্নয়ন এবং ক্রীতদাসের মুক্তিদানের মাধ্যমে মহানবী (সঃ) মানব জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

মহানবী (সঃ)-র আর্বিভাবের পূর্বে সমাজে নারীর কোন স্থান ছিল না। নারী ছিল তুচ্ছ, হীন, ঘৃণ্য। নারীকে মনে করা হতো সকল পাপের মূল উৎস। যে যুগে সকল দেশে নারী তার প্রকৃত মর্যাদা থেকে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত, উপেক্ষিত, অবহেলিত। সমগ্র বিশ্ব ছিল নারীর প্রতি অত্যাচার উৎপীড়নে খড়্গ-হস্ত। যখন আরব দেশে শিশুকন্যা স্বয়ং তার পিতার হাতে জীবন্ত অবস্থায় সমাধি হতো। মানবতার এমনি দুর্দিনে মহানবী (সঃ) নারী সমাজের উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, নারীকে তিনি দিলেন তার প্রকৃত মর্যাদা।

খৃষ্টান জগৎ যেখানে আজও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি যে, নারীর আত্মা আছে কিনা, নারী চির শান্তির আশ্রয় বেহেশতে গমন করতে সক্ষম হবে কিনা, সেখানে ইসলাম পবিত্র কোরআনের ভাষায়, মহানবী (সঃ)-র মাধ্যমে এই

www.pathagar.com

ঘোষণা করছে, সকল বিশ্বাসী পূন্যবান ও পূণ্যবতী নারী পুরুষের জন্য বেহেশতের দ্বার চির উন্মুক্ত, চির অবারিত। নারী জাতির মান উন্নয়নে মহানবী (সঃ) এর যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে তা তাঁর একটি কথা দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ "মায়ের চরন তলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।" বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (সঃ) নারীর অধিকার সংরক্ষণে সচেতন থাকার জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ "জনমণ্ডলী! তোমরা স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। "বস্তুতঃ, মহানবী (দঃ) নারী জাতির মান উন্নয়নে ইসলামের এই বলিষ্ঠ নীতিই ঘোষণা করেছেন যে, নারীর অবমাননা, মানুষের অবমাননা, নারীর অমর্যাদা, সমগ্র মানব জাতির অমর্যাদা। অতএব নারীর মান উন্নয়নের মাধ্যমেই মানব -মর্যাদার উন্নয়ন সম্ভব।

মানব-মর্যাদার উন্নয়নে মহানবী (সঃ) এর অবিস্মরণীয় অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে আমাদেরকে ক্রীতদাসের মুক্তিদানে এবং ক্রীতদাস সমস্যার সমাধানে মহানবী (দঃ) বলিষ্ঠ ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

মহানবী (সঃ) ক্রীতদাসের মুক্তিদানে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে , দাসত্বের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, সর্বোতভাবে। দাস-দাসীদের সাথে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সাথে সাম্য মৈত্রীর ভাব প্রকাশ করে নির্যাতিত, পদদলিত ক্রীতদাসদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং এই সমস্যার সন্তোজনক সমাধান করেছেন। এই পর্যায়ে একটি অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইতিহাস সাক্ষী, ক্রীতদাস জায়েদকে মহানবী (সঃ) আজাদ করে পালক-পুত্র বলে ঘোষনা করলেন এবং আপন পুত্রের ন্যায় লালন পালন করলেন, আর স্বীয় ফুফাতো বোনের সাথে তার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন, এবং মওতার যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত আলী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ক্রীতদাস সেনাপতির অধীনে অকুণ্ঠচিত্তে যুদ্ধে গমন করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা সত্যিই বিরল-বস্তুতঃ ক্রীত দাসের মান উন্নয়নের তথা গোটা মানব জাতির উন্নতি বিধানে মহানবী (সঃ) এর ভূমিকা অবিস্মরণীয় অতুলনীয় এর চির প্রশংসনীয়। কেননা, সেদিন মহানবী (সঃ)-এর মহান আদর্শের আলোক আভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল তিমিরাচ্ছন্ন। মানবতা, পেয়েছিল শান্তির, মুক্তির, উন্নতি ও অগ্রগতির উপায় অবলম্বন; ফলে মানবজাতি লাভ করেছিল তার প্রকৃত মর্যাদা। বিশ্বমানবের জাতীয় জীবনে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবের অধিনায়কই হলেন আমাদের পেয়ারা নবী হযরত রসুলে আকরাম (সঃ)।

[মাসিক জাহানে নও এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ ও মুক্তবুদ্ধি

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ

দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, বুদ্ধির জীবনে চলেছে জোয়ার-ভাটা। বুদ্ধি কোন কালে থাকে আবদ্ধ, আবার কোন কালে মুক্ত। বুদ্ধি কোন কালে ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করে আড়ষ্ট হয়, আবার ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

দেব-দেবী-বহুল গ্রীকদের ধর্মীয় ধারণা মানুষের আদি মানসের প্রত্যয় শীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানব সংস্কৃতির শৈশবে মানুষ যা' অবলীলা-ক্রমে গ্রহণ করেছে, পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধেই দেখা দিয়েছে তার মনে বিদ্রোহ। ধর্ম-সংক্রান্ত ধারণাগুলো পরবর্তীকালে বুদ্ধির আলোকে আপনা আপনিই বিলীন হয়ে গেছে। অথচ এই ধর্মের সংস্পর্শে এসে স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত ধারণাগুলো ধর্মের দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাস আজ সে সাক্ষ্যই বহন করছে।

গ্রীকদের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করলে দেখা যায়, থেলিস (Thales) থেকে যে চিন্তার সূত্রপাত হয়–প্লেটো বা এরিষ্টটলের চিন্তায় তা' পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। প্লেটো ও এরিষ্টটলের পরবর্তীকালে এপিকিউরিয়ান (Epicurean) বা ষ্টোয়িক (Stoic) মতবাদে জ্ঞানবিদ্যা বা নীতিবিদ্যার আলোচনাকে পূববর্তী চিন্তাধারার কোন কোন বিশিষ্ট দিকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বলা যায়। সে যুগের সর্বশেষ জ্ঞান সাধনার ফলস্বরূপ পাওয়া যায়– সন্দেহবাদ (scepticism) ও সংকলনবাদ (Eclectism)। ওগুলো জ্ঞানের রাজ্যে তৎকালীন মনীষীদের ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইহুদি-গ্রীক চিন্তাধারাতে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ইহুদি ধর্মের সমাঝোতা করার প্রয়াসই প্রকাশ পেয়েছে। এ চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হচ্ছে প্লটিনাস (Plotinus) নব্য-প্লেটোবাদ (Neo-platonism)। এ চিন্তায় প্লেটোর দর্শন ধর্মীয় রূপলাভ করেছে। এর মূখ্যমন্ত্র ছিলো ধর্মীয় অনুভূতির দার্শনিক রূপদান।

মধ্যযুগের শুরুতে ও মধ্যভাগে জ্ঞানের আদর্শ ছিলো খৃষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান। তাই একদা যে স্বাধীন চিন্তধারার ফলে প্লেটো বা এরিষ্টটলের মত চিন্তানায়কের উদ্ভব হয়েছিল, সে স্বাধীন চিন্তার ফলগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল ভক্তিমানের ধারণা-গুলোর পোষকতায়। অথচ যারা ছিলেন খাঁটি মর্ম গ্রহণকারী, 'তাদের কাছেও প্রচেষ্টা বিশেষ সমাদর লাভ করেনি। তাদের মতে, ধর্মের আসল প্রাণ হচ্ছে অনুভূতি। তা' ব্যক্তি জীবনের উপলব্ধি সাপেক্ষ। সে উপলব্ধিকে তর্কের বেড়াজালে ঘিরে নিলে তার প্রাণহানি ঘটে।

www.pathagar.com

তবে মধ্যযুগে মানুষের মন ধর্মের নামে এমন উম্মাদ হয়ে পড়ে যে, স্বাধীন ও সাম্প্রদায়ীকভাবে এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের কোন অনুশীলনেরই সে যুগে সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এতে অপর দিকে মানব-জীবন সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তির (Intellect) প্রাধান্য পরোক্ষ স্বীকৃত হয়। ধর্মকে জীবন দিয়ে গ্রহণ না করে বুদ্ধির মাধ্যমে তার সত্যগুলো উপলব্ধি করার প্রয়াস থেকেই খুব সম্ভব পরবর্তীকালে মুক্তবুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে পন্ডিতবিদ্যা (Scholasticism) ও সাধারণ মানুষের ধর্ম-সংক্রান্ত মতবাদে এখানেই ছিল প্রভেদ। যা সাধারণ মানুষ সুবোধ বালকের মত অনায়াসে বিশ্বাস করেছে, পন্ডিতেরা তাকেই যুক্তিসহ করার প্রয়াস করেছেন।

বুদ্ধি, তার অনুশীলন লাভে সমর্থ হয়ে মর্ধ্যযুগের শেষে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। খৃষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীতে আবার মানুষের চিন্তাধারা প্লেটো থেকে এরিষ্টটলের দিকে অধিকতর অগ্রসর হয়। এরিষ্টটল ছিলেন নিসর্গবাদী বা pagan। তাই পন্ডিতিবিদ্যার হাতিয়াররূপে তাঁর যুক্তিবিদ্যা প্রথমে ব্যবহৃত হলেও এবং সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস (st.Thomas Acquinas) এরিষ্টটলের মতবাদের ভিত্তিতে খৃষ্টধর্মকে যুক্তিসহ করার চেষ্টা করলেও পরবর্তীকালে সেন্ট টমাস স্কটাস (st.Thomas scotus) 'বিশেষের' (particulars) উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্যাষ্টি জীবনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দান করেন। ব্যাষ্টি এ প্রাধান্য লাভ করার ফলেই মধ্যযুগের শেষে এবং আধুনিক যুগের সূচনায় মানবতাবাদের (Humanism) উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। মানবতা বাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে অলৌকিকতার (Supernaturalism) দিক থেকে মানব-মনকে ফিরিয়ে এনে ইহলৌকিক (Secular) জীবন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ করে তোলা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর রেনেসাঁতে সে ভাবধারা আরও পুষ্টি লাভ করে। বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন তারই এক বিরাট পরিণতি। সে আন্দোলনের ফলে লুডোভিকো ভাইভাস্ (Ludovico Vives) বা পিটার রেমাস (peter remus) পন্ডিত বিদ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[১] ভাইভাস তাঁর সংলাপ বা (Dialogue) এ পন্ডিতবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এরিস্টটলের ন্যায় শাস্ত্রের বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযোগ তীব্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে স্বাধীনভাবে প্রকৃতির কার্যকলাপ অনুধাবন করাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। তেমনি পিটার রেমাস এরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্রকে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানের পথে প্রতিবন্ধক বলে অভিযোগ করেছেন। দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের ভিত্তি (Foundations of Dialectic) নামক পুস্তকে তিনি 'নীতি' বা principle এর আবিষ্কারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ সব সূত্র থেকেই

www.pathagar.com

আরোহ পদ্ধতির (In uctive Method) শুরু হয় এবং তা' ক্রমশ: মানব-চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করে।

আধুনিক কালের বিশেষত্ব হচ্ছে ব্যক্তি সত্ত্বার স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং আপ্ত বাক্যের উপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। মানুষ তার ব্যক্তিগত জ্ঞানের মাধ্যমে যে সত্যের পরিচয় পাবে, তাকেই সে অবাধে প্রকাশ করবে। এতে তার জন্মগত অধিকার রয়েছে। দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসবিদ থিলি (Thilly) তাই চমৎকার ভাষায় বলেছেন–"নূতন যুগের ইতিহাসকে চিন্তাশক্তির জাগরণ, সমালোচনার সচেতনতা, গুরুজন ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নির্বিশেষ বাদ (Absolutism) ও সংঘবাদ (Vallectivism) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এবং চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের স্বাধীনতা হিসাবে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের পরিবর্তনকালীন সময়ে যে বীজ ছিল কার্যকরী, পরবর্তী শতাব্দীতে তার ক্রিয়াশীলতা লোপ পায়নি এবং এখন পর্যন্ত সে রয়েছে সক্রিয়।" ২.

তাই দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন চিন্তার ফলে হয়েছে বিরাট গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি, মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্মের সংস্পর্শে এসে সে স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হয়েও আবার সে যুগের অন্তে মাথা তুলে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছে উদ্‌গ্রীব এবং তার জন্য এখনও সে অনবরত সংগ্রাম করেই চলেছে।

॥ ২ ॥

হযরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্মও সেই মধ্যযুগে। তাঁর প্রচারিত ধর্ম মধ্যযুগেই ব্যাপ্তি লাভ করে। অথচ সেই ধর্মে মানব-জীবনের চির অভীপ্সিত স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যাহত হয়নি বলেই অনেকের ধারনা। ইসলামের অতি আধুনিক প্রতিনিধি ও ভাষ্যকার আল্লামা ইকবাল উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন– "ইসলাম ধর্মে পয়গাম্বর তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এ সত্যটি আবিষ্কার করেছে। পয়গাম্বরীর অবসান হওয়া প্রয়োজনীয়। তার অর্থ হচ্ছে, জীবন চিরকালেই কোন না কোন নেতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না। পুর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য মানুষকে তাঁর স্বীয় শক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে।" ইকবালের ঘোষণার পোষকতায় বলা যায়, –আল-কুরআন প্রত্যাদেশমূলক (Revealed) হলেও তাতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা যুক্তিবাদমূলক জ্ঞানের (Rational Knowledge) বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। বরং এ সবের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের তাতে রয়েছে প্রচন্ড তাগিদ। সাধারণভাবে জ্ঞানকে জ্ঞানের অপর প্রধান অংশ বলে গণ্য করা হয়েছে।

ইকবাল তাই বলেছেন "আল্-কুরআন সামান্য মৌমাছিদেরও খোদায়ি প্রেরনা লাভ করার অধিকারীরূপে দেখেছে, তাতে পাঠকগণকে বায়ুর সতত পরিবর্তনশীল

www.pathagar.com

গতি, দিবারাত্রির আবর্তন, নক্ষত্র খচিত আকাশ এবং অন্তত স্থান ব্যাপী গ্রহ গণের সঞ্চরণ অবলোকন করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।" ৩.

অপর এক স্থানে তিনি বলেছেন-"কুরআনের ঘোষণা অনুসারে তাকে জ্ঞানের এ উৎস বলা যায় অপর দু'টো হচ্ছে ইতিহাস ও প্রকৃতি।" ৪.

আমাদের মনে হয়, ইতিহাস ও প্রকৃতি ব্যতীত হিকমতকেও কুরআনের ঘোষণা অনুসারে জ্ঞানের অপর মাধ্যম বলে গ্রহণ করা উচিত।

কারণ, হিকমত সম্বন্ধে কুরআনের বাণী অপরাপর বানী থেকে বলিষ্ঠতর -"এতে স্বতঃসিদ্ধের মত স্বীকার করা হয়েছে যিনি শেষোক্ত জ্ঞানলাভ করেছেন-তিনি অপরিসীম সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।"

কেবল কুরআনই নয়, হজরত রসুলে-আকরামের (দঃ) বিভিন্ন বাণীতেও ইন্দ্রিয়জ ও বিজ্ঞান অপরিসীম সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।"৫.

কেবল কুরআনই নয়, হজরত রসুলে-আকরাম (দঃ) বিভিন্ন বাণীতেও ইন্দ্রিয়জ ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে-

"বিজ্ঞান ও জ্ঞানের তথ্যাদি ঘন্টা খানেক শ্রবণ করা এক হাজার শহীদের জানাজা থেকেও অধিকতর পূণ্যের এক হাজার রাত্রিতে নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়েও পূণ্যতর"।

জ্ঞানী ব্যক্তির বাণী শ্রবণ করা এবং হৃদয়ে বিজ্ঞানের তথ্যাদি গ্রহণ করা ধর্মসংক্রান্ত কার্যাবলী থেকে উৎকষ্টতর। এ কর্ম একশত দাসের মুক্তিদানের চেয়ে পবিত্রতর"।৬.

এতে প্রমাণিত হচ্ছে, মুক্তবুদ্ধির জন্য ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। হিক্‌মত বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ইতিহাস ও প্রকৃতি পাঠ থেকে মানুষ অবাধে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। মধ্যযুগীয় গোঁড়া পন্ডিতদের মত মানুষকে কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্রের আলোচনাতেই ইসলাম আবদ্ধ করতে চায়নি। প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের (Revealed Knowledge) সঙ্গে আরও নানাবিদ উপায়ে এ জগৎ জীবন সম্বন্ধে যাতে মানুষ স্বকীয় চেষ্টার ফলে জ্ঞানলাভ করতে পারে, তার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ব্যক্তি জীবনের স্বাধীনতা এবং তার অবাধ চিন্তার স্ফুরণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তথা ইস্‌লাম স্বীকার করে নিলেও বিভিন্ন জ্ঞানের মূল্য নিরূপণে কোন তারতম্য হয়েছে কিনা, এবং কোন জ্ঞানকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। একই মানসে প্রতিভাত হলেও বিভিন্ন জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞান ব্যক্তি বিশেষের জীবনেই গৃহীত হয়। তিনি তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতার কল্যাণে সে জ্ঞানকে সর্বসাধারনের নিকট গ্রহণ-যোগ্য করেন। এ জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ধারিত হ'তে পারে কেবল মাত্র তার প্রয়োগিক মূল্য (pragmatic value) দ্বারা, অপরদিকে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের

www.pathagar.com

উপকরণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এ জগতে, মানুষের সমাজে রাষ্ট্রে বা সভ্যতায় যা ঘটছে তা ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতালব্ধ [illegible] তো বটেই সমষ্টির পক্ষেও সে জ্ঞান আহরণযোগ্য। মানব-জীবনের অভিজ্ঞতার খাতায় সে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জ দত্তি (Data) বা উপকরণ। তাকে মানুষ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহন বা পরীক্ষণ (Experiment) করতে পারে। তার প্রয়োগিক মূল্যও নির্ধারিত করতে পারে। প্রত্যাদেশ-মূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই।

অপরদিকে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। যে-সব বৈজ্ঞানিকের আবিস্কার এ পর্যন্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে আল্-কুরআন প্রদত্ত সৃষ্টিকলা রহস্যের সম্পুর্ণ ঐক্য নাও হ'তে পারে। সে ক্ষেত্রে ধর্মের বাণী একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির হবে অপমান। এ অবস্থায় মুক্তবুদ্ধির পক্ষ অবলম্বন করাই হবে স্বাভাবিক।

এ ক্ষেত্রে কুরআন প্রদত্ত হিকমতের ভূমিকা বিশেভাবে স্মরণীয়। হিক্মত ইল্মের এক অংশ মাত্র। হিক্মত ব্যতীত ও বোধির (Intuition) কল্যাণে মানুষ এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রত্যাদেশ বোধিরই অপর এক সংস্করণ। প্রত্যাদেশ ও হিক্মতের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক এবং তার বিচার সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয়। তাই যে মুক্ত বুদ্ধির জন্য আল্-কুরআন বা হযরত মোহম্মদ (সঃ) প্রেরনা দান করেছেন, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বা প্রতিভাসিত জগতেই (phenomenal World) গ্রহণযোগ্য। বোধির স্থল ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বুদ্ধি ও বোধির কোন মৌলিক সুত্র এখনও আবিস্কৃত হয়নি, তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনও রয়ে গেছে এক মস্ত বড় ফাটল।

তবু বুদ্ধির মুক্তির জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে মানুষের মনে প্রেরণা সঞ্চার করার জন্য আজও হযরত মোহাম্মদ (সঃ) রয়ে গেছেন মুক্ত বুদ্ধি মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর অনুপ্রেরণা লাভের ফলেই পরবর্তীকালে আরোহ পদ্ধতির (Inductive Method) উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে এবং এ দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কার মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে কৃতকার্য হয়েছে।

১. লুডোভিকো ভাইসাস (১৪৯২–১৫৪০) জাতিতে স্পেন দেশীয় ছিলেন। পিটার রেমাস (১৫১৫-১৫৭২)।
২. Frank Thilly—History of Philosophy—P. 226.
৩. Iqbal. Reconstruction of Religious Thought in Islam. P-3.
৪. প্রাগুক্ত ১৬ পৃ:।
৫. Abdus Salam khan—The Essence of the teaching of the Quran.
৬. Ameer Ali—The sprit of Islam. P-362.

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা

উবায়দুর রহমান খান নদভী

হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁর জীবনে ১৫ জন নারীকে বিয়ে করেন। ১৩ জনের সাথে ঘর সংসার হয়। একই সাথে তাঁর পরিবারে ১১ জন বিবির সমাবেশ ঘটে। আর ওফাতের সময় হযরতের ৯ জন বিবি ছিলেন।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর জীবনে একজন মাত্র অবিবাহিত কিশোরী হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। প্রিয়নবী প্রথম বিয়ে করেন পূর্বে দু'জন স্বামীর মৃত্যুতে পরম ভাগ্যহতা একজন প্রৌঢ়া (হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে অন্যান্য স্বামী-সন্তান হারা,অসহায় বিধবা নারীকে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় শত্রুবেষ্টিত পরিবেশে সহায়-সম্বলহীন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের আশ্রয়দাতারূপে মহানবী (সাঃ) তাঁদের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করে ধন্য করেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) কেবল তাঁর মানবিক প্রয়োজন বা প্রকৃতির আহবানে বিয়ে শাদী করেননি। সাধারন মানুষের মতো স্ত্রী গ্রহণ করলে তিনি তাঁর ভরা যৌবনে আরবের সেরা সুন্দরী তরুণীদের যে কাউকে বিয়ে করতে পারতেন। সাধারণ কোন চিন্তার সিদ্ধান্ত নিলে পঁচিশ বছরের যুবক মুহাম্মদ চল্লিশ বছর বয়সী বিধবা (হযরত খাদীজা রাঃ) -কে শাদী করতেন না। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতিটি বিয়ের পেছনে ছিল সীমাহীন প্রজ্ঞা আর বিপুল হৃদ্যতার ছোঁয়া। গোটা মানব জাতিকে, সর্বকালে-সর্বযুগে হিদায়েতের উজ্জ্বল পথের দিক নির্দেশ ও দয়ার মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার গুরুত্বপুর্ণ মিশন সফল করা ছিল যাঁর জীবনের প্রধান সাধনা। তাঁর জবিনযাত্রার প্রতিটি দিকই জীবন সাধনার মূলধারার সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল। হযরতের গ্রহণ-বর্জন, আদান-প্রদান, ভোগ ও ত্যাগ সবই ছিল তাঁর নবুওয়তের সুউন্নত মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল, আপন মিশনের সহায়ক।

হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন হযরতের প্রচারিত দাওয়াতের একটি ভিত্তিমূল। মক্কার বিপদ সংকুল দিনগুলোতে হযরত রাসুল করীম (সাঃ) -এর আশ্রয়স্থল। উম্মে হাবীবা, উম্মে সালমা, সাওদা, মায়মুনা ও যয়নব বিনতে খোযায়মা ছিলেন অসহায় বিধবা। নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পরই স্বামী হারানোর মাধ্যমে তাঁরা উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের গলগ্রহ হওয়ার মতো করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিলেন। এমন সময় বিশ্বজাহানের প্রতি আল্লাহর রহমতরূপে প্রেরিত মহান রাসুল তাঁদের ঘরে তুলে নিয়ে একটি নতুন জাতি সৃষ্টির ঐতিহাসিক লগ্নে নজিরবিহীন আদর্শ স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

হযরত যয়নব বিনত জাহাশ (রাঃ)-এর সাথে হযরতের বিয়ে মহান আল্লাহ্ পাকের প্রত্যক্ষ নির্দেশে হয়েছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে, লোকেরা বলে বেড়াবে, "মুহাম্মদ তাঁর পালিত পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন।" সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অনাত্মীয়ের ব্যাপারে অতিধারণা বিদূরিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাক হযরত যয়নবের সাথে তাঁর এ অকৃত্রিম সহচরের পূর্ব বিবাহিত মহিলাকে নিজ পত্নীত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন।

হযরত সাফিয়া ও জোয়াইরিয়া (রাঃ)-কে বিয়ে করার পেছনে মূল প্রেরণা ছিল এ দু'জন হতভাগ্য বিধবার অশ্রু বিমোচন। আল্লাহর রাসুলের সাথে লড়তে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী গোত্রপতিদের বন্দী স্ত্রী-কন্যাদের সাথে স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী এদেরকে বাঁদীর ভাগ্য বরণ করতে হতো। এমন সম্ভাব্য মহিলাদের বিয়ে করার মাধ্যমে আল্লাহর রাসুল একদিকে যেমন এদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, দাসীত্বের জীবন থেকে তাঁদের মুক্তি দিয়েছেন, অপরদিকে শত্রুদের হেয় না করে তাঁদের মাননীয়া নারী ব্যক্তিত্বের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক কায়েমের মাধ্যমে ওদেরকে এক ধাপ নিকটে টেনে এনেছেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ ধরনের বিয়ের গুরুত্ব কেবল যুদ্বরত দুটো বৈরী শক্তিই সঠিকরূপে আন্দাজ করতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর সকল নারীকেই আল্লাহপাক তাঁর শ্রেষ্ঠতম নবীর জন্য বৈধ করে দিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজ রুচি অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুপাতে বহু সংখ্যক নারীকে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আনার ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্নরূপে অনুমোদনপ্রাপ্ত। কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজনে এ অনুমোদনটি ব্যবহার না করে মানব জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা 'ইসলাম'-এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সাধনায় অত্যাবশ্যকীয় কিছু সংখ্যক সম্মানিতা মহিলাকে নিজ পরিবারভুক্ত করেন। এদের সবাই বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, বেশী বয়সী ও অসহায়। কেবল একজন স্ত্রী অবিবাহিত অবস্থায় তাঁর জীবনের সাথীরূপে আসেন।

সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর জন্যে যে রাসুলের জীবনের প্রতিটি আচার-আচারণ, কথাবার্তা, উচ্চারণ-অভিব্যক্তি, এক একটা জীবন্ত ও কালজয়ী আদর্শ ; সে রাসুলের জীবনের প্রতিটি মহূর্তে অনাগত দিনের মানব সভ্যতার প্রয়োজনে সুসংরক্ষিত করার অবিস্মরণীয় দায়িত্ব পালন করেছেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ)। শত সহস্র সাহাবীর হৃদয়পটে অংকিত হয়েছে আল্লাহর পবিত্র কালাম ও প্রিয়নবীর হাদীস। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উৎসমূল কোরআন ও সুন্নাহ।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সঃ) যখন জনসমক্ষে তাঁর জীবন-জীবিকা, সংগ্রাম-সাধনা, নবুওয়তের পদ মর্যাদাগত দায়িত্ব, যুদ্ধ, শান্তি, রাষ্ট্র শাসন, বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিকতার প্রতিটি কর্মকান্ড সম্পাদন করেছেন। কিন্তু প্রিয়নবীর ঘরোয়া জীবন, তার রাত্রিকালীন ইবাদত-বন্দেগী, গৃহকর্তারূপে হযরতের নবুওয়তী রূপ, তাঁর দাম্পত্য জীবন, বিশ্বনারী সমাজের জন্য হযরতের আদর্শিক দিক নির্দেশনা ইত্যাদি সুরক্ষিত রাখার জন্য রাসুল্লাহর (সাঃ)-এর প্রয়োজন ছিল অন্তত পুরুষ সাহাবীদের সিকি পরিমাণ মহিলা সহচর। কিন্তু পবিত্রতা ও ভারসাম্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মহানবী(সাঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় কয়জন নারীকে তাঁর সম্মানীয় জীবন সঙ্গিনীরূপে বরণ করে তাঁদের মাধ্যমেই গোটা নারী জগতের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিশাল আদর্শের বাস্তবায়ন ও সযত্ন সংরক্ষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর পরম মিত ব্যয়িতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গোটা মানব জাতিকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুউন্নত ও চির কল্যাণকর আদর্শের দীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। কেবল হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট থেকেই ইসলামী জীবন বিধানের একটি বিশাল অংশ গবেষক সাহাবীরা হাসিল করে ধন্য হন। যে সব বিষয় কেবল নবীর গৃহিণীর পক্ষেই জানা এবং উম্মতের জন্য বর্ণনা করা সম্ভব। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বিবিদের ইসলাম সমগ্র মুসলিম জাতির জননীর মর্যাদা দিয়েছে। নবী (সাঃ)-এর পত্নীদের "উম্মুল মোমেনীন" বা "মোমেনদের মা" বলা হয়। এর বহুবচন "উম্মাহাতুল মোমেনীন" অর্থাৎ "মুসলিম জাতির জননীবৃন্দ"। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত (সাঃ)-এর বিবিদের সম্পর্কে সরাসরি অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। কোরআন অধ্যয়নকারীদের জন্য এসব আয়াত প্রচুর ঈমানী শক্তি ও আত্মিক সজীবতার যোগান দিয়ে থাকে। উম্মুল মোমেনীনগণের সুমহান মর্যাদার একটি এটিও যে, হযরতের অবর্তমানে এসব সম্মানিতা মেয়েদের আর কারো সাথে বিয়ের সম্ভাবনাও শারীয়ত চিরতরে নাকচ করে দেয়। আমৃত্যু এসব পূণ্যবতী মুসলিম জাতির অভিভাবিকা ও জননীরূপে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোজ কিয়ামতে এরা হযরত রাসুল আকরাম (সাঃ)-এর সহধর্মিনীরূপে গোটা নারী সমাজের শিরোমণি হয়ে সাফল্যের পরম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন।

হযরত নবী করীম (সাঃ) এর গৃহিণী হয়ে যে সব সৌভাগ্যবতী চিরসাফল্য ও সুমহান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের পবিত্র নাম, বিয়ের ধারাক্রম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের আশায় এ প্রবন্ধে সংযুক্ত করা হলো।

হযরত নবী করীম (সাঃ) সর্ব প্রথম খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ নাম্মী মক্কার এক মধ্যবয়সী সম্ভ্রান্ত নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সময় নবী করীম (সাঃ) ২৫ বছরের যুবক। বিবি খাদীজার বয়স তখন চল্লিশ। ইতিপূর্বে বিবি খাদীজার আরো

দু'টো বিয়ে হয়। প্রথম স্বামী আতীক ইবন আয়েয ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাখযুম-এর মৃত্যুর পর আবু হালা ইবন যুররাহ ইবনুন নাব্বাশ আত-তামীমীর সাথে বিবি খাদীজার বিয়ে হয়।হযরত ইব্রাহীম ছাড়া সকল সন্তান তাঁর গর্ভ থেকেই জন্ম লাভ করেন। ইবরাহিম এর মা ছিলেন কিবতী বংশীয় রাজা মোকাওকিস কর্তৃক প্রিয়নবী (সাঃ)-কে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদত্ত দাসী হযরত মারিয়া কিবতিয়া। মারিয়া কিবতিয়ার আগমন ও ইবরাহীম-এর জন্ম হিজরত -উত্তর কালে মদীনা মুনাওয়ারার ঘটনা।

অতঃপর হুজুর (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আয়েশাহ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। হযরত আয়েশা এ সময় খুবই ছোট ছিলেন বলে তিনি তার পিত্রালয়েই থাকতেন। হযরত আবু বকর -এর পরিবার মদীনায় হিজরত করার পর হযরত আয়েশা রাসুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে নীত হন। প্রিয়নবী(সাঃ)-এর জীবনে হযরত আয়েশাই একমাত্র অবিবাহিতা কুমারী স্ত্রী।

হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ)-এর সাথে মক্কাতেই নবী করীম (সাঃ) এর বিয়ে হয়। সাওদা ছিলেন সাকরান ইবনে আমর -এর স্ত্রী। সাকরান ইসলাম গ্রহণের পর হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং হাবশাতে তার মৃত্যু ঘটে। বিধবা সাওদাকে তাঁর পিতা যামআ ইবন কায়েস রাসুলুল্লাহর (সাঃ)-নিকট বিয়ে দেন। এর আগে কুনায়স ইবন হোযাফা আসসাহমীর সাথে হাফসার বিয়ে হয়েছিলো। এরপর হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ) বিয়ে করেন। উম্মে সালমার স্বামী আবু সালামা ইবন আব্দুল আসাদ ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে হুযুর আকরাম (সাঃ) এর সাথে উম্মে সালমার বিয়ে হয়।

এরপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উম্মুল মাসাকীন যয়নব বিনতে খোযায়ম (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তোফায়েল ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মোত্তালিব ছিলেন তাঁর প্রথম স্বামী। হযরত যয়নব (রাঃ) ছাড়া বাকী সব সম্মানিত বিবিগণই প্রিয়নবীর ওফাতের পর ইন্তেকাল করেন। এরপর হুযুর (সাঃ) হযরত জোয়াইরিয়া বিনতুল হারিছাকে বিয়ে করেন। মালেক ইবন সফওয়ান আল-মোসতালিকীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। এপর উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব-এর সাথে হুযুর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত উম্মে হাবীবার প্রথম স্বামী উবায়দুল্লাহ বিন জাহশ হাবশায় হিজরত করার পর খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করে সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর মধ্যস্থতায় উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর বিয়ে হয়। নাজ্জাশীর দরবারে এ বিয়ে পড়ান হযরত খালেদ ইবন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ)। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর বিয়েতে মোহর ধার্য হয় চার হাজার দীনার। বাদশাহ্ নাজ্জাশী রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরফ থেকে তা আদায় করেন।

www.pathagar.com

এরপর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন। তাঁর পূর্বেকার স্বামী যায়েদ ইবন হারেসা ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর গোলাম। হুযুর তাকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত যয়নবের বিয়ে প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে আয়াত নাযিল হয়। এ নিয়ে হযরত যয়নব (রাঃ) হুযুরের অপরাপর বিবির সামনে গর্ব করে বলতেন, "আমি আপনাদের সবার চেয়ে বেশী সম্মানিত অভিভাবক ও ঘটক পেয়েছিলাম" রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম বিবি যয়নবই ইন্তেকাল করেন।

এরপর হুযুর (সাঃ) হযরত সুফিয়া বিনত হুয়াই ইবন আখতারকে বিয়ে করেন। প্রথম স্বামী সালাম ইবন মাশকাম-এর মৃত্যুর পর ইবনুর রবী' ইবনু আলি হাকীক এর সাথে তার বিয়ে হয়। কেন না খায়বরের যুদ্ধে নিহত হলে হুযুর (সাঃ) যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসা দাসীর পর্যায় থেকে মুক্তি দিয়ে হযরত সুফিয়াকে নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

এরপর রাসুল আকরাম (সাঃ) হযরত মায়মুনা বিনতুল মরিছ আল-হিলানীয়াকে বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্বামী উমায়ের ইবন আমর আস্ সাকাফীর পর আবু যোহায়ের ইবন আবদুল ওজ্জার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সবশেষে তাঁর বিয়ে হয় রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে। এরপর নবী করীম (সাঃ) শাররাফ বিনত খলীফাতুল কালবীকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রাঃ)-এর বোন। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে ঘর-সংসার করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। এর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপর কেলাব গোত্রীয় এক মহিলাকে হুযুর (সাঃ) বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু ঘটলে এ স্ত্রী হুযুরের নবুওয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তাঁর সাথে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর উরবাহ বিনত জাবেরের সাথে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিয়ে হয়। কিন্তু উরবাহ হযরত নবী করীম (সাঃ) এর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপনে অসম্মতি প্রকাশ করলে রাসুল (রাঃ) তাঁকে বন্ধন মুক্ত করে দেন। সবশেষে হুযুর (সাঃ) আলীয়া বিনতে যবইয়ানকে বিয়ে করেন। কিন্তু এ মহিলার একান্ত ব্যক্তিগত কোন কারণ থাকায় হুযুর তাঁকে তাঁর আত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দেন।

উপরিউক্ত স্ত্রীগণের বাইরে রাসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট দু'জন দাসী ছিলেন মারিয়া বিনতে শামউর আল-কিবতিয়ার নাম আগেই উল্লেখ্য করা হয়েছে। আরেকজন রায়হানা বিনতে যায়েদ।

আখেরী নবী হযরত রাসুল মকবুল (রাঃ) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসুলের মতো সংসার জীবন যাপন করেন। অন্য নবীদের যেমন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছিলেন, হুযুরের ও স্ত্রী,

www.pathagar.com

সন্তান-সন্তুতি ছিলেন। মানব জাতির আদর্শরূপে প্রেরিত পুরুষদের জন্য এ-ও ছিল পূর্ণতার পরিচায়ক। আল্লাহ পাক বলেন, **"ওয়ালা কাদ আরসালনা রসূলাম মিন কাবলিকা ওয়া জা'আলনা লাহুম আযওয়াজা ওয়া যুররিয়্যাহ''** (সুরা আর-রা'দ) অর্থাৎ, আপনার পূর্বেও আমি নবী-রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তাদের দিয়েছি স্ত্রী, পরিবার-পরিজন।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের যে আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তার সম্পূরক হিসেবে হুযুরের সন্তানদের নামও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উল্লেখ করছি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুত্রগণের নাম ঃ আল-কাসিম, আব্দুল্লাহ, তায়্যিব ও তাহির। এরা প্রত্যেক শিশুকালে মারা যান। মক্কা থেকে হিজরতের পূর্বেই এদের জন্ম মৃত্যু মক্কাতেই সংঘটিত হয়। মারিয়াহ কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহনকারী পুত্র ইবরাহীমও শৈশবে ইন্তেকাল করেন।

কন্যাগণের নাম ঃ যয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রাঃ)। এরা সবাই বয়োপ্রাপ্ত হন এবং তাদের বিয়ে শাদী হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে হয় আবুল আ'স ইবনুর রবীর সাথে। হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে হযরতের দু'কন্যা হযরত রোকাইয়াও উম্মে কুলসুমের বিয়ে (এক বোনের মৃত্যুর পর অপর জনের)হয়। আর এদের উভয়ই হযরত উসমানের জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। এদের কারো কোন সন্তানাদি জীবিত ছিলেন না অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্ত হননি।

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে হয়। তাঁর দু'সন্তান হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে নবীবংশ স্থায়ী হয়। আল্লাহ পাকের সীমাহীন বরকত ও করুণায় হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বংশ গোটা মুসলিম বিশ্বে সুমহান মর্যাদায় বিস্তৃত ও সুরক্ষিত রয়েছে।

[তথ্যসুত্র ঃ ইবনুল কালবী। আল-কামিল, ইবনুল আসীর। শায়খ আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী। নিসাউন নবী, ডঃ আয়েশাহ আবদুর রহমান।]

[সীরাত স্মারক '৯৭-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংস্কৃতি ও আজকের প্রেক্ষাপট

আ,ন, ম, আঃ কাইয়ুম খন্দকার

একদা মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন খুব দূরে নয়, যে দিন তোমরা দেখতে পাবে, সুদূর সিরিয়া সীমান্ত হতে একজন মহিলা প্রশান্তমনে একাকী আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে আসবে। অর্ধ-শত মাইল দুরত্বের পথ অতিক্রম করতে কোথাও জনপদ, কোথাও জনমানব শূন্য ধু-ধু মরুপ্রান্তর, আবার কোথাও পাহাড়িয়া দুর্গম রাস্তা। যে পথে একদা কোন কাফেলাও পথ চলতে নিরাপদ ভাবতে পারতো না, সে পথে একজন নারী তার জান-মাল ও ইজ্জতের ব্যাপ্যারে আশংকামুক্ত হয়ে একাকী চলার পরিবেশ সৃষ্টি করার নজীর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল, এরি নাম 'ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) আম্বিয়াকুল শিরোমণি রাহমাতুল্লিল আলামিন জনাবে রাসুলে পাক (সাঃ) এর ভবিষ্যত বাণীর বাস্তবতা নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অথচ উহাই ছিল সেই সমাজ, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল মানবতা শুধু উপেক্ষিতই ছিল না; বরং পেশীশক্তি ও নিষ্ঠুরতা ছিল সামাজিক অধিকারের মাপকাঠি। চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে দাসদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা প্রতিযোগিতায় রক্তের হোলিখেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা, দাসীদেরকে অশ্বের পেছনে বেঁধে তাদের করুণ আর্তনাদ ও চিৎকার শোনা, ঘোড়া দাবড়িয়ে দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার দৃশ্য উপভোগ করাসহ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। নারীদের কোন অধিকার থাকতে পারে, এ ধারণা শুধু জাযিরাতুল আরব নয়, বরং গোটা দুনিয়ার কোথাও ছিল না।

এখানে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি (তিনি যে ধর্মেরই অনুসারী হোন) ক্ষণিকের জন্য হলেও একটি প্রশ্ন তাকে বিস্মিত করবে। যুগ যুগ ধরে লালিত সামাজিক রীতি-নীতি মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে কি করে ওলট-পালট হয়ে গেল। এই অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবের মূল শক্তি কোথায়? এক কথায় এর জবাব 'ইসলামী সংস্কৃতি'। কারণ এই সংস্কৃতির রূপকার স্বয়ং মহান আল্লাহ্। যিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তার সৃষ্টির রহস্য পুরোপুরি জ্ঞাত। কাজেই মানুষের কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল তা একমাত্র তিনিই নির্ভুলভাবে জানেন। আর তিনি তাঁর হাবীব রাসুলে পাক (সাঃ) কে স্বীয় জিম্মায় প্রশিক্ষণ দিয়ে এ সংস্কৃতির বুনিয়াদ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন। কোরআন মজিদের শাশ্বত বাণী-'**অল্লাহ মুতিম্মু নুরিহী অলাও কারিহাল কা-ফিরুন**।' অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেনই তাতে খোদাদ্রোহীদের যতই অন্তর্জ্বালা হোক না কেন।'

ইসলামী সংস্কৃতি ও অন্যান্য সংস্কৃতির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য এখানেই। কারণ ইসলামী সংস্কৃতির গোটা পরিমন্ডল দ্বীনের (ধর্মীয় আদর্শের) আওতাধীন। দ্বীন যেখানে

www.pathagar.com

অনুপস্থিত সেখানে ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। অপরদিকে সংস্কৃতির নামে অপরাপর যা কিছু আছে, তা সবই ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ, ভাষার ভিত্তিতে সৃষ্ট। ফলে এখানে জাগতিক চাহিদা বা বস্তুবাদী মোহ প্রধান বিচার্য। কুসংস্কারমুক্ত, মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ইত্যাদির নামে প্রতিযোগীতার উন্মাদনাময় নৈতিকতার দেয়াল ভেংগে ফেলছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ক্রমে ক্রমে জন্ম নিয়েছে মানবতা বিরোধী অসংখ্য ক্রাইম। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ব্যভিচার, কালোবাজারী, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি সমাজবিরোধী এসব কর্মকান্ড আমাদের যুব সমাজের এমনকি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দ্রুত সংক্রমিত হয়ে মানবতাকে জিম্মী করে রেখেছে। এর জন্য সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি সিংহভাগ দায়ী, তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না। অশ্লীলতাকে শৈল্পিক নিপুণতার খ্যাতি দিয়ে উৎসাহিত করা, লটারীর নামে জুয়া খেলা, বিনোদনের নামে ব্লু-ফিল্ম চালানো, চিত্তাকর্ষনের নামে সামাজিক নাটক, ছায়াছবির নামে যৌন উন্মাদনা সৃষ্টি করা, দেশসেবার নামে আত্মসাৎ, রাজনীতির নামে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া, সেবার নামে শোষণ করা ইত্যাদি গর্হিত অনেক ক্রিয়াকান্ডের অপরাধের উপলব্ধিও ক্রমে ক্রমে হারাতে বসেছে। সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে এসব অনেক কিছুই আমাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আফসোস!

পক্ষান্তরে, ইসলামী সংস্কৃতির দাবী, সমাজের সর্বস্তরে মানবিক মূল্যবোধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ'-তোমরা আল্লাহর গুণাবলীতে চরিত্রবান হও' এই নীতি অবলম্বনে জাগতিক সকল কর্মকান্ডে তাকে আল্লাহর দাসত্বের পরিচয় দিতে হবে। কাজেই অশ্লীল ও অমানবিক কথা, কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, দর্শন-গবেষণা, লেখনী ইত্যাদি তা বাহ্যিক চাকচিক্যে ও ব্যবহারে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, ইসলামী সংস্কৃতি তা অনুমোদন করে না। এটা গোঁড়ামী নয় বরং মানব কল্যাণে এগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এ কারণেই। সর্বোপরি, ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিটি সদস্যের মূল শিক্ষা ও উদ্দেশ্য হলো–

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَ نُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ–আমার নামাজ, আমার কুরবাণী ও আত্মত্যাগ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেই নিবেদিত।

পরিশেষে বলবো, আমরা-যিনি যেখানে যেভাবে আছি, মহান ঐশী বাণী,

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ 'রাসুল তোমাদের নিকট যা কিছু উপস্থাপন করেছেন তা গ্রহণ কর আর তিনি যেসব জিনিস নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। এই হোক আমাদের জীবনাদর্শ, এই হোক আমাদের সংস্কৃতি, এই হোক আমাদের মাহে রবিউল আউয়ালের শপথ।

[সীরাত স্মারক '৯৫-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম

ডাঃ শাহ মুহাম্মদ এমদাদুল হক

অতীতের ঘটনা বর্তমানে বর্নিত হলেই তা হয় ইতিহাস। সব ঘটনাকেই মানুষের স্মৃতিপট বা মেধা ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও নিদর্শনসমূহ সব সময় সম্পূর্ণ বিলীন হয় না যা অনেক সময় ইতিহাসের প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশে ইসলামের অভ্যুদয় এমনি একটি ঘটনা যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে যথাসময়ে যথাযথভাবে লিখিত হয়নি। কিন্তু প্রকৃতি তার কর্তব্য পালনে কোন কার্পণ্য করেনি। এমনি ধরনের শত শত পূরাকীর্তি হাজার হাজার বছরের নানা অত্যাচার, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সহ্য করেও এদেশের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি ধরনের একটি পুরাকীর্তিকে ভিত্তি করেই ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ইং রংপুর শহরে ঐতিহ্যবাহী মিলনায়তন "টাউন হলে" একটি ব্যতিক্রমধর্মী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল "হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ইসলাম ও বাংলাদেশ" অর্থাৎ- ৬২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রেরিত হয় ইসলামের দাওয়াত। সে সময়ের প্রবর্তিত লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের "মাজদের আড়া" গ্রামে একটি সুপ্রাচীন মসজিদের ধ্বংস বিশেষ পাওয়া যায়।

জঙ্গলে ঢাকা মাটির টিলা সদৃশ্য ভূ-খন্ডের মালিক জনাব নবাব আলী, পিতা মৃত রহমতুল্লাহ প্রয়োজনের তাগিদে জঙ্গল পরিস্কার করে ৯/১০ ফুট উঁচু মাটির স্তুপ সরাতে গিয়ে একটি প্রাচীন প্রাসাদের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। জঙ্গল পরিস্কার করে ইটের নমুনা ধরে মাটি খুঁড়তে গিয়ে দালানের ৫১ ইঞ্চি ভিত্তি বের হয়ে আসে। এই সঙ্গে আরও বের হয় আরবী ভাষায় লিখিত "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ও হিজরী সন ৬৯"খচিত ইষ্টক। ইষ্টকের দৈঘ্য ৯ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭ ইঞ্চি এবং পূরুত্ব ২ ইঞ্চি। ফুলের নকশা করা বিভিন্ন ধরনের ও সাইজের ঘাঁতুনী থেকে উত্তোলন করা হয়। শেষ পর্যন্ত জঙ্গল পরিস্কার করে দেয়ালের সীমানা দেখে বোঝা যায় একটি সুপ্রাচীন মসজিদ। সেই সঙ্গে ইমামের জন্য নিদিষ্ট স্থান, মেহরাবেরও সীমানা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ অনেক পুস্প খচিত ইষ্টকও পাওয়া যায়। এ সমস্ত ইষ্টক ও শিলাটি স্থানীয় জনসাধরণের মনে স্বভাবতঃই প্রত্যয় জন্মায় যে, এটি একটি সুপ্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবিশেষ। তাই চিন্তাবিদ বা গবেষকগণ ধারণা করেন যে, "মাজদের আড়া" কথাটি আদতেই ছিল মসজিদের আড়া। দেশের উত্তরাঞ্চেলে বিশেষ করে রংপুর দিনাজপুরে জঙ্গল এলাকাকে এখনও " আড়া"বা "আড়া বাড়ী"বলে।

www.pathagar.com

সেমিনারে প্রবন্ধকার ছিলেন রংপুর শহরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও রংপুর বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি জনাব গোলাম রহমান, সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজের সহযোগী অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও আল-মদীনা ইনস্টিটিউট-এর প্রবীণ শিক্ষাবিদ মওলানা সাইদুর রহমান নোমানী। প্রবন্ধকারগণ তাদের তথ্যবহুল প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এদেশে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে হিজরী প্রথম শতাব্দীরও পূর্বে। জনাব গোলাম রহমান তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মদীনায় হিযরতের কয়েক বছর পূর্বে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর মাতুল উক্ত সাহাবী ইসলাম প্রচারকের একটি ছোট দল নিয়ে ভারতের উপকূল বয়ে বর্তমানের বাংলাদেশে আগমন করেন এবং আরও পূর্বদিকে পানি পথে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পূর্বএশিয়া অতিক্রম করে সূদুর চীন দেশের ক্যান্টন বন্দরে উপস্থিত হন এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর কোয়াংটা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা আজও বিদ্যমান। এ মসজিদ চত্বরেই হযরত আবি ওয়াক্কাসের (রাঃ) কবর এ যাবত স্বাক্ষ্য বহন করে যে, ঐ যুগে ইসলাম প্রচারকগণ ভারত উপকূল তথা বাংলাদেশ, বার্মা হয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ ভদ্র ১৪০৭ "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" কলাম।)

অধ্যাপক লুৎফর রহমান তাঁর প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ডঃ আব্দুর রহিমের মন্তব্য উল্লেখ্য করে বলেন, "খ্রীষ্টীয় ৭৫ শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আরব বণিকদের বাণিজ্য কক্সবাজার পর্যন্ত বিচরণ করত এবং বাণিজ্যিক মালামাল ক্রয়-বিক্রয় হত।"

মাওলানা সাইদুর রহমান তার প্রবন্ধে টি'ডব্লূ আরনাল্ড কর্তৃক প্রণীত "দি প্রিচিং অব ইসলাম" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৭ খ্রীস্টাব্দ) আরব দেশ থেকে একটি ছোট্ট মুসলিম প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক গুণাবলী স্থানীয় জনগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তৎকালীন বাংলাদেশ জাতীভেদ প্রথা ছিল প্রকট। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ মানুষকে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। অভিজাত উঁচু শ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে ঘৃণা করত, অস্পৃশ্য মনে করত। তাদের স্পর্শ করা দ্রব্যাদি কখনই ব্যবহার করত না। কাজেই এই অস্পৃশ্য ও নিম্নশ্রেণী বলে ঘৃণিত বিরাট জনগোষ্ঠী মুসলিম ধর্ম প্রচারকদেরকে যাবতীয় ভেদ চিন্তার উর্ধ্বে দেখে তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। (চিন্তাধারা, পৃষ্ঠা-৪, জেড আহমেদ কিসমত)।

www.pathagar.com

সেমিনারের উদ্যোক্তাগণ উল্লেখ করেন যে, অতিসত্ত্বর উল্লেখিত পূরাকীর্তির ধ্বংসাবিশেষ এ অঞ্চলের প্রাচীনতম মসজিদ সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের সমালোচনায় অংশগ্রহন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ জনাব গোলাম রাসুল, জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব ফিচার সম্পাদক, সুসাহিত্যিক ও প্রখ্যাত প্রবন্ধকার অধ্যাপক আব্দুল গফুর, বহুল প্রচারিত প্রাচীন মাসিক পত্রিকা "মদীনা'র সম্পাদক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও অনুবাদক মওলানা মুহীউদ্দিন খান, রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল কুদ্দুস বিশ্বাস।

আমি গত ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ইং রেডিও বাংলাদেশ রংপুর শাখার বার্তা নিয়ন্ত্রক বন্ধুবর জনাব নূরুল ইসলাম সরকার, রংপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জনাব জিল্লুর রহমানসহ উল্লেখিত মাজদের আড়ায় আবিস্কৃত ইসলামের প্রথম যুগের প্রাচীনতম মসজিদ দেখার জন্য যাই। স্থানটি রংপুর-লালমনিরহাট প্রধান সড়ক থেকে মাত্র ১ মাইল কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করলেই স্থানটি পাওয়া যায়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব নূরুজ্জামান সাহেবের তত্ত্বাবধানে সেখানে একটি দেয়াল হয়েছে এবং পর্যটকদের আগমন স্বাক্ষরের জন্য একটি খাতাও রক্ষিত আছে।

আমাদের টয়োটা গাড়ীখানা যখন এ মসজিদ চত্বরে পৌঁছে তখন অনেক স্থানীয় লোকজন জমা হয়। তাদের মুখে উল্লেখিত ইতিহাস ছাড়াও অনেক প্রামাণ্য সংবাদ পাওয়া যায়। আমরা তিনজনই ঐ মসজিদের সীমানার মধ্যে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে দোয়া করি। উৎসুক্য নিবারণ করতে না পেরে দুটি প্রাচীন ইষ্টকও সঙ্গে নিয়ে আসি।

[মরহুম ডাঃ শাহ মোহাম্মদ এমদাদুল হক সু সাহিত্যিক ও সমাজ সেবক ছিলেন। রংপুরের এই কৃতি সন্তান বিভিন্ন পর্যায় অবদান রাখার মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করে যান। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।]

www.pathagar.com

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা

মুহাম্মদ তাহের হোসেন

কর্মমুখর পৃথিবীতে কর্মহীন মানুষের কোন গুরুত্ব নেই। সর্ভতা, সংস্কৃতি, , ঐতিহ্য, কৃষ্টি , বিজ্ঞান , মানবতা প্রভৃতি মানুষের কর্মের সংগে সম্পৃক্ত। কর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মানুষের চেষ্টা ও সাধনার উপর । সূরা নাজমের ৩৯-৪২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "মানুষ যেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করবে সেরূপ সফলতা ও প্রতিদান পাবে এবং আল্লাহর নিকটেই মানুষের শেষ প্রত্যার্বতন"।

আমরা এখানে শ্রম বলতে বৈধ শ্রমের কথা বলছি। কারণ অবৈধ শ্রম ইসালামে স্বীকৃত নয়। আর তা সামগ্রিক কল্যান বয়ে আনতে পারেনা। উপার্জন তথা রুজি হালাল না হলে কোন ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। হালাল রুজি অনুসন্ধানের জন্য শ্রম, বিনিয়োগ, ব্যবসা, পরিশ্রম সকল কিছুই বৈধ হতে হবে। অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বৈধ কর্মের দ্বারা পৃথিবীতেও স্বচ্ছল হওয়া যায়, আখেরাতেও। তাই বেকার জীবন সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াতে ভাষ্যকার সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ "কাউকে বেকার বসে থাকতে দেখলে আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য লাগে।" ইসলামে ভিক্ষা বৃত্তিকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যারা সক্ষম, সুস্থ দেহের অধিকারী, কর্মদক্ষ, তাদের কোন ভাবেই ভিক্ষা করার সুযোগ নেই। এই উপায়ে অর্থ উপার্জনের মধ্যে কোন আত্ম গরিমা থাকে না। ভিক্ষে করা সম্পদে কোন সম্মান থাকে না। মানুষকে অত্যন্ত মর্যাদাহীন করে তোলে। কোন উপার্জন না করে ভিক্ষা বৃত্তি কাজে লিপ্ত হওয়াকে রাসুলে করীম (সাঃ) অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এতে আত্ম মর্যাদার হানি ঘটে। তাই ভিক্ষাবৃত্তি সক্ষম ও কর্মক্ষম মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। তবে যারা অক্ষম, অন্ধ, বধির, পংগু অর্থাৎ যাদের পক্ষে কোনভাবে কোন কাজ করা সম্ভব নয়, তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয় শিথিলযোগ্য। এই পদ্ধতি অবলম্বন না করাই উত্তম বলে ইসলামে ঘোষণা করা হয়েছে রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার সংগে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষা করবে না তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম"।

একমাত্র ভিক্ষা নয়, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ ছিনতাই, সন্ত্রাস, প্রতারণা, মজুতদারী, ঠকবাজী প্রভৃতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ইসলামে বৈধ নয়। যারা এইসব অবৈধ পন্থায় জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের মনুষত্ব লোপ পায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই কর্ম আল্লাহর কাছে পৌছায় না। বৈধ শ্রমের বিনিময়ে, আদর্শ ব্যবসা এবং চাকুরী ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সম্পূর্ণ বৈধ। পরিশ্রম করে, খেটে খাওয়ার প্রতি ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্ব

www.pathagar.com

প্রদান করা হয়েছে। পরিশ্রমী লোককে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে মহানবী (সাঃ) মনে করতেন। বৈধ উপায়ে যে কোন কাজের মাধ্যমে উপার্জন করা ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে। উপার্জনের দিকে সৎ থেকে কর্মমূখী জীবন পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে যখন নামাজ শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সংগ্রহ করার তাগিদে রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এই পরিশ্রমকে জিহাদের সংগে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "নিজের পরিজনদের নিমিত্ত হালাল রুজী উপর্জনে ব্যাপৃত থাক। এ নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে জিহাদ করার মতই।" নবী করিম (সাঃ) এই শ্রমের মূল্যায়ন করতে যেয়ে অনেক সময় বলতেনঃ "তোমদের কেউ দড়ি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে, লাকড়ি জমা করে পিঠে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করবে এবং এমনি ভাবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজনে মিটিয়ে দেবেন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, করুনা ও লাঞ্ছনা পাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছিলেনঃ "এক টুকরি খাদ্য আর এক টুকরি গম"। হযরত আলী (রাঃ) মজুরীর তালাশে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। ইহুদীর ক্ষেত্রে মেহনত করে খাবার নিয়ে রাতে ঘরে ফিরতেন। হাতে ফোসকা পড়ে যেত, তবুও শ্রম বিমূখ হননি। তিনি নিজের হাতে ঘর ঝাঁড়ু দিতেন। এতে কাপড়, চোপড় ময়লা হয়ে যেত। হযরত উমর (রাঃ) অনেক সময়ই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেনঃ "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন মেহনত করে অর্থ উপার্জনের কাজ বন্ধ না করে দেয় এবং এই বলে বেকার বসে না থাকে-যে আল্লাহ। তুমি আমার খাবার দাও। কারণ তোমরা ভাল করেই জান আকাশ হতে সোনা চান্দি ঝরে পড়ে না।

নবী করিম (সাঃ) নিজেও একজন শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। একজন আদর্শ ব্যবসায়ী ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি মাঠে বকরী চড়িয়েছেন। শ্রমের বিনিময়ে লাভের অংশীদার হিসেবে হযরত খাদীজা (রাঃ) এর ব্যবসায়ে খেটেছেন । রাসুলে করিম (সাঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়াতে আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি বকরী চড়াননি"। তখন সাহাব-ই-কিরাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হুজুর, আপনিও। নবী করিম(সাঃ) জওয়াবে বললেনঃ 'হাঁ, আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চড়িয়েছি"। কিন্তু আমাদের সমাজে শ্রমজীবী মানুষের কোন মর্যাদা নেই। তাদের শ্রমকে অবজ্ঞা করা হয়। শ্রম দেয় তাদের নাম দেয়া হয়েছে শ্রমিক। অথচ আমরা সকল মানুষ শ্রম বিনিয়োগ করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করি। চাকর-চাকরাণী, মেথর, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়ীওয়ালা, সুইপার, ঝাড়ুদার, কামলা, পিয়ন, নৈশপ্রহরী, ওয়ার্কার এদের কারোর শ্রম আমাদের সমাজে মর্যাদা পায় না। এর ফলে এরা মানুষ

www.pathagar.com

হিসেবেও তাদের অধিকার ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। শ্রমের ধরনের কারণে তারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত। অথচ এরা চুরি করে না, ডাকাতি করে না, প্রতারণা করে না বা অসামাজিক কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে না। অথচ যারা অবৈধ অর্থে অট্টালিকা গড়ে তুলছে, তাদের সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। তাকওয়াকে বাদ দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার মাপাকাঠিতে আজ মর্যাদাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর কাছে এদের কোন মূল্য নেই। কারন ইবাদতের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি। দুনিয়াবীর আলোকে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া হলেও আখেরাতের দৃষ্টিতে তাদের কোন সম্মান নেই। তারা নিশ্চিতভাবে দোযখের অধিবাসী হবে। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে তারা-ই বেশী মর্যাদাবান যারা অধিক খোদভীরু-পরহেযগার"।

নবী করিম (সাঃ) এই বিষয়ে বলেছেনঃ "এমনও হতে পারে যে, খাদেম তার মনিব অপেক্ষা উত্তম এবং বৈচিত্র্য নয় যে, আল্লাহর দরবারে খাদেমের কর্মই অধিক পছন্দনীয় হবে"। অর্থ নয় মানবিক গুণাবলীই মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলে। তাই রাসুলে করিম (সাঃ)-এর মত একজন আদর্শ ব্যক্তিকে বিত্তবান খাদীজা বিয়ে করেছিলেন। অথচ মহানবী (সাঃ)-এর কোন অর্থ ছিল না। তাঁর যা ছিল তা দুনিয়ার কোন মানুষের হবে না। ইসলামের স্বর্ণযুগে বিত্তহীন ঈমানদার ব্যক্তিগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) খলিফা হওয়ার পরও গতর খেটেছেন। হযরত উমর (রাঃ) রাখাল ছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মদীনার গভর্ণর ছিলেন। ইসলাম সকল মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ভুল করেনি। হযরত বিলাল, আম্মার, খব্বাব, সুয়াইব, যায়েদ, উসামা (রাঃ) প্রমুখ সকলেই দাস-শ্রমিক ছিলেন। কিন্তু এদের সামাজিক মর্যাদা অনেকের চেয়েও অধিক ছিল। নবী করিম (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) কে (নিজের পোষ্যপুত্র) আপন ফুফাত বোন হযরত যয়নব (রাঃ)-কে তার সংগে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত উসামার (সাঃ) নেতৃত্বে মহানবী (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহুর্তে সর্বশেষ যে মুজাহিদ বাহিনী কাফিরদের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় পঠিয়েছিলেন তার সেনাপতি ছিলেন এই দাস-শ্রমিক। হযরত আবু বকর, উমর উবায়দা ছিলেন সাধারন সৈনিক মাত্র। এইভাবে মহানবী তাকওয়ার ভিত্তিতে, মানুষ হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

[সীরাত স্মারক '৯৫-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয়
মূল ঃ ইবরাহীম মদিবুবো উমার

প্রত্যেক নবী তাঁর পরবর্তী নবীর আগমন সম্পর্কে তাঁর উম্মতদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এর একমাত্র ব্যতিক্রমি হলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি সমগ্র মানব সমাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার চুড়ান্ত অহী নিয়ে খাতামুন্নবিয়্যীন বা শেষ নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা হলো, হযরত নূহ (আঃ) থেকে মরিয়মপুত্র হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবীই খোদায়ী নির্দেশ মোতাবেক তাঁর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং তিনি যে বাণী নিয়ে আসবেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে গেছেন। মহানবী (সাঃ) এর বাণীতে পূর্ববর্তী সকল নবীর উপর নাজিলকৃত অহীর সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে সকল নবী তাঁদের উম্মতদের কাছে পবিত্র কুরআনের মতোই ঐশীবাণী নিয়ে এসেছিলেন।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ দি ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেন্টে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষদ্বাণী পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, মহানবী (সাঃ) যখন মানব জাতির জন্যে আল্লাহতায়ালার শেষ অহী নিয়ে আগমন করেন, তখন ঐসব সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্বেষ, ঔদ্বত্য ও পরশ্রীকাতরতা বশতঃ তাঁকে মান্য করতে অস্বীকার করে। মানব সমাজে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘতম নবুয়্যতী ধারা বিদ্যমান ছিল। ইসলামের মহান নবীগণ যেমন- হযরত মূসা (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) সকলেই ছিলেন ইয়াহুদী বংশজাত এবং বিশেষভাবে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী লোকজন তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে, এমনকি কাউকে কাউকে হত্যাও করে।

হযরত মুসা (আঃ) কে পাঠানো হয়েছিল ফেরাউনকে সতর্ক করার জন্য। যাতে করে সে, ইসরাইলের সন্তানদেরকে মুক্তি দেয়। কারণ ফেরাউন বনী ইসরাইলের সকল পুরুষ সন্তানকে হত্যা করতো আর বয়স্কদেরকে দাস হিসাবে ব্যবহার করতো এবং তাদের সাথে অবমাননাকর আচরণ করতো। ফেরাউন নবী মূসার আহবানের প্রতি কর্ণপাত না করায় তাকে নীল নদের পানিতে ডুবে মরতে হয় এবং ইসরাইলের সন্তানরা মিশরের ধন-সম্পদের মালিক হয়। কিন্তু কালক্রমে তারা তাদের বন্দীদশা থেকে মুক্তির পথে নেতৃত্ব দানকারী নবী মূসা (আঃ) কে অমান্য করা শুরু করে।

www.pathagar.com

হযরত জাকারিয়া (আঃ) তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া (আঃ) এর ঘটনা আরো মারাত্মক। তাঁরা যখন সত্যের ঘোষণা প্রচার করে, তখন তাদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয় এবং এক পর্যায়ে হত্যা করা হয়। একই ঘটনা ঘটে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বেলায়। তদানীন্তন আরব সমাজের লোকেরা তাঁকে আল-আমীন বা বিশ্বস্ত বলে জানতো। অথচ তিনিই যখন সত্যবাণী প্রচার শুরু করেন তখন লোকেরা তাঁর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ শুরু করে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। আরবদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বাছাই করেন, তারা বিদ্বেষ ও দাম্ভিকতাবশত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ইয়াহুদী ও আরবরা ছিল তার জাতিসম্পর্কের জনগোষ্ঠি। ইয়াহুদীরা ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধর, আরবরা ছিল হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর। এরা উভয়ে আবার এসেছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহানবী (সাঃ) ছাড়া নবী রাসুলগণ এসেছিলেন বিশেষ বিশেষ জাতি ও উপজাতির উদ্দেশ্যে। আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন আরব, ইয়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য সকল জাতি ও উপজাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তাঁর প্রচারিত বাণী ছিল সূর্যের কিরণের মতো সার্বজনীন ও সমুজ্জ্বল।

ইয়াহুদীর ধর্মগ্রন্থ দি ওল্ড টেস্টামেন্টের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মুসা (আঃ) ইসরাইলের বংশধরদের উদ্দেশ্যে তার বাণী প্রচার করেন এবং তাদেরকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কিত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবহিত করেন।

"আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজনকে নবী বানাবো, তোমার মতো এবং আমি তার মুখে আমার কথা দিয়ে দেবো এবং আমি তাকে যেভাবে আদেশ করবো সেভাবে সকলের উদ্দেশ্যে সে কথা বলবে।" (ওল্ড টেস্টামেন্টের পঞ্চম গ্রন্থ ১৮ঃ১৮)

উদ্ধৃতাংশটুকু আমাদের সামনে মহানবী (সাঃ) এর পরিচয় তুলে ধরছে, "তোমার মতো" অর্থাৎ হযরত মুসা (আঃ) এর মতো। কেউ কেউ দাবী করেন যে, তাঁকে মরিয়ম পুত্র হযত ঈসা (আঃ) সাথে তুলনা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রমাণাদি বিপরীতমুখী। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে একমাত্র অভিন্নতা হলো উভয়েই আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত এবং উভয়ই ইসরাইলের বংশধরদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। অভিন্নতা হযরত দাউদ (আঃ),হযরত সোলায়মান

(আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) প্রভৃতি যে কোন ইসরাইল নবীদের বেলায়ও লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য মহানবী (সাঃ) ও হযরত মুসা (আঃ) এর মধ্যে অনন্য অভিন্নতা বিদ্যামান, যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রথমতঃ হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়ের মাতা-পিতা ছিলেন কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এর ছিলেন কেবল মাতা।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মুসা (আঃ)ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই তাদের মিশন পরিচালানায় সফল হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) সাফল্য অর্জন করে যেতে পারেননি। পূর্বোক্ত দুজন আধ্যাত্মিক জগত নিয়ন্ত্রন করার সাথে সাথে পার্থিব জগতও নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন। কালক্রমে তাঁরা তাদের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হন। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) তা হতে পারেননি এবং এক পর্যায়ে তাঁকে ক্রুশেবিদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ হযরত ঈসা (আঃ) একাকী জীবন যাপন করে গেছেন। পক্ষান্তরে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিবাহিত জীবন যাপন করে গেছেন।

চতুর্থতঃ হযরত মুসা (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই একটি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন এবং তাদেকে দাফন করা হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ্ তা'লা শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উর্ধ্বে তুলে নেন।

পঞ্চমত ঃ হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ তাদের উম্মতদের জন্য নতুন বাণী নিয়ে এসেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আঃ) নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আগমন করেননি। সে কারনে তিনি বলেন, "মনে করো না আমি শরীয়তের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি, বরং আমি এসেছি তা পূরণ করতে।" (ম্যাথিউ ৫ঃ১৭)

নিউ টেস্টামেন্টের যুক্তি অনুসারে হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ত্রিত্ববাদের ধরণ অনুসারে হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র, সে মোতাবেক তাঁকেও খোদা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে হযরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে এ জাতীয় কোন ধারণা প্রচারিত নেই। কথিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) কে তিন দিন অগ্নিকুন্ডে থাকতে হয় কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) কে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। অবশ্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে কেবল হযরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বানীটি হযরত ঈসাও (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তবে ভুল ধারণাবশতঃ হযরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীটি, হযরত ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর আবর্তিত হয়েছিল। অবশ্য, গসপেল অব জনে হযরত ঈসার (আঃ) বাণীটি নিম্নরূপঃ "কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্য কথাটি বলছি। আমার

www.pathagar.com

দূরে সরে যাওয়াই তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো। কারণ, আমি না গেলে সাহায্যকারী (শেষ নবী) তোমাদের মাঝে আসবে না। (জন ১৬ঃ৭)

গসপেল অব জনে হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুরূপ আরেকটি উক্তি রয়েছে; "তোমাদেরকে আমার অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু এখন তা তোমাদের বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশী হবে। তবে যখন রূহ (শেষ নবী) আগমন করবেন, তিনি আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক কথা প্রকাশ করবেন, তিনি তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সত্যের দিকে এগিয়ে নেবেন। তিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, বলবেন তিনি যা শুনেন তা, এবং বলবেন ভবিষ্যত সম্পর্কে (জন ১৬ঃ১২-১৩।)

হযরত ঈসা (আঃ) ইসরাইলের বংশধরদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শেষ নবীর আগমন বার্তা পৌছে দিয়েছেন। আর শেষ নবী (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ধর্মে বিশ্বাসীদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করার আহবান জানিয়ে সত্যিকার অর্থেই খোদা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আদেশ দিয়েছেন ঃ "তুমি বলো, হে কিতাবধারীগণ! এসো সে কথার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি" (পবিত্র কুরআন ৩ঃ৬৪)।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ তায়ালার আদেশ সম্বলিত এ আয়াত থেকে শেষ নবী (সাঃ) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। যেমনঃ"তিনি নিজের থেকে বলেন না এবং তিনি যা শোনেন তা বলেন।"

পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণটাই নাজিল হয়েছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর। আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) প্রতিটি শব্দ তাঁকে শুনিয়েছেন, তিনি মনে ধারণ করেছেন এবং যেভাবে শুনেছেন সে ভাবে তা তাঁর অনুসারীদের কছে পৌছে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে সরাসরি আল্লাহর আদেশ উল্লেখিত হয়েছে। আবার হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তিটি পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাজিল হয়েছে এবং তা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দেবে সে কথাও উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তা এখনও অনাবৃত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অনাবৃত থাকবে। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করবেন, যা হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে

www.pathagar.com

অস্বীকারকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে আল্লাহর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এভাবে; "এবং এমনটি অবশ্যই ঘটবে যে, শেষ নবী বা আমার নামে বলবে, সে অনুযায়ী যারা আমার কথায় কর্ণপাত করবে না আমি তাদের পাকড়াও করবো।"(ওল্ড টেস্টামেন্টের পঞ্চম গ্রন্থ ১৮ঃ১৯)।

পবিত্র কুরআনও কি চমৎকার ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করেছে, "সে আমার নামে কথা বলবে।"আর অন্য যে কোন গ্রন্থের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমভাবে পবিত্র কুরআনে ১১৪ টি সূরা প্রত্যেকটির (একটি বাদে) সূচনা হয়েছে "দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে" এই বাক্য দিয়ে।

আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে কখনই ব্যর্থ হন না। যারা হযরত মূসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে অবশ্যই তিনি সমুচিত শাস্তিবিধান করবেন। আর সে শাস্তি হলো; "কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিক, জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; আর তারাই সৃষ্টির অধম" (আল কুরআন ৯৮ঃ৬)।

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক সিরাসুল হক

[সীরাত স্মারক '৯৬ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

সর্বোত্তম আদর্শ

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

পবিত্র কুরআনে মহানবী (সাঃ) কে 'উসওয়াতুন হাসানা' বা 'মানব চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের মহান নবী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন উন্নত এক মহান চরিত্রের অধিকারী। অতএব কৃত্রিমতার আবরণে চিত্তাকর্ষক কোন মন্তব্যের দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করার আদৌ প্রয়োজন নেই। মহানবীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী এবং কাজকর্ম ছিল এত বাস্তবধর্মী যে, কোন মন্তব্য ছাড়াই সে সবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা চলে এবং মহানবীর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। সমুদ্রের তীরে বসে যদি কেউ বিশাল সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি দেখতে থাকে অথবা হিমালয়ের চূড়ায় উঠে কেউ যদি চারদিকে কিংবা নিঃসীম নভোলীলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে,তখন যেমন সে ভীত বিহ্বল হয়ে তার অভিজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, ঠিক তেমনি মহানবীর জীবনও এক মহাসমুদ্র। খ্যাতনামা পারস্য কবি ও দার্শনিক শেখ সাদী(রহঃ) আরবীতে রচিত কবিতায় মাত্র চারটি লাইনে মহানবীর সাফল্য তুলে ধরেছেন। কবি সাদী মহানবীকে দেখেছেন অন্তর দিয়ে এবং পরিপূর্ন ভক্তি , সম্মান ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে; যে ভালবাসা এবং প্রেমের বাণী তিনি ছড়িয়ে গেছেন সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর জন্যে। যে চারটি পংক্তির মধ্য দিয়ে শেখ সাদী বিশ্বনবীর জীবন চিত্রায়ন করেছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে এই-কাজের মধ্য দিয়ে মানবজাতির মধ্যে তিনি হয়েছেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর অনুপম সৌন্দর্যটা বিদীর্ণ করেছে অন্ধকারকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহার ছিল মাধুর্যমন্ডিত। মহানবী ও তার বংশধরদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

এমন ব্যক্তি রয়েছেন, জীবনে যারা এক বা একাধিক ক্ষেত্রে বড় হয়েছেন। যেমন নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব যুদ্ধ কৌশলের জন্যে সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রেরণা ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। পক্ষান্তরে, আমেরিকান কবি এবং ঐতিহাসিক এনজারসোল ইতিহাসখ্যাত মহাবীর নেপেলিয়ানের হত্যা, অত্যাচার এবং নিপীড়নের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করার পরিবর্তে নিজেকে এমন একজন কৃষক হিসেবে কল্পনা করতে ভালবাসতেন, যে স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে তার দস্তানা বুনে দিতে ভালবাসবে এবং শরতের রৌদ্রকিরণের পরশে থেকে পেকে ওঠা আঙ্গুরের ক্ষেত দেখার মাধ্যমেই লাভ করবে সুবিমল আনন্দ। সক্রেটিস দর্শনের দিক থেকে এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অনন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অথচ এমনি এক অসাধারণ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সারা রাত সুরাপানে থাকতেন বিভোর এবং তার স্ত্রী 'জেনথিপি' প্রায়ই

www.pathagar.com

নির্দয়ভাবে তাঁর মাথায় গরম পানি ফেলে দিতেন। গ্রীসের হোমরা, পারস্যের ফেরদৌসী, ইংলান্ডের সেক্সপীয়র এবং প্রাচীন ভারতের কালীদাস এরা সকলেই কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু কবি কালিদাসের মৃত্যু ঘটে দক্ষিণ ভারতের এক পতিতাগৃহে। মানুষের জীবনে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করা খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমভাবে মহত্ত্বের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করা দুর্লভ ঘটনা এবং এ বিষয়ে মরু দুলাল মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, যা ছিল একেবারেই তুলনাহীন। দূর থেকে কোন জিনিস দেখতে সর্বদাই উজ্জ্বল মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরুপ সমুদ্রের ভয়াল ঢেউগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন সমুদ্রে বিছানো রূপার পাতগুলো চমকাচ্ছে। কিন্তু মানুষের মূল্য কখনও দূর থেকে ক্ষণিকের দেখা লোকদের স্তুতি বা প্রশংসা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মানুষ এবং তাঁর বিষয়ে বিচারে জনগণ অনেক সময়ই হয়তো গুরুতর রকমের ভুল করে বসে এবং সত্যি বলতে কি আমাদের অধিকাংশ সামাজিক দুর্গতির মূলেই রয়েছে এসব কারণ। একথা সত্যি যে, কোন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ঘনিষ্টভাবে তাঁর সাথে মিশবার সুযোগ পান। সেই ব্যক্তিই মহান যিনি তাঁর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভৃত্য এবং প্রতিদিনের সঙ্গী সাথীদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

হযরত খাদীজা ছিলেন রাসুলুল্লাহর যৌবনের বছরগুলোতে একমাত্র জীবন সঙ্গীনি। আর আল্লাহর রাসুল হিসেবে তিনি প্রথম তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন। অনুপম শিষ্টাচার এবং মধুর স্বভাবের দ্বারা মহানবী তাঁর মহীয়সী সহধর্মিনীর নিকট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহানবীর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর মহান জীবন সঙ্গীকে বর্ণনা করেন কুরআনের প্রতিচ্ছবি বলে । আল কোরআন যে আদর্শ উপস্থাপন করে, মহানবী ছিলেন তারই বাস্তব দৃষ্টান্ত। রাসুলুল্লাহর পরিচারক হযরত আনাস বলেছেন, 'আমি একাধারে তাঁর গৃহে দশ বছর কাজ করেছি। দীর্ঘ এই ১০ বছর সময়ের মধ্যে তিনি কখেনো আমাকে বলেন নাই 'কেন এটা তুমি করলে অথবা কেন এটা কর নাই।'

বাইবেলে খ্রীস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুখৃষ্ট এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, যারা আল কুরআনে বিশ্বাসী তারা সেই বিবরণ বিশ্বাস করে না। পবিত্র কুরআনের মতে, হযরত ঈসা পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক এবং তিনি তাঁর সঙ্গী -সাথীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেন্ট ম্যানুষের বিবরন মতে আমরা দেখতে পাই যীশুখৃষ্টের শেষ ভোজনের ১২ জন সাথীর মধ্য থেকেও একজন যীশুখৃষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করেন এবং অবশিষ্টরা তাঁকে তাঁর জীবনের শেষ রাতে মোরগের ডাকার আগেই

একবার নয়, তিন তিনবার অস্বীকার করেন। ইসলামের মহান নবীর নিজস্ব শিষ্য-সাথী ছিলেন, ইতিহাসে যাঁরা সাহাবীরূপে পরিচিত। তাঁরা ১২ জন নয়, ১২শতকেরও বেশী। রাসুলুল্লাহর তাঁর সাহাবাদের নিকট নিজেকে গোপন করতেন না, বরং মানব জাতির কল্যাণে তিনি সাহাবাদের নিকট প্রদীপ্ত সুর্যের ন্যায় নিজের জীবনধারা উম্মুক্ত রাখতেন। মহানবীর পূত চরিত্রে ও ব্যক্তিত্ব একটা বিস্ময়কর নিদর্শন। কোন সাহাবাদের মনে কস্মিনকালেও রাসুলুল্লাহ কিংবা তাঁর কাজের সামান্যতম ক্ষতিসাধন করার চিন্তা উদয় হয়নি। মহানবীর প্রতি এমন ধরনেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা ছিল সাহাবাদের। আরো বিস্ময়কর ব্যাপারে এই যে, মহানবীর গোরতর শত্রু আবু লাহাব এবং আবু জেহেল, যারা চিরকাল তাঁর রক্তমাংস কামনা করেছে, এইরূপ শত্রুরাও অন্তরে অন্তরে এই মহান শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করে পারতো না। একদা জনৈক বেদুঈন আবু লাহাবের নিকট কিছু সংখ্যক উট বিক্রয় করেছিল, কিন্তু আবু লাহাব বেদুঈনের প্রাপ্য পুরোপুরি পরিশোধ না করায় বেদুঈন মহানবীর নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে। মহানবী দরিদ্র বেদুঈনের অসহায়তায় ব্যথিত হয়ে আবু লাহাবকে বেদুঈনের পাওনা টাকা চুকিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। আবু লাহাব দ্বিরুক্তি না করে সাথে সাথে মহানবীর অনুরোধ মেনে নিয়ে বেদুঈনের টাকা পরিশোধ করে দেন। এসব ঘটনা মহানবীর মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম প্রমাণ। মহানবীর চরিত্রের এই অনুপম রূপ-মাদুর্যের জন্যেই পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'উসওয়াতুন হাসানা 'অর্থাৎ মানব চরিত্রের অনুপম আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[সীরাত স্মারক '৯৫-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মনীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

كُنْتُ نَبِيًّا وَالْاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

অর্থাৎ রাসুল (সঃ) বলেন ঃ " আমি নবী ছিলাম যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও মাটির মধ্যে (সৃষ্টিত হয়নি) রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক আমাকে প্রথম ও শেষ নবী করেছেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে এ ত্রিভূবন সুষ্টি করতাম না। " রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ সৃষ্টির ব্যাপারে নবীদের মধ্যে আমি প্রথম, আর আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি সবার শেষে।

আলোচ্য হাদীসগুলো দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাসুল (সাঃ) কে আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম সৃষ্টি করে সর্বশেষে প্রেরণ করেছেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণ হয় বিভিন্ন মনিষীদের বানীর মাধ্যমে। সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য নবী এবং তার আগমনও সত্য।

১। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমন সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে, "If You love me keep my commandments. And I will pray the father and he shall give you another comforter that he may a bide with forever".

অর্থাৎ "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তবে আমার উপদেশ মত কাজ করিও। আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব যাতে তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন।- যিনি চির দিন তোমাদের সংঙ্গে থাকতে পারেন।"

২। তাওরাতে হযরত মুছা (আঃ) বলেন - The lorn the god will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of the bretheren like unto me unto him ye shall hearken.

অর্থাৎ "তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার (মুছার) মতই একজন পয়গাম্বর উথিত করবেন। তার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবন করিবে। " এ কথার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩ । দিঘা- নিকাব্বায় আছে ঃ "মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তার নাম 'মেত্তের অর্থাৎ শান্ত ও করুনার বৃদ্ধি " ইহা দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝান হয়েছে।

www.pathagar.com

৪। ইয়াহুদিদের ধর্ম গ্রন্থ, The Old testament এর মধ্যে আছে যে, হযরত মুছা (আঃ) ইসরাইল বংশধরদের উদ্দেশ্য তার বানী প্রচার করেন এবং তাদেরকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবহিত করেন। Old test. 5 খন্ড 18পৃ ঃ এর মধ্যে আছে ("আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে এমন একজন নবী বানাবো তোমার মত এবং আমি তার মুখে আমার কথা দিয়ে দেবো আমি তাকে যেভাবে আদেশ করবো সেভাবেই সকলের উদ্দেশ্যে সে কথা বলবে।"

উল্লেখিত আলোচনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রতি ইংগিত করেছেন।

৫। জিন্দাবেস্তা ও দসাতির পার্শিকদের ধর্ম গ্রন্থ এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আগমনের ইঙ্গিত করা হয়েছে, এমনকি আহমদ নাম পর্যন্ত উল্লেখ আছে, যেমন - Noid te Ahmad dragyetim from raome.

অর্থাৎ আমি ঘোষনা করছি, আহমদ নিশ্চয় আসবেন।

৬। রোমক সম্রাট মক্কুকাস বলেন ঃ তিনি (মুহাম্মদ সঃ) নিশ্চয় সেই পয়গম্বর যার আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যৎ বানী করেছিলেন।

৭। খ্রীষ্টান সন্যাসি বাহিরা বলেন- "এইতো সেই বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শক, এই তো সেই (যীশুর প্রতিশ্রুর্ত শান্তি দাতা আল্লাহ একেই তো সকল জগতের আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

৮। হিন্দুদের বিশিষ্ট ধর্ম গ্রন্থ বেদ পুরানে আল্লাহ রাসুল মুহাম্মদ শব্দ পাওয়া যায়। যেমন-

"হবয়ামি মিলং কবর ইল্লালাং
আল্লাহ রাসুল মুহাম্মদরকং
বরস্য আল্লো আল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লো ইত্যাদি ইত্যাদি।

৯। আলফ্রেড দে লামর্টিন বলেন - দার্শনিক বক্তা ধর্ম প্রচারক যোদ্ধা আইন, রচয়িতা, ভাবের বিজয় কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন কর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহাম্মদ (সাঃ) কে। মানুষের মহত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে, তা দিয়ে মাপলে কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্বের হতে পারবে না।

www.pathagar.com

১০। ডঃ মরিচ বুকাইলি বলেন, মানব সভ্যতা যখন আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি, আল্লাহ তখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে প্রেরন করেন, মানবতার পূর্ন জাগরণের জন্যে। এক কথায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেরন বিপ্লব মানব জাতির শাশ্বত পথ নির্দেশ বা হেদায়েতের উৎস।

History of western philosophy' গ্রন্থে বারট্রার রাসেল বলেন– "পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলেই আমরা ৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে থাকি। অথচ এই সময়েই ভারত হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী সর্ভ্যতার বিকাশ ঘটে।"

জন অস্টিন তাঁর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ 'Mohammad the prophet of Allah' এ বলেন–"একবছরের কিছু বেশী সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার শাসনদন্ড পরিচালনা করেছিলেন যা সমগ্র পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল মহা আলোড়ন।"

ঐতিহাসিক গিবনের মতে, "মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, মনুষ্য সমাজে যার প্রভাব হয়েছিল স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সুবিজ্ঞ লেখকের মতে, "পৃথিবীর ধর্ম নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। টমাস কার্লাইন তার হিরোয এন্ড ওয়ার্শিপ গ্রন্থে বলেন, "সত্য ও বিশ্বস্ততার এক মানুষ, যা করতেন যা ভাবতেন তাতে বিশ্বাসী এক মানুষ। কথায় মৌন স্বভাবের একটি মানুষ কিছু বলার মত না থাকলে নীরব, কিন্তু যখন প্রাসঙ্গিক, বিজ্ঞ ও অকপট; সর্বদাই বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাতে অভ্যস্ত । চিন্তাশীল অকপট একটি চরিত্র তবুও অমায়িক সহৃদয় ও সামাজিক । তিনি ছিলেন মানুষের মধ্য থেকে এক মানুষ।"

এন আউট লাইন অব দ্য হিস্ট্রি গ্রন্থে এইচ. জি. ওয়েলস বলেন; "মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামধর্মের প্রবর্তক। ইসলাম সৃষ্টি করল এমন এক সমাজ, এর আগে দুনিয়ার অস্তিত্ববান যে কোন সমাজের তুলনায় যা ছিল ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্ত।

প্যারাডাইস লস্টের কবি জন মিল্টন বলেন, "মুহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভূত হলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিত করলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও মিসরের অনেকাংশ থেকে সর্বাংশে যারা আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহর ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত প্র[illegible] মনের উপর মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্মমুক্তির সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যা[illegible] অতীতে যে অন্যান্য সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থায়ও সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে

www.pathagar.com

স্থাপন করার অভিজ্ঞতা লাভে ইসলাম যদিও যথেষ্ট প্রাচীন, তবুও তার অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে এনেছে এবং কোন দৃষ্টিগোচর মূর্তি দ্বারা উপাস্যের জ্ঞানালোকিত ভাব রূপকে কখন কলঙ্কিত না করেই তারা গোড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকেছে। আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ (সাঃ) হল ইসলামীত্বের সহজ ও অপরিবর্তনীয় ঘোষণা।"

টর আঁদ্রো 'Mohammad' নামক গ্রন্থে বলেন, "আমরা যদি হযরত মুহাম্মদের প্রতি সুবিচার করি, তাহলে একথা আমাদের ভোলা উচিত নয় যে আমরা খ্রীষ্টানরা সজ্ঞানভাবে অথবা অবচেতনভাবে স্বীকার করি, বাইবেলের স্বর্গীয় বাণীতে আমরা যে অদ্বিতীয় ও সুউচ্চ চরিত্রের দর্শন পাই, মুহাম্মদ সেই ধরনের চরিত্র।

Comparative Religion নামক গ্রন্থে এস. সি বুকেট বলেন, "মুহাম্মদ রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ছিল বিলীয়মান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক, প্রান-প্রদীপ্ত ও উদ্যমশীল। অলৌকিকতা প্রদর্শনের সকল দাবীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে চলতেন। তিনি সরল ও অনাস্ব ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন, কিন্তু তাই বলে সন্ন্যাসব্রতী তার ছিল না।"

'An Apology for Mohammad and the Koran' গ্রন্থে জন ডেভেনপোর্ট বলেন, "ইসলামের প্রথম অনুসারীরা ছিলেন মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার নিকট আত্মীয় । নবীর সত্যতার এটা একটি শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ তারা ব্যক্তি মুহাম্মদ ও নবী মুহাম্মদকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। নবুওতের দাবি যদি তাঁর মিথ্যা হত, তাহলে এর কৃত্রিমতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দৃষ্টি এড়াতো না।

'The Salancens' গ্রন্থে আর্থার গিলম্যান বলেন, "মক্কা বিজয় মুহাম্মদের প্রশংসনীয় চরিত্রের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। মক্কাবাসীদের অতীত দূর্ব্যবহার তাকে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত করা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীকে সকল রক্তপাত থেকে বিরত রাখেন। মহাবিজয়রূপে দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বিনম্র মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাত্র দশ অথবা বার ব্যক্তিকে তাদের অতীতের জঘন্য অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান করা হয়। চারজনকে মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় এটা একান্ত মানবিক। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকারকালে খ্রীষ্টান ক্রুসেডাররা ৭০ হাজার মুসলিম নারী, শিশু ও অসহায়দের নির্মমভাবে হত্যা করে।

www.pathagar.com

ফরাসী ঐতিহাসিক হোমরাটিন এর মতে, "দার্শনিক বাগ্মী ধর্মপ্রবর্তক, আইন প্রণেতা, সেনানায়ক ধর্মমতের প্রবর্তক, কুড়িটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই মুহাম্মদ (সাঃ)। মানুষের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করার জন্য যতগুলো মাপকাঠি রয়েছে আমরা জিজ্ঞেস করি, সে গুলো দিয়েও যাচাই করলে তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর আছে কি?

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অটো বায়োগ্রাফীতে উল্লেখ রয়েছে, "আমি প্রশংসা করি স্রষ্টার এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে পবিত্র নবী, কুরআন মজীদের প্রতি। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানেরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল। মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা অনেক আত্মাকে। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এক মহান ব্যক্তি।

রাশিয়ার প্রখ্যাত লেখক ও ঔপন্যাসিক ঠলস্টয় সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত এবং আজও সমাদৃত হয়ে আছেন। শেষ জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মূল্যবান বাণী আমূল পরিবর্তন এসেছিলো তার মনেপ্রাণে। বর্তমানে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নামের কলংক যখন মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করেন, তখন স্বভাবতই তাদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, কেমন বুদ্ধি নিয়ে মানুষকে প্রতারনা করতে চাও? বিশ্বের সেরা মনীষীদের সজ্ঞান উপলব্ধিতে আমরাও মুাহম্মদ (সাঃ) কে আদর্শ মহামানব হিসেবে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হই। তাহলে মহানবী (সাঃ) এর সীরাত নিয়ে আমাদের ভাবনা স্বার্থকতা লাভ করবে। এ ব্যাপারে টলস্টয়ের বক্তব্য উল্লেখ্য, "আমি মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তার আবির্ভাবের পূর্বে ভ্রান্তির আঁধারে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি সে আধারে আলো হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর তাবলীগ ও হেদায়েত যথার্থ ছিল।

রাশিয়ার এই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের মৃত্যুর পর পকেটে পাওয়া গিয়েছিলো প্রিয় নবী(সঃ) মহানবী এর বাণী সমূহের অনুবাদ- সেইংস অব মুহাম্মদ । এই বইখানির সংকলক স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের অনেক আগেই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করে ছিলেন। মহানবী (সাঃ) বলেন- আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম আমার নুরকে সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবীর জাবুর, ইঞ্জিল, বেদ, পুরানে, জিন্দাবেস্তা, দিঘানিকায়া, বাইবেল ইত্যাদি সকল পুস্তকেই মুহাম্মদ (সাঃ) আগমনের ভবিষ্যৎ বানী করেছেন। আমরা এমন নবীর উম্মত হওয়ার গর্ববোধ করি, যিনি সৃষ্টির দিক থেকে সর্ব প্রথম, আবার সকলের শ্রেষ্ঠ, যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হত না। আমরা তাঁর সঠিক উম্মত হতে পারি। এই কামনাই আমরা করা উচিত।

www.pathagar.com

হাদীসে রসুল ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মুহীউদ্দীন খান

রসুলে খোদার (দঃ) উপদেশমূলক বাণী; ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশ ও নিষেধাবলীর ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং অপরের যে সমস্ত কাজ তিনি সমর্থন বা অনুমোদন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই হাদীস বা সুন্নাহ।

ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি হিসাবে কোরআনের পরই হাদীসের স্থান। শরীয়ত-বেত্তাগণ হাদীসকে কোরআনের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা হিসাবেও গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীস-বেত্তাগণের মতে কোরআন মূল শব্দ সম্ভারসহ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ আর হাদীসের মূল বক্তব্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রাসুলের (দঃ) অন্তর মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দাবির প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা কোরআনের এই দুইটি আয়াত পেশ করেনঃ

১। "ইনি নিজের খেয়াল-খুশীমত তোমাদের নিকট কোন কথা বলেন, না। বরং এই সব কথা তাঁহার অহীর মারফত জানাইয়া দেওয়া হয়।"

২। আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি 'কিতাব' ও 'হেকমত' নাজিল করিয়াছেন।

এই আয়াতে 'কিতাব ' অর্থে কোরআন বুঝানো হইয়াছে, আর 'হেকমত' শব্দ দ্বারা হাদীস বা সুন্নাহর মূল ইশারাকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

নবুওত প্রাপ্তির পর হইতে রসূল জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হইত। এই জন্য তাঁহার গোটা জীবনকেই কোরআনের মূর্তিমান রূপায়ণ বলা হইয়া থাকে। এক কথায় কোরআনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আদেশ-নিষেধকে জীবন্তরূপে তুলিয়া ধরিলে যে আকৃতি দাঁড়াইত, রসূলে খোদার গোটা জীবন তাহাই। হযরত আয়েশার নিকট জনৈক 'তাবেয়ী' রসূল চরিত্র সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি কোরআন পাঠ কর না? তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল কোরআন।" সুতরাং রসূলে-খোদার গোটা জীবনটাই আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং সেই জীবনের গোটা ছবিটাই বিধৃত হইয়াছে হাদীসের মধ্যে।

সুন্নাহ্ ও শরীয়ত বা ইসলামী জীবন-সংহিতার মুল ভিত্তি এই সম্পর্কে প্রমাণ হিসাবে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি উপস্থিত করা যাইতে পারে-

১। " আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদিগকে যাহা কিছু করিতে বলেন তাহা পালন কর আর যে সব কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলেন তাহা হইতে বিরত থাক।"

২। রসুলের জীবনে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ বিদ্যমান।

www.pathagar.com

৩। তাদেরকে বল– যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে চাও তবে– আমার অনুসরণ কর।

কোরআনে রসূলের হাদীসকে 'হেকমত" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ একটা জাতি হিসাবে গড়িয়া ওঠার পথে ইসলামের অনুসারিগণ প্রজ্ঞা ও প্রেরণার মূল উৎস হিসাবে হাদীস হইতে যতটুকু প্রাণরসের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহা সত্যই অতুলনীয়। রসূলে খোদা মদীনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মস্‌জিদটি ছিল একাধারে রসূলে খোদার দরবার-গৃহ এবাদত-গাহ্‌ এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সবকিছুই। প্রতিদিন ফরজ-বাদ তিনি মস্‌জিদে বসিয়াই সাহাবীগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দান করিতেন, নানা সমস্যার সমাধান ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। তা'ছাড়া সাপ্তাহিক জুমা, বৎসরের দুই ঈদ এবং অন্যান্য নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দিতেন। এইসব উপদেশ, আলোচনা ও বক্তৃতাবলীই পরে হাদীস হিসাবে সংগৃহীত ও সংকলিত হইয়াছে।

মস্‌জিদে নববীর এই শিক্ষায়তনে বিপুলসংখ্যক সাহাবী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষা যে কত সার্থক ছিল, পরবর্তীকালে,রসূলে খোদার এক এক জন সাহাবীর যোগ্যতা সম্পর্কে চিন্তা করিলে তাহা অনুধাবন করা যাইবে। বস্তুতঃ মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে একটি মস্‌জিদের আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করিয়া কয়েক সহস্র নিরক্ষর লোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, শাসক রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক, বক্তা, গণ-শিক্ষাব্রতী, প্রচারক প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের অধিকারী হওয়ার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। বলা বাহুল্য যে, এই সাহাবীদের একমাত্র আলোচ্য ও পাঠ্য বিষয় ছিল কোরআন ও রসূলের সুন্নাহ। সুন্নাহর এই যুগান্তকারী প্রভাবের ফলেই বিষয়টি মুসলিম জাতির এত যত্ন ও মনোয়োগে আকর্ষণ করিতে সামর্থ হইয়াছিল।

রসূলে খোদার (দঃ) মাহফিলে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া প্রত্যেক সাহাবীর রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একদল সর্বত্যাগী সাহাবী ঘর-সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বক্ষণের জন্য মস্‌জিদে-নববীর স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারাই মস্‌জিদ-সংলগ্ন একটি কুটীরে অবস্থান করিতেন। ইহাদের পরিচয় ছিল "আস্‌হাবে সুফ্‌ফা" বা কুটীরবাসী। হাদীস-চর্চার ক্ষেত্রে ইঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সাধনা করিয়াছিলেন। তাছাড়া রসূলে খোদার সহ ধর্মিণীগণ জীবনের একান্ত গোপনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে রসুলের আদর্শ ও নীতি এবং দৈনন্দিন অভ্যাস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হইয়াছিলেন। ব্যবহারিক জীবনের এই

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ দিকটির খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাহারাই উম্মতকে অবহিত করিয়াছেন। হযরত আয়েশা, হযরত উম্মে-সাল্‌মা প্রমুখ রসুলে খোদার সহধর্মিণীগণ বিপুল-সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রসূলে খোদার জীবনকালেও মুসলিম রমণীগণ যে কোন বিষয়ে অবগত হইবার জন্য হযরত আয়েশা প্রমূখের শরনাপন্ন হইতেন। হযরত আয়েশা রসূলে -খোদার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া ইঁহাদিগকে জানাইতেন। রসূলের তিরোধানের পর মুসলিম মহিলাগণ 'মা' আয়েশা প্রমূখের নিকট হইতে সকল সমস্যাকে সমাধান করিয়া লইতে আসিতেন। এইভাবে হযরতর আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২২১০। 'মাস্‌নাদে-আহ্‌মদ' নামক হাদীস-গ্রন্থে ২৩৫৩ পৃষ্ঠাব্যাপী হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তা ছাড়া উম্মুল-মোমেনীনগণের মধ্যে হযরত উম্মে সাল্‌মা ৩৭৮ টি, হযরত হাফসা ৬০ টি ও হযরত মায়মুনা ৪৬টি এবং হযরত উম্মে হাবীবা ৬৫ টি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

মদীনার জিন্দেগীর সূচনা হইতে শেষ বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত মহানবী একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে কাজ করিয়াছেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা, রাজস্ব আদায়, শান্তিরক্ষা, সর্বপ্রকার মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক রক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ফরমান ও নির্দেশাদি জারী করিতে হইত। মুসলিম সাধারণ ঐসব কিছুই অতি যত্নের সাথে সঙ্গে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধচুক্তি, সন্ধিপত্র, সরকারী ফরমান ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবেই রক্ষিত হইয়াছিল। এই গুলির প্রায় সমাপ্ত লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ উপদেশ ও আদেশ নিষেধমুলক হাদীসগুলি আস্‌হাবে সোফ্‌ফা ও অন্যান্য জ্ঞান-সাধক সাহাবীগণ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। এইরূপে হযরত আবু হোরাইরা ৫৩৭৪টি, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ১৬৩০টি, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ২৬৬০টি, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী ১৫৪০টি, হযরত আনাস ইবনে মালেক ১৬৮৬ টি, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী আন্‌সারী ১১৭০টি, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ৮৪৮টি, হযরত আলী ৫৮৬টি, হযরত ওমর ফারুক ৫৩৯টি, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস ৭০০টি, হযরত আবু মুসা আল্ আশআরী ৩৬০টি, হযরত আবুজর গেফারী ২৮১টি এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্‌কাস ২১৫টি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এছাড়া আরও অন্ততঃ ষাট জন সাহাবীর নাম করা যায়, যাঁহারা প্রত্যেকে শতাধিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এইভাবে সর্বমোট হাদীস বণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা কয়েক শত হইবে। ইঁহারা প্রত্যেকেই রসূলে-খোদার নিকট হইতে হাদীস শ্রবন করিয়া অপরকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ রসূলে-খোদার নির্দেশ ছিল. "আমার নিকট হইতে তোমরা একটি কথা

শিখিয়া থাকিলেও তাহা অপরের কানে পৌঁছাইয়া দাও।" এইজন্য হাদীস রেওয়ায়েত করাটা তাঁহারা ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

রসূলে-খোদার জীবদ্দশায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেন। কারণ, তাঁহার জীবন শেষ সময় পর্যন্ত কোরআন নাজিল হওয়ার ধারা বিদ্যমান ছিল। কোরআন নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই জন্য একদল হাফেজ-সাহাবী মোতায়েন ছিলেন। প্রধানতঃ এই সমস্ত সাহাবীকেই তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, তাহার ফলে কোরআনের বাণীর সহিত হাদীসের বক্তব্য একত্রিত হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। অবশ্য কোরআন লিপিবদ্ধকারী সাহাবী ব্যতীত অন্যদেরকে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইয়ামান হইতে আগত জনৈক সাহাবীকে তিনি বিদায় হজের বাণীটি পুরাপুরিভাবে লিখিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আলীও কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। সাহাবীগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এই সকল পান্ডুলিপিকে বলা হইত 'সাদেকা'। পরে যখন হাদীস সংকলন করার প্রয়োজন হয়, তখন লিখিত দলিল-দস্তাবেজ ও 'সাদেকা' গুলিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

রসূলে খোদার ইন্তিকালের পর মুসলমানদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। শাসনকার্য, বিচার বিভাগ, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি সর্ব-বিষয়ে প্রতিটি বিতর্ক মূলক ব্যাপারে হাদীসের বরাত উপস্থিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই জন্যই খোলাফায়ে রাশেদীন এক দল পণ্ডিত ও সাধক সাহাবীকে হাদীস বর্ণনা, ফত্ওয়া দান এবং ইসলামী শরীয়তের ব্যাখ্যাত্রা হিসাবে নিযুক্ত করেন। আরবের সাধারণ স্মরণশক্তির বলে এবং অধিক অনুশীলনের বলে এই সমস্ত সাহাবী হাদীসের এক বিরাট ভাণ্ডার কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। অধিকন্তু হাদীসজ্ঞানের মাপকাঠিতেই সাহাবীগণকে এই কার্যের জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল। হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, হযরত আয়েশা, হযরত আবু হোরাইয়া, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সাহাবীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ইহাদের সাগরেদদের দ্বারাই পরবর্তীযুগে হাদীসের চর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হিজরী প্রথম শতক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাদীস চর্চা মুখে মুখে এবং দলিল দস্তাবেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাহাবীগণ এবং প্রথম যুগের তাবেয়ীগণ হাদীসকে জীবনের প্রতি স্তরে এমনভাবে জড়িত করিয়া লইয়াছিলেন যে, হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু হিজরী

www.pathagar.com

প্রথম শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণ এবং প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ীগণ প্রায় সকলেই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহন করেন। এই সময় মুসলিম বিশ্বের আয়তনও এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাদীস সংকলিত অবস্থায় সংরক্ষিত করা না গেলে নানা বিভ্রাট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সাধক-শ্রেষ্ঠ হযরত ওমর ইবন আবদুল আজিজ তখন মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই তিনি দেশের প্রতিটি কেন্দ্রে এই মর্মে নির্দেশ জারী করেন যে, সকল এলাকা হইতেই যেন রসূলে খোদার হাদীস সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। এই নির্দেশ অনুসারেই ইমাম আবু বকর ইবনে হাযাম এবং ইমাম জুহ্‌রী হাদীস সংগ্রহ করার কাজ আরম্ভ করেন। ইমাম জুহ্‌রী মদীনায় বসিয়া কাজ আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম 'সাদেকা'গুলি সরকারী দলিল দস্তাবেজ ও সাহবীগণের লিখিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করা হয়। তৎপর তিনি মদীনায় ঘরে ঘরে যাইয়া এক একটি হাদীসের পুর্নাঙ্গ সংগ্রহ লিপিব্ধ করিয়া ফেলেন। মক্কায় ইমাম ইবনে জুরাইহ্, সিরিয়ার ইমাম আওজায়ী, কুফায় সুফিয়ান সাওরী, বসরায় রবী ইবনে সাবীহ্ ও হাম্মাদ ইবনে সালমা, ওয়াসেতে ইমাম হোমাইন, ইয়ামেনে ইমাম মা'মার, খোরাসানে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকএবং রায়-এ জুবাইর ইবনে আবদুল হামীদ হাদীস সংগ্রহের কাজ করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম মালেক মদীনায় মাকহুল, হেশাম ইব্‌নে উরওয়াহ্, আবুমা'শার সুলাইমান ইবনে বেলাল, আদুর রাহমান ইবনে মাহ্‌দী, ছুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ আরও অতিপয় মনীষী নানান স্থান ভ্রমণ করিয়া হাদীস সংগ্রহ করিতে শুরু করেন।

এই বিরাট সংগ্রহ হইতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সর্বপ্রথম-স্বীকৃত হাদীসগুলির সংকলন প্রকাশ করেন মদীনার ইমাম মালেক। তাঁহার এই সংগ্রহ পুস্তকের নাম 'মোয়াত্তা'। 'মোয়াত্তা' শব্দের অর্থ সকলের সম্মতি প্রাপ্ত। 'মোয়াত্তা' ছাড়া অন্যান্য যাঁহারা হাদীস-সংগ্রহের কাজ করেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই এক একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে আবু ইউসুফের 'কিতাবুল আ'সার' ও 'কিতাবুল খেরাজ', ইমাম মোহাম্মদের 'কিতাবুল হজ্জ' ও 'কিতাবুল আসার' ইমাম মায়ানী ইবনে ইমরানের 'কিতাবুস সুনান' ও 'কিতাবুজ জুহ্‌দ'এবং ইমাম ওয়ালীদ ইবনে মোসলেমের কিতাব সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'মাসনাদে ইমাম আহ্‌মদও এই যুগেরই আর একটি বিখ্যাত সংকলন।

পরবর্তী যুগের বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী, এই ছয়টি সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ উল্লিখিত সংগ্রহগুলি হইতেই প্রস্তুত করা হইয়াছে । হাদীসের এই ছয়টি কিতাবই বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। একত্রে এইগুলিকে 'সেহাহ সিত্তা' বলা হয়। এই যুগে হাদীসের আরও অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

সত্যের সাধনায় নবী মোস্তফা

আবদুল্লাহ্ সাঈদ

যে সময় রাসূলে করীম জন্মগ্রহন করেন তখন আরবের অবস্থা ছিল আশাতীতরূপে শোচনীয়। অত্যাচার,অনাচার, ব্যভিচার, ইত্যাকার জঘন্য প্রকৃতির স্বভাব সমাজ-জীবনে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, সে সবের নিষ্পেশনে মনুষত্ব পর্যন্ত হাঁপায়ে উঠেছিল এবং এ কারণেই সে যুগকে 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' বা 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু অন্ধকারের পরেও যেমন আলো আছে-এই চিরন্তন সত্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটলো আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে। মধ্যাহ্ন-সুর্যের প্রদীপ্ত ভাস্বর নিয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন নবী করীম (সাঃ)। মুহূর্তের মধ্যে যেন সমস্ত অন্ধকারের জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হলো স্বর্গীয় জ্যেতির অপূর্ব বিকাশ। সমগ্র সৃষ্টি অন্ধকার থেকে আলোকে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সেখানে ছিল অশান্তির দাবানল সেখানে প্রবাহিত হতে থাকলো শান্তির স্রোতধারা এবং দেখতে দেখতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তৃত হলো সেই শান্তির অমিয়ধারা। সারা বিশ্ব আজ ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত।

কি ভাবে এরূপ সম্ভব হলো? রাসূলে করীমের মধ্যে ছিল তিনটি বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমন্বয়। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক, সুন্দরের পূজারী এবং মঙ্গলের আধার। সত্যের সন্ধান ছিল তাঁর জীবনের ব্রত এবং 'সত্য'ই তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল (বালাগাল ওলা) যে, তিনি আপামর জনসাধারনের নিকট 'আল-আমিন' নামে পরিচিত ছিলেন। সত্যের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং মহান আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন।। " অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাঁকে (মুহম্মদকে) শিক্ষা দিয়েছেন। (৫৩ঃ৫)।" এই শিক্ষা তাঁর কর্মময় জীবনে এমনি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি এক মুহুর্তের জন্যও সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। এমনকি জীবনের বিনিময়েও না। তাঁর জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছে বিরুদ্ধাচরণ। কতবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উদাহরণ স্বরূপ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের পথে অবিচল, অনড় এবং এ কারণে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন জীবনের সকল কাজে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ ' তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ) কখনো ভূল করেন না, বা কখনো অকৃতকার্য হন না (৫৩ ঃ ২)।' যাহোক এ সত্যই তাঁকে পরিপূর্ণ আদর্শ মানব বা মানবশ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মখলুকাত) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

www.pathagar.com

রাসূলে করীম যে সুন্দর ছিলেন তার প্রমান বিধৃত হয়ে আছে তাঁর কর্মময় জীবনের সর্বত্র। যা সত্য তাই চির সুন্দর। সত্যের মোড়কে তাঁর সমগ্র জীবন আচ্ছাদিত বলেই তিনি সুন্দর এবং এ কারণেই সুন্দরের উপাসক। ক্ষমায়, ন্যায় বিচারে, বদান্যতায়, সততায়, সেবায়, সাহায্যে, সাহনুভূতিতে , স্ববলম্বনে এবং নির্ভীকতায় তিনি ছিলেন ভারী সুন্দর এবং এই সব গুণ সত্যিই মহান সৌন্দর্যেরই পরিচয় বহন করে। আর এসব কারণই মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে 'ওসওয়াতুন হাসনা' বা সুন্দরের শ্রেষ্ঠ আদর্শবলে অভিহিত করেছেন। রাসুলুল্লাহ যে কত সুন্দর ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হবে আশা করি ঃ

"দান কয়রাত হযরতের জীবনের আর এক বৈশিষ্ট্য। দুঃস্থ নিপীড়িত মানবের সাহায্যকল্পে সতত তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। জীবনে কোন দিন কোন লোক হযরতের নিকট কোন কিছু চাহিয়া বিমুখ হয় নাই। ---- বিবি খাদিজার অগাধ ধনসম্পদ ছিল। খাদিজার সহিত বিবাহের পর তিনি সেই সম্পদের প্রকৃতি অধিকারী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধলব্ধ ধনরত্নের তিনি এক পঞ্চমাংশের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এত ধন দৌলতের অধিকারী হইয়াও মহাপুরুষ ছিলেন একেবারে নিরাসক্ত। তাঁর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না; সমস্ত বিলাইয়া দিয়া দরদী নবী কোন দিন অনাহারে পেটে পাথর বাঁধিয়া, কোনদিন বা দুইটি খোর্মা খাইয়া জীবন যাপণ করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পরম সুখে ভোগ বিলাসের মধ্যে বসিয়া দিন কাটাতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। প্রচুর অর্থ তাঁহার হাতে আসিয়াছে বটে কিন্তু তিন দিনের বেশী অর্থ গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই। একবার শিষ্য-বৃন্দের সহিত নামায পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া গৃহে গমন করেন, ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া গিয়া নামাযে যোগ দেন। শিষ্যবৃন্দ অবাক হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন; কতিপয় দিনার গতকল্য হইতে এখনও আমার বিছানায় পড়িয়া আছে, তাহা আজও বিতরণ করা হয় নাই। নামায পড়িতে পড়িতে সেই কথা মনে পড়ায় আমি উঠিয়া যাই; দিনারগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম"।

এইভাবে সারাটি জীবন ধরিয়াই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। এমন কি মৃত্যু-শয্যায় থাকিয়াও তিনি দান করিতে ভুলেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব দিন তিনি বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেন; তোমার কাছে যে দিনারগুলি রাখিতে দিয়াছিলাম সেগুলি কোথায়?'আয়েশা উত্তর দিলেন আমার কাছেই আছে।' হযরত বলিলেন, ' সেগুলো শীঘ্রই দান করিয়া দাও।' বলিতে বলিতেই তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

পরে জ্ঞান হইলে আবার জিজ্ঞেস করিলেন 'দিনারগুলি দান করিয়াছ কি? আয়েশা বলিলেন; 'না এখনও করি নাই।' তখন হযরত সেগুলি আনিতে বলিলেন। আয়েশা তাহা আনিয়া হযরতের হাতে দিলেন। দেখা গেল ছয়টি দিনার। হযরত কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিলেন; 'এখন আমার শান্তি হইল। দিনারগুলি হাতে রাখিয়া আমার প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হইলে কি লজ্জার কথাই না হইত।' (গোলাম মোস্তফা ঃ বিশ্ব নবী ঃ পৃ ঃ ১৬৮-৬৯)

রসুলে করীম ছিলেন মঙ্গলের আধার এবং এ কারণেই তাঁকে বলা হতো 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বা সমগ্র বিশ্বের মুর্তিমান কল্যাণ ও আর্শীবাদ। তিনি আমাদের আর্শিবাদ স্বরূপ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তিনি যদি জন্ম গ্রহন না, করতেন তবে সমগ্র সৃষ্টিই ধ্বংসের মুখে চলে যেত। ধ্বংসের মুখ থেকে যিনি আমাদের রক্ষা করেছেন। তিনি কল্যাণ বা আর্শীবাদ ছাড়া আর কি? যা হোক্ একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই তাঁকে আদর্শ মানব রূপে গড়ে তুলেছে। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের যে দিকেই তাকাইনা কেন সর্বত্র চির অভ্রান্ত এবং চির নির্ভরযোগ্য সত্যের জ্যুতি বিচ্ছুরিত দেখতে পাই এবং এ কারণেই তিনি শুধু আরবের নন, সারা বিশ্বের এবং শুধু মুসলমানের নন সকল মানুষের নবী, -আদর্শ মানব এবং সত্যের পথপ্রদর্শক। পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে; 'হে রসূল নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরন করেছি সাক্ষী স্বরূপ, সংবাদদাতা-স্বরূপ' সতর্ককারী-স্বরূপ, আল্লাহর দিকে আহবানকারী-স্বরূপ এবং আলোক বিচ্ছুরণকারী সত্যের মশাল-স্বরূপ।" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

[মাসিক জাহানে নও এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

আখেরী নবীর (সঃ)-এর উল্লেখযোগ্য মর্যাদা

জি, এম, এ হামিদ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে রাহমাতুল্লিল আলামিন করে পৃথিবীতে প্রেরণ করছেন। তিনি (সঃ) ফরমান, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা আমার নুর (নূরে মুহাম্মদী)। তিনি আরও বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) পানি ও মাটির মধ্যে মিশ্রিত ছিলেন।

কিয়ামতের দিন হুজুর পাক (সঃ)-এর রওজা মুবারক সর্বপ্রথম খোলা হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথমে সুপারিশ করবেন। সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজাও খুলবেন তিনি এবং সর্বপ্রথম তিনিই বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

সর্বশেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)পৃথিবীতে প্রেরিত হন। তাই তাঁকে আখেরী নবীও বলা হয়েছে।

যার শুভাগমনে ধন্য হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। যাঁর নুর বা জ্যোতি, বিকিরণে উজালা হয়েছে সমগ্র বিশ্বভূবন। যিনি আগমন করেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসিম রহমতের জীবন্ত প্রতীক হয়ে। যিনি বহন করে এনেছেন বিশ্বমানবের জন্য চির শান্তি, চির নাজাতের পয়গাম। যার বদৌলতে বিশ্বজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। যাঁর সৌজন্যে মানবতার উচ্চ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাঁর পবিত্র বরকতে সমগ্র মানবজাতি লাভ করেছে সরল সঠিক পথ বা সিরাতুল মুস্তাকিম। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনিই সাইয়্যেদুল মুরসালিন, নবীগণের নেতা। তাঁর মর্যাদা বর্ণনাতীত, তাঁর শান ও মান কল্পনাতীত।

প্রিয় নবীজীর (সঃ) শানে আল্লাহ্পাক নিজেই কুরআন মজিদে-'উসওয়াতুন হাসানা' বা মানব চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বলে ঘোষনা করেছেন। যাঁকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া, মানুষ, জীব-জন্তু-প্রাণী কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না। যাঁর নামের অছিলায় হযরত আদম (আঃ) এর অপরাধ আল্লাহ মার্জনা করেন। যাঁর শ্রেষ্ঠত্বে অধিভুক্ত হয়ে হযরত ঈসা (আঃ)কে মর্যাদা দেয়া হয়েছে; বরং তার চেয়ে বাড়তি অনেক কিছুই দান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত নবীগণের ইন্তিকালের মাধ্যমে তাদের নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু রহমাতুল্লিল আলামিনের (সঃ) নবুওয়াত তাঁর ওফাতের পর শেষ হয়নি; বরং তিনি নবী ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। তার

www.pathagar.com

এজন্য সারা পৃথিবীতে দৈনিক পাঁচবার আযানের সময় "আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলল্লাহ্" উচ্চারণ করে তাঁর রিসালত ঘোষণা করা হয়।

অধ্যাপক হিট্টি এ সম্পর্কে লিখেছেন, পৃথিবীতে এমন কোন মুহূর্ত নেই, যখন কোথাও না কোথাও প্রিয় নবীর (সঃ) নাম মুবারক উচ্চ স্বরে উচ্চারিত হয় না এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর সুগন্ধ (সুনাম) ছড়ায় না। এভাবে আখেরী নবীর (সঃ) খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

আখেরী নবী (সঃ) নিজেই বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর একথা গর্ব করে বলছি না। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমার হাতেই থাকবে আল্লাহ্পাকের হামদের পতাকা, আদম এবং তার পর যত লোক এসেছে এবং আসবে, সবাই আমার পতাকা তলে আশ্রয় নিবে। এসবই প্রিয় নবীজীর শান ও মর্যাদা। আলকুরআনে ঘোষিত হয়েছে ,

"তিনি নিজের ইচ্ছায় কোন কথা বলেন না; যা কিছু বলেন, আল্লাহ পাকের ওহী (প্রত্যাদেশ) ব্যতিত আর কিছুই নয়।"

এর দ্বারা একথা প্রমানিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবীজীর (সঃ) সমস্ত কথার এবং কর্মের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যেমন হিজরতের রাতে প্রিয়নবী (সঃ) সূরা ইয়াসিনের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলওয়াত্ব করে বালির উপর ফুঁক দিয়ে শত্রু কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে তখন কাফিররা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর হযরত (সঃ) আল্লাহ্পাকের বিশেষ রহমতে নিরাপদে তাদের মধ্যে থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ্পাক অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ " হে রাসুল! আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন প্রকৃত পক্ষে আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ্পাকই করেছেন। "এমনকি আল্লাহ্পাকের পবিত্র কুরআনে একথা ঘোষণা এসেছে যে, প্রিয়নবীর (সঃ) অনুসরণ করাই আল্লাহ্পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নামান্তর। তাই এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করেছে সে যেন আমারই (আল্লাহ্পাকের) আনুগত্য প্রকাশ করেছে।"

বিশ্বনবী (সঃ) আর একটি শান হলো এই যে, আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যে কোন নবীকেই ডাক দিয়েছেন, তা তাঁর স্বীয় নাম ধরেই ডাক দিয়েছেন। যেমন ইয়া আদম, ইয়া ইব্রাহিম, ইয়া মুসা প্রভৃতি। কিন্তু বিশ্বনবী (সঃ) কে সমগ্র কুরআনের কোথাও তাঁর নাম ধরে যেমন ইয়া মুহাম্মদ, বলে ডাকা হয়নি। বরং ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু, "ইয়া আইয়্যুহার রসুল" বলে ডাকা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটিও তাঁর শান ও বিশেষ মর্যাদা। প্রিয়নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাকে পাঁচটি এমন জিনিষ

www.pathagar.com

দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি; আর এতে আমার কোনরূপ গর্ব নেই।

(১) আমি প্রেরিত হয়েছি (সাদা কালো) সকলের নিকট তথা সমগ্র মানব জাতির নিকট। আর অন্য সকল নবীগণ শুধু তাদের নিজ নিজ জাতি সমূহের নিকট প্রেরিত হয়েছেন।

(২) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যমীনের যে কোন অংশে উম্মতে মুহাম্মদিয়া নামাজ আদায় করতে পারে এবং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। অন্য কোন উম্মতের এ সুযোগ ছিলনা।

(৩) আমাকে সাহায্য করা হয়েছে দুশমনের অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে।

(৪) যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিলনা। এবং

(৫) শাফায়াতের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা আখেরী নবী (সঃ) কেউ একমাত্র 'হাবিবুল্লাহ'' (আল্লাহ্‌র প্রিয়) বলে আখ্যা দিয়েছেন। সর্বপরি প্রিয়নবী হযরত (সঃ) শবে মি'রাজে আল্লাহপাকের দিদার লাভে ধন্য হয়েছেন, যা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। শবে মিরাজে (রাতে) বায়তুল মুকাদ্দাসে নবী রাসুলগণের ইমামতি করেছেন-সাইয়্যেদিল মুরসালিন হযরত রসূলে করীমের (সঃ) শান প্রকাশিত হয়েছে এমন বহু ঘটনায়। এসব লিখে শেষ করা যাবেনা।

প্রিয়নবী (সঃ) তেইশ বছর নবুওয়াতের জীবনে পৃথিবী অগ্রসর হয় বিপুল শান্তি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। হিজরতের পর যে দশ বছর তিনি মদীনা শরীফে কাটান, তাতে তিনি কম বা বেশি এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁরা ইসলামের প্রয়গাম নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন। আর এ দশ বছরেই তিনি প্রায় আশিটি যুদ্ধ করেছেন-সারা বিশ্বে ইসলামের মর্মবাণী পৌছাতে। এ অল্প সময়ে তিনি ইতিহাসের সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানব জীবনে এনেছেন অভূতপূর্ব বিপ্লব। আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব তিনিই, তাঁর পবিত্র হাদিস সমূহ কণ্ঠস্থ করেছেন লক্ষ লক্ষ আলিম ও মুহাদ্দিসগন। তাঁর পবিত্র শ্রেষ্ঠ সুন্নত বা রাসুল্লাহর সত্য তরীকত সাধনা (ধ্যান, মুরাকাবা, জিকির ফিকির ও সালাম) আজও অব্যাহত রয়েছে। মুসলমানসহ ভিন্নধর্মী চিন্তাবিদরাও তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলে মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি The Hundreds গ্রন্থের রচয়িতা মাইকেল এইচ, হার্ট পৃথিবীর একশ'জন মনীষীর মধ্যে

www.pathagar.com

তাঁকেই (সঃ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রিয়নবীর (সঃ) পবিত্র নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি জর্জ বার্ণাড'শ বহু চিন্তার পর যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলেছেন, "আমার বিশ্বাস নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর মতো কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান বিশ্বের একনায়কের পদ গ্রহণ করতেন, তবে তিনি সমকালিন বিশ্বের সমস্যাবলীর এমন সমাধান দিতে পারতেন, যার ফলে সমগ্র বিশ্বে কাঙ্খিত শান্তি ও সুখ নেমে আসত। এসবই আখেরী নবীর (সঃ) শান বৈ কিছু নয়। তবে একথা চির সত্য যে, আল্লাহপাক হযরত নবী করীম (সঃ) কে যে শান ও মর্যাদা দান করেছেন, তা যেমন বর্ণনাতীত, তেমনি কল্পনাতীত। শুধু কবির ভাষায় এইটুকু বলা যেতে পারেঃ

"হে মোর সুন্দরতম! হে নব রতন! চাঁদের দিয়েছো জ্যোতি তোমারই আনন। অসম্ভব যথাযোগ্য প্রশংসা তোমার সংক্ষেপে, খোদার নিচে তোমারই আসন।" কি শ্বাশত বাণী আর আদেশ নামা ঃ "নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আমার ফেরেশতা মণ্ডলীসহ নবীপাকের (সঃ) উপর দরুদ (রহমত) সালাম পাঠ করি। অতএব, হে বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ সালাম প্রেরণ কর।"-আল-কুরআন।

সুতরাং বিশ্বনবী (সঃ) যে সত্যি সত্যি হাবিবুল্লাহ বা আল্লাহর প্রিয় নবী; একথা আল্লাহর স্বীয় বাণীতেই বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাঁর মর্যাদাও নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

[সীরাত স্মারক ২০০০-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন "নারীরা হচ্ছে পুরুষের জন্য পোষাক স্বরুপ আর পুরুষরা হচ্ছে নারীদের পোষাকস্বরূপ" এই আয়াত এমন একটি সময় অবতীর্ণ হয় যখন সারা পৃথিবী জাহেলিয়াতের আধারে আচ্ছন্ন পশুত্ব ও পাশবিকতার বেড়াজালে আক্রান্ত। পৃথিবীর অবস্থা ছিল মূমর্ষ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সকল অন্যায়, যুলুম, শোষণ, নারী, নির্যাতন ইত্যাদি নির্মূল করে শান্তি ভরা এক সমাজ কায়েম করলেন। সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারী জাতীকে মুক্তি দিলেন। বিষয়টির ভালভাবে আলোচনায় তুলে ধরতে তখনকার নারীদের অবস্থার চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

তখনকার নারীদের অবস্থা ঃ রাসুলের (সঃ) আগমনের সময় নারীদের মর্যাদা সাধারণ আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। এমনকি চতুষ্পদ প্রাণীর থেকেও ঘৃণা করা হত। তখন নারীরা পশুদের মত বেচাকেনা হত। বিয়ে সাদীতে তাদের মতামত গ্রহণ করা হত না। ধর্মে কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না। তাদের ইবাদত উপাসনা কিংবা বেহেস্তের জন্য যোগ্য মনে করা হত না।

নারীদের চেয়ে দুনিয়ার আর কোন নিকৃষ্ট বস্তু নেই-এই ছিল তাদের ধারণা। একই সাথে একজন পুরুষ অনেক স্ত্রী রাখতে পারত। আবার একজন নারীও অনেক পুরুষের শর্যা সঙ্গীনী হতে পারত। নারীদেরকে ভোগ বিলাসের বস্তু ছাড়া অন্য কিছু মনে করা হতনা।

রাসুল (সঃ) এই করুণ অবস্থা থেকে নারীকে উদ্ধার করে মায়ের আসনে বসালেন। স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদায় বসালেন।

জননী হিসেবে নারীর অধিকার ঃ নারীর অীধকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসুল (সঃ) বলেন , বেহেস্ত মায়ের পদতলে। সেবা যত্নের ব্যাপারে মায়ের অধিকারের কথা তিন বার বলা হয়েছে এবং পিতার অধিকারের কথা এক বার বলা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হুজুর (সঃ) কে বলেন আমার সবচাইতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে? তিনি বলেন 'তোমার মা' 'তোমার মা' 'তোমার মা' তার পর কে? তিনি বললেন তোমার বাবা। (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, তাহার নাসিকা ধুলায় মলিন হউক, তাহার নাসিকা ধুলায় মলিন হউক, তাহার নাসিকা ধূলায় মলিন হউক। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হল কে সে? হে আল্লাহর নবী! জবাবে তিনি

www.pathagar.com

বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা কোন একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ সে বেহেস্তে প্রবেশ করল না। (মুসলিম) পিতা, মাতার সাথে এমন ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে যে তাদের 'উহ' শব্দটি ব্যবহার করতে না হয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, যদি তারা বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে তাদের একজন অথবা উভয় জন, তাদের শানে বিরক্ত সূচক ধ্বনী উচ্চারন করোনা এবং ধমকদিয়ে কথা বলো না তাদের সাথে নরমভাবে কথা বলো। (বনী ইসরাইল-২৩)

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ঃ অবহেলিত নারী জাতীকে রাসুল (সঃ) অর্ধাঙ্গীনির মর্যাদায় আসীন করালেন। যেমন ঃ রাসুল (সঃ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।

স্ত্রীদের অংশ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নির্ধারিত করেছেন। যেই নারী সমাজে অবহেলিত ছিল যারা কোন পক্ষ থেকেই সম্পদের অংশীদার হত না, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা একজন হয় তাহলে সে অর্ধেক পাবে। এমনকি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার পরও স্ত্রীকে মাল প্রদান করার জন্য নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। কুরআনের ভাষায় তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হক রয়েছে স্বামীর কাছে, এটা মুত্তাকীনদের উপর হক।

রাসুল (সঃ) বলেন, "কিয়ামতের দিন স্বামীর ভাল-মন্দের ব্যাপারে স্বাক্ষী হিসাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হবে।" যার স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে ভাল বলে সাক্ষী প্রদান করবেন আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

শুধু মাত্র নির্দেশ প্রদান করেই রাসুল (সঃ) ক্ষান্ত হননি, নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনকি রাসুল (সঃ) যে কোন যুদ্ধে গমণ করতেন, তিনি কোন না কোন স্ত্রীকে সাথে নিতেন এবং স্ত্রীদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতেন।

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার ঃ

যেই সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা পাপ বলে মনে করা হত, কন্যা সন্তান হলে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, সেই সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসুল ঘোষণা করলেন। যার তিনটি কন্যা থাকবে, সে তাদের সুন্দর ভাবে লালন পালন করবে ও সৎ পাত্রস্থ করবে অবশ্যই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্য হাদিসে আছে, রাসুল (সঃ) বলেছেন, তারা আর আমি একই বেহেস্তে থাকব অথবা তাদের জন্য আমি সুপারিশ করব।

www.pathagar.com

কন্যা সন্তানের প্রতি চরম অবহেলার ব্যাপারে হুসিয়ারী ভাষায় আল্লাহ্ বলেন ঃ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা "সন্তান পরকালে আল্লাহর আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, কি অপরাধে তাকে প্রোথিত করা হলো।"

মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার ঃ

নারী মানুষ কিনা বা তার আত্মা আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল তখনকার যুগে। তাদের কে জড় পদার্থের মত মনে করা হত তাদের এ মতামতকে ভ্রান্ত ঘোষণা করার জন্য রাসুল (সঃ) বলেন, "নারী জাতিও পুরুষের ন্যায় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য্য অংশ। তারাও আল্লাহর সৃষ্টি। তাদেরকে অবহেলা করা চলবে না। এরপর রাসুল (সঃ) এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন, হে মানব সমাজ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদের একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন তাদের থেকে আরও অনেক মানব পুরুষ ও মহিলা সৃষ্টি হয়েছে।

হায়েজ অবস্থায় নারীর অধিকার ঃ ইহুদিদের প্রথা অনুযায়ী ঋতুবর্তী নারীকে ভিন্ন ঘরে থাকতে দেওয়া হতো। ভিন্ন গ্লাসে পানি পান করানো হতো। কেউই তার সাথেএকত্রে আহার ও উঠা বসা করতে পারতো না। এমনকি স্বামীও এক বিছানায় শয়ন করতে পারতোনা। হিন্দু সমাজের অবস্থা ও প্রায় তদ্রুপ। ঋতুবর্তী মহিলাকে সকাল বিকাল গোসল করতে হবে। অন্যথায় সে হাড়ি পাতিল থালা বাসন ইত্যাদি কোন কিছু স্পর্শ করতে পারবেনা। ঋতু অবস্থায় নারীকে অপবিত্র বলে মনে করা হত। কিন্তু খ্রীষ্টানদের প্রচলিত প্রথা ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঋতুবর্তী স্ত্রীর ব্যাপারে তার কোন কিছুর বাছ-বিচার গ্রাহ্য করে না। এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ হল- আল্লাহ বলেন, আপনাকে ঋতুবর্তী নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি বলুন! এটা মহিলাদের জন্য কষ্টকর অবস্থা, সুতরাং এই সময় যেন স্বামীগণ তাদের থেকে বিরত থাকে।

রাসুল (সঃ) ঋতুবর্তী অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে থাকতেন। যেমন হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) আমাকে হায়েজ অবস্থায় রীতিমত ইজার পরিধান করার আদেশ করতেন এবং আমার সাথে এক বিছানায় শুইতেন। তবে রাসুলে খোদা (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সংযমী বলে সীমা লংঘন না হওয়ার ব্যাপারে সর্তক করা হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ঃ

পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে। বেশী হউক আর কম হউক এ অংশ নির্ধারিত। (নিসা-৭)

নারীরা পাঁচ স্থান থেকে তার হক পায় (১) মা; (২) বাবা; (৩) ভাই; (৪) স্বামী; (৫) সন্তান।

www.pathagar.com

কোন পুরুষই নারীর অনুমতি ব্যতিত তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। পরিশেষে একথা আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি যে, ইসলাম নারীদেরকে যে কতটুকু অধিকার প্রদান করেছে অন্য কোন ধর্মে তা করেনি। আজ তথাকথিত নারী অধিকার বা আন্দোলন চলছে ইসলাম কে বাদ দিয়ে। একথা আদৌ ঠিক নয় যে ইসলাম নারীদের প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারনা নেই বিধায় তারা এমন কথা বলে। মূলত ঃ এসব বাজে কথার ছদ্মাবরণে নারী অধিকার নামে বেহায়াপনা নির্লজ্জতা দিয়ে সমাজকে অনৈসলামী ধারায় প্রবাহিত করতে চায়। কিন্তু নারীদের এটা অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলামের অনুশাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কোন অধিকার তাদেরকে সম্মানীত করবে না। বরং তাদের লাঞ্চনা অবমাননা আরও বাড়বে।

[সীরাত স্মারক ২০০০-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানে রাসুল (সাঃ)

মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম মিফতাহ্

কবির ভাষায় ঃ

"ভবিষ্যতের লক্ষ্য আশা মোদের মাঝে সন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।"

আজকের শিশু আগামী দিনের স্বপ্নিল সম্ভাবনা। শিশুর সুস্থ বিকাশের উপর নির্ভর করে একটি উন্নত জাতির গঠন। এ জন্যই শিশু জীবনের নিরাপত্তা ও তার সুস্থ বিকাশ অপরিহার্য।

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) রাহমাতুললিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন। তৎকালীন আরবের পারিপার্শ্বিকতার আলোকে তাঁর পূণ্যময় কর্ম আলোচনা করলে পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি শিশুদের ব্যাপারে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের শিশুদের অবস্থা ঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের সময়টি আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলে পরিচিত। গোটা সমাজ তখন পাপাচার, অনাচার, অবিচার, চরমভাবে নিমজ্জিত। সে সমাজে তারাই বেঁচে থাকতে পারত, যারা ক্ষমতাবান ও অর্থবিত্তের অধিকারী ছিল। শিশুরা যেহেতু জন্মের পর পরই অসহায় , তাই তাদের জীবনের সজীবতা মৃত্যু নির্ভর করে পিতা-মাতা ও সামাজিক আচরণের উপর। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের অত্যন্ত গ্লানিকর জীবন যাপন করতে হত। তাদের শুধু ভোগ্য পন্য হিসেবে ব্যবহার করা হত। এহেন অনাকাঙ্খিত , অনভিপ্রেত ও চরম দুঃসহ ভবিষ্যতের চেয়ে দুর্বল বাবা-মা তাদের কন্যা সন্তানকে আঁতুর ঘরেই জীবন্ত পুঁতে ফেলা অধিকতর ভাল মনে করত। তাই কন্যা সন্তানের জন্মের বার্তায় বাবা মায়ের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে আনতনা বরং তারা মুষড়ে পড়তো সন্তানের অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। কন্যা-সন্তানের জম্মে তারা উৎফুল্ল না হয়ে অজ্ঞাতসারে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এ কোন কাল্পনিক গল্প নয়। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবে এটাই ছিল বাস্তবতা। এতো গেল কন্যা সন্তানের কথা। অপরদিকে পুত্র -সন্তান এ বর্বরতার হাত থেকে বেঁচে যেতোনা। কন্যা-সন্তানেরা সুস্থ এবং সুষ্ঠ ভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ পেত না। তারা বেড়ে উঠত

www.pathagar.com

অনাদরে, অবহেলায়, অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, অবাঞ্চিত মানবরূপে। বিবাহ প্রথার যেহেতু কোন বালাই ছিলনা, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু তার বাবা মায়ের সোহাগ থেকে বঞ্চিত হত।

*** হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আদর্শ শিশুর পথিকৃৎ ঃ**

আরবের এহেন সমাজ কাঠামোতে ৫৭০ ঈসায়ী সালের ১২ই রবিউল আউয়াল , সোমবার রাত্রির শেষ প্রহরে পৃথিবীর জন্য নতুন প্রভাতের পয়গাম নিয়ে জন্ম নিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেয়া এই শিশু মহান রাব্বুল আলামীনের প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে লাগলেন। আরবের চরম বর্বর লোকেরা পর্যন্ত এই শিশুর বিশেষত্ব ও গুনাবলিতে মুগ্ধ হন। ইতিহাসে তারা এই প্রথম বারের মত কোন শিশুকে মন উজাড় করে সোহাগ করতে শিখলো।

*** শিশু হত্যা রোধ ও শিশু জীবনের নিরাপত্তা দান ঃ** আল্লাহর রাসুল (সাঃ) শিশুদের নিয়ে আরব সমাজের বীভৎস কার্যকলাপে স্থীর থাকতে পারলেন না , মানবতার নবী (সাঃ) আরব সমাজ থেকে শিশু হত্যা সম্পূর্ন বন্ধ করেন। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষনা করেন "সন্তান গর্ভপাত কারিনী ও জিবন্ত কবর দাতা উভয়েই জাহান্নামে যাবে।" অসভ্য ও বর্বর আরবজাতির সামনে তিনি আল্লাহর ফরমান পেশ করেন ঃ "এইরূপে তাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা তা করত না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও।" (সুরা আনআম-১৩৭)

"যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতার দরুণ নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে , আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং নিষিদ্ধ গন্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপদগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথগামীও ছিলনা" (সুরা আনআম-১৪০)

"বল, আস , তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই, তা এই-তোমরা তার কোন শরিক করিওনা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।" (সুরা আনআম-১৫০)

"তোমাদের সন্তানদের লালন পালনের ভয়ে হত্যা করোনা, তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ " (সুরা বনীইসরাইল-৩১)

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ) এভাবে আল্লাহর বাণী প্রচার করে শিশু জীবনের অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসেন। আরব সমাজ থেকে বহুল প্রচলিত শিশু হত্যার মত জঘন্য অপরাধের মূল্যোৎপাটন করেন।

আরব সমাজ থেকে শিশু হত্যার রোধ তথা শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী (সাঃ) শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

শিশু অধিকারে তাঁর অবদান ঃ

১। **শিশু পৃথিবীর সেরা সম্পদ ঃ** আরব সমাজে চরম অবহেলিত এবং নির্যাতিত শিশুদের তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেন। তাদের পৃথিবীর সেরা সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেন। কোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে-"ধনৈশ্বর্য এবং সন্তান সন্তুতি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।" (সুরা কাহাফ-৬)

২। **শিশু হচ্ছে সৌভাগ্য ও সুসংবাদ ঃ** কোরআন কারীমে শিশুদের সৌভাগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংবাদরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে "হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের যার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে আমি আর কাউকে এই নামধারী করিনি। (সুরা মারইয়াম ৭)

৩। **শিশুরা বেহেস্তের পতঙ্গ ঃ** রাসুল (সাঃ) আমাদের জন্য শিশুদের জগতকে চিহ্নিত করেছেন বেহেস্তের নিকটবর্তী একটি জগত হিসেবে। তিনি বলেন ,"শিশুরা হল বেহেস্তের পতঙ্গ (প্রজাপতি) তুল্য "।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন "শিশুরা হল স্বর্গের বিস্ময়, এরা এদের মাতাপিতার কাপড়ের আঁচল ধরে রাখবে যে ভাবে আমি তোমাদের বস্ত্রের আচঁল ধরে রেখেছি, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পিতামাতাসহ জান্নাতে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত তারা আর পৃথক হবে না।"

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেন "যখন কারো সন্তান মৃত্যু বরন করে তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের আত্মা কবজ করে নিলে? ফেরেশতারা বলে "জ্বি- হাঁ। আল্লাহ তায়ালা আবার জিজ্ঞোসা করেন, 'তোমরা কি তার কলিজার টুকরা কবজ করে নিলে"? ফেরেশতারা বলেন, জ্বি- হাঁ। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন আমার বান্দা কি বলেছে? ফেরেশতারা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে। এবার আল্লাহ তায়ালা বলেন আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর যার নাম হবে বায়তুল হামদ। (তিরমিযী) সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিশুরা কেবল বেহেশতী সওগাতই নয়, তাদের সম্মানে তাদের মা বাবাকে পর্যন্ত (বেহেশতের) সুংসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪। **শিশুরা চোখের প্রশান্তি ঃ** শিশুদেরকে বাবা মায়ের চোখের প্রশান্তি রূপে বিশেষায়িত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–" হে প্রভু ! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের আমাদের জন্য নয়ন জুড়ানো করে দিন, (সুরা আল ফোরকান– ৪৭)

৫। **শিশুদের মাধ্যমে আযাব থেকে রক্ষা ঃ** রসুল (সাঃ) এরশাদ করেন "দুগ্ধপায়ী শিশু, রুকুকারী (এবাদতে মাশগুল) বৃদ্ধ, বিচরনশীল পশু না থাকলে তোমাদের উপর মুষলধারে আযাবের ফেরেশতা নেমে আসত"।

উক্ত হাদিসে তিনি শিশুদের উপস্থিতিকে আল্লাহর আযাব প্রতিরোধের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পৃথিবীতে প্রথম বারের মত মানবমুক্তির দূত রাসুলে করীম (সাঃ) শিশুদের এহেন সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

৬। **প্রত্যেক শিশুরা ফেতরাতের উপর জন্ম ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসুল (সাঃ) এরশাদ করেন " প্রত্যেক শিশু ফেতরাতের উপর জন্মগ্রহন করেন। অতঃপর পিতামাতা তাকে হয়ত ইহুদি বানায়, নয়তো নাসারা কিংবা মাজুসী।" (বোখারী ও মুসলিম)।

ফেতরাত অর্থ সত্য গ্রহণের যোগ্যতা। প্রত্যেকটি শিশুকে এহেন গুণের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করে রাসুল (সাঃ) দুনিয়ার সকল শিশুর মর্যাদা সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শিশুদের অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে অধিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে রাসুল আকরাম (সাঃ) তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিত আলোচনা করা হল ।

ইসলাম সাম্যের ধর্ম, আর এ সাম্যের শিক্ষা ও চর্চা জীবনের ঊষালগ্নেই করা জরুরী। আল্লাহর হাবীব (সাঃ) কন্যা সন্তানদের মধ্যে সমতা আনয়ন করেন। হাদিসে বর্ণিত "এক ব্যক্তি তার দুই সন্তান থেকে একজনকে চুমো দিল এবং অপরজনকে চুমু দিলনা, রাসুল (সাঃ) বললেন , "তুমি উভয়ের মধ্যে সমতার বিধান করলেনা কেন?" ইসলাম কি চমৎকার সমতার বিধান করার নির্দেশ দেয়। এমনকি আদর স্নেহ এবং চুমোর ব্যাপারেও কন্যা সন্তানদের বিশেষ মর্যাদার আসন অধিষ্ঠিত করতঃ প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করেন,

✪ পর্দানশীল কন্যাগনই উত্তম সন্তান; ✪ তোমাদের সন্তানদের মধ্যে মেয়েরাই উত্তম ; ✪ কন্যা হল সুগন্ধি ফুল আর তার রিযিক তো আল্লাহর হাতে; ✪ যে ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তানের ভরণ পোষন করেছে তার জন্য বেহেস্তে নির্ধারিত হয়ে গেছে; ✪ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যার প্রথম সন্তান কন্যা ; ✪ কোন ব্যক্তি

www.pathagar.com

বাজারে গেলে, একটি উপহার কিনে তার নিজের সন্তানদের জন্য তা বহন করে নিয়ে এল। তার এ কাজ দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের জন্য দান খয়রাত বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত মর্যাদাপূর্ণ। ছেলে সন্তানদের পূর্বে মেয়ে সন্তানদেরকে উপহার দিবে।

*** শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি ঃ** সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠার জন্য শিশুর যথাযথ খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন। রাসুল করীম (সাঃ) খাদ্য ও পানাহার সংক্রান্ত বিধানমালা মানুষের সামনে পেশ করেছেন যার মাধ্যমে শিশুর সুস্থ শারিরীক বিকাশের নিশ্চয়তা রয়েছে।

*** মায়ের দুধ শিশু সুস্থতার গ্যারান্টি ঃ** বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শিশু জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে মায়ের দুধ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। তারা গবেষণা করে প্রমান করেছেন, "মায়ের দুধে শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য বিদ্যমান থাকে বিধায় ছয় মাস পর্যন্ত অন্য খাবারের প্রয়োজন নেই। মায়ের শাল দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের এসব তথ্য আবিষ্কারের পূর্বে রাসুল (সাঃ) জন্মের সাথে মায়ের শাল দুধ প্রাণ করার জন্য বলেছেন। শুধু তাই নয়, মায়ের দুধ শিশুদের জন্য আল্লাহর দেওয়া অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য আজ মায়েদের নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যধির সৃষ্টি হচ্ছে।

শিশু অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি ইসলাম যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মহানবী (সাঃ) শিশুদের জন্য যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা নিসন্দেহে অদ্বিতীয়।

[সীরাত স্মারক ২০০০-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

রাসুলের (সাঃ) বিপ্লবী দাওয়াত

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন

রাসূলের (সাঃ) বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমত আমাদেরকে দুটি শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। যার একটি হচ্ছে বিপ্লব আর অপরটি হলো দাওয়াত। প্রথমে বিপ্লব সম্পর্কে কিছুটা ধারনা দেয়া যাক।

বিপ্লব ঃ এটি একটি বহুল ব্যবহৃত বাংলা শব্দ। ইংরেজীতে এটাকে বলা হয় Revolution এ হিসাবে কোন বিপ্লবীকে বলা হয় Revolutionist বা Revolutionary. কিন্তু আরবীতে বিপ্লব শব্দের যথাথ প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন ইসলামী মনিষীগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে, বিপ্লবটাকে যদি আমরা আন্দোলন অর্থে গ্রহণ করি তবে এটিকে আরবীতে হরকত বলা যায়। হরকত শব্দের অর্থ নাড়া চাড়া, পরিবর্তিত হওয়া, ইত্যাদি। অপরদিকে আন্দোলন শব্দটি এসেছে দোলন থেকে। এর অর্থও হরকত বা তাহরীফ এর অনুরূপ। অতএব এদিক থেকে বিচার করলে বিপ্লবকে হরকতও বলা যায়। কিন্তু বিষয়টিকে যদি আমরা এ ভাবে চিন্তা করি যে, বিপ্লবটা আসলে দ্বীন কায়েমেরই সমার্থবোধক, তাহলে বিপ্লবকে ইকামতে দ্বীনও বলা যায়। আসলে সঠিক বিবেচনার কষ্টি পাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে বিপ্লবকে আমরা ইকামাতে দ্বীন বলাটাই শ্রেয় মনে করি। কেননা কুরআনুল কারীমের যত জায়গায় দ্বীন কায়েমের আন্দোলন বা বিপ্লবের কথা এসেছে তার প্রায় সব জায়গাতেই ইকামাতে দ্বীনের প্রয়োগ ঘটেছে। অবশ্য দ্বীন কায়েমের সংগ্রামকে কুরআনুল কারীমে কখনও কখনও জিহাদ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। বরং জিহাদ বা সার্বিক প্রচেষ্টা যে কোন বিপ্লবেরই পূর্ব শর্ত। সুতরাং ইসলামী বিপ্লবকে আমরা জিহাদ বলে সীমিত করাকে সমিচীন মনে করিনা। বরং বিপ্লবটা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের একটা সফল রূপ। অতএব আরবীতে এর স্বরূপ প্রকাশ করতে গেলে ইকামতে দ্বীন ছাড়া অন্য কোন শব্দের প্রয়োগ করলে তাতে ব্যাপক অর্থ বোধক বিপ্লব শব্দটির যথার্থ পরিধি ক্ষুন্ন করে।

দাওয়াত ঃ এটি একটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হল আহবান করা; ডাকা ইত্যাদি। কুরআনুল কারীমে এসেছে ' ডাকো তোমার রবের পথে, কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ফায়সালা কর।"

আলোচ্য আয়াত দাওয়াত দ্বারা ডাকা বা আহবান করা অর্থই প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে, শব্দগত অর্থে দাওয়াত শব্দটি দ্বারা যে কোন দিকেই আহবান করাই বুঝায়। চাই সেটা ভাল কাজের দিকে হোক অথবা মন্দকাজের দিকে হোক। এই অর্থে যেমনি ভাবে একজন নবী রাসুলকে দায়ী বলা যায়; দায়ী বলা যায় ইসলামী বিপ্লব প্রত্যাশী একজন কর্মীকে। ঠিক তেমনী ভাবে

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র বা ধর্ম নিরপেক্ষতার একনিষ্ঠ কোন সেবককেও দায়ী বলা যায়। কিন্তু ইসলামী জীবন দর্শনের পরিভাষায় যে কোন ধরনের আহ্‌বানকে কিছুতেই দাওয়াত বলা যায় না। শুধু তাই নয় ইসলামের পথে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে কেবল ডাকলেই সেটা যথার্থ অর্থে দাওয়াত নাও হতে পারে। বরং কুরআন হাদীস বিশ্লেষনের আলোকে , নবী রাসুল গণের বিপ্লবী জীবনাচারনকে সামনে রেখে এবং সেই সাথে বর্তমান সভ্যতা তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযোগী করে, সুষ্ঠু ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ইসলামের পথে আহ্‌বানকেই সঠিক অর্থে দাওয়াত ইলাল্লাহ বলা যায়। একজন দায়ী ইলাল্লাহ নিজেকে আল্লাহর সৈনিক মনে করবেন অথচ ইসলাম বিদ্বেষীরা তাকে দাওয়াত দিয়ে আদর আপ্যায়ন করবে, তাতো হতে পারেনা! ইসলামের একজন মর্দে মুজাহিদ তিনি যত বড় বুজর্গই হননা কেন তিনি ইসলাম প্রচার করছেন, ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য। বক্তব্য রাখছেন অথচ কোথাও হতে তিনি বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন না, তার চলার পথে কোন ঝুকি নেই, বিপদ নেই, সমাজের মূর্খ বখাটে ও সন্ত্রাসীরা দলে দলে তার মুরীদ হচ্ছে এমন বুজর্গের ভক্ত সংখ্যা কোটি কোটি হলেও তাকে যর্থার্থ অর্থে একজন দায়ী ইলাল্লাহ বলা যায়না। হতে পারে যে, উক্ত দাওয়াত দানকারীর আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু যোগ্যতা ও বিচক্ষনতার অভাব আছে বেশুমার। নইলে রাসুল যা পারেননি তিনি কি ভাবে তা করছেন। মূলত এ ধরণের অসতর্ক ও অবিবেচক দাওয়াত দানকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের বড় ধরণের ক্ষতির কারন হয়ে থাকে। এরা নিজকে একজন খাঁটি ইসলাম প্রচারক দাবী করা সত্ত্বেও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। ফতোয়াবাজীতে এরা বড়ই ওস্তাদ। আর ইসলামের ব্যাপক জ্ঞানের অভাবেই এদের পেছনে ছুটছে অগনিত মানুষ। যাদের সামনে উক্ত বুজর্গের আসল মুখোশ কখনও উন্মোচিত হয় না। সুতরাং ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতকে বুঝতে হলে কুরআন হাদীসের ব্যাপক জ্ঞানার্জন অতীব জরুরী।

আমরা সকলেই জানি, কুরআনুল কারীম কোন দল বা ব্যক্তির জন্য নাযিল হয়নি। এমনকি এটি শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পদও নয়। বরং পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এটি গাইড লাইন। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের একজন সৈনিক বলে দাবী করেন তার উচিত কুরআনে হাকীমের অনুসরণ করা।

আমাদের এ বসুন্ধরায় এ যাবৎকাল অনেক বিপ্লবীই জন্ম গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই সমাজ বিপ্লবের জন্য আমরণ সংগ্রাম করছেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার দোর গোড়ায় দাড়িয়ে আজ সকলকে একটি সত্য স্বীকার করতেই হবে, তাহলো যে সকল বিপ্লবীরা নিজেদের মেধা দিয়ে বিপ্লবের চেষ্টা করেছেন তারা সকলেই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে, মানুষকে যিনি সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন, সেই স্রষ্টার পক্ষ থেকে যারা বিপ্লবের পয়গাম নিয়ে এসেছেন তারা সকলেই সফল হয়েছেন। আর এ সফলতায় সবার শীর্ষে যার অবস্থান তিনি হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। ক্রেপারের মত ইসলাম বিদ্বেষীরাও তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, "The man who of all man has exercised the greatest influence upon the human race." সুতরাং ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতকে জানতে হলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর বিপ্লবী দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরী।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিশ্ব চরাচরে মহান আল্লাহ তায়ালা মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র তার উলুহিয়্যাতকে মেনে নেয়ার জন্য তারই নিমিত্তে সকল প্রকার ইবাদতে নিবেদিত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যার প্রমান দিচ্ছে মহান আল্লাহর ঐশী বাণী-

আমি আল্লাহ জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নবী ও রাসুলগণের আগমন ঘটেছে এ বিপ্লবী দাওয়াত উল্লেখিত জাতির সামনে উপস্থাপন করার জন্যে। কুরআনুল কারীম স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত ইব্রাহিম, নূহ, লুৎ, সালেহ ও হুদ (আঃ) সহ সকল নবীর দাওয়াতের বক্তব্য ছিল। " তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, আর সর্বপ্রকার তাগুতকে পরিহার কর।

আমাদের রাসুল হযরত মুহাম্মদও (সঃ) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাকেও আল্লাহ তায়ালা এক মহান দায়িত্ব দিয়ে রাসুল হিসাবে প্রেরণ করলেন। যে দায়িত্বের ব্যাখ্যা দিলেন মহান আল্লাহ পাক। তিনি বলেন-

তিনি আল্লাহ তার রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি এ দ্বীনকে সকল বাতিল মতাদর্শের উপরে বিজয়ী করে তোলেন। যদিও একাজ মুশরিক শক্তি অপছন্দ করে থাকে।

দ্বীন বিজয়ের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে রাসুল (সঃ)। তাকে কর্মপন্থা বাতলে দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েক দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে দিলেন আল্লাহ। যার প্রথম দফা ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ। যে কাজের আদেশ প্রাপ্তির মধ্যে দিয়েই আরম্ভ হলো রাসুল (সঃ) এর রিসালতের জীবন। আল্লাহ বলেন–

হে চাদরাবৃতকারী ব্যক্তি! ওঠ অতঃপর (মানুষকে) সতর্ক কর এবং তোমার প্রভুর মহানত্ব বর্ণনা কর। [৭৪ঃ১-৩]

নবীদের দাওয়াতের এ কাজ, দাওয়াতের এ পথ লাল গালিচায় মোড়ানো ছিলনা। বরং ছিল অনেক বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। যে বিপ্লবী দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের দু চারজন ছাড়া বাকী সকলকে ভোগ করতে হয়েছে বহু নির্যাতন। ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছে অনেককেই। কুরআনুল কারীমের বক্তব্য আর ইতিহাসের বাস্তবতা

www.pathagar.com

আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, দ্বীন বিজয়ের বিপ্লবী দাওয়াত মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করার মানেই হলো নির্যাতন নিপীড়ন দুঃখ কষ্ট অনিবার্য। আল্লাহপাক রাসুল (সঃ) ও তার সাথীদের এ অনিবার্য সত্যকে মেনে নেয়ার জন্যে মন মানসিকতা তৈরি করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন।

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থান অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে, যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য। তোমরা শুনে নাও আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" (আলকুরআন)

এ মহাসত্যের মুখোমুখি হয়েছেন রাসুল (সঃ)। তিনি দ্বীন বিজয়ের জন্যে ১ম দফা কর্মসূচী "দাওয়াত" এর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সকল প্রকার জুলুম অত্যাচারের মোকাবেলা করেছেন তিনি। কিয়ামত পর্যন্ত আগত, অনাগত সকল মানুষের জন্যে এ আদর্শ উপস্থাপন করে গেছেন যে, যারাই মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এ আদর্শ কায়েমের দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করবে তাদের জীবনে এসকল নির্যাতন নিষ্পেষন ও দুঃখ যন্ত্রণার মোকাবেলা করাটাই সুন্নত। নিম্নে রাসুল (সঃ) এর প্রতি নির্যাতনের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলো-

রাসুল (সঃ) যেসকল নির্যাতনের মোকাবিলা করেছেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) দৈহিক নির্যাতন (২) মানসিক নির্যাতন।

মানসিক নির্যাতন ঃ

একথা সর্বজন বিধিত যে, মানুষের জন্যে শারিরিক কষ্টের চেয়ে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়াটা তুলনামূলক বেশী পীড়াদায়ক। রাসুল (সঃ) জীবনে এমন কষ্টের মুখোমুখী হয়েছেন বিভিন্নভাবে। যেমন-

(ক) প্রত্যাখ্যাত হওয়া ঃ

রাসুল (সঃ) রিসালতের দায়িত্ব পাওয়ার পর একদিন মক্কার সাফা পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে মক্কাবাসীদের আহবান করে বললেন হে কুরাইশগণ ! তোমরা একত্রিত হও। হে অমুক গোত্রের লোকেরা তোমরা একত্রিত হও। রাসুলের এ আহবান সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জনগণ সেখানে একত্রিত হলো এবং বলল কেন তুমি আমাদের আহবান করেছ? তিনি বললেন, "আপনারা একটা কথা বিবেচনা করুন। যদি আমি আপনাদের বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে একদল শত্রূ (আপনাদের আক্রমণ করার জন্যে) অপেক্ষা করছে, আপনারাকি আমাকে বিশ্বাস করবেন? তারা বলল, হ্যা। কেননা আপনি এমন এক ব্যক্তি যিনি কখনও মিথ্যা বলেননা। তিনি বললেন," আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের এমর্মে সতর্ক করছি যে, যদি তোমরা

www.pathagar.com

আখিরাতের জীবনে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাও তবে সকলে ঘোষণা কর" আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই"

রাসুলের চাচা আবু লাহাব এতে ক্ষিপ্ত বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি আমাদের এজন্যেই ডেকেছ? এ মুহূর্তে তার এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল আবু লাহব সহ আরো অন্যান্য সকল কোরেশরা। রাসুল তখনকার সময় প্রত্যাখ্যাত হবার ফলে মানসিকভাবে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, যদিও তিনি মনোবল হারা হননি। আর তাদের ব্যাপারে নিরাশও হননি।

(খ) নিন্দা জনক কাব্য রচনা ঃ

রাসুল (সঃ) তার বিপ্রবী দাওয়াত দিতে গিয়ে যে সকল মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আরবদের বিশেষ কয়েকজন কবি রাসুল (সঃ)কে লক্ষ্য করে কুৎসামূলক কবিতা লেখা তার মধ্যে অন্যতম। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারিস, আমর বিন আস ও আবদুল্লাহ বিন যুবাইর উল্লেখযোগ্য।

(গ) ভয় প্রদর্শন ঃ

রাসুল (সঃ) এর নবুয়াতের ৫ম বছর। তিনি ইতিমধ্যে তার দাওয়াত কার্যক্রম কিছুটা হলেও সম্প্রচার করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে কুরাইশরা তার উপর আরো বেশী ক্ষিপ্ত হলো। তারা রাসুল (সঃ) এর চাচা এবং অবিভাবক আবু তালিবের মাধ্যমে এমর্মে ভয়ভীতি প্রদর্শন করলেন যে তিনি যেন মুহাম্মদ (সঃ)-কে তার এ নতুন দাওয়াত থেকে বিরত রাখেন। যদি তিনি বিরত রাখতে ব্যর্থ হন তবে শুধু মুহাম্মদকে নয় তাকেও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। এ ধরণের ভয়ভীতি তারা একবার দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং পর্যায়ক্রমে তিন তিনবার তারা এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে।

(ঘ) নব্য সাথীদের প্রতি নির্যাতন ঃ

রাসুল (সঃ) এর রিসালত জীবনের প্রথমদিকে তার আহবানে সাড়া দিয়ে যারাই ঈমান এনেছিল তাদের অনেকেই কুরাইশ কর্তৃক নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয় শ্রেণীর লোক ছিল। অমানষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যারা তাদের মধ্যে হযরত বিলাল, হযরত আম্মার, হযরত ইয়াসির, হযরত সুমাইয়া, হযরত খাব্বারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পিতা মাতার সন্মুখে হযরত আম্মারকে তার দুটো পা বিপরীতমুখী উটের পায়ে বেঁধে বিপরীত দিকে ছুটিয়ে দেয়ার মাধ্যমে দ্বিখন্ডিত করে হত্যা করা হয়। হযরত সুমাইয়াকে পত্নীর সামনে তার গুপ্তাঙ্গে তীর নিক্ষেপে করে হত্যা করা হয়। এসকল ঘটনা রাসুল (সঃ)-কে মানসিকভাবে ব্যাপক কষ্ট দান করে।

www.pathagar.com

(ঙ) সমাজচ্যুত ও অন্তরীন রাসুল (সঃ) ঃ

নবুয়্যতের ৭ম বছর পর্যন্ত রাসুলের আহবানে প্রায় চার শত লোক সাড়া দিয়েছে। কুরাইশরা রাসুল (সঃ) ও তার সাথীদের কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করলেন। লেন-দেন ব্যাবসা-বাণিজ্য সহ সকল প্রকার মোয়ামালা বন্ধ করে দিলেন তাঁরা। এতে রাসুল (সঃ) ও তার সাথীরা সমাজে একঘরে হয়ে পড়লেন।

তখন আবু তালিবের পরামর্শে রাসুল (সঃ) তার সাহাবাগণ বনি হাশিম ও বনি মোতালিব গোত্রের লোকজন সহ আবু তালিব নামক গিরি সংকটে প্রস্থান করলেন। কুরাইশরা সুযোগ বুঝে গিরিসংকটে যোগাযোগের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যাতে তারা কোন খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারে। মুসলমানগণ দু'বছরের ও বেশী এ গিরিসংকটে আটকা পড়ে আবদ্ধ জীবন জাপন করে। অনাহারে অর্ধাহারে জীবন কাটায়। গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয় তারা। এভাবে মানসিকভাবে নির্যাতিত হন রাসুল (সঃ)।

২. শারিরিক নির্যাতন ঃ

মহান আদর্শ ইসলাম কায়েমের দাওয়াত দিতে গিয়ে বহুবিধ মানুষিক নির্যাতনের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে শারিরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যেমন-

(ক) ক্ষুধা দারিদ্র ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হযেছে, আবু তালিব গিরিসংকট এর কথা। সেখানে দু'বছরের মত অবস্থান কালে রাসুল (সঃ) ও তার সাথীরা মানসিক কষ্টের পাশাপাশি ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাবার মত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দৈহিক ভাবেও নির্যাতিত হয়েছেন। ঐ সময় ক্ষুধার জ্বালায় বাচ্চা শিশুদের কান্নায় আকাশ বাতাস ম্লান হয়ে উঠত এমনকি গিরিসংকটের বাইরে থেকে তা শোনা যেত।

(খ) প্রহৃত হন রাসুল (সাঃ) ঃ

তাওহীদের বিপ্লবী দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্ন সময় প্রহারে নির্যাতিত হয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ)। একদিন রাসুল (সঃ) কাবায় প্রার্থনারত ছিলেন। এমন সময় ওকবা বিন আবি মুয়িত হযরতের গলায় কাপড় পোঁছিয়ে তাঁকে জীবনের মত শেষ করার উপক্রম করে। আশে পাশে কুরাইশরা ঘটনা দেখছিল আর হাসছিল। হযরত আবু বকর রাসুলকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

অন্য এক দিনের ঘটনা। রাসুল (সঃ) কাবায় নামাযরত ছিলেন। এমন সময় জনৈক দুষ্ট কুরাইশ উটের নাড়ীভুড়ি নিয়ে এসে তার ঘাড়ের উপর নিক্ষেপ করে। তখন অন্যান্যরা হাসাহাসি করছিল। এ ধরণের বহু ঘটনা ঘটেছে রাসুলের জীবনে।

www.pathagar.com

(গ) পথ চলতে বাঁধা দান ঃ

রাসুল (সঃ) এর দাওয়াতের বিরোধীতা করতে কোরেশ মহিলারাও পিছিয়ে ছিলনা। আবু লাহাবের স্ত্রী রাসুলের চলার পথে রাত্রিবেলা কাঁটা পুঁতে রাখতো যাতে তিনি ক্ষত বিক্ষত হন।

(ঘ) রক্তাক্ত হন রাসুল (সঃ) ঃ

মক্কার দাওয়াত দিতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে রাসুল (সঃ) এক পর্যায়ে এ মহান আদর্শের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে তার পালিত পুত্র যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কা হতে ৬০ মাইল দূরে তায়েফের পানে রওয়ানা হলেন। ভাবলেন সেখানকার লোকেরা হয়তোবা এ মহান সত্যকে গ্রহণ করবে।

দাওয়াত দেয়ার জন্যে তিনি সর্বপ্রথম "লাত" দেবতার অবস্থানে বড় মন্দিরে গেলেন। লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর দাওয়াত দিলেন তাদের নেতা আব্দুলজলিল বিন আমর মাসুদ এবং হাবিবকে। তারা প্রত্যাখ্যান করল এ দাওয়াতকে। শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলোনা বরং একদল দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিল হযরতের পিছনে। তারা হযরতের ওপর ইট পাটকেল, ধূলা-মাটি ঢিল-ইত্যাদি নানা নোংরা জিনিস নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ তিন মাইল পর্যন্ত অত্যাচারের ফলে এক মর্মান্তিক অবস্থায় নিয়ে আসে। তার শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন রাসুল(সঃ)।

রাসুল (সঃ) এর বিপ্লবী দাওয়াতকে ঠেকানোর জন্যে কোরাইশরা তার উপর মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা রাসুলের প্রাণ নাশের জন্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল এবং সকল প্রকার পরিকল্পনা তৈরি করল। সকল শক্তির আঁধ্যায় আল্লাহ পাক রাসুলকে এ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন তাকে এবং তার সাথীদের মদীনায় হিজরতের জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। হিযরতের মাধ্যমে রাসুল (সঃ) ও তার সাথীরা নির্যাতিত জীবনের অবসান ঘটল। আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে রাসুলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সফল করলেন।

রাসুল (সঃ) এর শিক্ষাপ্রদ বিশাল জীবন থেকে উল্লেখিত সামান্য বক্তব্য থেকে আমরা এতটুকু বুঝতে পারি যে, কিয়ামত পর্যন্ত যারাই নবীদের আনিত হেদায়েতের পথ অনুসরণের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবে তাদেরকে অবশ্যই জেল-জুলুমসহ বিভিন্ন ধরণের শারিরিক নির্যাতন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। এ সকল নির্যাতনে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

[সীরাত স্মারক ২০০০-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আজকের বিশ্ব

আহমেদ সেলিম রেজা

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র দর্শন এক কথা নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল এবং রাষ্ট্রদর্শন বলতে বুঝি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু মাত্র একজন শাসক বা রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ তা'লার প্রেরিত রহমত স্বরূপ। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল । ফলে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাদি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপরিচালনার কৌশল বা দক্ষতার মধ্যে সীমিত ছিল না। তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও মানব সমাজের মুক্তির জন্য । আর এজন্য তিনি মানব জাতির সামনে নীতিমালা দিয়ে যান, সেই নীতিমালা শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ভূমি নিমার্ণ করেনি, এই নীতিমালা ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মের যাবতীয় বিষয়াবলীকে ধারণ করেই বিকশিত হয়েছে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্রনীতি মৌলিক কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে রাষ্ট্র বলতে সংবিধান, আইন সভা ও সার্বভৌমত্ব এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে বুঝায়। এছাড়া রাষ্ট্রের জন্য ভু-খন্ড, জনগণ ও সরকার অপরিহার্য উপাদান। আধুনিক রাষ্ট্রের এই Concept (ধারণা) এর সাথে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র দর্শনের ধারণার কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র দর্শন ও সংবিধান আইনসভা ও সার্বভৌমত্ব দাবী করে। ভূ-খন্ড, জনগণ ও সরকার এই রাষ্ট্র দর্শনের উপাদান। তবে পার্থক্য হলো; রাসুলূল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্রদর্শনে জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেনা। এক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ বিবেচনা করা হয়। কারণ আল্লাহ তা'লা নিজেই এ বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন; পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য। -(সুরা আনআম) এমনকি আইন সভা এবং সংবিধানের কর্মপরিধি ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাষ্ট্র দর্শন সীমিত করে দিয়েছে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'লা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী তাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা কর। (এ ব্যাপারে) তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করোনা। (-আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ)।

উপরোক্ত প্রত্যাদেশ থেকে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল যে দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত তা সরাসরি আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রত্যাদেশ বা আল কুরআন। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহর (সাঃ) এর রাষ্ট্রের সংবিধান আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব আল-কুরআন। এখানে মানুষের কোন হাত নেই। নীতি নির্ধারণে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে আইন সভার কাজও নির্ধারিত। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসভা মানুষের কল্যাণে কোরআন থেকে পথ নির্দেশ অনুসন্ধান করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে দিক নির্দেশনা দিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্টি বা দলের খেয়াল খুশি মতো কিছু করার ক্ষেত্রে সরাসরি কোরআনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আইন সভাকে এই আয়াত দ্বারা দায়বদ্ধ থাকতে বলা হয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর কাছে। তবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি হাদিসের মাধ্যমে এই দায়কে কমিয়ে আইন সভার সদস্য বা প্রশাসকগণের জন্য কিছু সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে সহজ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে দেশবাসীর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যখন সরাসরি কোরআন ও হাদিসে ঐ সমস্যার সমাধান খুজে পাওয়া যাবেনা; তখন তারা ইজতিহাদ করতে পারবেন। হাদিসটির উদ্ধৃতি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মা'আয বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনের গভর্ণর নিয়োগ করে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন ঃ

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেশবাসীর সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে? মা'আয (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাকের কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জানতে চাইলেন, যদি এ বিষয়ে কোরআন পাকের নির্দেশ খুজেঁ না পাও ? মা'আয (রাঃ) বললেন, হাদিস মোতাবেক।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় জানতে চাইলেন যে, যদি হাদিসেও তার নির্দেশ না পাও -তাহলে ? মা'আয (রাঃ) বললেন, তাহলে আমি আমার বিবেচনা মোতাবেক ইজতিহাদ করবো।

অতপর নবী করিম (সাঃ) বললেন, "সেই আল্লাহ পাকের প্রশংসা যিনি তার রাসূলের সাহাবীকে এমন একটি কাজের তৌফিক দান করেছেন, যে কাজটি তার রাসুল নিজে পছন্দ করেন।" [আল হাদিস]

এখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান যে বৈশিষ্ট্য গুলো লক্ষ্য করা যায় –তা আমরা পৃথক ভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

রাষ্ট্র দর্শন ঃ রাসুহল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র দর্শনের মৌলিক বিষয় ছিল ঃ

১। আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্বের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং সে মোতাবেক সবকিছু তার নামেই শুরু করা।

www.pathagar.com

২। দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক শাসন কার্য পরিচালনা করা।

৩। জনগন তথা দেশবাসীর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনে কোরআন ও হাদিসে সমাধান না পেলে ইজতিহাদ বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে নতুন দিক নির্দেশনা খুঁজে নিতে পারার স্বাধীনতা ।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয় ছিল ঃ

১। ধর্মীয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সহ অবস্থান ।

২। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের পৃথক ও স্বাধীন স্বত্তা।

৩। প্রশাসন পরিচালনায় অবরোহ পদ্ধতির অনুশীলন ।

অথাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সরকার কাঠামোতে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে পাওয়া যায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে এবং সরকার প্রধান হিসেবে পাওয়া যায় একজন নিয়োজিত প্রশাসককে।

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কাঠামোতেও সরকার প্রধান নিয়োজিত হন রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক। এই সরকার প্রধানকে শপথ করান রাষ্ট্রপ্রধান। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রপ্রধান শপথ নেন প্রধান বিচারপতির কাছে। তবে আধুনিক রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর এই প্রক্রিয়ার সাথে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র কাঠামোর সুক্ষ একটু পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রক্রিয়া জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগন নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পূর্বাহ্নে নিজেরাই ঠিক করে দেন যে, তাদের রাষ্ট্র প্রধান কি করবেন । আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র কাঠামো যেহেতু আল্লাহর সার্বভৌত্বকে সর্বোচ্চ বিবেচনা করে সেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় খোদাভীরু ব্যক্তিদের সীমিত পরিসর থেকে। পরামর্শ ক্রমে যেমন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনার মাধ্যমে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। এক্ষেত্রে যে হযরত আলী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচাতো ভাই এবং একমাত্র মেয়ের জামাতা হিসেবেও বিশেষ কোন অগ্রাধিকার লাভ করেননি। কারণ অগ্রধিকারের বিষয় হিসেবে আত্মীয়তার বন্ধনকে বিবেচনায় আনা হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা হলো তাঁর পর কে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এ ব্যাপারে তিনি কোন অছিয়ত রেখে যাননি। কারণ তাতে ইসলামী রাষ্ট্র রাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পথ সুগম হতো ; অন্যদিকে ধর্মভীরুতা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণ করা পরিত্যাগ করে মানুষ দলে

www.pathagar.com

দলে রাজা বাদশা ও রাষ্ট্রের আচার আচরণকে অনুসরণ করা বিধেয় মনে করে বসতো। যেমনটি বর্তমান যুগের মানুষেরা অনুশীলন করছে।

উল্লেখ্য, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার যে সকল বৈশিষ্ট এ সমাজের আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর আলোকে পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়, তম্মধ্যে রয়েছে-

১. **রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশলঃ** যার মূল কথা ছিল জনগণের জান মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা।

২ .**পররাষ্ট্র নীতি ও কৌশল ঃ** যার মূল কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের দাওয়াত ও সহ অবস্থানের নীতি অথবা শত্রুতা পোষণ করলে যুদ্ধ।

৩ **রাজস্ব নীতি ও কৌশল ঃ** যার মূলকথা যাকাত, উশর, খারাজ, জিজিয়া, খুসুম, ফাই ইত্যাদি পদ্ধতিতে এমন কর প্রয়োগ-যাতে অমুসলিম ও ধনীর সম্পদে রাষ্ট্রের অধিকার নিশ্চিত করবে এবং দরিদ্র জনগণের জীবন যাত্রার মনোন্নয়নের সহায়ক হবে।

৪. **অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল ঃ** যার মূলকথা সুষম বন্টন নীতিতে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা ।

৫ . **জনকল্যাণ নীতি ও কৌশল ঃ** যার মূলকথা জনগণের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

আজকের পৃথিবীতে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিয়েছে কার্যত তা ধনী দরিদ্রের বৈষম্যকেই প্রকট করে তুলেছে। এখন জনকল্যানের পরিবর্তে রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিয়ে রাষ্ট্রকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া প্রতিরক্ষার নামে চলছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা ও একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের ষড়যন্ত্র। এ ছাড়া সকল আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় ধর্মকে পৃথক করা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়েছে আল্লাহ বিরোধী ও মানুষের ইহজীবন নির্ভর ভোগ বিলাসিতার ক্ষেত্র তৈরীর রাজনীতি নির্ভর। যাকে ক্ষমতার শাসন বা শাসকের ক্ষমতায়ন বলা যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ এসেছে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে। ইরশাদ হচ্ছে, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন।' সূরা-আল ফাতির আয়াত --৩৯।

আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র দর্শন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা কার্যত পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলের (সাঃ) অনুসরণ করার এমন এক বিধান যাকে আল্লাহ পাক নিজে খেলাফত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাদের খলিফা নিযুক্ত করবেন, যেমন তাদের পূর্বে এরূপ খেলাফতের মর্যাদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল। (সূরা–নূর আয়াত-৫৫)

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই খিলাফত বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য' নির্ধারিত নয় বরং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, খেলাফতের উত্তরাধিকার তাদের জন্য। অথ্যাৎ এই খেলাফতের সাথে শুধু রাষ্ট্র শাসন করার বিষয়টি জড়িত নয়। তার সাথে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসরণের বিষয়টিও প্রত্যাদেশ হিসেবেই এসেছে।

ইরশাদ হচ্ছে, ' আল্লাহ তা'লা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী তাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা কর।' --(সুরা মায়েদা)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, 'তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মের উপর এ ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। -(সুরা তওবা)

এতে স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার সম্মিলিত এক অনুপম রাষ্ট্র কাঠামো। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে রাষ্ট্র কাঠামো থেকে ছেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদি ও খোদাদ্রোহী কমিউনিষ্টদের প্ররোচনায়, ধর্মকে সর্বত্র শাসন তন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য এখানে। এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন নাগরিকের ভূমি ও খাদ্য, আশ্রয় ও যৌন চাহিদা নিবারণের বৈধ অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভের অধিকার তথা জীবন যাপনে জনগণের জান মাল ইজ্জতের হেফাজত বা নিরাপত্তা বিধান করা একজন শাসকের জন্য আল্লাহর কাছে তার জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ পবিত্র হাদিস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, যে নেতা বা রাষ্ট্র নায়ক অধীনস্থ জনগণের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে মৃত্যু বরণ করবে আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনায় তার পক্ষে বেহেস্ত লাভ হারাম "-(সহীহ বোখারী)

অপর এক হাদিসে আছে, 'জনগণের প্রতি যে নিষ্ঠুর, আল্লাহপাকও তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর । যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় আল্লাহ পাকও তাকে কষ্ট দিবেন।" --[মুসলিম শরীফ]

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রাষ্ট্র ব্যবস্থার আরেকটি চিত্র পাওয়া যায় তাঁর মুনাজাত থেকে, তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের কর্তৃত্ব লাভ করে যে তাদেরকে নিপীড়ন করে, হে আল্লাহ ! তুমিও তাদের নিপীড়ন করো, এবং যে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, নম্রব্যবহার করে, হে আল্লাহ তুমিও তার প্রতি সদয় থেকো, মধুর ব্যবহার করো।'--[মুসলিম শরীফ)

আজ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রাষ্ট্র দর্শন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে তাঁর উম্মত হিসেবে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি। কিন্তু এই দূরত্ব মৃত্যুর পর আমাদের উপর যেন আযাবের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়--সেই ভয় থেকে আমরা মুক্ত হবো কিকরে ? আমাদের দেশবাসীকে মুক্ত করবো কি করে ? তার কর্মপন্থা আমাদেরকেই উদ্ভাবন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন।

[প্রবন্ধটি ২০০০ সনের জুলাই মাসে প্রেস ক্লাব ভি, আই, পি লাউঞ্জে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধকারে গঠিত]

[লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও সাংস্কৃতিক সংগঠক]

www.pathagar.com

রাসুল (সাঃ)-এর ব্যবহৃত পোষাক ও দ্রব্য সামগ্রী

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

ধর্মপ্রান মুসলমানের প্রান-মন রাসুল (সাঃ) এর মোহব্বতের প্রেরনায় তরঙ্গায়ীত। রাসুল (সাঃ) এর যাহেরী সুরত চাল-চলন, আহার-বিহার, স্বভাব-চরিত্র, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী কেমন ছিল, কিরূপ ছিল তা ভালভাবে জেনে নিয়ে ভক্তি ও মুহাব্বতের সহিত মানসপটে ঐ সকল অঙ্কিত রেখে যথাসাধ্য তাঁর অনুসরণ অনুকরন করা যে কোন মুমিন মুসলমানের জন্য ইহকাল-পরকালের শান্তির কারণ হতে পারে- তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সিহাহ সিত্তার বিশিষ্ট ইমাম তিরমিযী (রাঃ) এর শামায়েলে তিরমিযী কিতাব এ সকল বিষয় বিশদ ভাবে ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারই আলোকে রাসুল (সাঃ) এর পোষাক-পরিচ্ছদও ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণনা করা হল।

রাসুল (সাঃ) অধিকাংশ সময় মোটা কাপড় পরতেন। কোন কোন সময় উত্তম পোষাকও পরিধান করেছেন। উত্তম পোষাক বর্জনের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন না। হাদিসের বর্ণনায় দেখা যায়, রাসুল (সাঃ) পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতেন। মাঝে মাঝে নম্রতা ও বিনয়ের উদ্দেশ্যে পুরনো কাপড় ও পরেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) সাদা কাপড় পরতেন। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলতেন-"তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা সাদা কাপড় উত্তম পোষাক। জীবদ্দশায় সাদা পোষাক পরিধান করা উচিত, আর মৃতদেরও সাদা কাফনে দাফন দেয়া উচিত।

রাসুল (সাঃ) এর উল্লেখযোগ্য পোষাক ও ব্যবহার দ্রব্য সামগ্রীর হুলিয়া-

কোর্তা (জামা) ঃ হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) এর প্রিয় পোষাক ছিল কোর্তা। ইহা ছিল পায়ের টাকনুর অর্ধেক পর্যন্ত ঝুলানো (টাকনু গিরার উপর) এবং আস্তীন (হাতা) কবজি পর্যন্ত। রাসুল (সাঃ) মাঝে মাঝে খাটো আস্তীন বিশিষ্ট কোর্তা পরেছেন, তবে তা কখনো কবজির উপর উঠতো না।

চাদর ঃ হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) এর পোষাকের মধ্যে কারুকার্য খচিত ইয়ামেন দেশীয় বুটিদার চাদর অধিক পছন্দ করতেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) একবার অসুস্থ অবস্থায় যায়েদের পুত্র ওছামার গায়ের উপর ভর করে বের হলেন এবং জামাতে নামায পড়ান। এ সময় তাঁর পবিত্র দেহ একখানা ইয়ামেন দেশীয় নকশাদার চাদরে আবৃত ছিল। তাঁর

www.pathagar.com

চাদরের রং আবু হোজাইফা (রাঃ) এবং বরা ইবনে আযেব (রাঃ) এর বর্ণনা মতে লাল এবং আবু রমছাহ (রাঃ) এর বর্ণনা মতে ছিল সবুজ। প্রথমোক্ত দু'জন রাসুল (সাঃ) এর একখানা চাদর ছিল বলেছেন, আর শেষোক্ত জন বলেছেন দু'খানা।

রাসুল (সাঃ) এর চাদরের পরিমাপ এক বর্ণনায় দেখা যায়, ৪ হাত লম্বা ও ২ ১/২ হাত চওড়া। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ৬ হাত লম্বা ও ৩ ১/২ হাত চওড়া।

জুব্বাহ ঃ মুগীরাহ ইবনে শোবাহ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) সংকীর্ণ আস্তীনদ্বয় বিশিষ্ট একটি রুমি জুব্বাহ পরিধান করতেন। তার বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, দেহইয়া কালবী (রাঃ) রাসুল (সাঃ)-কে একটি জুব্বাহ দিয়েছেলেন। রাসুল (সাঃ) এর জুব্বাহ তাঁর ওফাতের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তা হযরত আছমা (রাঃ) এর নিকট রক্ষিত থাকে।

মোজা ঃ রাসুল (সাঃ) কয়েক রকমের মোজা ব্যবহার করেছেন। বোরায়দাহ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হাবশী রাজা নজ্জাশী রাসুল (সাঃ) এর জন্য এক রঙ্গা এক জোড়া কাল মোজা পাঠিয়েছিলেন। রাসুল (সাঃ) সেগুলো পরিধান করেছেন।

মুগিরাহ ইবনে শেরাহ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, দেহইয়া কালবী (রাঃ) রাসুল (সাঃ) কে এক জোড়া চামড়ার মোজা উপহার দিয়েছেলেন। রাসুল (সাঃ) চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন উল্লেখ রয়েছে।

না'লাইন (জুতা) শরীফ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল দু'তছমা বিশিষ্ট জুতা পরতেন এবং প্রত্যেক তছমা (বেশ) দোহরা ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) কেশ বিহীন চামড়ার জুতা পরতেন এবং ঐ জুতা পরে ওযুও করতেন। ঐ জুতার তলী (তলা) পুরু চামড়ার এবং উপরে চামড়ার বেল্ট বিশিষ্ট ছিল।

আংটি ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) একটি রূপার আংটি তৈরি করায়েছিলেন। তাতে 'মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' খোদাই কৃত ছিল। তিনি উহা সীল মোহর কাজে ব্যবহার করতেন। হযরত মুয়াইকীব নামক সাহাবী আংটিটির রক্ষক ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে আংটিটি তাঁর নিকট ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) এর আমলে বিরে আরীছে (কোবা মসজিদের নিকট কূপ) আংটিটি পড়ে যায়। তবে আলেমগন এ হাদিছের ব্যাখা করতে গিয়ে বলেছেন, রাসুল (সাঃ) এর দুটি আংটি ছিল। একটি পরতেন এবং অন্যটি সীল মোহরের কাজে ব্যবহৃত হতো।

তরবারী ঃ রাসুল (সাঃ) এর কয়েককানা তরবারী ছিল। সেগুলোর পৃথক পৃথক

www.pathagar.com

নাম ছিল। প্রথম তলোয়ার খানার নাম ছিল মা'ছুর। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার বিত্ত হতে ইহা পেয়েছিলেন। ইহা ছাড়া কৃজীব' কলয়ী; ত বার' ও 'জুলফাকার' নামীয় তরবারী ছিল।

হযরত আনাছ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জুলফাকার নামক তরবারী হাতলের টুটি চাঁদি নির্মিত ছিল। ইহা মক্কা বিজয়ের সময় রাসুল (সাঃ) এর হাতে ছিল।

লৌহজামা ঃ রাসুল (সাঃ) এর নিকট সাতটি লৌহার জামা ছিল। যুদ্ধাভিযানের সময় শরীর রক্ষায় জন্য এগুলো গায়ে পরিধান করতেন। প্রত্যেকটির পৃথক নাম ছিল। ১. যাতুন ফুযুল আবু শ্বাহাম নামক ইহুদীর নিকট এটি বন্ধক ছিল ২. যাতুল হাওয়াসী ৩. যাতুল বেশাহ, ৪. ফিযযাহ ৫. ছোগদিয়া ৬. তবরা ও ৭. খরনক। তবে তিনটির কথা হাদীসের কিতাবে অধিক উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিরস্ত্রান (লোহার টুপি) ঃ যুদ্ধে শত্রুর আস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে শিরস্ত্রান পরতেন। হযরত আনাছ (রাঃ) এর বর্ননা থেকে জানা যায়যে রাসুল (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর পবিত্র মস্তকের উপর শিরস্ত্রান ছিল।

পাগড়ী ঃ রাসুল (সাঃ) এর পাগড়ী ব্যবহার করতেন, হাদীছের বিভিন্ন বর্ননা রয়েছে। ইমাম নববী (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসুল (সাঃ) এর দুটি পাগড়ী ছিল। একটি ছোট ৬ হাত বা ৭ হাত দীর্ঘ আর একটি বড় ১২ হাত লম্বা। রাসুল (সাঃ) বেশির ভাগ সময়ে কালো কাপড়ের পাগড়ী পরতেন বর্ণিত হয়েছে। হযরত আমর ইবনে হারীছ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) একবার লোকগণকে খোতবা দেওয়ার সময় তাঁর পবিত্র মস্তকের উপর কালো কাপড়ে পাগড়ী ছিল।

লুঙ্গি ঃ রাসুল (সঃ) সর্বদা লুঙ্গী পরতেন। পায়জমা পরিধান করতেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে এক রেওয়াতে পায়জামা পরিধান করেছেন উল্লেখ আছে। রাসুল (সাঃ) এর ওফাতের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাঝে পায়জামাও ছিল। তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসুল (সাঃ) এর ওফাতের সময় তাঁর পরিধানে একখানা মোটা কাপড়ের লুঙ্গী এবং গায়ে একখানা তালিযুক্ত চাদর ছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত এক হাদিছে উল্লেখ আছে রাসুল (সাঃ) এর লুঙ্গী ৪ $\frac{১}{২}$ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া ছিল। লুঙ্গির রং আবু জোহাইফাহ (রাঃ) এর বর্ণনায় লাল এবং কায়লাহ বিন্তে মখরমাহ (রাঃ) এর বর্ণনায় যাফরান রং বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

লাঠি মোবারক ঃ রাসুল (সাঃ) জুমা'আর দিন 'ওস্তোয়ানা হান্নান, (খেজুর বৃক্ষের কাঠ) এর উপর দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন । তবে রাসুল (সাঃ) সব সময় যে লাঠি ব্যবহার করেছেন সেটা গাছের ডাল ব'লে উল্লেখ আছে। রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশনাবলীর মধ্যে লাঠি উল্লেখ আছে।

পেয়ালা ঃ রাসুল (সাঃ) পেয়ালায় পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রাঃ) এর ছেলে নযর ইবনে আনাস উত্তারধিকার সূত্রে উক্ত পেয়ালা পেয়েছিলেন। উক্ত পেয়ালা আট লাখ দেরহামে বিক্রি হয়েছিল (শামায়েলে তিরিমিযী)। আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে রাসুল (সঃ) এ পেয়ালা দ্বারা মধু, দুধ ইত্যাদিও পান করতেন। সাবেত (রাঃ) এব রর্ণনায় জানা যায়, ইহা মোটা লৌহ পাতযুক্ত কাষ্ট লিখিত ছিল।

এ সকল ছাড়া ও রাসুল (সাঃ) এর ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে সুরমাদান আতরদানের কথা হাদীছের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

সুরমা সম্পর্কে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর বণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে সুরমাদান থেকে চোখে সুরমা লাগাতেন, ঐ সুরমার নাম ছিল 'এছমদ'।

আতরদান বিষয়ে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সাঃ) এর একটি আতর দান ছিল। রাসুল (সাঃ) তা থেকে আতর ব্যবহার করতেন।

[লেখক ঃ বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ , আলেমে দ্বীন ও পীর সাহেব বায়তুস সাইফ দরবার শরীফ, লক্ষীপুর ।]

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বনবী (সঃ) এর অবদান

ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ

আধুনিক জগতের অনেকেরই এক তরফা ধারণা যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কেবল ধর্মই প্রচার করেছেন এবং ইসলাম শুধু সর্বস্ব ধর্মীয় বিধান। এ ধারণা ভুল। ইসলাম নিছক আধ্যাত্মিক বিধান কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের নাম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। 'A complete code of life' এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক জীবনের বিধি নিষেধ, ধর্মীয় সামাজিক দেওয়ানী, ফৌজদারী ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, সামরিক বেসামরিক, বিচার বিভাগীয় এবং দন্ডবিধি বিষয় আইন কানুন।

এ বিধান বা ধর্মের প্রবর্তক এমন এক মহামানব, যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। যার না ছিল পূর্ব নির্ধারিত কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও কর্মসূচী, আর না ছিল কোন সেনাবাহিনী। অথচ খালি হাতে বিশ্বের দরিদ্রতম অবস্থানে থেকে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে গেলেন, যার নজীর ইতিহাসে মিলবে না। বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী জর্জ বর্ণার্ড'শ তাই বলেছেন ঃ

"If all the world was under one leader, then Mohammad (sm.) would have been the best fitted man to lead the people of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness"

অর্থাৎ যদি সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, আদর্শ ও ক্ষমতাবলম্বী মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হতো তবে একমাত্র মুহম্মদ (সঃ)-ই সর্বাপেক্ষা যোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

আজ বিশ্বের সর্বত্র অবিশ্বাস, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি লেগেই আছে। আমাদের দেশের সর্বত্র ও একই চিত্র বিদ্যমান। সামান্য স্বার্থের খাতিরে, নগন্য পার্থিব লোভের কারনে অনায়াসে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে, টুটি টিপে ধরছে, গুলিবিদ্ধ করছে। সর্বত্র হত্যার মহড়া চলছে।

মহানবী (সঃ) কেবল ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্রীয় নেতাও ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে পোপ ও সিজার। কিন্তু তাঁর রাজ্যে পোপের ভনিতাও ছিল না বা সিজারের সেনাবাহিনীও ছিল না। তিনি মদীনার সনদে বলেছিলেন , You are muslims as against all mankind.

www.pathagar.com

বস্তুত মহানবী (সঃ) এর রাজনীতি ছিল প্রকৃত অর্থে নীতির রাজ, রাজার নীতি নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ এ আদর্শ অনুসৃত হলে শান্তির ভাবনায় অস্থির হওয়ার কারণ থাকতো না।

ডব্লিউ মনটি গুমারী ওয়াট তাঁর Mohammad at Medina গ্রন্থে বলেছেন, "Had it not been statesman and administrator and bebind these his trust in god and firm belief that god sent him a notable chapter in the history of mankind would have remained unwrittten." মহানবী (সঃ) এর ধর্মীয় নেতৃত্ব, রাজনীতিবিদগনও প্রশাসকের ভূমিকা পালনের অবদান। উপরন্তু আল্লাহর উপর প্রগাঢ় আস্থা এবং তিনিই তাঁকে রাসুল রূপে পাঠিয়েছেন– এ বিশ্বাস ব্যতিত মানব জাতির ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অলিখিত থেকে যেতো।

সমাজবাদ রুশ শ্বেতভল্লুকের ধূর্ততার মাকাল ফল। এর ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এতে সকল মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করে মুষ্ঠিমেয়র হাতে ক্ষমতা আসে। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় প্রভু কমরেডের সেবাদাসে পরিণত হয়। লোক বেয়নেটের মুখে কলুর বলদের মত ঘানি টানে আর পেট বাঁচায়, কিন্তু মুখে টু শব্দটি করতে পারে না। প্রতিবাদ করা মাত্রই মৃত্যুর পরোয়ানা আসে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আঁাদ্রে শাখারভ এবং এ ধরণের মুক্ত চিন্তার অধিকারীদের নির্বাসিত ও নির্যাতিত জীবন যাপনই কি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়?

The worlds on the brink of the abyes গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে বলশেভিকাদের এ হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। কমিউনিজম বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার কাল্পনিক অপরাধে বা অমূলক সন্দেহে ও ব্যক্তিগত আক্রোশে তারা ১৮, ৬০,০০০ লোককে হত্যা করেছে। তার মধ্যে ২৮জন বিশপ, ১২০০ পাদ্রী, ৬০০ শিক্ষক, ৮৮০০ ডাক্তার, ১২৯,০০০ শ্রমিক এবং ৮১৫,০০০ কৃষক রয়েছে। এতো গেল সরকারী হিসাব। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী কত লোক মারা হয়েছে তার পরিসংখ্যান কে দিবে? চীনা সামাজতন্ত্রেরও কি অন্য চেহারা? মাওসেতুং নিজে বলেছেন , আমরা ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ এর বিপ্লবে একদিনে মাত্র সাতাশ মিলিয়ন (দুই কোটি সত্তর লক্ষ) শত্রু নিধন করেছি।" পিকিং টাইমস এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার উন্নতি ও প্রগতি দেখে উৎফুল্ল হয়েও আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মানুষকে মারিয়াই যে সভ্যতার বিকাশ, সে সভ্যতায় মানুষের কাজ কী? আসলে এ ইজমগুলো ধনীকে করে, আরো দরিদ্রকে বানায় আরো দরিদ্র। এ সকল

www.pathagar.com

আদর্শ যে ক্ষণজীবী, বর্তমান বিশ্বের মুক্তিকামী সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর মুক্তির উল্লাসই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বর্তমান বিশ্বের পাঁচশ কোটি মানুষ পাগল হয়ে খুজছে একটি মাত্র পথ। সেটি হল মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাই মানব জীবনের কঠিনতম এবং জটিলতম সমস্যা। তথাকথিত পূঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র তার গোলক ধাঁধায় ফেলে মানবতাকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সে সাথে সে মনোমোহন কলা বলে মানব সমাজকে তার মনুষ্যত্ব ভূলিয়ে অধঃপতনের অতলে নিক্ষেপ করেছে।

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ধনতন্ত্র মানুষের জন্য সার্বিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। ব্যর্থ হয়েছে সমাজতন্ত্র ও মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ এনে দিতে। ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি মানুষের নিরঙ্কুশ মালিকানা কর্তৃত্বের একদিকে যেমন সৃষ্টি করেছে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা, শোষণ, লুণ্ঠন ও ভোগ বিলাসের অবধারিত দ্বার, অন্যদিকে তেমনি কোটি কোটি মানুষের নির্মম বঞ্চনা ও দারিদ্রের নিষ্ঠুর কশাঘাতে নিম্নতম মানবিক মৌলিক অধিকার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে দুঃসহ এক শ্বাসরুদ্ধকর সামাজিক অবস্থার। বিশ্বের সর্বত্র সমাজতন্ত্রের নামে সমাজ সমষ্টির মালিকানা যে মানুষের মানবীয় অধিকারের বঞ্চনার নামান্তর এবং একে দাসত্বের শৃংখলে বেঁধে মারার এক গ্যাড়াকল মাত্র, একথা আজ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। বিশ্বের প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্র মাত্র সত্তর বৎসর বয়সে তার জন্মভূমি রাশিয়ায়ই আত্মহত্যা করে কবরস্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্র মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে একথা আজ সমাজতন্ত্রের জন্মভূমিতেই স্বীকৃত। তাই সে 'ইজম' সেখান থেকে নির্বাসিত। 'প্রেস্ত্রয়কা' ও 'গ্লাসনষ্ট'-এর কফিনে বন্ধ 'তন্ত্রের' দাপট আর কেউ দেখবেনা। রাশিয়া, পূর্ব জর্মানী, রুমানিয়া, হাঙ্গেরীর লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষ আজ সমাজতন্ত্রের যাঁতাকল থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেঁড়ে বেঁচেছে। উত্তর কোরিয়ার কিউবা ও অন্যান্য দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্যাংগ্রীনে ভোগে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

জাহেলী যুগে সুদ, ঘুষ এসব অসামাজিক কাজ অবাধে চলত। ধনীরা বিশেষ করে ইহুদীরা সুদের ব্যবসা করত। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ও ঋণের দায়ে অনেক সময় খাতককে ভিটে মাটি ছাড়তে হতো। এমন কি ঋণগ্রস্থ অধমর্নদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কুসীদজীবী উত্তমর্ণদের হাতে তুলে দিতে হতো। এভাবে পুঁজিপতিরা আরো ঋণের মালিক হতো আর তাঁদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতো দরিদ্ররা।

এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রনায়ক মহানবী (সঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সুষম অর্থনীতির প্রবর্তন করে সমাজ থেকে পুঁজিবাদী ও একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটান। মানবতার মুক্তির সাধন মানুষকে শোনালেন আল্লাহরই বাণী। লিল্লাহি মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি-একমাত্র আল্লাহরই

আসমান ও যমীনের রাজত্ব। কাজেই আল্লাহর রাজ্যে অন্যকে বঞ্চিত করে কেউ ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না। আল্লাহর সকল বান্দারই-এর মধ্যে অধিকার দিলেন। যাতে করে, কাউকে পাঁচ তলায় আর কাউকে গাছ তলায় থাকতে না হয়। গরীব ও সহায় সম্বলহীনরা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, কোন মতেই তাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে না হয়, তিনি সে ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। তিনি যাকাত, সদকা, জিয্‌ইয়া, গণীমত, ফায়, ব্যবসা, বাণিজ্য, পণ্য মওজুদ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মালিকানা, আয় ব্যয় সঞ্চয়, সাংসারিক খরচাদি, অধীনস্থের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সুষ্ঠ অর্থ ব্যবস্থার সুষম নীতি প্রবর্তন করে মুসলিমদের মধ্যে পদ্ধতি চালু করে দুনিয়াতে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে, এ পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে মানবীয় স্বার্থপরতা এবং সুস্থ সমাজ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।

যাকাত ঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান ও উত্তম ব্যবস্থা 'যাকাত'। ইসলাম যাকাতের মাধ্যমে সমাজকে দারিদ্রমুক্ত করতে চায়। ইসলামের যাকাত এমন একটি বাধ্যতামূলক 'কর' ব্যবস্থা, যা সাধারণ শুল্ক বা করের মত নয়। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ বা সম্পদ যে কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সমাজের অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণের জন্য যাকাত বণ্টনের খাত সুনির্ধারিত করে দিয়েছে। যাদের ধন সম্পদ নেই, স্বচ্ছলতা নেই, যারা ফকীর, মিসকিন, ইয়াতিম, নিঃস্ব, পথিক, তাদের জীবিকার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার বিধান ইসলামে রয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে বিধান দিয়েছে ঃ ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারায়ি ওয়াল মাসাকীনি আলায়হা ওয়াল মুয়াল্লাফাতি কুলুবুহম ওয়া ফীর রিকাবি ওয়াল গারেমীনা ওয়াফী সাবিলিল্লাহি ওয়াবনিস সাবিল। ফরীদাতাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আলীমুল হাকীম। বস্তুত যাকাতের মাল কেবল ফকীরদের আর মিসকিনদের জন্য, আর যারা তার আদায়ের কাজ করে তাদের জন্য, আর যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা আবশ্যক, আর যাদের স্কন্ধ দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, আর যারা সর্বস্বান্ত। আর আল্লাহর পথে ও নিঃসম্বল ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য। এ ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহর নির্ধারিত। তিনি জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়।

(১)এ আয়াত সমাজের অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র পীড়িত মানুষের জন্যই যাকাত নির্ধারিত হয়েছে। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর ও তাদের ভাতা এ তহবিল থেকেই পাবে।

(২) যাকাত যেহেতু অসহায় দুঃস্থদের অভাব অনটনকে দূর করার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে তাই ধনী ও সমর্থ উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য তা নিষিদ্ধ হয়েছে। যাতে ধনীদের যাকাত ধনীরা খেয়ে আরো ধনী না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তুয়াতিমু মিন আগনিয়াইহিম ওয়া তুরাদ্দু ইলা ফুকারা ইহিম (যাকাত)। তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যে গরীবদের তা দিতে হবে। (৩) তিনি আরো বলেন ঃ লা হিযবা ফীহা লিগানীয়ীন ওয়া লিকাবিইন মুকতাসিবিন -যাকাতে ধনীর কোন অংশ নেই, আর না শক্তিশালী উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য। (৪) বস্তুত যাকাত মানবতা ও সহমর্মিতার জন্য প্রচলন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, কায়লা ইয়াকুনু দাওলাতান বায়নাল আগানিয়া মিনকুম, যাতে ধনসম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তন না করে অর্থাৎ পুঞ্জীভূত ও সীমাবদ্ধ না থাকে। (৫) এ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশিত ইসলামী অর্থনীতির মৌল দর্শন ঘোষিত হয়েছে। এ দর্শনের দৃষ্টিতে জাতীয় সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের মধ্যে যাতে বণ্টিত হয় তার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ইসলামী বিধানে মূলধন যেন জনকয়েক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত না হয় তার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি ধনসম্পদ কোথাও কারো কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে বেকার পড়ে থাকতে পারবে না। ধন সব সময় উৎপাদনশীল খাতে খাটাতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতে জমা করে ফেলে রাখার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে ধন দেননি। যারা এরূপ জমা রাখে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, আল্লাযীনা ইয়াকনিযু নায যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা ওয়ালা ইয়ানফিকুনাহা ফী সাবিলিল্লাহ ফাবাশ শিরহুম বি' আযাবিন আলীম-"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য ধনভান্ডারে সঞ্চিত করে এবং তা আল্লাহর্ পথের ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ দাও"। কমে না যায়, সেদিক দৃষ্টি রেখে যাকাতের হিসাব স্থির করা হয়েছে। ইসলামের সোনালী যুগে বহু দরিদ্রের পূনর্বাসন হয়েছে। এখানে এ ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে চালু করলে সমাজের দরিদ্র মোচন করা সম্ভবপর হবে।

যাকাত, উশর, ফিতরা, খায়রাত, মুসলিম জীবনের অন্যতম বাধ্যতামূলক দেয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছে কেবল সহানুভূতি ও মানবতার সেবার দিকে দৃষ্টি রেখেই। যে পেটপুরে খেল আর তার প্রতিবেশী উপবাসী রল সে মুমিন নয় বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছেন, যেখানে ধন-বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য কল্যাণ একে অন্যের প্রতি এতখানি সহানুভূতিশীল ও মানবতামুখী হতে হবে, যাতে সমাজে দুঃখ দরিদ্র না থাকে।

আল ইহতিকার ঃ মজুতাদারী ইহতিকার মানে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশী লাভে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সস্তার সময় কিনে গুদামজাত করে রাখা। ইহতিকার হলো পুজিবাদের বাহন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কোথাও ইসলামী আইনের প্রয়োগ নেই।

অর্থনীতি আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এ দুই বাদের খপ্পরে পড়ে একদিকে ধনের পাহাড় গড়ে তোলার সহায় হচ্ছে, আর একদিকে ক্ষমতার প্রভাব

www.pathagar.com

কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। বর্তমানকালের একজন সমাজতন্ত্রের ধারক নিজেই এ তন্ত্র সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছেন, রাশিয়ার মোট আয়ের অর্ধেক শতকরা ৫ থেকে ১২ জন লোকের কাছে সঞ্চিত হয়, বাকী অর্ধেক অবশিষ্ঠ ৮৮ ভাগের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। ফলে বিশ (২০) লক্ষ লোক হত্যা করে এবং বহু পরিমাণ লোক আহত করে সে ইজমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার স্বরূপ উদঘাটিত হতে বেশী সময় লাগল না। তাই ক্ষণস্থায়ী অনুশীলনমূলক এসব 'ইজম' শান্তির চাইতে অশান্তিরই জন্ম দিয়েছে বেশি।

আসল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। দুইয়েই মৌল স্বভাব হলো শোষণ করা ও পুঞ্জিভূত করা Laissez fair laissez passe কাজেই যে গরীবকে যত শোষণ করে সেই তত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কর্মঠ বলে সম্মানিত।

মহানবী (সাঃ) এসব সমাজ বিধ্বংসী ধারণার পোষণ না করে এদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিবারাত্রি খাদ্যশস্য মওজদু করে রাখে তবে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকল না, আল্লাহও তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আর কোন জনপদে কোন ব্যক্তি যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায় তবে তারাও আল্লাহর দায়িত্ব বহির্ভূত।"

গণিমত ও ফায় ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম আয়ের উৎস গণিমত ও ফায়। কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়ী হলে তাদের পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি বিজয়ী ইসলামের রাষ্টের করায়ত্ত হয়। একে গণিমত বলে। আল -কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এটি একটি বৈধ আয়। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের ও দরিদ্র জনসাধারণের হক রয়েছে এ গণিমতের মালে।

আল-কুরআনে নির্দেশ এসেছে- তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা গণিমত স্বরূপ যা কিছু লাভ করবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ-আল্লাহ্র রাসূলের জন্য নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্য ইয়াতীম, মিসকিন ও নিঃস্ব পথিকের জন্য।

যুদ্ধ বা কোন কষ্ট ব্যতীত শত্রুদের কাছ থেকে সম্পদ যদি হালালভাবে হস্তগত হয় তাকে বলা হয় ফায় । পবিত্র কুরআনে ফায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ ওয়ামাআপা আল্লাহ আলা রাসুলিহি ওয়ালি যিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকীনি ওয়াবনিস সাবিলী কায় লা ইয়াকুনা। এখানে ফায় মালের খাত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[সীরাত স্মারক ২০০০-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ওয়াকিয়ায়ে হাররা ও আমাদের শিখনীয়

আ, ন, ম, আঃ কাইয়ুম খন্দকার

কমবখত ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সিরীয় বাহিনী কর্তৃক পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের কলংকময় ঘটনাবলীকে মুসলিম ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকিত কাহিনী বলে অভিহিত করা হয়। এ কাহিনীটি ওয়াকিয়ায়ে হাররা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। একে হাররায়ে দাকেম ও হাররায়ে জোহরাও বলা হয়। মদীনা থেকে একমাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত।

রাসুলে খোদা (সাঃ)-এর ভবিষ্যতবানী ঃ এই হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে এমন একদিন আসবে যেদিন মদীনা বাসীকে বের করে দেওয়া হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, বহিষ্কারকারী ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, সে সাংঘাতিক খারাপ লোক। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের ধ্বংস ও বিপর্যয় কুরাইশের একটি গোত্র দ্বারা সংঘঠিত হবে। হুজুর (সাঃ) এর নিকটে উপস্থিত সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, তখন আমাদের জন্য কি করণীয় ? তিনি বললেন, চুপ থাকা। হযরত আবু হুরায়য়ার (রাঃ) অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে. হুজুর (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর কছম! যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, এই মদীনাতে অবশ্যই লড়াই হবে। সেদিনের ঘটনায় দ্বীনের আদর্শগুলো এমন ভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ দ্বীনকে বরবাদ করা হবে।) যেমনভাবে ক্ষুর দিয়ে মাথার চুল পরিষ্কার করা হয়। সে দিন তোমরা (যারা তখন বিদ্যমান থাকবে) এক মাইল দূরে গিয়ে হলেও মদীনা থেকে সরে পড়বে।

ওয়াকেদী আইয়ুব বিন বশীর থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসুলে খোদা (সাঃ) মদীনা থেকে বের হয়ে যখন হাররায় জোহরায় উপনীত হন। হঠাৎ তিনি থেমে যান এবং "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাহি রাজিউন" পড়েন। সাহাবায়ে কেরাম বুঝে নিলেন যে সফরটি বোধ হয় অনুকূল হয়নি। এ ব্যাপরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আপনি ইন্না লিল্লাহি...........পড়লেন? রাসুলে খোদা (সাঃ) বললেন, হাররার এই প্রস্তর ভূমিতে আমার এই উম্মতের উত্তম লোকেরা শাহাদাত বরণ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে জোবালা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর কতিপয় সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় আশে-পাশে পরিদর্শনে বের হন। এক পর্যায়ে তিনি হাররায় দাকেমে পৌছলেন এবং দেখতে পান প্রবাহিত পানি ময়দানের চতুর্দিক দিয়ে খুব গতিবেগে বের হচ্ছে। হযরত

www.pathagar.com

কা'ব আহবার খলীফাকে বললেন, আমরুল মু'মেনীন; আল্লাহর শপথ, আজ যেভাবে পানির স্রোত ময়দানের চতুর্দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তেমনি ভাবে এখানে একদিন মানুষের রক্ত প্রবাহিত হবে। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের কথাটি শুনে তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ ঘটনাটি কোন সময় ঘটবে? কাব বললেন, বালক ! ভীত হও! অবশ্যই উহা তোমার হাত পা দ্বারা হবেনা। কুরতুবী (রাঃ) বলেন, পবিত্র মদীনা থেকে মদীনাবাসীদের বের হওয়ায় ঘটনাবলী সম্পর্কিত কতিপয় হাদীসের ইংগিত মূলতঃ এই হাররার ঘটনার ইংগিতবহ। তখন পবিত্র মদীনা নগরী অত্যন্ত সুদর্শনা এবং শান্তির এক উত্তম নিদর্শন ছিল। মুহাজিরীন, আনসার সাহাবাগণের কেউ কেউ তখনও উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় সমজ্জল ছিলেন। পিপাসু মু'মেনীন ও আশেকে রাসুল এ সময় মদীনার পানে ছুটে আসার জন্য উদগ্রীব থাকতেন এবং সুযোগ পেলেই এখানে চলে আসতেন।

ঘটনাবলী ঃ কমবখত ইয়জিদ বিন মুয়াবিয়া তার অবৈধ খেলাফতের অনুকূলে হারমাইন শরীফাইনের আনুগত্য আদায়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিন উতবার নেতৃত্বে এক বিরাট সিরীয় বাহিনী মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করে। প্রয়োজন বোধে পাইকারীভাবে হত্যা, লুন্ঠন ও ধর্ষনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনদিন পর্যন্ত হারামে নবী (সাঃ) এর মধ্যে অবর্ণনীয় নারকীয় অপকর্ম চালানো হয়। এ ঘটনাকে ওয়াকেয়ায়ে হাররা বলা হয়ে থাকে। অবলীলা ক্রমে নিরাপরাধ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের ধরে নিয়ে হাররায় দাকিমে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এটি মদীনা থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তার প্রেরিত বর্বর বাহিনী এখানেই এক হাজার সাত শত মুহাজিরীন আনসার-সাহাবা ও ওলামায়ে-তাবিয়ীনদের শহীদ করে। নারী ও শিশু ব্যতীত অপরাপর দুই হাজার লোকদের হত্যা করে। সাত শত হাফিজে কুরআনদের জবাই করা হয় । তিন দিন পর্যন্ত ধর্ষনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে অনেক মহিলাদের গর্ভে অবৈধ সন্তান জন্ম নেয়। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর অভ্যন্তর ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পবিত্র স্থানটিকে জানোয়ারের প্রস্রাব ও পায়খানায় দুর্গন্ধময় করা হয়েছিল। অথচ হুজুর (সাঃ) এর পবিত্র জবানে ঘোষনা করেছিলেন "আমার রাওজা ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানের একটি বাগিচা"। কুরতবী (রাঃ) আরও বলেন, মদীনা নাওয়ারা সম্পূর্ণ জনশুন্য হয়ে জানোয়ারের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। কুকুর ও অন্য জানোয়ার মসজিদে নববী তে অবাধে আসা যাওয়া করত।

তিরবানী শরীফে হযরত ওরয়া বিন জোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ইনতেকালের পর মদ্যপায়ী ও তারিকুছ-সালাত, কমবখত ইয়াজিদের

www.pathagar.com

অনুকূলে বয়া'আত গ্রহনে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের অস্বীকার করেন এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষনা দেন। খবরটি ইয়াজিদের কর্নগোচর হলে তাকে গ্রেফতার করার জন্য লোক প্রেরন করা হয়। শপথ করা হয় যে, আবদুল্লাহর গলায় শিকল না পরিয়ে যেন তার সম্মুখে না আনা হয়। ইয়াজিদের শপথের ভয়ানক পরিনাম থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরকে কতিপয় সঙ্গি এভাবে পরামর্শ দেন যে, গলায় একটি রূপার তৈরি শিকল পরে উপরে পোশাক পরিধান করে ইয়াজিদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে আপনি রাজী হলে হয়ত বা তার সঙ্গে আপোষ করার ব্যবস্থা হতে পারে। এতে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, খোদার কছম! এরূপ আমি কখনও করব না। পরপরই তিনি নিজেকে খলিফা বলে ঘোষনা করলেন এবং তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণে লোকদের আহ্বান জানালেন। ফলে ইয়াজিদ মুসলিম বিন উতবার নেতৃত্বে সিরিয়া বাহিনী মদীনা বাসীদের সংগে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। সৈন্যদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, প্রথমে তারা মদীনা আক্রমন করবে। উহা বেশীভূত করার পর মক্কাভিমুখে রওয়ানা হবে এবং সেখানে আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরকে খতম না করা পর্যন্ত লড়াই বন্ধ হবে না। মুসলিম বিন ওতবার বর্বর বাহিনী মদীনায় উপস্থিত হলে আসহাবে রাসুলে খোদা (সাঃ) এর মধ্যে যারা জিবীত ছিলেন, মদীনা থেকে বের হয়ে যান। মুসলিম বাহিনী পরবর্তী তিনদিন স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে হত্যা লুণ্ঠন ও ধর্ষনের যে নজীর স্থাপন করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এজিদ বাহিনী মদীনা বিজয়ের পর মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে মুসলিম মারা যায় । মৃত্যুর পূর্বে হেসীন বিন নুমায়ের কে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়। হোসাইন বিন নুমায়ের মক্কায় যুদ্ধাবস্থায় ইয়াজিদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করে। ফলে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

ইবনে জাওযী (রাঃ) বলেন, বাষট্টি হিজরীতে ইয়াজিদ বিন মোয়াবিয়া স্বীয় চাচাতো ভাই ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে মদীনা বাসীদের আনুগত্য আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। উসমান বিন মুহাম্মদ মদীনা থেকে একটি দল শপথ নেওয়ার জন্য ইয়াজিদের নিকট পাঠায়। ইয়াজিদের নিকট থেকে উক্ত দলটি মদীনা মুনওয়ারায় ফিরে এসে তার আসল রূপ ও কুকীর্তি সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করে। উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর মধ্যে বদ্বীনি স্বভাব, মদ্যপান, কুকুর নিয়ে খেলা করা, নাচ গানের আসরে মত্ত থাকা ইত্যাদি উল্লেখ করে নিজেদের বায়আত গ্রহণ অস্বীকার করে অন্যদেরকেও বিরত রাখে। দলের মধ্যে মানযার নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন যে, ইয়াজিদ আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করেছে এবং আমাকে একলক্ষ দেরহাম পুরস্কার দিয়েছে। তথাপি আমি তার

www.pathagar.com

সম্পর্কে কোন সত্য আজ গোপন করব না। সে একজন মদ্যপায়ী-মাতাল এবং নামাজ, রোজা ভঙ্গকারী। ফলে মদীনাবাসীরা ইয়াজিদের প্রতিনিধি উসমান বিন মুহাম্মদকে শহর থেকে বের করে দেয় বা আবদুল্লাহ বিন হানযালা গাসসীল এর হাতে বায়আত গ্রহন করে। আবদুল্লাহ বিন হানযালা লোকদেরকে বললেন, আমি ঐ পর্যন্ত ইয়াজিদের হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য রওয়ানা হব না এবং কাউকে বয়আত হওয়ার জন্য পাঠাবো না যতক্ষণ আকাশ থেকে পাথর বর্ষনের আশংকা দেখা না দেবে। মদীনা বাসীদের নিকট ইয়াজিদের বদ্দীনি স্বভাব ও ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশিত হওয়ার পর মদীনা বাসীগন মসজিদে নববীর মিম্বরে উঠে তার বয়াত অস্বীকার করে। আবদুল্লাহ বিন আবী আমর বিন হাফছ মাখযুমী মাথা থেকে স্বীয় পাগড়ী নামিয়ে বললেন, যদিও কমবখত ইয়াজিদ আমার প্রতি সদয় আচরণ করেছে ও আমাকে পুরস্কৃত করেছে, তবুও আমি এই খোদার দুশমন ও মদ্য পায়ীর বায়আতকে ছিন্ন করলাম, যে ভাবে পাগড়ীকে মাথা থেকে খুলে ফেললাম। অন্য একজন উঠে পা থেকে জুতা খুলে ইয়াজিদের বয়আত ভঙ্গ করার ঘোষনা করলো। এতে উপস্থিত অপরাপর ব্যক্তিগণ বায়আত ভঙ্গ করার নিমিত্তে পাগড়ী ও জুতা খুলে ফেলায় মজলিশে পাগড়ী ও জুতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এর পর তাঁরা আনসারদের পক্ষে আবদুল্লাহ বিন হানযালাকে এবং কুরাইশদের পক্ষে আবদুল্লা বিন মুতয়ীকে অলী নিযুক্ত করেন। বনী উমাইয়্যা যারা ছিল তাদেরকে মারওয়ানের গৃহে আবদ্ধ করে রাখা হলো। মারওয়ান উপায় অন্তর না দেখে ইয়াজিদের নিকট সৈন্য প্রেরণ করে সাহায্যের আবেদন জানালে ইয়াজিদ, মুসলিম বিন উতবার নেতৃত্বে এক বিরাট সিরীয় বাহিনী প্রেরণ করে। মুসলিম বিন ওতবা একজন বৃদ্ধ র.গ মিস্ত্রী ছিল। বার্ধক্য জনিত দূর্বলতা স্বত্তেও সে মদীনা বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করে। সৈন্য বাহিনী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইয়াজিদের হুকুমে ঘোষনা করে দেয়া হলো, যে ব্যক্তি হেজাজে লড়াইয়ে পা বাড়াবে, সে সরকারী দফতর থেকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও সামগ্রী পাবে। এতদ্ব্যতিত একশত দীনার পুরষ্কার দেওয়া হবে। এতে বার হাজার লোক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। প্রথমতঃ ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইবনে মারজানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন এবং পরিশেষে বললেন, আল্লাহর শপথ! একজন ফাসিকের পক্ষে রাসুলের আউলাদকে হত্যা করা এবং বাইতুল্লাহতে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে মুসলিম বিন উতবাকে এভাবে অসিয়ত করে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে, সে মারা গেলে হেসসীন বিন নুমায়ের তার স্থলাভিষিক্ত হবে। প্রথমে আমার অনুকূলে শপথ গ্রহণের জন্য তিনবার আহবান জানানোর পরেও যদি তারা বায়আত গ্রহণে রাজী না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

লড়তে হবে। বিজয়ী হওয়ার পর তিন দিন পর্যন্ত মদীনার হেরেম শরীফের মধ্যে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষন বৈধ বলে ঘোষনা দেওয়া হলো । সেখানে যত মালামাল পাওয়া যাবে তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টিত হবে। মদীনাবাসীরা এই খবর পেয়ে মারওয়ানের গৃহে আবদ্ধ বানু উমাইয়াদেরকে বললেন, আমাদের নিকট শপথ করো, এ ব্যাপারে তোমরা কোনরূপ হঠকারীতা ও বিশৃংখলায় জড়িত হবেনা। অন্যথায় তলোয়ার দ্বারা তোমাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। আপাততঃ সংকট নিরসনের কৌশল হিসাবে তারা প্রস্তাবে রাজী হয় এবং মুসলিম বিন উতবার সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে মদীনাবাসীদের সাথে যোগ দেয় । এদিকে মারওয়ান চতুর কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় পুত্র আবদুল মালিককে গোপনে মুসলিমের নিকট পাঠিয়ে এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে তারা যেন হারাম শরীফ থেকে সরে গিয়ে তিন দিন অপেক্ষা করো। আর নিজে মদীনাবাসীদের সঙ্গে সংকট নিরসনের জন্য আলোচনায় মিলিত হলো। মদীনা বাসীদের পক্ষ থেকে বলা হলো, সমস্যা যে অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে তাতে লড়াই ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। মারওয়ান সুকৌশলে তাদেরকে বুঝাতে লাগল যে এ পবিত্র শহরে ফিতনা-ফাসাদের সংঘাতে অপবিত্র করা কিছুতেই সমীচিন হবেনা। বরং তোমরা সহজ ভাবে ইয়াজিদের বায়'আতকে মেনে নাও । মদীনাবাসী কিছুতেই একজন মদ্যপায়ী ও ফাসিককে খলীফা মেনে নিতে পারলেননা। ফলশ্রুতিতে আবদুল্লাহ বিন গাসসীল ইয়াজিদ বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধের আহবান জানালেন। অপরদিকে মুসলিম বিন ওতবা অসুস্থ থাকায় একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে তার বাহিনীর লোকদেরকে যুদ্ধে উৎসাহীত করল। যুদ্ধে ইয়াজিদের বিরাট বাহিনীর সাথে মদীনাবাসীদের ক্ষুদ্র শক্তি পরাজিত হলো। ইয়াজিদের ফরমান মোতাবেক তারা পরবর্তী তিনদিন পর্যন্ত মদীনায় হারাম শরীফে পাইকারী ভাবে হত্যা, লন্ঠন ও ধর্ষন করেছিল।

ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে ইয়াজিদ বাহিনী মদীনা নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদে মদীনাবাসীগণ রাসুলে খোদা (সঃ) কর্তৃক আহযাবের যুদ্ধে যে পরীখা খনন করেছিলেন, উক্ত পরীখাটি পুনরায় খনন করেন। এই পরীখাটি খননে তাঁরা ৯য় পনের দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ফলে মদীনা দুশমনদের জন্য এক দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত হয়। পরীখার আড়াল থেকে শত্রুবাহিনীর উপর চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির ন্যায় তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে শত্রু বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হওয়ায় তারা ভীত হয়ে পিছু হটে হাররায় অবস্থান নেয়। মারওয়ানের নিকট গোপনে দূত পাঠিয়ে. যে- কোন উপায়ে মদীনা আক্রমনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম পরামর্শ দেয়। মারওয়ান বনু হারিসের লোকদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে কিছু লোককে

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় লোভ-লালসা দেখিয়ে মদীনায় প্রবেশের একটি রাস্তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সুযোগ পেয়ে মুসলিম বিন উতবা তার বাহিনীসহ মদীনার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। মদীনাবাসী প্রাণপন বাঁধা দান করেও বিরাট বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। ইয়াজিদের বায়া'আত অস্বীকারকারীদেরকে বন্দী করে হাররায় নিয়ে জবাই করা হয়। মুসলিম বিন উতবা কর্তৃক হত্যাযজ্ঞে উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জনৈক মহিলা বন্দীখানা থেকে তার পুত্রকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে আবদার করলে মুসলিম হুকুম দেয়, "দ্রুত পুত্রকে কয়েদ খানা থেকে নিয়ে এসে তার মস্তক কেটে মহিলাটির হাতে দিয়ে দাও"। নিজের জীবন রক্ষা পেয়েছে সে জন্য শোকর না করে পুত্রের জীবন বাঁচাতে এসেছে। এহেন অকৃতজ্ঞদের উপযুক্ত পুরস্কার এরূপই হয়ে থাকে! সাঈদ বিন মুসায়্যিব, যিনি তাবেয়ীনদের অগ্রজ ছিলেন, তাকে মুসলিমের নিকট উপস্থিত করা হলো এবং বলা হলো, ইয়াজিদের আনুগত্যের শপথ নাও। সাঈদ বলেন, আমিতো আবু বকর (রাঃ) ও ওমরের (রাঃ) আদর্শে বায়'আত নিয়েছি। মুসলিম তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিলে একজন বলে উঠলো, জনাব! লোকটিতো পাগল। এতে মুসলিম ক্ষ্যান্ত হয়। অত্যাচারের সব ধরণের সীমা অতিক্রম করায় লোকেরা মুসলীম বিন উতবাকে মুসরিফ (সীমা অতিক্রমকারী) বলতো। কিন্তু এরূপ জঘণ্য হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তার নিজের অবিভ্যক্তি ছিল এরূপঃ

"এসব অপরাধীদের হত্যা করার কারণে যদি আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম দেন, তাহলে আমার চেয়ে হতভাগা আর কেউ হবে না"। মারওয়ানের দাস, যাকওয়ান থেকে বর্ণিত মুসলিম বিন ওতবা দীর্ঘদিন প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত ছিল। ঔষধ সেবন করার পর সংগে সংগে খাবার আনার আদেশ দেয় অথচ ডাক্তারের পরামর্শ ছিল, ঔষধ সেবনের পর বিলম্বে খাবার গ্রহন করা। এ ব্যাপারে সে উক্তি করে যে "জীবনে বেঁচে থাকার আর সাধ নেই। এতদিন একটি অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য বেঁচে থাকা অধিক প্রিয় মনে করেছি। তারমতে, ওসমান (রাঃ) হত্যাকারীদেরকে স্বীয় তরবারী দ্বারা হত্যা করে হৃদয়ের আগুন নির্বাপিত করতে পারার দীর্ঘ দিনের লুপ্ত আকাঙ্খা পূরণ হওয়ার আজ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু বরণ করাই অধিক প্রিয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা আমার হাতে হত্যাকৃত এসব অপবিত্র লোকদের হত্যার বিনিময়ে সকল পাপারাশি ক্ষমা করে দিয়েছেন।" জাহেল ঔদ্বত্য লোকেরা যখন ন্যায়ের সকল স্তর থেকে পদংখলিত হয়ে অতিশয় সীমা অতিক্রমকারী হয়ে যায়, কেবল তখনি তাদের মুখে এরূপ কথা বের হয়! অন্যথায় এই জঘন্য লোকটির হাতে রাসুলে খোদা (সঃ) এর যে সকল মহান সাহাবী অত্যাচারিত হয়ে শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন হানযালা আল

গাসসীলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যিনি এই ঘটনায় তাঁর স্বীয় সাতটি পুত্রসহ শাহাদাৎ বরণ করেন। আবদুল্লাহ বিন যায়িদ (রাঃ) যার থেকে হুজুর (সঃ) এর অজু করার বর্ণনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হযেছে এবং মাকাল ইবনে আননান আল আসারী, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম বাহিনীর ঝান্ডা নিয়ে রাসুলের সংগী ছিলেন, এই হত্যাকান্ডে শাহাদাৎ বরণ করেছেন।

বদবখত মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনার হেরেম শরীফের মধ্যে সওয়ারীর উপর উপবেশন অবস্থায় উল্লাশে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে আবদুল্লাহ ইবনে গাসসীলকে দেখতে পায় কালেমার আংগুলি (শাহাদাত আংগুলী) আকাশের দিকে উত্তোলন করে মৃতাবস্থায় পড়ে আছেন। তাকে এ অবস্থায় দেখে সে বলে উঠল, আজ তোমারা মৃত্যুর পর আকাশের দিকে আংগুলি উঠিয়েছ। জেনে রেখো, আমরা জীবিত অবস্থায়ও এমনটি করিনি। দরবারে ইলাহীতে তোমাদের ন্যায় রোনাজারীও করিনি আবার বদদোয়াও করিনি। জনৈক ব্যক্তি একথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি যা বললে, এদের অবস্থা প্রকৃতই যদি তদ্রুপ হয় তাহলে আমাদের মতামত হলো, এরা অবশ্যই জান্নাতী। উত্তরে মারওয়ান বলে এরাতো "ধর্মের বিরোধী!"

মোটামুটি এই নারকীয় ঘটনার যেসব খারাপ দিক রয়েছে, তরমধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল রাসুলে খোদা (সঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর মুখের সমস্ত দাঁড়ি উপড়ে ফেলা। তার এহেন অবস্থা দেখে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ অবস্থা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি সিরীয়বাসী কর্তৃক অত্যাচারিত। একদল লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমার গৃহের যাবতীয় [illegible]দ লুঠ করে নিয়ে যায়। এরপর আরেকদল প্রবেশ করে গৃহে কিছু না পেয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলো, এই বৃদ্ধকে শোয়ায়ে এক একজন তার মুখ থেকে একটি করে দাঁড়ি উপড়ে ফেলো। তারা আমার সাথে অনুরূপ আচরণ করলো যার পরিণতিতে আমার এই অবস্থা। (ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাহি রাজিউন)

বর্নিত হয়েছে যে মুসরিফ মুসলিম জোর পূর্বক অবশিষ্ট মদীনাবাসীদের থেকে ইয়াজিদের বায়আত গ্রহণে বাধ্য করে, তাদের মধ্যে একজন কুরাইশ ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি শপথ গ্রহণকালে বললেন, আমি শুধু ন্যায়ের স্বপক্ষে শপথ নিলাম, গুনাহের ব্যাপারে নয়। মুসরিফ তার শপথ গ্রহণ না করে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। এ সংবাদ পেয়ে নিহতের মা আল্লাহর শপথ করেন যে আমি সুযোগ পেলে এর প্রতিশোধ জীবিত অথবা মৃত নেবো এবং ঐ সীমালংঘনকারীকে অবশ্যই আগুনে

পোড়াবো। মদীনাবাসীদেরকে তিন দিন পর্যন্ত অবর্ণনীয় অত্যাচার করার পর মুসরিফ বাহিনী ইবনে যোবায়েরকে খতম করার জন্য মক্কায় রওয়ানা হয়; কিন্তু পথিমধ্যে সে মারা যায় এবং পথেই তাকে দাফন করা হয়। মহিলাটি এ সংবাদ পেয়ে কয়েকজন দাস সংগে করে তার কবরের নিকট গিয়ে পৌঁছে। লাশ বের করার উদ্দেশ্যে কবর খুলার পর দেখা যায়, এক বিরাট অজগর সাপ তার শরীরকে পেঁচিয়ে রেখেছে। আর তার নাকের হাড়টি মুখে ভরে চুষছে। লোকেরা এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং মহিলাকে বলল, মহান আল্লাহ তার জঘন্য কার্যকলাপের শাস্তি দিচ্ছেন। কাজেই আপনার প্রতিশোধের ইচ্ছা পুরণ করা থেকে বিরত হোন। মহিলাটি বললেন, কখনো নয়, আমি আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি, তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত এ জালিমের কবর থেকে এক পাও নড়বনা। সে লোকজনকে কবরের অন্য পাশ খোঁড়ার নির্দেশ দিল। তাতেও দেখা গেল অনুরূপভাবে আকেরটি সাপ তাকে জড়ায়ে আছে। এহেন অবস্থা দর্শনে মহিলাটি অজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহর সমীপে দু'হাত তুলে মিনতি ভরে আবেদন করল, হে খোদা! মুসলিম বিন ওতবার উপর আমার রাগান্বিত হওয়া শুধু তোমার রিজামন্দির উদ্দেশ্যে। আমাকে তোমার কুদরাতী শক্তি দাও যেন আমি এই জালিমকে বের করে আগুনে ভষ্মীভূত করে দিতে পারি। এরপর মহিলাটি একটি লাঠি দিয়ে সাপটির লেজে আঘাত করলে সাপটি লাশ থেকে সরে গেল। মহিলাটি তার লোকদেরকে লাশ বের করে আনার নির্দেশ দেয় এবং তিন দিন পর্যন্ত পার্শ্বস্থ একটি গাছে উহা ঝুলিয়ে রাখে । সেপথে যারাই অতিক্রম করছিল, তারা এ জালিমের লাশের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে ঘৃণা প্রকাশ করছে। এরপর নামিয়ে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে হেসসীনের নেতৃত্বে ইয়াজিদ বাহিনী মক্কা মুয়াজ্জামা আক্রমণ করে। হেরেম শরীফের মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইয়াজিদ বাহিনী কাবার অভ্যন্তরে কামানের গোলা ব্যাবহার করেছিল। হঠাৎ কমবখত ইয়াজিদ 'লিভার সিরোসিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করার সংবাদ পেয়ে ইয়াজিদ বাহিনী ঘাবড়িয়ে যায় এবং সেখান থেকে সকলেই পালিয়ে যায়।

ওয়াকিয়ায়ে হারবার ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ মতে, ৬৩ হিজরী সনের জিলহজ্জের ২৭/২৮ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। মুসলিম বিন ওতবা ৬৪ হিজরীর সনের ১৪ মহররম রাতে মৃত্যুবরণ করে আর একই সনের রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখে ইয়াজিদ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

আলোচ্য ওয়াকেয়ায়ে হাররা প্রকৃতই মুসলিম মিল্লাতের জন্য হৃদয় বিদারক

www.pathagar.com

দুঃখজনক ও শিখনীয় ঘটনা। ধর্মের অজুহাত দেখিয়ে অথচ নিজেরা ধর্মীয় আদেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অসৎকাজ ও জঘন্য অনাচারমূলক কাজ মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়েছে বহু পূর্বে থেকে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ইয়াজিদ তার সূচনা করে। নবী (সঃ) এর মহান সাহাবায়ে কিরামের রক্তে পবিত্র হারামাইন শরীফের পবিত্রতা নষ্ট করে যে অপকর্মের সূত্রপাত করা হয়েছিল আজও নানাভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে তা চালু আছে। ইয়াজিদের অনুসারীদের সংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে। ইয়াজিদী কার্যকলাপ চলছে এবং আগামীতেও চলবে। তবুও ইয়াজিদী কার্যকলাপ ও ইয়াজিদের অনুসারীদের মোকাবেলা করে আমাদের উম্মতের মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রকৃত নবী প্রেমিকের জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

(বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, গবেষক ও আশিকে রাসুল শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) এর লিখিত সুপ্রসিদ্ধ কিতাব জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব অবলম্বনে)

[সীরাত স্মারক ২০০০-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মহানবী'র (সঃ) কতিপয় সুমহান মর্যাদা

আ.ন.ম.আবদুশ শাকুর

অবতরণিকা ঃ সাইয়েদে আওলাদে আদম, (আ) সাইয়্যেদুল মুরসালীন ওয়া খাতামুন নবীয়্যন, শাফিউল মুজনাবীন, ছাহেব 'লাও লাকা মা খালাকতুল আকলাক, 'ছাহেবে কা'বা ও কাওছাইন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শত শত মহত্ত্ব ও মর্যাদা বিদ্যমান। এসব মহৎ মর্যাদা থেকে কতিপয় নিম্নে পেশ করা হলো-

তিনি (সাঃ) সেরা বংশের সন্তান এবং আদম (আঃ) সন্তানদের নেতা:

অবশ্যই মহান আল্লাহ তা'লা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সৃষ্টিকুলের মধ্যে উচ্চতম মর্যাদা ও উচ্চতম স্থান দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাঁকে (সাঃ) মানবকূলের মধ্যে সম্মানিত করেছেন। যেন তিনি (সাঃ) হন তাঁর নির্মল সৃষ্টি এবং আল্লাহর নিকট তিনিই যেন হন সবচেয়ে প্রিয়তম। তিনিই যেন হন দ্বীন ইসলামের নবী । মানুষদের প্রতি তাঁর রাসুল । নবীগণের ইমাম আর সৃষ্টির সর্দার । নবী এবং রাসুলগণের মধ্যে যেন হন শ্রেষ্ঠ এবং ইহা সবই আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে চান দান করেন।

হযরত ওয়াছেলা ইবনে আছমা (রা) থেকে বর্ণিত-তিনি বলেছেন' আমি রাসুল খোদা (সাঃ) কে ইরশাদ করতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা কেনানকে সম্মানিত করেছেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তান দ্বারা এবং কুরাইশকে সম্মানিত করেছেন কেনান দ্বারা । কুরাইশ থেকে সম্মানিত করেছেন বনী হাশেমকে । বনী হাশেম থেকে সম্মানিত ও নির্বাচিত করেছেন আমাকে।' (-মুসলিম ও তিরমিজী।) ইহা ইমাম তিরমিজী ওয়াছেলা (রাঃ) এর সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ও ইহাকে সহীহ বলেছেন।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তান থেকে ইসমাঈল (আঃ) কে সম্মানিত করেছেন এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) -এর সন্তানদের মধ্যে নবী হিসেবে সম্মানিত করেছেন, অতঃপর রাবী হাদীসটিকে উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি বিদা 'আ' (রা)-এর হাদীসে আছে এবং উহাতে রাসুল (সাঃ) এর কথা আছে। "আমি মুহাম্মদ (সাঃ) ইবনে আবদুল মুত্তালিব, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আমাকে জানিয়েছেন তাদের উত্তম দলে, অতঃপর তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর তাদের উত্তম দলে আমাকে বানিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন কাবিলায় । অতঃপর আমাকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাবিলায় । তাদেরকে বানিয়েছেন ঘরের মত।

www.pathagar.com

অতপর আমাকে করেছেন উত্তম ঘর এবং আমাকে করেছেন তাদের মধ্যে উত্তম সত্তা। তিরমিজী ইহাকে হাসান হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকেও এ হাদীসটি হাসান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর (সাঃ) আউয়ালীন ও আখেরী নবীগনের সর্দার হওয়া সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। উহার দিকে ইঙ্গিত করাটাই যথেষ্ট মনে করি । আল্লাহ চান তো ২য় পরিচ্ছেদে উহার উল্লেখ কররো।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে তিরমিজী শরীফে সহীহ হিসেবে বর্ণিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে মুসলিম ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

"আমি আদম সন্তানদের সর্দার । এতে গৌরবের কি আছে?"

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলে খোদা (সাঃ) ইরশাদ করেছেন " হে আল্লাহ! তুমি সৃষ্টি করেছ আমাকে আদম সন্তানদের সর্দার করে । এতে গৌরবের কিছু নেই । " ইহা বর্ণনা করেছেন আহমদ, আবু ইয়ালী, উহার রাবীগন নির্ভরযোগ্য।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত দিবসে আমি মানবকূলের সর্দার।" (–বুখারী ও মুসলিম।)

অতঃপর তিনি (সাঃ) আদম সন্তানের সর্দার। মানব কূলের সর্দার। সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ তাঁর (সাঃ) প্রশংসা করেছেন। কিয়ামত দিবসে হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্যরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। ইহার উপরে গৌরবের কিছু নেই। সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

তাঁর (সাঃ) জন্য আরশের ডান পাশে কুরসী পাতা থাকবে-

মহান আল্লাহ পাক তাঁকে (সাঃ) যে সকল বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তম্মধ্যে একটি হলো-আরশের ডান পাশে তাঁর জন্য একটি আসন পাতা থাকরে। সৃষ্টির মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্যে এ আসনটি হবে। এ স্থানে তিনি (সাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ নেই যার জন্যে এ আসনটি হবে। এ স্থানে তিনি (সাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ অবস্থান করতে পারবেনা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -রাসুলে খোদা (সাঃ) ইরশাদ করেছেন "–আমাকে বেহেশতের পোশাক পরিধান করানো হবে। তখন আমি আরশের ডান পাশে দাঁড়াব। আমি ব্যতীত এ স্থানে দাঁড়াবার মতো সৃষ্টি কূলে আর কেউ নেই।"-তিরমিজী-ইহা বর্ণনা করেছেন- এবং এ হাদীসকে হাসান বলেছেন।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ-ইবনে-সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,! -নিশ্চয়ই আল্লাহর সৃষ্টি কূলের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাশীল হলেন আবুল কাসেম (সাঃ)-। অতঃপর তিনি বললেন, যখন কিয়ামত দিবস সংঘটিত হবে, আল্লাহ সৃষ্টিকূলের প্রত্যেক উম্মতকে নবীসহ পৃথক পৃথক ভাবে উঠাবেন। আহমদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মত উক্ত কেন্দ্রে শেষ উম্মত হিসেবে উঠবেন। তিনি বললেন -যখন তিনি (সাঃ) দাঁড়াবেন এবং তাঁর উম্মতের সৎ ও অসৎ লেকেরাও পেছনে পেছনে দৌড়াবে। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত প্রতিষ্ঠা করা হবে। অতএব তারা পুলের উপর চলতে থাকবে । তখন আল্লাহ তার শত্রুদের চোখের জ্যোতি নিয়ে যাবেন। তখন তার বাম ও ডান দিক থেকে দোযখে অনবরত পড়তে থাকবে এবং রাসূল (সাঃ) ও সৎ লোকেরা মুক্তি পাবে। তখন ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। তাদেরকে ফেরেশতারা দেখাবেন-বেহেশতের মধ্যে তাদের স্থান। ডান ও বাম দিকে শেষ পর্যন্ত রাসুল (সাঃ) তাঁর প্রভুর নিকট গিয়ে পৌঁছবেন। তখন আল্লাহর ডান পাশে তাঁর (সাঃ) জন্য একটি আসন রাখবেন এবং একজন ঘোষণা করবেন-ঈসা (আঃ) এবং তাঁর উম্মত কোথায়?- আল হাদীস।

এ হাদীসটি হাকেম বর্ণনা করেছেন ও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন । ইমাম জহুরী (রাঃ) ইহাকে সঠিক বলে অভিহিত করেছেন।

মুসলমানদের ইমামের পেছনে মসীহ (আঃ) এর নামায ঃ

অসংখ্য হাদীস তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌছেছে যে, শেষ জামানায় হযরত মসীহ (আঃ) যখন অবতীর্ণ হয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন তিনি এই উম্মতের ইমামের পেছনে নামায পড়বেন। 'মানাকেবুশ শাফেয়ী 'কেতাবে বর্ণনা করেন- এই উম্মতে মাহদী আগমন সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌছেছে, এবং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর পেছনে নামায পড়বেন।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি রাসুল (সাঃ) কে ইরশাদ করতে শুনেছি - "আমার উম্মতের একটি দল, কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় সত্যের উপর বিজয়ীর বেশে যুদ্ধ করতে থাকবে।" তিনি (সাঃ) আরও বলেন-মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন এবং উম্মতের আমীর ঈসা (আঃ) কে বলবেন-"আসুন। আমাদের নামায পড়ায়ে দিন।" তিনি বলবেন-"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেহ তোমাদের আমীর।"-এই উম্মতের জন্য ইহা আল্লাহর দেয়া সম্মান। হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসুলে খোদা (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- "কেমন উম্মত তোমরা! যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন তোমাদের মাঝে, তোমাদের ইমাম হবে তোমাদের মধ্য হতে।"(-বুখারী ও মুসলিম।)

www.pathagar.com

এই উম্মতের সারিবদ্ধতাকে ফেরেশতার সারিবদ্ধতার মতো করা হয়েছে ঃ

এই উম্মতের নামাযের সারিবদ্ধতাকে ফেরেশতার সারিবদ্ধতার মতো করা হয়েছে। যেভাবে হযরত হোযাইফা (রঃ)-এর হাদীসে এসেছে-তিনি বলেন-রাসূলে খোদা (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-"আমাদেরকে মানবমণ্ডলীর উপর তিনটি বিষয়ে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের সারিবদ্ধতাকে ফেরেশতার সারিবদ্ধতার মতো করা হয়েছে। আমাদের সমগ্র জমিনকে সিজদাগাহ করা হয়েছে এবং শুষ্ক মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র করা হয়েছে, যখন আমরা পানি পাই না। আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রঃ) হতে বর্ণিত, 'তিনি বলেন- রাসুল (সঃ) একদিন বের হলেন এবং বললেন-তোমারা কি সারিবদ্ধ হবে না, যেভাবে ফেরেশতারা তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হয়? "আমরা বললাম-"হে আল্লাহর রাসুল, ফেরেশতারা তাদের প্রভুর নিকট কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? রাসূল (সাঃ) বললেন- "তাঁরা প্রথম সারি পূর্ণ ও অন্যান্য সারিকে এর সাথে মিলায়।"-মুসলিম।

উপসংহার ঃ এভাবে হাদীস ও কোরআনের ছত্রে ছত্রে রয়েছে মহানবীর গুণগান, যা কখনও লিখে শেষ করা যেতে পারে না। এই শত শত মহাত্ম ও মর্যাদা শেষ না হওয়াটাই এক মহান মর্যাদা।

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

সুস্বাস্থ্য রক্ষায় রাসুলের (সঃ) আদর্শ

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত

পিয়ারা নবী,সরওয়ারে কায়েনাৎ, সাইয়্যেদুল মুরছালীন,খাতামুন্নাবীয়্যিন, হাবিবুল্লাহ ওয়া রাসুলুল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই তথ্যটি এত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইসলামের প্রতিটি কাজের ভেতর তিনি আদর্শিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। অজু-গোসল থেকে শুরু করে, তায়াম্মুম, নামায ও রোযার ভিতর দিয়ে, সময়মত নিদ্রা ও নিয়মিত আহারের মাধ্যমে এবং মাদকদ্রব্য বর্জনের দ্বারা তিনি স্বাস্থ্যকে বজায় রাখার এমন কতকগুলো ব্যবস্থাপনা দিয়ে গিয়েছেন, যাকে বর্তমান জগতের কম্পিউটার সিস্টেমের সঙ্গে অথবা একটি পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যে মেশিন দূষিত পানির ধূলা- ময়লা আবর্জনা রোগ-জীবাণুকে ছেঁকে আলাদা করে দিয়ে বিশুদ্ধ পানি বের করে আনে। সর্বসাধানণের পানের উপযোগী করে । এবারে আসুন এর প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা পর্যলোচনা করে দেখি, কিভাবে এ গুলো আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে।

আহার ঃ ইসলাম প্রচারের চৌদ্দশত বছর পরে, বর্তমান জগতের ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, অতি ভোজনকারীর জীবন, স্বল্প -ভোজনকারীর জীবনের চেয়ে বেশী ক্ষণস্থায়ী (অর্থাৎ মোটা লোক কাজে-কর্মেও দুর্বল এবং তারা তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করে।) এর কারণ নির্ণয়ে দেখা গেছে যে, মোটা লোকের শরীরে কলেস্টেরল (cholesterol) জমা হয়, যা হৃৎপিণ্ডের কাজের ব্যাঘাত ঘটায় এবং তাতে তাড়াতাড়ি মানুষের মৃত্যু হয় । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ডাক্তারও ছিলেন না, বৈজ্ঞানিকও ছিলেন না, কিন্তু তিনি এমন সুনিপুণ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে (স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে, এসব তথ্যই তাঁর জানা ছিল। যার জন্য তিনি নিজেও সর্বদা স্বল্পাহারী ছিলেন এবং অন্যকেও স্বল্পাহারের উপদেশ দিতেন, সেই সঙ্গে আবার কেউ যাতে অনাহারে না থাকে, সেদিকেও সর্বদা সু-নজর রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন দাওয়াত খেতে যেয়ে অর্ধ -দুম্বা ভক্ষণ করে ফেলেছেন-এমন কোন ঘটনা বা নজির তাঁর কোন শত্রুরাও কোন দিন উপস্থাপন করতে পারেনি।

রোযা ঃ আহারের ব্যাপারটি শেষ করার আগে রোযার প্রসংগটাও আলোচনা করা দরকার। হুজুরে করীম (সাঃ) রোযার খুব ভক্ত ছিলেন এবং রমযানের রোযা ছাড়াও সারা বছরই বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোযা রাখতেন। রমযানের রোযা সম্বন্ধে হাদীস এত শক্ত যে-বিনা কারণে একটা রোযা ভঙ্গ করলে, তার জন্য একাধারে ৬০টা রোযা রাখতে হয়। রোযা সম্বন্ধে এত জোর তাগিদ কেন

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে? এর প্রধান কারণ এই যে, অর্থাভাবে যারা অনাহারে থাকে, তাদের ক্ষুধার জ্বালা কি দুর্বিষহ,তা যাতে সকলেই উপলব্ধি করতে পারে, ধনীর বাড়ীর পাশে যাতে কোন গরীব অনাহারে না থাকে, ধনীর-গরীবের প্রতি যাতে সহানুভূতি সম্পন্ন হয় এবং ফিৎরার টাকা, যাকাতের টাকাও অন্যান্য টাকা দিয়ে যাতে তাদের সাহায্য করে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো স্বাস্থ্যগত। রোযায় মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হয়-এটাই সর্বসাধারণের ধারনা। কিন্তু এতে যে বিশেষ বিশেষ লোকের স্বাস্থ্য, সমাজের ধনিকশ্রেণী বা স্থুলকার লোকেরা, অধিক ভোজনের জন্য যাদের দেহে কলেস্টেরল বা চর্বি জমা হয়, হৃৎপিণ্ডের কাজের ব্যাঘাত ঘটায় এবং মৃত্যু ডেকে আনে। রমযানের রোযায়, এক মাস কৃচ্ছসাধনার ফলে, তাঁদের হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে তাদের জীবনের আয়ু বৃদ্ধি পায় । ধূমপায়ীদের জন্যও রোযা একটা বিরাট ফায়দা বহন করে আনে। এরূপ যে, তাদের ফুসফুস অন্ততঃ একমাসের জঘন্য নিকোটিনের বিষ ক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে । কোষ্ট -কাঠিন্যদের জন্যও রোযা কিছুটা সুফল বয়ে আনে। একই রাতে তিনবার আহার করায় এবং ইফতারীর সময় প্রচুর শরবৎ পান করায়, কোষ্ট-কাঠিন্য দূর হয়ে যায়।

তাছাড়া রোযা রেখেও যে পূর্ন শৌর্য-বীর্যের কাজ করা যায়, তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা বদরের যুদ্ধে । রমযান মাসে বদরের যুদ্ধে মাত্র তিনশত তের জন রোযাদার মুসলমান, একহাজার অ-রোযাদারের বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে তুমুল যুদ্ধ করে তাদের কে ছাগল-ছানার মত ধরাশায়ী করে সহজ ভাবে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মুসলমান তা গৌরব -ভরে স্মরণ করবে।

নিদ্রা ঃ সু-নিদ্রা সুস্বাস্থ্যের সুসহায়ক। রাতে শয্যায় শুয়ে যারা শুধু ছটপট করে এবং অনিদ্রায় ভুগে, তাদের স্বাস্থ্য কিছুতেই ভাল থাকতে পারে না। আগের দিন রাতে কোন কারণে অনিদ্রা হলে, পরের দিন কাজ কর্মে কতটা ব্যাঘাত ঘটে, তা ভুক্ত ভোগী সবাই জানেন । কাজেই নিদ্রা হলো আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার প্রতি এক বিশেষ দান বা নিয়ামত। হুযুরে করীম(সাঃ) এ কথাটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতেন বলেই ঘুমের উপর তিনি যথেষ্ট জোর দিয়েছেন্। ইসলামের বিধানই হলো, সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, রাতে এশার নামায পড়ে এবং আহারাদি শেষ করেই তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়া এবং প্রায় ছয় ঘন্টার প্রচ্ছন্ন ঘুমের পর সোবহে সাদেকে উঠে, হাত -মুখ ধুয়ে, ওযু-গোসল করে, প্রশান্ত মনে ফযরের নামায আদায় করা। যারা ইসলামের এই সুন্দর বিধানটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে. তারা যে কত দিক থেকে লাভবান হয়ে থাকেন, এখানে তার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

৬/৭ ঘন্টার প্রচ্ছন্ন ঘুমের পর আপনি যখন জাগ্রত হলেন, যেন মনটা আপনার আপনা-আপনি প্রশান্তিতে ভরে গেল।

ওযু ঃ আল্লাহর যে কোন এবাদৎ-বন্দেগী শুরু করার আগে, দেহ ও মনকে পবিত্র করার জন্য ওযুর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যখন কোন রাজা-বাদশাহর দরবারে যাই, তখন ভাল করে গোসল করে, সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, আতর-গোলাপ-খুস্‌বু মেখে সেই দরবারে হাজির হই। আর আল্লাহ্‌র এবাদত করার সময় আমরা আল্লাহর দরবারে হাজির হচ্ছি। তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন, সারা আলমের শাহান শাহ, বাদশাহ। কাজেই তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার আগে আমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পূতপবিত্র হতে হবে- এটাই স্বাভাবিক। শুধু হাত পা ও মুখ পরিস্কার করলেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে ওযুর কাজ হয়ে যায়। কিন্তু নবীজী এ ব্যাপারে কতটা গভীরে প্রবেশ করেছেন, সেটাই আলোচনা করে দেখার বিষয়। হাত ধোয়াতো সবার আগে একান্ত প্রয়োজন, তাই ওযু করতে যেয়ে নিয়তের পরই কমপক্ষে তিনবার কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়ার নির্দেশ এসেছে। এরপর গড়গড়া করে তিনবার কুলি করতে বলা হয়েছে, যাতে মুখে কিছু না থাকে। নাকের ময়লা দূর করার জন্য নাককেও সাফ করতে বলা হয়েছে। এরপর মুখমন্ডল ভাল করে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার পুরা হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে, ভিজা হাত দিয়ে শের মসেহ করতে বলা হয়েছে। যাতে এরপর মাথার চুলে এবং কানের পৃষ্ঠে কিছু লেগে না থাকে। সবার শেষে পা দুটিকে ভাল করে ধুতে বলা হয়েছে। ওযু করার নিয়মগুলো এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, যাতে গোসল ব্যতিরেকেও শরীরের বাইরের অংশগুলো (Exposed parts) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিস্কার হয়ে যায়। এর মধ্যে প্রধান ৪টা কাজকে ফরয হিসেবে রাখা হয়েছে, যেমন কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা, মাথা মসেহ করা এবং টাকনা পর্যন্ত দুই পা ভাল ভাবে ধৌত করা। অর্থ্যাৎ যে সব কাজগুলো একান্ত করণীয় সেগুলোকে ফরয হিসেবে রাখা হয়েছে, যাতে কেউ সেগুলো বাদ দিতে না পারে। কেননা এই ৪টার যে কোন একটা বাদ গেলে ওযুই বরবাদ হয়ে যাবে। ওযুর পদ্ধতিটা এত সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, যিনি ৫ বার ওযু করে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়বেন, তাঁর চেহারাই উজ্বল হয়ে পরিস্ফুটিত হবে।

নামায ঃ সমস্ত ইবাদতের শেষ্ঠ ইবাদত হলো নামায, যা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তাই নামাযপড়া মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। এই নামায, কুরআন তেলাওয়াতের মত বসে বসে পড়ারও ব্যবস্থা করা যেত অথবা যোগী

ঋষীদের মত বৃক্ষতলায় বসে জপমালার মত তসবীহ্ হাতে জপ করা যেত। কিন্তু নবীজীর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং তাঁর চিন্তাধারা ছিল গভীর বা অনন্য। তাই যে নামায সারাজীবন পড়তে হবে এবং এক দিনে বারে বারে পড়তে হবে, সেটাকে তিনি অলস, অথর্বের মত এক জায়গায় চুপ করে বসে বসে পড়ে হাত-পা গুলোকে স্থবির করে দিতে চাননি। বরং ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে, সারা শরীরের এক্সারসাইজ হয়ে, শরীরে যাতে বেশী করে রক্ত সঞ্চালন হয়, মুসুল্লিগণ যাতে কর্মক্ষম থাকেন এবং রুজী-রোযগারে জন্য হাত-পা যাতে শক্ত-সবল থাকে, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রেখে নামাযের পদ্বতিগুলো ঠিক করেছেন। শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য আজকার জিমন্যাসিয়ামে যেসব এক্সারসাইজের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, নামাযের ভেতর দিয়েও ইসলামে তার প্রায় সবগুলো ব্যবস্থাই দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই দেখুন, নিয়তের পরই দুই হাত উঁচু করে কান পর্যন্ত স্পর্শ করতে হচ্ছে, এতে হাতের একটা বিরাট এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। এরপর হাত দুটোকে নাভির উপরে সুন্দর করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। সুরা তেলাওয়াতের পর যখন রুকুতে যাওয়া হচ্ছে, তখন ঘাড়ের পিঠের ও হাতের এক্সারাসাইজ হয়ে যাচ্ছে, কেননা ছহি রুকু করার নিয়ম এই যে, মাথা এতটা ঝুঁকাতে হবে যাতে মাথা পিঠ ও চোতড় এক লাইন বরাবর হয় এবং হাতের আঙ্গুল গুলো ফাঁক ফাঁক করে হাঁটুর উপর শক্ত ভাবে অবস্থান করে। আবার রুকু থেকে ঘাড় উঠিয়ে যখন সিজদায় যাওয়া হয়, তখন হাঁটু, হাত, পা, মাথা, পেট, নাক ও কপালের এক্সারসাইজ হয়ে যায়, কেননা সহি-সিজদার নিয়ম এই যে, প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে রাখতে হবে, তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রেখে তার মাঝখানে মাথা রাখতে হবে এবং কপাল ও নাক দুটোকেই মাটিতে ছোঁয়াতে হবে এবং পেট এতটা উঁচুতে রাখতে হবে যাতে পেটের নীচ দিয়ে ছোঁট একটি বকরীর বাচ্ছা চলে যেতে পারে। নামায শেষে ছালাম ফেরাবার সময় আবার ঘাড়ের ও চোখের এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোন ধর্মে এ ধরনের এক্সারাইজ আছে কি? এটাই হচ্ছে ইসলামের নবীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা।

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা ঃ দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পর, মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামে মাদ্রকদ্রব্যকে হারাম করা হয়েছে এবং তা করে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা সবগুলো মাদকদ্রব্যই স্বাস্থ্যের হানি করে থাকে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে এরশাদ রয়েছে, -"ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা

www.pathagar.com

আমানু, ইন্নামাল্ খামরু ওয়াল মায়ছিরু ওয়াল আন্ছাবু ওয়াল আযলামু রেজছুন মিনাল আমালিশ শয়তানি, ফজতানেবুহু, লায়াল্লাকুম তুফলেহুন (সুরা মায়েদাহ, আয়াত ৯০) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া মূর্তি এবং লটারীর তীর এ সমস্তই গর্হিত বিষয়, যা শয়তানের কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং ইহা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, কারণ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

মানুষ মদ খায় কেন? শরীরের উপর মদের একটা প্রতিক্রিয়া আছে। মদের মেডিক্যাল নাম হল "এালকোহল" (Alcohol)। যা ঔষধ এবং অন্যান্য বহু জিনিসকে পচন ক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যার জন্য মিউজিয়ামে কোন মৃত জিনিসকে রক্ষা করার এটা এ্যালকোহলে ডুবিয়ে রাখা হয়। মদ খাওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে তা শরীরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে (stimulation)। ফলে শরীরে একটা পুলক পুলক ভাবের উদ্রেক হয় (Euphoria)। এই পুলক পুলক ভাবটাই হলো মদের নেশা। যার জন্য মানুষ পতঙ্গের মত এর পিছনে ধাবিত হয়। কিন্তু নির্বোধরা জানে না যে, শরীরে যে জিনিস প্রথমে উত্তেজনা (Stimulation) আনে, পরে সেই জিনিসই শরীরে অবসাদের (depression) সৃষ্টি করে। আর মদের এই অবসাদ উত্তেজনার চেয়ে.অনেক গুণবেশি। যার জন্য মদ শরীরকে যতটুকু ভাল করে, তার চেয়ে এর প্রতিক্রিয়ার শত গুণ বেশী খারাপ করে। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি কেউ মদ ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞেস করে তবে বলে দিন, এদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে, আবার মানুষের জন্য উপকারও আছে কিন্তু এতদুভয়ের পাপরাশি উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।

অন্যান্য মাদক দ্রব্য-গাঁজা, ভাং, আফিম, চরশ, কোকেইন, মারিজুয়ানা, প্যাথডিন, হিরোইন-এসবগুলোর কার্যক্রম মোটামুটিভাবে মদের মতই। প্রথমে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, পরে অবসাদ ডেকে আনে, ক্ষুধা নষ্ট করে এবং স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। কাজেই ইসলামে মাদক দ্রব্যকে হারাম করা হয়েছে।

পরিশেষে বর্তমান যুগের ভয়াবহ অসুখ এইড (AIDS) সম্বন্ধে কিছু না বললে, আমার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমি মনে করি। তাই এ সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করব।

এইডস হচ্ছে যৌন অনাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। এইডস নামের অসুখটি আজকাল সবার নিকট পরিচিত। কিন্তু যে চারটি শব্দের সংমিশ্রনে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, তা কিন্তু অনেকেই জ্ঞাত নহেন। তাই প্রথমে রোগটি সম্বন্ধে

www.pathagar.com

কিঞ্চিৎ ধারণা দিয়ে নিচ্ছি। এইডস মানে Acquired, Immunity, Deficiency, Syndrom.

Acquired ঃ নিজের ভুলে বা নিজের দোষে বা নিজের খেয়ালখুশীমত উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবন যাপনের ভিতর দিয়ে এই অসুবিধাটি অর্জিত হয় বলেই প্রথমে Acquired শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। Immunity শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক। রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রাক্ষ করার জন্য, আল্লাহর অশেষ রহমতে, দেহের ভেতর এক রকম Defensive force বা প্রতিরোধ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে Immunity। এই ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ রোগ-জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস ঃ

হযরত লুত (আঃ)-এর সময় তাঁর কওম যখন আল্লাহর প্রদত্ত সীমানা লংঘন করে সম্পূর্ণরূপে ব্যভিচার-এ লিপ্ত হয়েছিল, বিশেষ করে বালকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল (sodomy), তখন আল্লাহর গজব তাদের উপর নাজিল হয়েছিল এবং বজ্রাঘাত ও পাথর বৃষ্টি দ্বারা সে জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। (সুরা হিজ্বর, আয়াত ৬১-৬৪ এবং ৭৩-৭৫)।

প্রায় ৫-৬ হাজার বছর পূর্বে পাপীদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর এই অভিশাপ ধরায় নেমে এসেছিল। এতদিন পরে আবার সেই গজব ধরায় নাজির হল কেন? বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ যখন এটমবোম ও মিসাইল আবিষ্কার করে ফেলল, এমন কি রকেটে চড়ে চন্দ্রে অবতরণ করতেও সক্ষম হল এবং সেই সঙ্গে টেস্ট টিউব বেবীরও জন্ম দিল, তখন তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করল এবং আল্লাহর অস্তিত্বকেও ভুলে যেতে শুরু করল এবং আল্লাহর প্রদত্ত আইনকে অমান্য করে সীমানা লংঘন করে, নিজেদের খেয়াল-খুশিমত খাও দাও এবং স্ফুর্তি কর। Rat & Drink & Merry এই ধরনের আইন প্রণয়ন করে, শুধু মদ, নারী ও সম্পদ নিয়ে (Wine, Woman & Wealth) ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হতে হতে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তারা ঘরের স্ত্রীর আকর্ষণ হারাল। দারাপুত্র পরিবারের মায়া-মোহ ভুলে গেল, চিরন্তন বিবাহ প্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে। যার যার খুশিমত নর-নারীর সহ-অবস্থানকে আইন দ্বারা সিদ্ধ করে নিল। কিন্তু তাতেও তাদের লোভের শেষ হল না। কোন কোন দেশে তারা, বিশেষ করে ক্যালিফোনিংয়ায়, পুরুষে পুরুষে ঘর বাধার আইন পাশ করার জন্য, মিছিল ও মিটিং করা শুরু করল অর্থাৎ লুত (আঃ)-এর জামানা আবারো ফিরে আসল। এই যখন অবস্থা হল তখন

www.pathagar.com

পরম শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার লাগামকে শক্ত হাতে কষে ধরলেন এবং তিনি মানব জাতিকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, "অমাকারু, মাকারাল্ল্যাহ, আল্লাহু খায়রুল মাকেরীন" (অর্থ্যৎ তাহারা মক্কর করিল, (সুতরাং) আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করলেন (এবং জেনে রাখ যে) আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী। এদ্বারা তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিলেন যে, হে আমার বান্দারা, আমি তোমাদের কত রকম নিয়ামত খেতে দিলাম, আমোদ-স্ফুর্তির জন্য নারী জাতিকে সৃষ্টি করে দিলাম। তারপরও তোমরা খুশি থাকতে পারলে না? ঠিক আছে, তোমাদেরকে মজা দেখাচ্ছি, তোমাদেরকে এমন গজব দেব, যার প্রতিকার নেই এবং সেই গজবই হচ্ছে, ঘাতক ব্যাধি এইডস। এটা এমনি এক ব্যাধি যার কোন চিকিৎসা নেই। যে বৈজ্ঞানিকরা এটম-বোম বানিয়েছে, মিসাইল বানিয়েছে, যারা রকেটে চড়ে চন্দ্রে আরোহণ করেছে, টেস্ট-টিউবে বেবীর জন্ম দিয়েছে, তারা আজ প্রায় চৌদ্দ বছর যাবৎ দিন রাত রিচার্স করে, কোটি কোটি টাকা খরচ করেও এর কোন চিকিৎসা বের করতে পারছে না। আল্লাহ্‌র গজব কি সাংঘাতিক!

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

প্রিয় নবীর জন্মভূমি

মুহিউদ্দীন খান

প্রিয়তম নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্মভূমির নাম আরব দেশ। ওদেশের ভাষায় আ'রব বলা হয় ঐসব লোককে যারা শুদ্ধ সাবলীল ভাষায় কথা বলতে পারে। আ'রব বা বাকপটু মানুষের দেশটিরই নাম দেওয়া হয়েছে 'আরব'। সে দেশের মানুষেরা তাদের ভাষাজ্ঞান নিয়ে এতই গর্বিত ছিল যে, নিজেদেরকে তারা 'আরব' অর্থাৎ কাব্যশৈলী সম্পন্ন এবং অবশিষ্ঠ দুনিয়ার মানুষকে 'আজম' অর্থাৎ ভাষা জ্ঞানহীন নামে অভিহিত করতো।

অন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিত মনে করেন যে, 'আরব' শব্দটি হিব্রু ভাষা থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ মরুভূমি। কারও কারও মতে 'আরাবা' শব্দটির অর্থ গোধুম বর্ণ এবং এরূপ পাত্র বর্ণ বিশিষ্ট লোকের বাসস্থান বলেই দেশটির নাম আরব হয়েছে। অন্য আর এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এ ভূ-খণ্ডে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপনকারী ব্যক্তির নাম ছিল ইয়ারব ইবনে কাহতান। তাঁর নামানুসারেই বিশাল এ দেশটির নামকরণ হয়েছে– আরব।

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানসহ এই ভূ-খন্ডে রেখে যান। তখনকার আরব ভূমিকে পবিত্র কোরআন "কৃষি উৎপাদনহীন উষর উপত্যকা" নামে অভিহিত করেছে। এটা ছিল এ অঞ্চলে সার্বিক অবস্থারই আংশিক চিত্র। প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে নবী হযরত সুলায়মানের যুগেও এ অঞ্চলটি 'আরব' নামেই অভিহিত হতো।

আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত আরব দেশটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়ার সাথে প্রায় সম্পর্কহীন একটি বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ড। অথচ অবস্থানগত দিক থেকে সুপ্রাচীনকাল থেকেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলন-সন্ধিতে বিরাজমান ছিল আরব ভূ-খন্ডটি। এর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, উত্তরে প্রাচীন শাম ও ফিলিস্তিন ভূমি। পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং দজলা-ফোরাতের মিলিত ধারা শাতিল-আরব সংলগ্ন পারস্য দেশ, পশ্চিমে লোহিত সাগর, যার অপর তীরে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত।

দেশটির তিন দিককার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল কর্ষণযোগ্য এবং শস্য -শ্যামল। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত একটি দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী রয়েছে যাকে 'জাবালে-

www.pathagar.com

সারাত' বলা হয়। এই পর্বতশ্রেণী উত্তরে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সুবিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলেও মূলত এই পর্বতশ্রেণী একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতারই অংশবিশেষ।

দেশটির মধ্যভাগে রয়েছে দিগন্তহীন মরুভূমি। সাগর বক্ষের বিশাল উর্মি মালার মতো বালুকাময় টিলায় ভরা মরুভূমিতে সর্বক্ষণ প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত লূ-হাওয়া। সাইমূম বিক্ষুব্ধ এসব মরু অঞ্চল পাড়ি দেওয়া ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার । পূর্ব -দক্ষিণে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বড় মরুভূমিটির নাম রুবউল-খালী ও মধ্যাঞ্চলের বৃহদায়তন মরুভূমি 'নুফুয'। অন্য আরও দু'টি বড় মরুভূমির নাম আদ-দাহনাও বাহিয়াতুশ-শাম। উপদ্বীপ সদৃশ এ বিশাল ভূ-খণ্ডটির মোট আয়তন ১২১৯৭৪৮ বর্গমাইল। দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ গড়ে ৮০০ মাইল। সম্প্রতি এর লোকসংখ্যা দেড় কোটিতে পৌছেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই আরব ভূ-খণ্ডটি চারটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত । এগুলো হচ্ছে তেহামা,নজদ, হেজায ও ইয়ামান।

পশ্চিমাঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত নীচু এবং বেশী উষ্ণ। এ অঞ্চলটিই তেহামা নামে পরিচিতি । পূবাঞ্চলটি সমুদ্রবক্ষ থেকে অনেক উঁচু এবং এ অঞ্চলকে নজদ বলা হয় । তেহামা ও নজদের মধ্যবর্তী পর্বতময় অঞ্চলটি হেজায নামে অভিহিত। ইয়ামানের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূ-খণ্ড।

উপকূলবর্তী একটি এলাকার প্রাচীন নাম ছিল 'আল-আহসা; বর্তমানে ওমান ও বাহরাইন । আদিকাল থেকেই এই এলাকার পার্বত্য এলাকা সীসা, তামা প্রভৃতি খনিজদ্রব্য এবং সমুদ্র উপকূল মুক্তার জন্য বিখ্যাত ছিল। উপত্যকা গুলো ছিল উর্বর এবং উন্নতজাতের ঘোড়া, গরু ও ছাগল পালের চারণ ভূমি । খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এ অঞ্চল ছিল ইরানী সাম্রাজ্যের অধীন। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ অঞ্চলের করদ রাজা মানযার ইবনে সাওয়াকে এক পত্রের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দেন, মানযার তাঁর প্রজাবৃন্দসহ ইসলাম কবুল করেন।

ইয়ামান অঞ্চলটি ছিল দুর্গম পার্বত্য টিলাসংকূল। এটি নজদ-এর সাথে সংযুক্ত। অঞ্চলটি উর্বর ও জনবহুল। দক্ষিণে বিশাল মরুভূমি রুবউল-খালী ও উত্তরে নজদ প্রদেশ । ইসলামের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে অগণিত পুরাকীর্তি ছড়িয়ে ছিল। সেখানকার অধিবাসী বনী হুনায়ফা হিজরী আট সনে হযরত নবী করীমের খেদমতে

www.pathagar.com

প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। এদের মধ্যেই আবির্ভূত নবুওয়্যাতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়ালামাতুল কাজ্জাব প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ)শাসনামলে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী খেতাব প্রাপ্ত হযরত খালেদের হাতে পরাজিত ও উহুদ যুদ্ধে হযরত হামযাকে (রাঃ) হত্যাকারী ওয়াহশীর হাতে নিহত হয়।

নজদ মধ্য-আরবের উঁচু উর্বর মালভূমি এলাকা । সমুদ্রবক্ষ থেকে এর উচ্চতা ১২০০মিটার । অঞ্চলটি তিন দিক থেকে মরুভূমি পরিবেষ্টিত । এ কারণে বহিঃর্বিশ্বের প্রভাব মুক্ত এ অঞ্চলটিই বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির লালনক্ষেত্র রূপে পরিচিত হয়ে আসছে। প্রাচীনতম আরবী কবি 'মুহালহাল' এ অঞ্চলেরই লোক ছিলেন। উর্বর উপত্যকা ও পর্বতের সানুদেশে বিস্তার কৃষি উপযোগী ভূমি ও চারণভূমি রয়েছে। এ অঞ্চলের ঘোড়া ও উট উন্নতমানের এবং সুদর্শনীয় । প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলটিতে কিন্দা রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বংশের শেষ রাজপুত্র আরবের বিখ্যাত কবি ইমরাউল কায়েস। এর পূর্ব দিকে ছিল হাওয়াযেন গোত্রের অধিবাসী । এদেরই এক শাখা গোত্র বনী সাআদে প্রিয় নবীজী (সাঃ) শিশুকালে লালিত পালিত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ অঞ্চলে বনী গাতফান নামক অপর একটি শক্তিশালী গোত্রের বসবাস ছিল। এ গোত্রটি বরাবরই ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়েছে। হিজরী তিন সনের গযওয়ায়ে-আনমার এবং চার হিজরীতে গযওয়ায়ে -যাতুর রেকা' এদের দমন করার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

হেজায বলা হয় লোহিত সাগরের তীরবর্তী উত্তর-দক্ষিণে পর্বতঘেরা একটি অঞ্চলকে। তেহামা ও নজ্দ অঞ্চলের মধ্যস্থলে এর অবস্থান। পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা হেজাযেই অবস্থিত। অবস্থিত বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর জেদ্দা এবং ইয়ামবু। মক্কা থেকে উত্তরে তাবুক পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটিতে এমন এক ধরনের কালো পাথরের গঠিত পর্বতশ্রেণী রয়েছে যেগুলোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পোড়া পাথর বলে মনে হয়। এরূপ পাহাড়ের সংখ্যা প্রায় একশত। পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় কিছু উর্বর ভূমি এবং পশুচারণ ক্ষেত্র রয়েছে। সুপেয় পানির উৎসরূপে রয়েছে পাহাড়ী ঝরনা। এগুলোর আশপাশেই জনবসতি গড়ে উঠেছে। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও কিছু কিছু কর্ষণযোগ্য উর্বর ভূমি রয়েছে।

হেজাযের অধিকাংশ এলাকা উষর মরুময়। এর মধ্যেই চার দিকে পর্বতঘেরা পবিত্র মক্কা নগরীর অবস্থান। এই শহরের নির্মিত আল্লাহ্ তায়ালার উপাসনার লক্ষ্যে মানব জাতির প্রথম এবাদতগাহ। সূচনাতে পবিত্র ঘরটি ছিল শুধু দেয়ালের সমষ্টি। এতে ছাদ, জানালা বা বারান্দা ছিল না। এর দৈর্ঘ্য ছিল ৩২ গজ, প্রস্থ ২৩ গজ এবং উচ্চতা ৯ গজ।

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক পবিত্র গৃহটি পূনঃনির্মিত হওয়ার পর থেকে তাঁর আহ্‌বানে সাড়া দিয়ে লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে এখানে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে সমবেত হতে থাকে। সুদূর অতীত আসাদ তোব্বা নামক জনৈক হিময়ারী বাদশাহ্‌ কাবাঘর প্রথম গেলাফ দ্বারা আবৃত করেন। প্রতি যুগেই এই পবিত্র গৃহটির সম্মান বজায় থাকে।

খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগ থেকেই মক্কানগরী সিরিয়া ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিলরূপে পরিচিত ছিল। কাবাগৃহ পূনঃনির্মিত হওয়ার পর কিছুসংখ্যাক আরব গোত্র এখানে ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে মক্কা একটি গরুত্বপূর্ণ জনবসতি ও বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে।

হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশধরগণের মধ্যে কুসাই নামক এক ব্যক্তি মক্কা কেন্দ্রিক জনবসতির শাসকরূপে আবির্ভূত হন। ইনিই কোরাইশ গোত্রের প্রথম স্থপতি। কুরাইশদের জনৈক ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ সাঈদ ইবনে ওমর মক্কানগরীতে প্রথম ইমারত নির্মাণ করেন।

প্রাচীন আরবী ভাষায় কুরাইশ শব্দের অর্থ বণিক। কুরাইশদের বিশাল আকৃতির বাণিজ্য কাফেলা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত এবং শীতকালে ইয়ামানের দিকে যাত্রা করতো। এসব বানিজ্য কাফেলা কোন কোন সময় সহস্রাধিক উট বোঝাই পণ্যসামগ্রী এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে নিয়ে যেতো। ইয়ামানের সানআ ও মায়ারেবের বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে এবং এডেন ও আম্মানের সমুদ্রবন্দরে হাবশা ও দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপাঞ্চল থেকে আমদানিকৃত নানান মসলা দ্রব্য, সুগন্ধী, উন্নতমানের বস্তুসামগ্রী কুরাইশ বণিকদের মাধ্যমেই সমগ্র আরব, শাম ও মিসর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতো। অপর দিকে দামেস্ক, বস্‌রা প্রভৃতি উত্তরের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো থেকে এরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী, শুষ্ক ফলমূল, সুতীবস্ত্র, বিভিন্ন ধাতুনির্মিত পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সুগন্ধী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে এবং দক্ষিণের প্রসিদ্ধ মেলাগুলোতে হাজির করতো। আরবরা নিজস্ব পণ্য পশুর চামড়া, পশম খনিজ তৈল, লোবান, মূল্যবান পাথর এবং উন্নতমানের ঘোড়া ইত্যাদি উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিতো। কুরাইশদের এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা স্বয়ং আল্লাহ পাক কোরআনেও উল্লেখ করেছেন। তাদের এই লাভজনক নিরাপদ বাণিজ্য যাত্রার পিছনে পবিত্র কাবাগৃহের সেবা এবং ধর্ম নগরী মক্কার অধিবাসী হওয়ার বিষয়টি ছিল বিশেষ অগ্রগণ্য। সমগ্র আরব জাহানেই কাবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কুরাইশদের একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল।

www.pathagar.com

মক্কার উপকণ্ঠে আরাফাত ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে ওকায নামক স্থানে প্রতিবছর একটা বড় ধরনের মেলা বসতো। এটি ছিল আরবের সর্বাপেক্ষা বড় মেলা। এটা সর্বাধিক বাণিজ্যিক লেনদেন ছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি, কবি-সাহিত্যিক, বক্তা, কুস্তিগীর, ভবিষ্যৎ বক্তা প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর সেরা প্রতিভার সমাগম হতো। সব ধরনের পণ্যসামগ্রীর বিপুল সমাবেশ ঘটতো এসব মেলায়। সাথে সাথে চলতো বিভিন্ন প্রতিভাধরদের প্রতিযোগিতা। কুস্তি-লড়াই, তীর-ধনুক, তরবারী, বর্শা নিক্ষেপ, ঘৌড়দৌড়, উটের দৌড় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো বিপুল উৎসাহে। সর্বাপেক্ষা বড় লড়াই হতো বাক্য প্রতিভার। সে যুগের আরবরা কবিতার খুব বড় সমঝদার ছিল। কোন গোত্রে একজন ভাল কবির আবির্ভাবকে তারা সর্বাধিক গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করতো। কারণ, কবিরাই ছিল সে যুগের সর্বশ্রেণীর মানুষের হাসি-কান্না, পিতৃপুরুষের গৌরব গাঁথা এবং দুঃখ-বেদনা প্রকাশের সর্বাপেক্ষা বড় মাধ্যম। বর্তমান সমাজে একটি শক্তিশালী সংবাদপত্র যে ভূমিকা পালন করে থাকে, তখনকার একজন শক্তিমান কবিকণ্ঠকে তাই মনে করা হতো। মনোত্তীর্ণ এক একটি কবিতাকে তারা দৈব বাণীর মত সম্মান করতো।

প্রিয়তম নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের ঠিক আগেকার সময়টিকে আরবে কাব্য চর্চার সোনালী যুগ বলে গণ্য করা হয়। তখনকার যে কবিতাগুলো সার্বজনীনভাবে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতো সেগুলো রেশমী কাপড়ে লিখে পবিত্র কাবাগৃহে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এরূপ সাতখানা দীর্ঘ কবিতা "সাবআয়ে মোয়াল্লাকাত" নামে এখনও পর্যন্ত প্রাচীন আরবী সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ নমুনারূপে খ্যাত হয়ে রয়েছে। শুধু আরবী সাহিত্যই নয়, 'সাবআয়ে মোয়াল্লাকাত' গুলো বিশ্ব সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সাতটি বিখ্যাত কবিতার রচয়িতাগণের মধ্যে লবীদ ইবনে রবীয়া আল আমেরী প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সাক্ষাতলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গোত্র কবীলা জাফর ইবনে কেলাবের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় হাজির হয়েছিলেন এবং পবিত্র কোরআনের ভাষাশৈলীতে অবিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ কবি কণ্ঠরূপে তাঁর মর্যাদা তখন এতই উচ্চে ছিল যে, সাধারণ মানুষ তাঁর কোন কোন কবিতা শুনে ছেজদায় পড়ে যেত। লবীদ আমেরীর (রাঃ) একটি কবিতা খোদ নবী করীম (সাঃ)-এর খুবই পছন্দনীয় ছিল। অনেক সময় কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি নবীজীর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হতে শোনা যেতো। পংক্তি কয়টির ভাবার্থ ছিল নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

"সব মানুষই তার যাবতীয় কর্মপ্রয়োগের ফলাফল তখনই জানতে পারবে, যখন আল্লাহ তায়ালার সামনে তা প্রকাশিত হবে। স্মরণ রেখো .যা আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়, সে সব কিছুই নিরর্থক "। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় .যে , স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ছিলেন কাব্য সাহিত্যের একজন সর্বোত্তম যোদ্ধা ও শুদ্ধভাষী ব্যক্তি । তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যই (হাদিস) সর্বকালের আরবী ভাষার শুদ্ধতম নমুনা! কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) বাণী হচ্ছে ঃ "কাব্য কথার মধ্যে যে গুলো মানুষের মনে উত্তম প্রেরণা সৃষ্টি করে , সে গুলো নিঃসন্দেহে উত্তম এবং যেগুলো মন্দের দিকে প্ররোচিত করে, তা অবশ্যই মন্দ।"

অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছেন, "নিঃসন্দেহে কাব্য কথার মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা লুকায়িত থাকে।

প্রাচীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে মেলার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। শতধা বিক্ষিপ্ত গোত্র ও অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক সম্পৃক্ততা ছিল অত্যন্ত গভীর। দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই মওসুমী পণ্য মেলা অনুষ্ঠিত হতো এবং সেগুলো মাসাধিককালও চলতো। সেসব মেলায় সমগ্র আরবের বণিকগণ স্ব স্ব অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য নিয়ে হাজির হতো। পণ্য বিনিময় এবং নগদ ক্রয়-বিক্রয় চলতো। এভাবেই এক অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য অন্য অঞ্চলে চলে যেতো।

শাম ও হেজাযের মধ্যবর্তী দাওমাতুল জন্দল নামক স্থানে রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে মেলা শুরু হতো। মাসাধিককাল এখানে বেচা-কেনা চলতো। এই মেলার পণ্য নিয়ে বণিকদের কাফেলা বাহরাইনের 'মুশাককার' নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে যেতো। সেখানকার মেলা জমাদিউস্সানী পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। এখানে ইরানের বণিক দলও যোগ দিত। এই মেলা শেষে পাঁচ দিনের আর একটি মেলা বসতো উমানের বন্দরনগরী সাহ্হারে। অতঃপর রজবের শেষ পর্যন্ত দাববায় মেলা চলতো। সব বন্দর নগরীগুলোর মেলায় ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু মালাবার, এমন কি চীনের সামুদ্রিক বাণিজ্য বহর সমবেত হতো। এর জের চলতো শামের ও আদন বন্দরে রমযান মাসের প্রায় শেষ অবধি। রমযানের পর থেকে সানআয় পনেরো দিন এবং তারপর হাযরামউত, রাবিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিখ্যাত মেলার বাণিজ্য শেষে কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যিলক্বদ মাসের প্রথমে ওকাযে পৌঁছতো। যিলহজ্ব মাসে হজ্বের মওসুমে মক্কার উপকণ্ঠে যিল-মাজায ও মিনায় মেলা বসতো। হজ্বের মওসুম এবং মহররম ও রজব ছিল পবিত্র মাস। চারটি পবিত্র মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সবধরনের রক্তপাত ও আগ্রাসন নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণে

www.pathagar.com

হজ্বের সময়ে মক্কার যিল-মাজায, মিনা এবং ওকাযের মেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি ভীড় হতো।

মহরম মাসের দশ তারিখ থেকে উত্তরের জনপদ খায়বারে মেলা শুরু হতো। সেখান থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে বণিকদের কাফেলা ইয়ামামা ও বস্‌রার দিকে চলে যেতো। মক্কা ছাড়াও তখনকার আরবের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য শহর ছিল তায়েফ এবং শামের বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার পথে ছিল ইয়াস্‌রাব। এটা ছিল মূলত ইহুদী ব্যবসায়ীদের আবাসস্থল। যা পরে 'মদীনাতুন-নবী' বা মদীনা নামে পরিচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আরবের বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রিয়তম নবী (সাঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত বানিজ্য কাফেলা নিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছেন। বাণিজ্য স্থানগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ পরিচিতি পরবর্তীতে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলে সীরাত লেখকগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় নবীজীর (সাঃ) আবির্ভাবের সময়কার আরবের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল ইয়ামানই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও শস্য-শ্যামল ছিল। এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। ফল-ফসলের সমাহার ছিল। আরবের সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বতমালাও এ অঞ্চলেই অবস্থিত। এসব পর্বতের কোন কোনটির শৃঙ্গ ১৩-১৪ হাজার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ঠ। পবিত্র কোরানের উল্লেখিত নবী-রাসুলগণের অনেকেই এ অঞ্চলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। অঞ্চলটি হাযরামাউত, বেলাদুল-আহকাফ, নাজরান, সানআ প্রভৃতি এলাকায় বিভক্ত ছিল। প্রাচীন আরবের সুসভ্য জনগোষ্ঠী সাবা গোত্রের লোকদের অধিবাস ছিল মাআবের নগরীতে। এখানেই ইতিহাস বিশ্রুত আরেম নামক ভয়াবহ বানভাসি সংঘটিত হয়েছিল। এই বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার তোড়ে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। লোকজন এ অঞ্চলের বসতি ত্যাগ করে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। নাজরান নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল আসহাবুল-উখদুদের লোমহর্ষক ঘটনাটি। পবিত্র কোরআনে যার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আহকাফ নামক অঞ্চলে প্রাচীন কওমে আদ-এর আবাসস্থল এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই শাদ্দাদ নামক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ রাজত্ব করতো। ওরা মাটির পৃথিবীতেই কৃত্রিম বেহেশ্‌ত নির্মাণ করেছিল। এ অঞ্চলের মরুভূমিগুলোতে এখনও সে যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

হাযরামউত এলাকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন হযরত হুদ আলাইহিস সালাম। তাঁর মাযারও এখানেই অবস্থিত। সমগ্র ইয়ামানের কেন্দ্রভূমি সানআ বহু প্রাচীন শহর।

www.pathagar.com

দেশের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং উর্বর ভূমির কারণে ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই এখানে সভ্যতার সূতিকাগার গড়ে উঠেছিল। পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রবাহিত অসংখ্য প্রাকৃতিক ঝরনা এবং বৃষ্টির পানি ধরে রেখে কৃষিকার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সানআ বাসীগণ বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করেছিল। এ সবেরই একটি ছিল কোরআনে উল্লেখিত সদ্দে মা'আরেব। আদন বা বর্তমান এডেন বন্দরের উপকণ্ঠে ছিল সাবার রাণী বিলকিসের রাজধানী। এ অঞ্চলের সুগন্ধী কাষ্ঠ, লোবান ইত্যাদি আদিকাল থেকেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়ও ইয়ামান ছিল সমগ্র আরবের পথিকৃৎ। মাঈন, সাবা এবং হিময়ার জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করেছে। এদের নির্মিত ইমারত, বাঁধ, সেতু ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ এখনও পর্যন্ত যা অবশিষ্ট রয়েছে তা থেকে সভ্যতা নির্মানের সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলোর পারদর্শিতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

নাজরান খৃষ্ঠধর্মের সূচনাকাল থেকেই এ ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটেছিল। এখানেই আরব জাহানের সর্বাপেক্ষা বড় গীর্জা নির্মিত হয়েছিল। এটাকে খৃষ্টানেরা 'কাবাতুন নাজরান' বলতো। এই নাজরানের গীর্জা থেকেই একদল পাদ্রী প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল। তাদের মোকাবেলায় প্রিয় নবীজী (সাঃ) মোবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলেন। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

আবরাহাতুল আশরম নামক বিখ্যাত খৃষ্টান শাসক সান'আতেও একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করেছিল। সে গীর্জাটির গুরুত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই আবরাহা বিপুল সংখ্যক হাতী সাওয়ার একটি বাহিনীসহ পবিত্র কাবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কা উপকণ্ঠ পর্যন্ত চড়াও হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহপাক বিশালদেহী হাতীর বাহিনী ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রাকারের এক প্রকার পাখীর বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। পাখীগুলোর দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথর কণার আঘাতেই হস্তী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী হয়েছিল। এই ঘটনা প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের জন্মের চল্লিশ দিন আগে সংঘটিত হয়েছিল।

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ঈদ-ই-মিলাদ-উন-নবী (সাঃ)

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

হযরত রসুল-ই-আকরামের (দঃ) জন্ম ইন্তেকালের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে মুসলিম জাহানে-উৎসব পালন করা হয়। এজন্য একে বলা হয় ঈদ-ই-মিলাদ উন-নবী। সাধারণতঃ তার জন্ম উপলক্ষে এ উৎসব পালন করা হয়। এর উৎসবের প্রবর্তন হয়েছে আব্বাসীয় তথাকথিত খলিফা আল-আল রশিদের সময়। এ হারুন আল রশিদ তাদের বংশের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত রসুল আকরামের (দঃ) আওলাদের মধ্যে ত্রিশ হাজার সৈয়দ বংশীয় লোককে হত্যা করিয়েছিল। মুসলিম জাহানে তার নামধামের শোহরত প্রকাশ পায় আল্লাফ লায়লা অর্থাৎ আরব্য হাজার রজনীপ্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। এতে তার রাজত্বে যে সব অত্যাচার, অনাচার ও কুৎসা হত, তা রূপকের আকারে প্রকাশ করে তখনকার দিনের বাগদাদবাসী লেখকগণ তাকে অমর করে তুলেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী জীবনধারা থেকে তখনকার দিনের মুসলিম সমাজ অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে খোলাফা-ই রাশেদীনের পরে উম্যাইয়া বংশীয় আমির মোয়াবিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম সমাজ ইসলামী রীতিনীতি আইন কানুন-প্রভৃতি থেকে সরে যেতে আরম্ভ করে এবং দামেস্কে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সে বংশের লোকদের মধ্যে নানাভাবে ইসলাম বিরোধী কার্য্য কলাপ শুরু হয়। এ বংশের মধ্যে একমাত্র উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ব্যতীত কেউ সর্বাংশে ইসলামী আইন কানুনের পারদর্শী ছিলেন না। এ জন্য তাকে পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়। এ বংশের লোকদের আব্বাসী তথাকথিত খালিদ জা'ফর মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হলে তারা বনি উমাইয়্যাদের লাশ কবর থেকে তুলেও পুড়িয়ে ফেলতেন। যে সব লাশ পাওয়া যেতোনা -সে সব ক্ষেত্রে তাদের হাড্ডি তুলেও পুড়াতো এবং কোন কিছু না পাওয়া গেলে খালি কবরেও আগুন জ্বালিয়ে দিতো। এ গুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। অথবা এসব কাজের হোতা আব্বাসীগণই এক সময় মুসলিম সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধভাজন হয়েছিলেন। আব্বাসী বংশের খলিফা আল-মামুন জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অগ্রসর করার জন্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎকালীন ভারত থেকেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের জাহাজ যোগে বাগদাদে নিয়েছিলেন। এতে তাদের রাজত্ব কালে বাগদাদে যে মুসলিম সমাজ অগ্রসর হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ইসলামী জীবনধারা থেকে তারা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। ঈদ--মিলাদ-উন নবী তাদের দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল তখনকার দিনের মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন। মিলাদ উন নবীর তো কোন প্রযোজনীতা তো খোলাফা-ই রাশেদীনের সময় ছিল না। কারণ তারা হযরতের প্রশংসা কেন তার চরিত্র এবং গৌরবের সংস্পর্শ দিবারাত্রি সব সময়ই পেতেন।

www.pathagar.com

হযরতের ইন্তেকালের পরে একজন সাহাবা হযরত আয়েশা সিদ্দিকার নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করেছিলেন, -আম্মা, আপনি হযরতের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন। এতে বিজ্ঞ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছিলেন, তোমরা কি কুরআন পাঠ করনা? তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত কুরআন। তিনি কুরআনের প্রতীক অর্থাৎ তা জীবনে রূপায়িত করেছিলেন। কাজেই যারা রীতিমত কুরআন পাঠ করে তারা হযরতের প্রশংসা কুরআন থেকেই রোজ লাভ করে। এরূপ ঘটা করে তার আয়োজন করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এত দীর্ঘকাল পরে তার জীবনীকে প্রকাশ করারও একটি মূল্য রয়েছে। এতে তার জীবনের মূল্যবান দিকের যদি আলোচনা হয় তাহলে সত্যিকার মুসলিমেরা সেদিক গুলো তাদের জীবনে রুপায়িত করার চেষ্টা করবে। যে চেষ্টার ফলেই তারা প্রকৃত মানবতাবাদী হয়ে এ বিশ্বে শীর্ষ স্থান লাভ করবে। আল্লাহ বলেছেন, "তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ" "আল্লাহর গুনে গুনান্বিত হও"। মুসলিম মানেই জীবনের কাম্য হিসাবে তাঁরা আলাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। ইকবাল সত্যি বলেছেন, এ দুনিয়াতে আল্লাহ তার রসুল (দঃ) কে পাঠিয়েছেন প্রধান শিক্ষকরূপে কুরআনকে নির্দেশিকারূপে এবং তাদের একান্ত বাসনা হচ্ছে, এ দুনিয়ার মানুষকে রসুলের পথে (দঃ) পথে মর্দ্দে মুমিন বা ইনসান–ই–কামিল করে তুলা। ইনসান-ই কামিল হলেই তাদের জ্যোতি ফেরেশতাদের চেয়ে আরও উজ্জ্বল হবে এবং তারাই এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে, তখনই মানুষের মধ্যে প্রেমপ্রীতি ভালরাসা ও সৌহাদ্ধের সৃষ্টি হয়ে তাদের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক বা ভৌগলিক যে জাতীয়তার উৎপত্তি হয়েছে তা সম্পুর্ণ ভাবে নির্মূল হয়ে একটা বিশাল ও বিপুল জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা একে অপরের হিত ও কল্যাণ সাধনে তৎপর হবে। ঈদ-ই-মিলাদ-উন নবীতে সে আদর্শ মানুষ তৈরি করার জন্য সে চেষ্টাই এ দুনিয়ায় হচ্ছে। অতএব এ বিষয়কে সাম্প্রদায়িক বিষয় বলে গণ্য না করে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় বলে গণ্য করা উচিৎ।

মুসলিম সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে হযরত সাদী ইন্তেকালের পরে এক বুজুর্গ স্বপ্নে দেখেন, হযরত রসূলের ডান হাতের কব্জীর উপরে একটা বুলবুল বসে সুর ধরে বলছে–বালগাল উলা বিকামালিহী কাসাফাদ দুজা বেজামালিহী ,হাসুনাত জামি খিছালিহি সাল্লু আলাইহি আলিহী। বুজুর্গের কাছে তার ব্যাপারে গেলে তিনি বলেন, এ বুলবুল হচ্ছে, হযরতের সঙ্গী। আল্লাহর রসুলের গুনাবলী বর্ণনা করছেন। আমাদের পক্ষে কর্তব্য, প্রত্যেকেই সে গুনাবলী এখতিয়ার করে বৃহৎ মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ জগতে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

[সীরাত স্মারক '৯৬-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন ও হাদীস বিজ্ঞানের আকর

আমিরুল ইসলাম মিফতাহ

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন পাকে ইরশাদ করেন, এটি (কুরআন) একটি কল্যাণময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন মানুষ বাক্য (আয়াত) সমূহ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তাভাবনা করে আর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।"(সুরায়ে ছোয়াদ-১৯)

আল্লাহ আরও ফরমান, তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' (সূরা-মুহাম্মদ)

কুরআনে এরূপ বহু আয়াতে আল্লাহ পাক কুরআনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কতক মূর্খ নাস্তিক-মুরতাদদের আবির্ভাব ঘটেছে যারা কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা না করে কুরআনকে বিজ্ঞান বিরোধী এবং সেকেলে গ্রন্থ আখ্যা দিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করে থাকে। কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অনেক বিধর্মী মুসলমান হলেও এসব নাস্তিক -মুরতাদের হৃদয় কুরআনের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। কারণ তারা পরিত্র কুরআনের ভাষায় পঞ্চ ইন্দ্রীয় শক্তিহীন জড় পদার্থ। ইরশাদ হচ্ছে " তারা বধির ,মূক ও অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।"(২:১৮)

তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অজ্ঞ নাস্তিক মুরতাদদের চোখে (কুরআনের ভাষায় যদিও তাদের চোখ নেই) আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই যে, কুরআন বিজ্ঞান বিরোধী নয়, বরং কুরআনই সকল বিজ্ঞানের মূল আকর । কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা বর্তমান বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র চৌদ্দশত বছর আগেই নিখুঁতভাবে ঘোষনা করেছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান আবিস্কার করছে। দুটোর কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ নিম্নে পেশ করছিঃ

১. অনেক গবেষণার পর বিজ্ঞান বিদ্যুৎকে বিশ্লেষণ অযোগ্য বলে ঘোষণা করল। অথচ আল কুরআন বিদ্যুৎ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে "তিনিই মহান সত্তা যিনি তোমাদের বিদ্যুৎ চমক দেখান ভীতি ও আশা সহকারে। তিনি ঘন মেঘ সঞ্চার করেন। বজ্র তারই মহিমার জয় ঘোষণা করে এবং ফেরেশতারা তাই করেন ভয়ে-ভক্তিতে। তিনি ঘটিয়ে থাকেন বজ্রপাত। আরও ইরশাদ হচ্ছে "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ পাক মেঘমালাকে ধীরে ধীরে চালিত করেন, তারপর তাদের একত্রিত করেন, আর তাদের করেন স্তুপীকৃত এবং তোমরা দেখতে পাও, তার মধ্যে থেকে ফোটা ঝরতে থাকে। তিনিই প্রেরণ করেন আকাশ, পাহাড় হতে শিলাবৃষ্টি। তিান এর দ্বারা আঘাত হানেন যাকে ইচ্ছা। আর যাদের ইচ্ছা করেন, সংরক্ষণ করেন।"

www.pathagar.com

২. বিজ্ঞান আবিষ্কার করল, পৃথিবী কোন এক পয়েন্ট হতে আপন কক্ষ পথে ঘুরে আবার ঐ পয়েন্টে আসতে আসতে আনুমানিক ৩৬৫দিন লাগে, আর এ সময়কে পৃথিবীর এক বছর বলা হয়। এভাবে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের বছর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন–একটি নক্ষত্র আছে তার কোন এক পয়েন্ট হতে ঘুরে সেই পয়েন্ট আসতে উনত্রিশ বছর লেগে যায়। আর ঊনত্রিশ বছরই ঐনক্ষত্রের জন্য এক বছরই ঐ নক্ষত্রের এক বছর হয়। তেমনি ইউরেনাসের বছর আমাদের হিসেবে ৮৪ বছর হয়। নেপচুনের বছর আমাদের একশ চৌষট্টি বছরে। অন্য নক্ষত্র আছে, যার বছর সম্ভবতঃ এক বছর পঞ্চাশ হাজার বছরের ন্যায় হয়ে থাকে। কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগে আল কুরআন ঘোষণা করেছে, ইরশাদ হচ্ছে, "তোমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের গণনা মতে, হাজার বছরের একদিন আছে।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে"কিয়ামত এমন একদিনে হবে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (সূরা লাওয়ামাহ) উক্ত আয়াতগুলো ঐ সব রহস্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করে।

৩. পানির গতিপথ (বিজ্ঞানের ভাষার ওয়াটার সাইকেল) সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই মানুষের বিভিন্ন ধরনের ধারনা ছিল। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক অভিমত প্রকাশ করেছে। অবশেষে ১৫৮০ সালে বানার্ড প্যালিসি ওয়াটার সাইকেল সম্পর্কে বিজ্ঞানের পুরাতন মতবাদ খন্ডন করে সুস্পষ্ট মতবাদ প্রকাশ করেন। সতের'শ শতাব্দীতে এসে ম্যারিয়াকি ও পিপ্যারলটের দ্বারা তা সত্য প্রামাণিত হয়। বানার্ড প্যালেসি দাবী করেন যে, ভূগর্ভস্থ পানির উৎস হল মাটি এবং বৃষ্টির পানি। কিন্তু সেই মধ্য যুগের আল–কোরআন একটা বিজ্ঞানহীন জাতির উপর নাযিল হয়ে ঘোষনা করে- ইরশাদ হচ্ছে "আমি আকাশ হতে পানি বর্ষিয়ে থাকি পরিমান মত এবং স্থান দেই তা জমিনের বুকে এবং তা সরিয়ে নেয়ারও দক্ষতা রাখি।"(২৩ঃ১৮,১৯)

৪. আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, যাবতীয় জীবন্ত কিছু তো বটেই এমন কোন জড় পদার্থ নেই যা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়নি। এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণায় জোড়া ভিত্তিক সৃষ্টির কৌশল আবিষ্কৃতি হয়েছে, অথচ-মহাগ্রন্থ আল কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে বিশ্ব বাসীকে চমক লাগিয়ে ঘোষণা করেছে। এরশাদ হচ্ছে– " সকল গৌরব তাঁরই, যিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছু জোড়ায় জোড়ায়,তা মাটি হতে উৎপন্ন হোক, তাদের (মানবজাতির) হোক, কিংবা হোক সেই সব যা তারা জানে না(৩৬ঃ৩৬)

৫. চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মধু কোন কোন রোগের মহৌষধ। কিন্তু

আল কোরআনে মৌমাছির নামে একটি স্বতন্ত্র সুরাই অবতীর্ণ হয়েছে। মধু সম্পর্কে আল-কুরআনের ঘোষনা হচ্ছে-"তাদের (মৌমাছির) দেহ হতে নির্গত হয় নানা ধরনের পানীয় যাতে আরোগ্য রয়েছে মানুষের জন্য। (১৬ ঃ ৬)

৬. আধুনিক জীব বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার করল যে, পৃথিবীর সকল প্রাণের উৎস হল পানি। পানি হচ্ছে জীবন্ত জীবকোষ গঠনের প্রধান উপাদান। পানি ছাড়া জীবন আদৌ সম্ভব নয়। জীব বিজ্ঞানের তথ্য দ্বারা বুঝা যায়, পৃথিবীতে জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শনের প্রথম হচ্ছে উদ্ভিদ জগৎ আর পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদই হচ্ছে এক ধরনের সামুদ্রিক আগাছা বা শ্যাওলা যে গুলো আলজে নামে পরিচিত, অথচ কোরআন অনেক আগেই বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে ঘোষনা করেছে, অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করেনি, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিলিত ছিল। পরে আমি তাদের পৃথক করেছি এবং প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে বের করেছি পানি থেকে তারপরেও কি তারা বিশ্বাস করে না?(২১ ঃ ৩০)

৭. বর্তমান বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, পৃথিবী এমন একটি গ্রহ যা পানি সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এই পানি থাকার করণেই গোটা সৌরমন্ডলে গ্রহ হিসাবে পৃথিবী সম্পূর্ন একক। কিন্তু বিজ্ঞান ঘোষণা করার বহু পূর্বেই কোরাআন ঘোষনা করেছে, ইরশাদ হচ্ছে- তিনিই সে সত্তা , যিনি পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী বানিয়েছেন এবং তার মধ্যবর্তী স্থানে নদী প্রবাহিত করেছেন। পর্বতসমূহ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন, প্রতিন্ধকতা স্বরুপ দুইসাগেরের মধ্যে আছে কি কোন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত -কেউ জানে?

৮. আধুনিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী পৃষ্ঠের ভাঁজের উপর ভিত্তি করে পর্বতসমূহ দন্ডয়মান। আর এ সব ভাঁজের আয়তন মোটামুটি দশমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। অথচ কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে, ইরশাদ হচ্ছে-পর্বতমালা সমূহ আল্লাহ গেড়ে দিয়েছেন দৃঢ়ভাবে। (সূরায়ে আন নাজিয়াত, আয়াত-৩২)

৯. পৃথিবী ঘোরে না স্থির আছে, এ নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও কেম্পর্নিকাস প্রমুখ ষোড়শ শতকে আবিস্কার করল, পৃথিবী সূর্যের চর্তুদিকে ঘুরে। কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা তো ভাবছ পাহাড়, আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সে মেঘের ন্যায় অদৃশ্যভাবে নড়া চড়া করেছে।

১০. মাত্র উনিশ'শ সতের সালের দিকে আধুনিক বিজ্ঞান জানাতে পারলো যে, আমাদের ছায়াপথ ও সূর্যেরও একটি কক্ষ পথ বা গতি পথ আছে। কিন্তু আল

কোরআন চৌদ্দশ বছর আগে এমন তথ্য প্রদান করেছে, যে সম্পর্কে তখন কিছুই জানা ছিল না। ইরশাদ হচ্ছে-কসম করছি সূর্য ও তার আলোর এবং চাঁদের যখন সে তার পিছে পিছে এবং দিনের যখন সে সূর্য্যের আলোতে গরমের সৃষ্টি করে। এবং রাতের যখন সে তার আলোকে ঢেকে ফেলে। (সুরাহ শামছ–১-৪)

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন, সূর্য কখনো ধরতে পারে না চাঁদকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করতে পারবে না দিবসকে। প্রত্যেকই পরিভ্রমণে নিয়োজিত নিজ নিজ কক্ষ পথে, নিজস্ব গতিবেগ সহকারে। (৩৬ঃ৪৩) তোমাদের জন্য আল্লাহ্ অধীনস্থ করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। তারা শক্তিহীণভাবে চলছে, আপনাপন কক্ষ পথে এবং তোমাদের জন্য তিনি অধীনস্থ করেছেন রাত্রি ও দিবসকে (সুরা -৩৩)

আমরা লক্ষ্য কললে দেখতে পাই কোরআনের আয়াত সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে রাসুলের অগনিত হাদিসে। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের আমল সমূহে আমরা এমন সব বিজ্ঞানের সূত্র খুজে পাই তাতে বলতে হয় আল কোরআন ও আল হাদীস হচ্ছে বিজ্ঞানের আকার।

[সীরাদ স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ)-এর মানব প্রেম

ডঃ আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও প্রেমের কারণে যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের দিক নির্দেশনার জন্য তিনি ১/২ লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ যিনি, সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন এই পৃথিবীতে তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম। পার্থীব জীবনের প্রারম্ভে ধাত্রী মা হালিমার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন সময়ে যেমন মানব প্রেমের নির্দশন দেখিয়ে দু' ভাইয়ের জন্য একটি স্তন রেখে দিয়ে অপরটি গ্রহণ করতেন, তেমনি নির্যাতিত, নিপিড়ীত মানুষের কল্যাণ ও সাহায্যের জন্য কিশোর বয়সে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'হিলফুল ফুযুল'। আর ঠিক একইভাবে নবুয়্যত প্রাপ্তির পর মানব জীবন তথা নবুয়্যত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মহাপবিত্র লগ্নে মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল মি'রাজেও মানব প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্দশ স্থাপন করেছিলেন তিনি। আল্লাহ তা'য়ালা যখন এক বচন ব্যবহার করে তাঁকে আসলামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবী অর্থাৎ 'হে নবী আপনার প্রতি শান্তির বাণী সালাম বর্ষণ করেছিলেন সে রহস্যময় জগতের সর্বোত্তম লগ্নে তিনি মানুষের প্রতি তার দয়া ভালবাসায় কথা ভুলেলেনি। তিনি মহান আল্লাহর এই শান্তির বাণী তার একার জন্য গ্রহণ না করে সকল সত্যানুসন্ধানী মানব মন্ডলীর জন্য গ্রহণ করে বলেছিলেনঃ আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। অর্থাৎ আমাদের সকলের জন্য এবং সত্যানুসারী সকল মানুষের জন্য সালাম (শান্তির বানী) গ্রহণ করছি (হে প্রভু)। তাইতো বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর শানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছিলেন ঃ

অর্থাৎ- 'হে রাসুল (রাঃ) আমি আপনাকে দু'জাহানের রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।

আর এটা হলো সকল মানব-মহামানব তথা সকল নবী ও রাসুলের উপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর শ্রেষ্ঠত্ব। মহানবী (সঃ) এর পূর্বের নবী রাসুলগণের জীবনে দেখা যায়, যখন তারা সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নির্যাতিতও অত্যাচারিত হয়েছেন তখন অনেকেই অত্যাচারীদের শাস্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছেন। আর মানবতার নবী আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (সঃ)যখন অবিশ্বাসীদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন, তখন তাদের হেদায়েতের বা সত্য মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেছেন।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ মহাশান্তির প্রতিচ্ছবি, মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেমের প্রতীক, বিশ্বনবী মানবতার নবী, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ পৃথিবীতে আবিভুত হয়েছেন মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত বা দয়া হিসাবে, তাই তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে নয়। প্রশ্ন হতে পারে যদি প্রেম ভালবাসার মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়ে থাকে তাহলে ইসলামের ইতিহাসে এমনকি মহানবী (সাঃ) -এর জীবদ্দশাতেও এতো যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল কেন? এই বিষয়ে একেবারে সরাসরি বলতে গেলেও বলতে হবে মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশায় তথা ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (সঃ) বা মুসলমানদের দিক থেকে কোন আক্রামণাত্মক যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে সকল যুদ্ধই পরিচালিত হয়েছিল আত্মরক্ষামূলক এবং যুদ্ধের মাধ্যমে কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলাম গ্রহণে রয়েছে, মহানবী (রাঃ)-এর মানব প্রেম,মানবতা বোধ সুকোমল আচরন আর পরবর্তীতে তার চরিত্রের সঠিক অনুসারীদের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি অবিশ্বাসীরা মহানবী (সঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছে। তার প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। এমনকি মক্কা থেকে হিজরতের প্রাক্কালে তাকে হত্যা করার জন্য পিছু ধাওয়া করেছে। শুধু তাই নয় মদীনা আগমণ করার পর মদীনা আক্রমণ করেছে। কিন্তু মানব প্রেমিক মহানবী (সাঃ) জাতি, ধর্ম নির্বেশেষে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান, ইহুদী সমন্বয়ে সকল মানুষের মানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ করে রক্তক্ষয়, বিবাদ ও হানাহানি থেকে বিরত রেখে তাদের শান্তি ও কল্যানের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সন্ধি চুক্তি 'মদীনার সনদ' (Charter of Madina) লিপিবদ্ধ করেন। যার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। মানবপ্রেমের মাধ্যমে শান্তির এই প্রক্রিয়া তিনি শুধু আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বিশ্বমানবতার কল্যানের জন্য ৬ষ্ট হিজরী তে(৬২৮ খ্রীঃ) তিনি স্বাক্ষর করলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তজার্তিক পর্যায়ে সর্বপ্রথম লিখিত সন্ধি চুক্তি যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে আখ্যায়িত। এই সন্ধির প্রতিটি ধারা মুসলমানদের বিপক্ষে হওয়া সত্ত্বেও মানব সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহানবী (সঃ) কে রাসুলুল্লাহ না লেখা শর্তেও মানব প্রেম ও মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে তিনি নিদ্ধিধায় তাতে স্বাক্ষর করলেন। শুধু তাই নয়, তার যে মাতৃভূমি মক্কা থেকে তাকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ৮ম হিজরীতে সেই মক্কা বিজয়ের পর প্রতিশোধের পরিবর্তে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং মক্কা তথা আরবের সকল মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার নিশ্চয়তা বিধান করলেন।

www.pathagar.com

আসলে মহানবী (সঃ) এর প্রতি মানুষ তথা সকল সৃষ্টির আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল সকলের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রেম। আর মনের পবিত্রতার মাধ্যমে ঐকান্তিক প্রেম না হলে ঈমান হয়না, মুমিন হওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ **ওয়াল্লিযিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ** অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তাদের সর্বাধিক প্রেম হবে আল্লাহরই জন্য । আর আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক প্রেম হলে আগে তার সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও ভালবাসা হতে হবে। তাই মহানবী (সঃ) ছিলেন মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেমের মহান প্রতীক। আর এই প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন। আকৃষ্ট করেছেন মানব জাতিকে সত্যের প্রতি, সুন্দরের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি, ইসলামের প্রতি।

আমাদের প্রায় সবার জন্য ছোট্ট দু'টি ঘটনার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) -এর সুন্দর ব্যবহার ও মানব প্রেমের কথা বলা যেতে পারে। মহানবী (সাঃ) ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে মানুষের মঙ্গল ও কল্যানের কথা ভাবছিলেন। মানুষ কেন সত্য ও সুন্দরের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না এসব ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন। হঠাৎ তিনি এক বৃদ্ধ মহিলাকে দেখতে পেলেন, যিনি তার সাধ্যতিরিক্ত বোঝা বয়ে কোথাও যাচ্ছেন। মহানবী (সঃ) তার সাহায্যার্থে বৃদ্ধার বোঝা নিজেই বহন করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মা ! বৃদ্ধ বয়সে এত বড় বোঝা বয়ে কোথায় যাচ্ছ,বৃদ্ধা জানালেন তার এলাকায় এক ব্যক্তি নতুন ধর্ম প্রচার করেছেন যার নাম মুহাম্মদ। তার সঙ্গে দেখা হলে লোকেরা পিতৃ ধর্ম হারিয়ে ফেলে। তাই বৃদ্ধ বয়সে পিতৃধর্ম হারিয়ে ফেলার ভয়ে তিনি এই এলাকা ছেড়ে দূর আত্মিয়ের এলাকায় চলে যাচ্ছেন। মহানবী (সাঃ) মনে ব্যাথা পেলেও মুখে কিছু বললেন না। বরং বৃদ্ধার বোঝা গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে মহানবী (সঃ) যেহেতু কখনও মিথ্যা বলতেন না, তার সঠিক পরিচয় দিলেন। তখন কৃতজ্ঞতা ও লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে বৃদ্ধা বললেন ঃ আপনিই সেই মুহাম্মদ যার ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি যেই মুহাম্মদ মানব প্রেমে উদ্ভাসিত যার, মধ্যে এই মহানুভবতা ,যার চরিত্র এমন মাধুর্য প্রেমে উদ্ভাসিত, যার মধ্যে এই প্রেম তার ভয়ে পালনোর তো প্রয়োজন নেই বরং তিনি অবশ্যই মহামানব সত্য নবী, তার দ্বীন অবশ্যই সঠিক দ্বীন। মহানবী (সঃ) -এর চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধা ইসলাম গ্রহন করলেন। এমনি সুন্দর আচরণ ও মানব প্রেমের মাধ্যমেই পথ হারা মানুষ মহানবী (সঃ) প্রদর্শিত সত্যের পথে এসেছেন, ইসলাম গ্রহন করেছেন। শক্তি দিয়ে বা জোর করে নয়। অপর ঘটনাটিও প্রায় আমাদের সবারই জানা যে, একজন ইহুদী বৃদ্ধা মহিলা মহানবী (সাঃ) কে তো বিশ্বাস করতই না বরং তার অমঙ্গল কামনা এবং তাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে পথে কাটা দিয়ে রাখতেন। একদিন মহানবী (সাঃ) সেই পথে কাটা না দেখে তার হেতু জিজ্ঞেসা করে

জানতে পারলেন বৃদ্ধা অসুস্থ। মহানবী (সঃ) স্বয়ং বৃদ্ধার সেবা ও সুচিকিৎসার সব কিছু করলেন। বৃদ্ধা যা কখনও কল্পনা করতে পারেনি। মহানবী (সঃ) -এর এমন মহানুভবতা ও মানব প্রেমে বিমুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধা সত্যের পথে আসলেন।

বস্তুতঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মানব জাতিকে যে মানব প্রেম ও মানবিক এবং গুণাবলী অর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন সে সব গুণাবলী এবং সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রেম অর্জন না করার কারণেই বর্তমানে বিশ্বে মানুষের বড় অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে মানুষের পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হলেও বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অভাব মানুষের। যে মানুষের কাছে মানুষের জীবন, সম্পদ বা সম্ভ্রম নিরাপত্তহীনতা বোধ হয় তাকে কি মানুষ বলা যায়? একটি নিকৃষ্ট পশুর কাছেও তো মানুষের জীবন সম্পদ বা সম্ভমের নিরাপত্তাহীনতা বোধ হয় না। আসলে আমরা ধর্মের কথা বলি ইসলামের কথা বলি কিন্তু ধর্ম বা ইসলামকে বাস্তবে রূপান্তরিত করি না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ তোমরা এমন কথা বলোনা, যা তোমরা নিজেরাই পালন কর না, নিজে (আমল) না করে অপরকে বলা আল্লাহর নিকট বড়ই জঘন্য অপরাধ। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে আমাদের দেশে ইসলাম বা ধর্ম প্রায় দুই জাগায় সীমাবদ্ধ। এর একটি হলো বক্তৃতা মঞ্চে অপরটি বেশ ভূষার বা বাহ্যিক আবরণে। অথচ মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদ দেখেন না তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কর্ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা সমাজ, জাতি, গোষ্ঠী, সরকার এমনকি ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা করি অথচ মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা হলো আত্মসমালোচনা করা। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা, জাতি ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা এলাকা নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ কামনা করা। এক কথায় মানব প্রেমে উদ্ভাসিত হওয়া। অথচ বিশ্বের যে কোন স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানুষের চরিত্র পশুর চেয়ে, নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। পশুতো ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদ, ভাষা বা রং-এর কারণে রক্তপাত করে না একে অপরকে হত্যা করে না। সবচেয়ে পীড়াদায়ক জঘন্য হচ্ছে মানুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদে ভাষা, রং-ও জাতিগত কারণে হত্যা লুণ্ঠন এমনকি মা বোনদের সম্ভ্রমের উপর আঘাত করছে। তার মানে পৃথিবীর মানুষেরা ধর্মও মানছে না। কোন ধর্মেই তো মানুষের অকল্যাণের কোন নির্দেশ দেয় না। কারণ ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যে ধর্ম মানুষের কল্যাণ সাধন করে না, তা অন্য কিছু হতে পারে, ধর্ম হতে পারে না। তাই বিক্ষুব্ধ এই বিশ্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মানব প্রেমের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সময়ের নিতান্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, রং ও ভাষা নির্বিশেষে মানব সমাজে সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি, ভালবাসা ও প্রেম স্থাপিত হতে পারে।

www.pathagar.com

যে কোন বর্ণ, গোত্র বা স্থানের অধিবাসী হই না কেন আমরা সবাইতো এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং এক মাতা পিতা হযরত আদম ও হাওয়ার সন্তান। এই নীতি ও আর্দশের উপর ভিত্তি করেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এটা ছিল বিশ্বনবী, প্রেমের ছবি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মানব প্রেমের ভিত্তি। ইসলামের সার্বজনীনতার এই আদর্শের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেনঃ সৃষ্টি জগত (বা মানব জাতি) আল্লাহর আল্লাহর সৃষ্টি পরিবারে সদস্যের ন্যায়) পুষ্য, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে তাঁর পুষ্যের প্রতি অধিক সদ্ব্যবহার করে। মানব প্রেম তথা সৃষ্টি প্রেম, ছাড়া কোন মতেই স্রষ্টা প্রেম অর্জন করা যায় না। তাই মহানবী (সাঃ)-এর মানব প্রেমের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই শুধু বিশ্ব শান্তি তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি নির্ভরশীল।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মহানবী (সাঃ)-এর মানব প্রেমের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি লাভ করার শক্তি দান করুন।

(লেখক ঃ অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

[সীরাত স্মারক '৯৬-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

১২ই রবিউল আউয়ালে আমার ভাবনা

ডঃ মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসাইন

আরবী ভাষায় আমার জ্ঞান সীমিত। কুরআনের বক্তব্য আমি পূর্ণভাবে আরবী থেকে বুঝি না। ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদের মধ্য থেকে আমি কুরআনের অর্থ এবং বক্তব্যটি বুঝে নেবার চেষ্টা করি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থেকে, একই সাথে ইসলামী দেশ-সমাজের সাথে পশ্চিমা বিশ্বকে তুলনামূলক ভাবে দেখবার এবং বুঝাবার মধ্য দিয়ে। আমার এসব জ্ঞানার্জন দেখা এবং বুঝবার প্রচেষ্টায় আমি যেসব কিছু দেখিনি বা বুঝিনি, তা আমি বুঝতে পারি বলে আশা করি। আমার সীমাবদধ জানা শোনা দিয়ে আমাদের নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে যতটুকু জেনেছি-বুঝেছি, তাতে এতটুকু নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে, তিনি একজন মহান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর স্বল্পকালীন জীবদ্দশাতেই তিনি একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তবেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলেন। অবশ্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই যাতে কিছু তিনি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তবুও কথা থাকে। আল্লাহ্ যেমন 'কুন' বললে সব কিছু হয়ে যায়, তেমনটি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ক্ষেত্রে হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় না। কেননা, আমরা জানি যে, তিনি একজন মানুষ ও সাধারণ মানুষের নেতা হিসেবেই তাঁর আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, মানুষের নেতা হিসাবেই। আমরা জানি যে, যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বর্তমান কালে প্রয়োজন হয় দল গঠনের। কিন্তু তিনি যে সময়কালে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন-আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে-তখন কিন্তু সম সাময়িক বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের রীতি বলা যায় অপরিচিত ছিল। তখন রীতি-নীতি ছিল রাজার ছেলে রাজা হবে। রাজ্য স্থাপন করার জন্য ও রাজা হতে হলে অন্যের রাজ্য যুদ্ধ করে অধিকার করতে হত। রাজা-রাণী নিজের খুশীমত রাজ্য শাসন করত। চরম আরাম-আয়েশ করতে সে সব রাজা-রাণী বা তাদের পারিষদ সবাই। সাধারণ মানুষ ছিল আনেকটা দাসের মত। প্রায় কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না জনসাধারণের । বলা যায়, জোর যার 'মুল্লুক তার' ধরনের জংলী ব্যবস্থা ছিল। আইনের শাসন বলতে বলা যায় কোন কিছুই ছিল না প্রায় কোথাও। এমন কি রোম, পারস্য, মিশর যে পুরাতন সভ্যতার দাবীদার সে সব রাজ্যেও সর্বসাধারনের জন্য আইনের শাসন এক অপরিচিত বিষয় ছিল। আমেরিকা তখন ছিল অনাবিস্কৃত। ইউরোপ ছিল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত জমিদাদের অধীন। অসভ্য ছিল এরা সবাই। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন ভারতের অবস্থাও ভিন্ন কিছু ছিল না ঐ সময়কালে। রাজ-রাজাদের

www.pathagar.com

উপভোগের জন্য ছিল যার যার রাজ্য বা জমিদারী। সাধারণ মানুষ ছিল দাস। উত্তম মহৎ আদর্শ বলতে কোন কিছুই ছিল না সাধারণ মানুষের জন্য। রাজ-রাজারা তো ছিলেন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, শোষক এবং নির্মম। মোটকথা, মানুষের জন্য কোন সার্বজনীন মানবিক সমাজ ছিল না। দুনিয়াব্যাপী ছিল আইয়ামে জাহেলিয়াত। তখন শুধু মাত্র আরব দেশে আইয়ামে জাহলিয়াত ছিল এটি আমি মানতে চাই না। সারা দুনিয়ার তখন দেড় হাজার বছর আগে ছিল এক অন্ধকারময় সময়কাল। দিক নির্দেশনাহীন অবস্থায় নিপতিত ছিল মানুষ ও মানবতা। এমন কি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথের যে অনুসারী ছিল। ইহুদী-খৃষ্টানরা তখন তাদের মূল শিক্ষা হারিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পথ চলছিল । মানবতার এমনি এক ঘোর অন্ধকারময় সময়কালে আল্লাহ্ সঠিকভাবেই আমাদের নবী করিমকে রাহমাতুল্লীল আলামীন বা দুনিয়ার সকল মানুষের এবং সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতার জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আল্লাহ্ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করার জন্য। স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই তিনি সে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে গিয়েছিলেন।

ইসলাম এসেছিল একটি বিপ্লব হিসাবে। কিন্তু সে বিপ্লব বর্তমান বিশ্বে বিপ্লব বলতে আমরা যা বুঝি বা জানি বা দেখি হুবহু তা ছিল না। আধুনিক কালের বিপ্লবে আমরা অহেতুক হানাহানি দেখি। মারামারি,কাটাকাটি,গণহত্যা যেন বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল বা সহযোগী হিসেবে কোন দোষণীয় বলে আমরা মনে করি না। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা বর্তমান কালের বিপ্লবের কেন–তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সাঃ) যখন বহু কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি, রক্ত ইত্যাদির বিনিময়ে মক্কা বিজয় করেছিলেন, তখন কি তিনি তিল মাত্র ও প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন? নেননি। এমন নজীর কি দ্বিতীয়টি দুনিয়ার আর কোথাও আছে? নেই। কি মহান বিপ্লবী 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' নেতা ছিলেন তিনি। কি ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী নেতা এবং ব্যক্তি ছিলেন তিনি সেই সমসাময়িক বিশ্বে। সে ধরনের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি আজতক আর কেউ দেখাতে পারছেন না। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে এর মধ্যে দিয়েও তাঁর মহত্ত্ব, মহানূভবতা এবং অতি মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরপেক্ষ ইতিহাসে তাই তাঁর পূর্ন স্বীকৃতি আছে। লন্ডন নগরীর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীন আইন শিক্ষাকেন্দ্র লিংকনস্ ইন -এ তাঁর স্বীকৃতির নমুনা খোদাই করা আছে' পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ 'আইন দাতা' হিসেবে। আমেরিকাতেও সে স্বীকৃতির নমুনা স্থাপিত হয়েছে দেশের সুপ্রীম কোর্টে (যদিও তাঁর কল্পিত মূর্তি স্থাপন করার কাজটি আমরা মুসলমানরা পছন্দ করি না)। দুনিয়ার কেউ আমাদের নবী করিম (সাঃ) -কে স্বীকৃতি দিল কি না বা কে কি বলল, তা বড় কথা নয়। তবে যদি কেউ

www.pathagar.com

নিজেকে উচ্চতর মানব পর্যায়ে পরিচিত করাতে চান, তাহলে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে উঁচুতে স্থান দিলে তিনি তা করতে পারবেন। তাঁকে হেয় করতে পারে শুধুমাত্র চরম অজ্ঞরাই। সে যাই হোক, তিনি দেড় হাজার বছর আগে আদর্শিক রাজনীতি এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের নমুনা রেখে গেছেন, তা অনেক উন্নত হয়েছে। যেমন, আইনের শাসনের ধারণা দিয়েছে সর্ব প্রথম ইসলাম। উন্নত অনেক দেশেই এখন আইনের শাসন মেনে চলে। ইসলামে আইনের শাসনের নমুনা হিসেবে নিরপেক্ষ, কাজীর বিচার এখনো জুরিস-প্রুডেন্স বা আইন বিজ্ঞানের একটি বিষয় বলে সর্বত্র সম্মানিত। উন্নত বিশ্বে প্রচলিত সোশ্যাল সিকিউরিটি বা বেকার ও বার্ধক্য রাষ্ট্রীয় ভাতা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকেই গৃহীত হয়েছে। শাসনের জন্য জনগণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা-যা কিনা বর্তমানে গণতান্ত্রিক বা ভোটাভুটির আকার ধারণ করেছে-তাও আমাদের নবী করিম(সাঃ) ই পথ দেখিয়ে রেখে গেছেন। অবশ্য বলা দরকার যে, বাংলাদেশের মত আরো কিছু কিছু অনুন্নত দেশে যে ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি, ভোট কেনা-বেচা ধরনের নীতি বিবর্জিত কাজ হয় তার সাথে ইসলামের শিক্ষার বা নীতির কোন সম্পর্ক নেই। যেমন সম্পর্ক নেই মানুষে মানুষে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের-যা কিনা এখন প্রতিটি দেশেই এরূপ বাস্তব চিত্র। মুসলমান শাসকদের মধ্যে যাদের তিলমাত্রও ঈমান আছে তাদের তাকওয়ার সাথে খেয়াল করা জরুরী যে, আমাদের নবী করিম কিংবা তাঁর খলিফাগণ কত সাদাসিধা এবং সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। সাধারণ গরীব-দুঃখী মানুষের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতেন। উপভোগ পরিহার করতেন। শুকনা রুটি আর খেজুর খেতেন, আমীর-ওমরা, খলিফা-সাধারণ শ্রমিক প্রত্যেকেই। সাধারণ মোটা কাপড় পরতেন সবাই। বাসস্থানও ছিল সাধারণ। শিক্ষা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। মৌলিক শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। সমাজ ছিল সহযোগী-সমবায় ধরনের। সবাই সবার জন্য। ব্যবসা-বণিজ্য ছিল মানুষের সেবা করার জন্য-'কাট থ্রোট' (cut throat) লাভের জন্য ছিল না। ছিল আমানতদার বিবেচনায়। পশ্চিমা জগতের ব্যক্তি মালিকানার অর্থে নয়। ইসলামের প্রাথমিক সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখন এমন কি কোন মুসলমান দেশেই মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে প্রচলিত নেই। পশ্চিমা বিশ্ব গ্রহণ করেই উন্নত হয়েছে, কিন্তু ইসলামী আদর্শিক ও আত্মিক মূল্যবোধের কোন কোন বিষয় বর্জন করেছে। যেমন সম্প্রতিককালে যে পুঁজিবাদ বা চরম স্বার্থবাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ পশ্চিমা বিশ্বে চালু হয়ে গেছে, তা ইসলামসম্মত নয়। কেন নয়-সে বিষয়ে আমি একটু আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি। এর কুফল ওরা ভোগ করছে। লাগামহীন পুঁজিবাদ বো খোলা বা বাজার অর্থনীতি সম্পদ বা বিশেষ কোন অর্থব্যবস্থ সৃষ্টি করতে পারলেও তা সমতা বা সর্বোচ্চ জনকল্যান নিশ্চিত করতে

www.pathagar.com

পারে না। পশ্চিমা দেশে পারেওনি। ফলে সে দেশে কয়েকটি কুফল ফলছে । প্রথমটি হত না, যদি সেই অর্থবান ব্যক্তিটি উপভোগ পরায়ণ না হয়ে জনসেবায় সচেতন হতেন। জনকল্যাণে তার অর্থ ব্যবহার করতেন। আমি তাকে 'হাতেম তাই' হতে বলছি না। কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তি বা উপভোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে যদি সেই ধনী মানুষটিকে তার অর্থ জনকল্যণ মূলক লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতেন,তাহলে তা ন্যায়ভাবে ব্যবহার হত। কিন্তু তেমনটি কচিৎই হয়। এরা 'কাট থ্রোট' লাভ করার সাথে সাথে নিজেরা উপভোগ পরায়ন হয়। মদ, জুয়া, কেসিনো ইত্যাদি এদের অর্থেই মশহুর ব্যবসা চলে। ইসলামী মূল্যবোধ যদি এসব মানুষ অনুসরণ করত তাহলে বিষয়টি ভিন্নতর হত। আমাদের কেউ কেউ যারা ইসলামের ব্যক্তি সম্পদের অধিকারকে পশ্চিমা পুঁজি বাদের সাথে একাকার করে দেখেন তারা বোধ করি ওদের উপভোগের বিষয়টির খারাপ এ দিকটি বেমালুম ভুলে যান। বাংলাদেশের মত পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশে বিষয়টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে গভীর বিবেচনার দাবী রাখে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অর্ধশতাধিক মুসলামান দেশ এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কমিউনিষ্ট রাশিয়ার পতন এবং ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান শেষে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দুনিয়ার মুসলমানকে এক সংঘবদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলা করতে হবে বলে আমরা অনেকই বুঝতে পারছি। দুনিয়ার মানুষ এখন সংঘাতমুখী হয়ে মুসলমান এবং অমুসলমান এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা, নাস্তিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পতনের সাথে সাথেই পুঁজিবাদী চরম স্বার্থপর পশ্চিমা বিশ্বেরও অবসান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। ওরা এখন বেঁচে থাকতে চাইছে নব্য উপনিবেশবাদী কায়দায়। বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে তারা শুধু অনুন্নত বিশ্বকেই শোষণ করছে না, একই সাথে তারা নিজেদের দেশের গরীব মানুষকেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবেও শোষণ -বঞ্চনা করছে। কেননা, সংখ্যাগুরু মানুষকে শোষণ-বঞ্চনা করা ছাড়া পুঁজিবাদ বেঁচে থাকতে পারে না। আপনারা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন যে, ১৯৯৭ সালের জুনের শেষের দিকে জাতিসংঘের পরিবেশ সম্মেলন কোনরূপ রাজনৈতিক ঐকমত ছাড়াই শেষ হয়ে গেল? কেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন পরিবেশ সংরক্ষণে তার নিজের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ওয়াদা করতে ব্যর্থ হয়েছেন? কেননা, তা করতে হলে তাদের উপভোগ কমাতে হবে। যেমন মোটরগাড়ি ব্যবহার কমাতে হবে। জ্বালানী তেল পোড়ানোর পরিমান হ্রাস করতে হবে। তার দেশের মানুষের উপভোগের এই অভ্যাস কমাতে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন কি? কি তার কি সে ক্ষমতা আছে? নাকি তিনি উপভোগবাদী, 'কাট থ্রোট' লাভকারী অন্য সবার কাছে বন্দী? পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদের অন্যায়

www.pathagar.com

আবদারের কাছে পরিবেশ সংরক্ষণ বস্তুত অসহায় একটি ইস্যু। এই পর্যায়ে যদি ইসলামী উপভোগ বিরোধিতা কার্যকর থাকত তাহলে বিষয়টি ভিন্নধর্মী হত। পরিবেশ রক্ষা করা যেত অতি অনায়াসে। পরিবেশ বিপর্যয় থেকে পৃথিবী বহুলাংশে নিরাপদ হত।

ইসলাম উন্নয়ন বিরোধী নয়। ইসলামের উন্নয়ন মানুষকে নিয়ে। মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য উন্নয়ন। মানুষের দিয়েই মানুষের উন্নয়ন। আমাদের নবী করিম মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য মানুষের আত্মিক গুণাগুণ উন্নত করেই তাঁর সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। আদর্শহীন অকর্মণ্য মানুষকে দিয়ে, মুসলিম দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করেননি তিনি। বর্তমান কালের মুসলিম বিশ্বে মূল ক্রাইসিস বা সংকট এখানেই। এই প্রশ্নেই আমার বিশ্বাস এই যে, বাংলাদেশে ১৯৭২সাল থেকে এই আর্থিক সংকট গভীর থেকে দিন দিন আরো গভীরতর হচ্ছে। সামনে যেন কোন উজ্জ্বল কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেশের ভবিষ্যৎ যুবকদের যে একটি বিরাট অংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, তারাই তাঁর ভাষায় 'অস্ত্রবাজ' ও সন্ত্রাসী। আদর্শিক বিচ্যুতির ও মূল্যবোধহীনতার চরম এক নজীর। এ ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত করার কোন অবকাশ নেই। তাহলে এ দেশের ভবিষ্যৎ কি? কোথায় চলেছে এই মুসলমান প্রধান দেশটি?

বাংলাদেশের এই যে অরাজক পরিস্থিতি, অন্যায়ের ছড়াছড়ি, মূল্যবোধহীনতার সয়লাব এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? ইসলামী শিক্ষা এবং মূল্যবোধের দিকে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ আর নেই। অতএব আসুন, আমরা সবাই মিলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস ১২ই রবিউল আউয়ালে পুনঃ ওয়াদা করি যে আমরা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মহান ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করি এবং পদে পদে তা মেনে চলি এবং তা করলেই এ দেশটি সত্যিকার সোনার বাংলা হতে পারে। অন্যথায় এ দেশের স্বাধীন-সার্বভৌম-স্বতন্ত্র সত্ত্বা বেঁচে থাকবে বলে-বিশ্বাস করা যায় না।

[সীরাত স্মারক '৯৭ সৌজন্যে]

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা

উবায়দুর রহমান খান নদভী

শুরুতেই একটি কথা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইহজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা বৈষয়িক কৌশল ও প্রযুক্তি আসমানী বার্তা বা রিসালাতের মূখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। সাধারণ বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বৈষয়িকতার উদ্ভাবন, বিকাশ, উন্নয়ন ও উৎকর্ষ মানবজাতির চিন্তা-গবেষণা, অভিজ্ঞতা, চেষ্টা ও সাধনার সাথে সম্পৃক্ত। যদিও জাগতিক বৈষয়িকতা তথা সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রথম সূত্র বা আদি যাত্রা শুরু হয়েছিল একজন নবুওয়াত প্রাপ্ত মানবের পবিত্র হাতের স্পর্শে। আর এর বিকাশ বিবর্তনের প্রতিটি উল্লেখ্যযোগ্য মোড়েও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে একজন আসমানী বার্তা বাহক নবী-রাসুলের অবদান। তথাপি মানব জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম বা উন্নয়নের অভিযাত্রা আসমানী বার্তা বা আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত দ্বীনের মূখ্য আলোচ্য বিষয় নয়।

এসব বিষয়ে দ্বীনের ভূমিকা আরো স্পষ্ট। ব্যাপক অর্থে দ্বীন ও শরীয়ত যে নৈতিক দিক নির্দেশনা দান করে তার পরিধি বৈষয়িকতার কোন দিকই পরিত্যাগ করে না। জাগতিক সকল কিছুই ইসলামের আদর্শিক নীতি-নির্দেশ নৈতিক অনুশাসনের আওতাভুক্ত।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রীতি-পদ্ধতিতে নৈতিক ও মানবিক পন্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, আবিস্কার ইত্যাদি সবকিছু মানবতা সত্য ও শান্তির সপক্ষে সুষম ব্যবহারের পুর্ণাঙ্গতার নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনার প্রারম্ভে বক্তব্য এটাই যে , কোন পাঠককে যেন ইসলামী আদর্শে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষ তালাশ করে বিভ্রান্তির শিকার হতে না হয়।

জাগতিক তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকার পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ মূলত হেদায়তের উৎস। বিজ্ঞানের সুত্র বা দর্শনের মাত্রা এখানে পাওয়া গেলেও এ আলোচনা মূখ্য হতে পারে না। কোরআনে চিকিৎসা শাস্ত্রীয় নির্দেশনা পাওয়া গেলেও এ আলোচনা মূখ্য হতে পারে না। কোরআনে চিকিৎসা শাস্ত্রীয় নির্দেশনা পাওয়া গেলে ও একে প্রচলিত অর্থে চিকিৎসা গ্রন্থ বলা চলবে না। বলা যাবে না, ইতিহাসগ্রন্থ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই, সাহিত্য বা অলংকারের বই; যেমন পবিত্র কোরআনকে একটি নিছক সংবিধান গ্রন্থ বলেও আখ্যায়িত করা চলে না। আছে সবকিছুই কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে মূখ্য আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতির সার্বিক পথনির্দেশ, আত্মিক সংশোধন ও উপশম। আল্লাহ, রাসুল,

www.pathagar.com

ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, পার্থিব জীবনের অস্তিত্ব আর পরজগতের সমূহ গুরুত্ব বর্ণনায় এর মৌলধারা।

মানুষের জীবন যাত্রার সুন্দরতম পথটি হাদীস শরীফে এঁকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিগত বৈষয়িকতার জন্যে মানুষের অভিজ্ঞতাকেও দেয়া হয়েছে সীমাহীন গুরুত্ব। হাদীসে বর্ণিত এই ঘটনাটি থেকে বিষয়টি আন্দাজ করা সম্ভব। একবার হযরত নবী করীম (সঃ) খেজুর বাগানের পরাগায়ন দেখতে পেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, কাজটা অর্থহীন। এ বিষয়ে তিনি প্রতিকূল মন্তব্যও করেছিলেন। পরবর্তী সময় তিনি যখন জানতে পারলেন, পরাগায়ন না করায় এ বছর এই এলাকায় ফলন কম হয়েছে। নবী করীম (সঃ) এ পরামর্শের স্থলে নতুন করে নির্দেশ দিলেন। বললেন, "তোমাদের জাগতিক কর্মের ব্যাপারে তোমরাই বেশী অভিজ্ঞ।" এখানে নারী খেজুর গাছে পুরুষ প্রজাতির ফুল নিয়ে বেঁধে রাখা বা না রাখা সম্পর্কিত কোন আয়াত বা হাদীস খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। কেননা, এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) কৃষিবিদ বা অভিজ্ঞ কৃষকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর বাণীসূমহে আমরা নিম্ন বর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

১। তদানীন্তন জাহেলী আরবে প্রচলিত অপচিকিৎসা ও কুসংস্কার দূরকরণার্থে হুযুর (সাঃ) সংস্কারমূলক যা কিছু বলেছেন।

২। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন রাষ্টের দায়িত্ব বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে নবী করীম (সাঃ) যে সব নির্দেশ জারি করেছেন।

৩। ধর্মীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি (সাঃ) রোগ, উপশম ও ওষুধের দ্রব্যগুণ তথা এসবের শরীয়ত সম্মত বিশ্লেষণ করে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। যা কেবল শরীয়ত প্রবর্তক কর্তৃকই সম্ভব।

৪। আধ্যাত্মিক দিগদর্শন দানের যিম্মাদার হিসেবে তিনি জড় ও বস্তুগত প্রতিষেধক ব্যবহারে বৈধতা বা অপরিহার্যতার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি সহৃদয় বিনম্রতার সাথে ওষুধ ব্যবহার বা চিকিৎসা গ্রহণ-সাংঘাতিক তো নয়ই বরং এরা একে অপরের পরিপূরক।

৫। রূহানিয়াত বা আত্মিক উৎকর্ষেয় ধর্ম হওয়ায় ইসলামের বিধানে অভূতপূর্ব কিছু রূহানী বা আধ্যত্মিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলতে বুঝানো হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে বিকশিত চিকিৎসা বিজ্ঞান। আর কোরআন ও হাদীসে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যনীতি বা চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মহানবী (সাঃ) -এর আদর্শ ও শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত পূর্বোল্লেখিত পাঁচ

www.pathagar.com

প্রকারের স্বাস্থ্যবিধিকে ইসলামী ঐতিহ্যের পরিভাষায় তিব্‌বে নববী 'বা নবী করীম (সাঃ)-এর চিকিৎসা বিদ্যা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইসলামের ইতিহাসে 'তিব্‌বে নববী' প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থ ও গবেষণা নিবন্ধ তৈরী হয়েছে। এসবে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির আলোকে তিব্‌বে নববীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। আত্মরক্ষামূলক স্বাস্থ্য সচেতনা বা রোগ প্রতিরোধ।

২। রোগ নিরাময় প্রক্রিয়া ও প্রতিষেধক।

এ দুটি প্রকারের আওতায়, সামাজিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা, গণসুস্থ্যতা , সংক্রামক ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষা, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যনীতি, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সচেতনা, প্রচলিত অপচিকিৎসা ও কুসংস্কার প্রতিরোধ ইত্যাদি সবই রয়েছে।

মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রূপে ইসলাম যে নির্দেশনা দেয় তা সত্যিই অনন্য।

ইসলাম মানুষকে রোগ-ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপদেশ করেছে উপশমবিধি। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি কাজেই মানুষের সুস্থ্যতা দরকার। ইসলামের অনুসরণে, ইবাদত বন্দেগীতে সর্বত্রই প্রয়োজন চিন্তা, মেধা ও মানবের একাগ্রতা। দুর্বলতা, আলস্য ও ব্যাধি যদি মানুষকে অচল করে দেয় তাদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব হয়না। সৃষ্টি জগতকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক নিয়মে নিজের, পরিজনের, সমাজ ও সভ্যতার সেবা করা এবং আল্লাহ্ নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতা। সহজ কথায় বললে, ঈমান ও একীনের পর মানুষের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রহ ও দয়ার দান হচ্ছে সুন্দর স্বাস্থ্য।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম সার্বজনীন স্বাস্থ্যনীতির যে ব্যাপকতর রূপরেখা অংকন করেছে তা বিশ্ব প্রকৃতির ব্যবস্থাপনার মতই অতুলনীয়। ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পানাহারে মিতাচার, ক্ষতিকর সম্ভোগ, অপচয় ও বিলাসিতার অবৈধতা ইত্যাদি সবই মানবজাতির মনো-দৈহিক ও মর্মগত সুস্বাস্থ্যেরই চাবিকাঠি। অপরিহার্য মৌল ইবাদতের মধ্যে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতেও আত্মিক মানসিক উৎকর্ষের পাশাপাশি সমাজ ও দেহের স্বাস্থ্যগত সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে।

মানুষের মনো-দৈহিক পবিত্রতা, সুস্থতা ও কল্যাণকে সামনে রেখে ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রণীত হয়েছে। ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল ইত্যাদির আওতায় বিধৃত রীতি-পদ্ধতি ও জীবনাচারের সবগুলোই সমাজের সদস্যদের আত্মা, দেহ ও মেধার

www.pathagar.com

সুস্থতা সাধনে প্রত্যক্ষভাবে উপাদেয়। রক্ত, মৃতপ্রাণী, শুয়োর, হিংস্রপ্রাণী ও নষ্ঠ-গলিজ হারাম করা সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য অবৈধকরণ, অশ্লীলতা, বেহায়া বেলেল্লাপনা, যৌন উচ্ছৃংখলতার শিরোনামে সকল প্রকার নষ্টামি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলাম ছোট বড় সকল ব্যাধি থেকে মানব সমাজকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়েছে; পরিবার, সমাজ ও বৃহত্তর বিশ্বপল্লীকে মানব বসতির উপযোগী রাখার অপরিহার্য নীতি বাতলে দিয়েছে বৃহৎ আঙ্গিকে সাধারণ কোন চিকিৎসা শাস্ত্র, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যনীতি বা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধির আওতার দাখিল করা সম্ভব নয়। শরীয়ত যেমন সর্বব্যাপী, এর নীতি-পদ্ধতিসমুহও ব্যাপক। কোন প্রাণী, উদ্ভিদ পদার্থ বা ওষুধের ভালো-মন্দ সম্পর্কিত কোন হাদীসকে নির্দেশনা হিসেবে প্রথম কাতারে এবং চিকিৎসা রূপে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা স্থান দিতে বাধ্য। কিন্তু এসব হাদীসের সমষ্টিকে আমরা তিব্বে নববী বলে অভিহিত করে সীমাবদ্ধতার শিকলে আবদ্ধ করতে পারিনা। কারণ, গোটা ইসলামকেই আল্লাহ্ পাক মানবজাতি জন্য অনুপম রহমত ও সেরা উপশম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামের নৈতিক উৎসমূল পবিত্র কোরআনের পরিচিতি আল্লাহ্ পাক এভাবেই দিয়েছেন যে, নাযিলকৃত আমার এ কোরআন সে তো ঈমানদারদের জন্য রহমত ও উপশম স্বরূপ। এ অর্থে ইসলামী জীবন বিধান সবটাই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির সার্বিক সুস্থ্তা ও কল্যানের নিশ্চিত দলিল। খন্ডিত অর্থে "ইসলামের চিকিৎসাটি নির্দেশনা বা মহানবী নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতি বা স্বাস্থ্যবিধি" এ ব্যাপক ধারণারই বিভাগীয় রূপ মাত্র।

নবী করীম (সাঃ)-এর চিকিৎসা সম্পর্কিত বাণী বা নির্দেশনা এত বিপুল যে, এ সবের সংগ্রহ ও সংকলন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে গ্রন্থ ও পুস্তকমালার যে বিশাল লাইব্রেরী উম্মতের নিকট দ্বীনি উত্তরাধিকার স্বরূপ মওজুদ রয়েছে, সে এক মহাসমুদ্র। ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ মহাসিন্ধু থেকে বিন্দুসম কিছু পাঠকগণের সামনে মুল্যবান উপঢৌকন হিসেবে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি। বিশ্বজাহানের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত মহানবী (সাঃ) -এর শিক্ষা ও আদর্শ পার্থিব জীবনের সকল কিছুর চেয়ে দামী, অফুরন্ত কল্যাণ, করুণা ও অনুগ্রহের আঁধার।

নবী করীম (সঃ)-এর সুন্নত এই যে, তিনি নিজে নিজের, নিজ পরিবার পরিজনের, সাহাবীগণের চিকিৎসা করতেন। রোগ-ব্যাধিতে ব্যবহৃত তাঁর ওষুধপত্র প্রায় সবগুলোই অমিশ্র বা একক উপাদান বিশিষ্ট ছিল। ওষুধের তুলনায় তাঁর সাবধানতা রীতি মানুষকে অধিক সুফল দিত।

রাসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, মানুষ যে পাত্রটি সবচেয়ে বেশী ভর্তি করেছে, তা হচ্ছে পেট। মানুষের কোমর সোজা থাকার জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ঠ। বেশী খেতে চাইলে পেটের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ করে খাওয়া উচিত এবং এক তৃতীয়াংশ

www.pathagar.com

পানির জন্যে আরেক তৃতীয়াংশ শ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখা উচিত। [যাদুল মা'আদ]।

আল্লাহর রাসুল বলেছেন, রোগীদেরকে খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করোনা। কেননা, আল্লাহ পাক তাদেরকে পানাহার করান। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, দুধের সীরা বা দুধ মিশ্রিত খাদ্য ও রুটি ইত্যাদি রোগীকে শক্তি যোগায় এবং ক্লান্তি দূর করে। (যাদুল মা'আদ।)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাসে তিন দিন সকাল বেলা মধু চেটে চেটে খাবে বড় কোন রোগ-ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হবে না। -ইবনে মাজা, রায়হাকী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, দুটি আরোগ্য দানকারী বস্তুকে তোমরা অপরিহার্য করে নাও। একটি মধু অপরটি আল-কোরআন। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কালোজিরা, মৃত্যু ছাড়া অন্য সকল রোগের ওষুধ। (বোখারী, (মুসলিম)। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বাত ও ব্যথায় জয়তুনের তেল ও রসুনের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।-তিরমিযী

একবার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম (সাঃ) তাকে দেখতে যান। হযরত আবু সাঈদ বুকে হাত রেখে হুযুর (সাঃ) বলেন, তোমার হৃদরোগ। মদীনার আযওয়া খেজুর বীচি ফেলে দিয়ে ব্যবহার কর। (-যাদুল মা'আদ।) হযরত আবু আমের ইবনে আবী ওয়াক্কাস (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন, ভোর বেলা যে ব্যক্তি মদীনার সাতটি আযওয়া খেজুর খাবে, কোন বিষ বা যাদু -টোনা সেদিন আর তার কোন ক্ষতি করবেনা। (-বোখারী, মুসলিম।)

কালজয়ী মানব-ধর্ম ইসলামের ব্যাপকতা ও নবী করীম (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ নবী হওয়ার দাবীতেই ইসলামী জীবন পদ্ধতি সর্বশেষ্ঠ ও চূড়ান্ত। প্রিয় নবীজির তিব্ বা চিকিৎসা নির্দেশনাও এ আদর্শিক অবদানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । এর অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ নিশ্চিতরূপেই কামিয়াবী লাভে সক্ষম হবে। কাল কালান্তরে এর আবেদন নিঃশেষ হওয়া তো দূরের কথা একটু ম্লান বা নিস্প্রভও হতে পারেনা।

www.pathagar.com

মদীনা-মুনাওয়ারার প্রিয়তম নবীর (সাঃ) স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ সমূহ

মুহিউদ্দীন খান

প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এবং সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল ছিল পবিত্র মসজিদ। মক্কার তেরো বছরের নবুওতী জিন্দেগীতে মসজিদ নির্মাণ এবং প্রকাশ্যে নামাজ ও জামাত কায়েম করার সুযোগ ছিল না। মদীনায় হিজরত করার পর সর্বপথম তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দেন। তাঁর পবিত্র হাতে নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদটি ছিল "মসজিদে -কোবা"। উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে হিজরত করে সর্বপ্রথম তিনি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত কোবা নামক পল্লীতে অবতরণ করেছিলেন এবং এখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করে বর্তমান মদীনার কেন্দ্রস্থল মসজিদে-নববী শরীফের পাশে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। সময়ের ব্যবধানে মহাজিরগণের অব্যাহত আগমন এবং ইসলামে দীক্ষিত স্থানীয় লোকদের সংখ্যাবৃদ্ধি জনিত কারণে মদীনার জনবসতি দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এ সময় মসজিদে-নববী শরীফ থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত মহল্লাগুলোতে মসজিদ নির্মাণ এবং নিয়মিত নামাযের জামাত কায়েম করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উম্মত জননী হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনা ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্প্রসারিত প্রতিটি মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ এবং সেগুলোকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সুগন্ধী দ্বারা আমোদিত করে রাখার নির্দেশ জারী হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী নিজের বসত বাড়ী মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। মহল্লাবাসীগণ যৌথভাবেও স্থান নির্বাচন করে মসজিদ নির্মাণ করেন। এসব মসজিদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রিয় নবীজি (সাঃ) স্বয়ং সাহাবায়ে-কেরামের জামাতসহ হাজির হয়ে নামায পড়ার মাধ্যমে এগুলো উদ্বোধন করতেন। যুদ্ধ অভিযানে এবং সফরের সময়েও যেসব স্থানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করেছেন এবং দু'এক ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন, যে সব স্থানে প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পবিত্র ললাট সেজদায় ভূমি স্পর্শ করেছে সে মসজিদগুলো জিয়ারত এবং সে গুলোতে নামায আদায় নিঃসন্দেহে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই সে মসজিদগুলোর এ বিরল বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হয়ে আসছে। এমনি কয়েক খানা মসজিদের এখন পর্যন্ত সে পূণ্য স্মৃতি বুকে ধারণ করে বিদ্যমান। রওজাপাক এবং মসজিদে-নববী শরীফে হাযিরা দেয়ার সময় যে মসজিদগুলো যিয়ারত করা যেতে পারে সে গুলোর পরিচিতি নিম্নরুপ ঃ

www.pathagar.com

মসজিদে কোবা ঃ হিজরতের পর মদীনার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছার আগে হযরত নবী করীম সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথমে কোবা নামক পল্লীতে বনী আমর ইবনে আওফের মেহমান হন। এখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মানের কাজ শুরু করেন। কোবা পল্লীর এই মসজিদখানাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মানের মাধ্যমেই প্রিয় নবীজী (সঃ) হিজরত পরবর্তী সোনালী যুগের সূচনা করেন।

হযরত কুলসুম ইবনে আদাম (রাঃ) নামক জনৈক প্রবীণ সাহাবীর একখন্ড ভুমির উপর এ মসজিদ নির্মিত হয়। নির্মাণের প্রতিটি কাজে প্রিয় নবীজী (সাঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নির্দেশ করেই সুরা তওবার তের নম্বর আয়াতখানা নাযিল হয়। যাতে বলা হয়েছে ঃ সেই মহিমাময় মসজিদ, যার ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর। প্রথম অবস্থা থেকেই নামাযের উদ্দেশ্যে এখানে দাঁড়ানোই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। এর মধ্যে এমন লোকজন আছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষ যত্নবান। আর আল্লাহ তা'লা পাক-পবিত্র লোকদেরই পছন্দ করেন।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোবা বাসীগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, পাক-পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে তোমরা এমন কি পন্থা অবলম্বন করে থাক, যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন।

তাঁরা জবাব দিয়েছিলেন, মলমূত্র ত্যাগ করার পর প্রথমে মাটি দ্বারা আমরা অপবিত্রতা দূর করি, তারপর পানি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হই। হযরত নবী করীম (সাঃ) নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার কোবার মসজিদ যিয়ারত করতেন। কখনও কোন সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কখনওবা পায়ে হেঁটে যেতেন। (বুখারী ১ম খন্ড, মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড) অন্য এক হাদিসে রয়েছে যে, "কোবার মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা একটি ওমরাহর সমতুল্য পূণ্যের কাজ। [তিরমিযী শরীফ, ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড]

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদ বর্ণনা করেছেন, একদা আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কোবার মসজিদে হাযির হন। ঘটনাক্রমে সে সময়ে কোন-যিয়ারতকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, যে সর্বশক্তিমান সত্ত্বার কুদরতী হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, ইমামুল-আম্বিয়া, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে এ মসজিদ নির্মাণের সময় নিজ হাতে ইট বহন করেছেন। সে দৃশ্য যেন এখন আমার সামনে ভাসছে। আল্লাহর কছম! এই মসজিদ যদি দুনিয়ার অন্য কোন প্রান্তেও থাকতো

www.pathagar.com

তবে এটির যিয়ারতের জন্য আমরা উটের কলিজা শুকিয়ে দিতাম। অতঃপর সাইয়্যেদেনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) খেজুরের ডাল হাতে নিয়ে মসজিদে ঝাড়ু দিতে শুরু করলেন। সঙ্গী-সাথীগণ আরজ করলেন, আমরা ঝাড়ুঁ দেওয়ার কাজটি করে দিচ্ছি। তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ্‌র কছম! তোমরা এ কাজের জন্য যথেষ্ট নও।" অর্থাৎ এ মসজিদের মর্তবা এতই উচ্চে যে, স্বয়ং খলীফার হাতেই এর ঝাড়ু দেয়ার কাজটি হওয়া উচিত। [আল ওয়াফা] ইবনে যুবালা হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, খলীফা হযরত ওমর এ মর্মে খুতবা প্রদান করেছিলেন যে ঃ আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি মসজিদে কোবা আমাদের নিকটবর্তী করেছেন। যদি দূরবর্তী কোন দেশে এর অবস্থান হতো তবে আমাদেরকে সে পর্যন্ত পৌঁছতে উটের কলিজা কাবাব করতে হলেও তা করতে হতো। *[মুসাননাফ আব্দুর রাজ্জাক]*

কা'ব ইবনে হাজরা বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে উত্তমরূপে অযু করে মসজিদে কোবা পৌঁছার নিয়তে বের হয় এবং একমাত্র সে মসজিদে নামাজ আদায়ই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, আর সেখানে পৌঁছে চার রাকাত নামায আদায় করে প্রতি রাকাতই সূরা ফাতেহা পাঠ করে, সে আল্লাহ্‌র ঘরে ওমরা করার অনুরূপ সওয়াব পাবে। (ইবনে আবী শাইবা।) মসজিদে কোবা অনেক বার পূনঃনির্মিত হয়েছে। তবে মেহরাব ঠিক সে স্থানটিতেই রাখা হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন। মসজিদের চত্ত্বরে একটি ছোট্ট মিনারার মত চিহ্ন রয়েছে। বর্ণনাকারীগণ বলেন, এই স্থানটিতেই প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উটের পিঠ থেকে প্রথম অবতরণ করেছিলেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এর অব্যবহিত পরে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের শাসনামল থেকে মসজিদে কোবা বহুবার সংস্কৃত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, বর্তমানে মদীনা মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীর পর মসজিদে কোবাই আয়তনের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদ।

মসজিদে জুমাআ ঃ হিজরতের পর হুযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোবায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করার পর মদীনার দিকে রওয়ানা হন। দিন ছিল শুক্রবার। পথিমধ্যে বনী ছালেম বিন্ আওফের পল্লীতে কিছু সময় অবস্থান করেন। এখানেই জুমার সময় উপস্থিত হয় এবং প্রিয় নবীজীর (সঃ) সাহাবীগণকে নিয়ে একটি স্থানে জুমার নামায আদায় করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম জুমা। যে স্থানটিতে তাজদারে মদীনা জুমা আদায় করেছিলেন সেখানেই বর্তমানে মসজিদুল জুমাআ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি ছিল কাঁচা ইটে নির্মিত একটি সাধারাণ ইমারত। হিজরী নবম শতাব্দীতে এটি পাকা ইমারতে রূপান্তরিত হয়। এর আয়তন ছিল দৈর্ঘ-

www.pathagar.com

প্রস্থে ৩০ফুট ও ২৫ ফুট। শেহাবুদ্দীন কুওয়ান নামক একজন তুর্কী মসজিদটির গোম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন বলে ওয়াফা আল ওয়াফার বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। প্রিয় নবীজীর (সঃ) প্রথম জুমার স্মৃতিবাহী এ পবিত্র মসজিদটিতে জিযারতকারীগণ অন্তত ঃ দুই রাকাত নামায আদায় করে থাকেন।

মসজিদুশ্-শামস্ ঃ কোবার মসজিদ থেকে কিঞ্চিত পূর্বদিকে একটি টিলার উপর মসজিদুশ্-শামস্ অবস্থিত। কালো পাথর নির্মিত এ মসজিদটির আয়তন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৬ ফুট। বনী নযীর নামক ইহুদী গোত্রটিকে অবরোধ করার সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছয়দিন পর্যন্ত এই টিলার উপর একটি তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। এখানেই প্রিয় নবীজী (সঃ) সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন।

আল্লামা মজদুদ্দীন ফীরোজাবাদীর (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী, আশপাশে ছায়াদার বৃক্ষলতাহীন প্রখর রোদের মধ্যে এর অবস্থান ছিল বিধায় সম্ভবতঃ এর নামকরণ হয় মসজিদুশ্-শামস্। দীর্ঘ ছয় দিনের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত এই মসজিদটিও একটি বরকতপূর্ণ জিয়ারতগাহ রূপে পরিচিত হয়ে রয়েছে। [ওয়াফা আল ওয়াফা ২য় খণ্ড]

মসজিদে বনু কোরায়যা ঃ মসজিদে শামস্-এর পূর্বদিকে মসজিদে বনু কোরায়যা অবস্থিত। বিদ্রোহী ইহুদী গোত্র বনু-কোরায়যার আবাসস্থল অবরোধ করার সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম এই স্থানটিতে অবস্থান করে নামায আদায় করেছিলেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের খেলাফত আমলে চিহ্নিত সে স্থানটিতে মসজিদ নির্মিত হয়। ইবনে-নাজ্জারের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদটির আয়তন ছিল দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৩০ ফুট। ঘন খেজুর বাগানের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মসজিটির নির্মাণশৈলী ছিল ঠিক কোবা মসজিদের অনুরূপ। আযান দেয়ার জন্য এর সামনে একটি মিনারও ছিল। মোট ১৬টি স্থরের উপর ছিল এর ছাদ। কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত এসব স্তম্ভের কয়েকটি ধসে যাওয়ার ফলে এর ছাদও ভেঙ্গে পড়েছে। ৮৯৩ হিজরী সনে শাহীন জামালী নামক একজন তুর্কী আমীল মসজিদটি পাকা ভীতের উপর পূনঃনির্মাণ করেন। [মা'আলেম দারুল হিজরা।]

মসজিদ মাশারাবায়ে উম্মে ইবরাহীম ঃ বনু-কোরায়যা মসজিদের উত্তর দিকে ঘন খেজুর বাগানের মধ্যে এই মসজিদটির অবস্থান। এই বাগানের মালিক ছিলেন উম্মত-জননী হযরত মারিয়া ক্বিবত্বিয়া। অধিকাংশ সময় তিনি এখানেই অবস্থান করতেন। প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সর্বশেষ সন্তান হযরত ইবরাহীম এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুগ্ধপানরত অবস্থাতেই তাঁর ওফাত হয় এবং এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রিয় নবীজী (সাঃ) হযরত ইবরাহীমের মা উম্মতজননী হযরত মারিয়া কিবত্বিয়ার নিকট নিয়মিত যাতায়াত কালে যে স্থানটিতে নামায আদায় করতেন, মসজিদে মাশরাবা উম্মে ইবরাহীম সে স্থানটিতেই নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটির আয়তন দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট এবং প্রস্থে ১২ ফুট।

মসজিদে বণী যফর ঃ জান্নাতুল বাকীর পূর্বদিকে কোবার রাস্তায় মসজিদটির অবস্থান। মসজিদে বাগলা নামেও এটি প্রসিদ্ধ। হযরত নবী করীম সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবায়ে কোরামের এক জামাতসহ এ স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। ওদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত মায়াজ ইবনে জাবালও (রাঃ) শরীক ছিলেন। একটি পাথরের উপর তিনি বসেছিলেন। একজন সাহাবীকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ দেন। তেলাওয়াতের এক পর্যায়ে সাহাবী একখানা আয়াত পাঠ করলেন যার অর্থ হচ্ছে, "তখনকার অবস্থাটা চিন্তা করুন, যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষ্য উপস্থিত করা হবে এবং তাদের সকলের জন্য সাক্ষ্যদাতা রূপে আপনাকে উপস্থাপন করবো।" এ আয়াতখানা শ্রবণ করে প্রিয় নবীজী ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন এবং বলতেছিলেন, "মাওলা! যাদের মধ্যে আমি এখন অবস্থান করছি, তাদের জন্য না হয় আমি সাক্ষ্যদাতা হলাম, কিন্তু যে মানবগোষ্ঠী এখনও আবির্ভূতই হয়নি তাদের উপর আমি সাক্ষ্যদাতা হবো কিরূপে।" যে স্থানটিতে ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই উল্লেখিত মসজিদে বনী যফর নির্মিত হয়েছে। মসজিদের বর্তমান ইমরাতটির গায়ে স্থাপিত শিলালিপির বর্ণনা অনুযায়ী এই ইমরাত হিজরী ৬৩০সনে আবু জাফর আল মনসুর আল মুসতাইন বিল্লাহ আমীরুল মুমেনীনের দ্বারা নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট এবং প্রস্থ ৩৩ ফুট। -[ওয়াফা আল ওয়াফা ২য় খণ্ড]

মসজিদুল ইজবাহ ঃ জান্নাতুল বাকীর উত্তর দিকে কয়েকজন শহীদ সাহাবীর কবর যেখানে অবস্থিত, তার সন্নিকটে মসজিদুল ইজবাহ অবস্থিত। ৩৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২৫ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট এই মসজিদটিতে মদীনার প্রাচীন অধিবাসী আওস গোত্রের একটি শাখা বনী মোয়াবিয়ার নামানুসারে মসজিদের বনু মোয়াবিয়া নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একদিন প্রিয় নবীজী সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনার আওয়ালী অঞ্চল থেকে ফিরে আসার পথে এই মসজিদে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। সাহাবায়ে-কেরামের একটি জামাতও তাঁর সাথে ছিলেন। নামায শেষে প্রিয় নবীজী (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতে থাকেন। দোয়া শেষে তিনি এরশাদ করেছিলেন, আমি এখানে তিনটি বিষয় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলাম। যার মধ্যে দুটি বিষয় আল্লাহ পাক কবুল করেছেন, আর তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে মানা করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

(ক) আমি দোয়া করেছিলাম, আল্লাহ পাক যেন আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করে ধ্বংস না করেন। আল্লাহ পাক তা কবুল করেছেন।

(খ) আমি দোয়া করেছিলাম, আমার উম্মতকে যেন জলোচ্ছাসে নিপতিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ পাক আমার সে দোয়াও কবুল করেছেন।

(গ) আমি দোয়া করেছিলাম, আমার উম্মতকে যেন আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর দরবারে আমার সে আরজী কবুল হয়নি। এই মসজিদে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) দুটি দোয়া কবুল হয়েছিল বিধায় মসজিদটি 'মসজিদুল-ইজবাহ' (দোয়া কবুলের মসজিদ) নামে অভিহিত হয়।

মুহম্মদ ইবনে তালহার বর্ণনা অনুযায়ী, মসজিদের যে স্থানটিতে সেদিন প্রিয় নবীজী (সাঃ) নামায আদায় করেছিলেন, সে স্থানটুকু ছিল বর্তমান মেহরাবের অনুমান দুইগজ ডান দিকে। [ওয়াফা আল-ওয়াফ ২য় খণ্ড।]

মসজিদে ত্বুরীকুস্ সাফেলা ঃ উহুদ ময়দানের নিকটবর্তী হযরত আমীর হামযার (রাঃ) মাযারের দিকে যাওয়ার পথে হাতের ডান দিকে অবস্থিত- এ মসজিদটির নাম মসজিদে তুরীকুস সাফেলা। এটিকে হযরত আবুযর গেফারীর (রাঃ) মসজিদ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এতে অনুমতি হয় যে, এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবত ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবুযর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম বায়হাক্বী (রাহঃ) শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এ মর্মে একখানা বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ র(রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মসজিদে নববী শরীফের চত্বরে এসেছিলাম এক সময় চতুর্থ দরজা দিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে সাল্লামকে কোথাও যেতে দেখে আমিও তাঁর পিছনে যেতে লাগলাম। তিনি আসওয়াফের একটি খেজুর বনে অযু করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। নামায শেষে দীর্ঘক্ষন সেজদায় পড়ে রইলেন। অনেক সময় অপেক্ষা করে এক সময় আমার মনে হচ্ছিল, প্রিয় নবীজীর (সঃ) রূহ মোবারক উর্ধ্বজগতে চলে যায়নি তো! এ কথা ভাবতে ভাবতে আমার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমি ক্রন্দন করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক সময় প্রিয় নবীজী (সাঃ) মাথা তুললেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আবদুর রহমান! তোমার কি হয়েছে? আরজ করলাম, এত দীর্ঘ সময় সেজদা অবস্থায় থাকতে দেখে আমার মনে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, আল্লাহ না করুণ, আপনার পবিত্র-আত্মা দেহপিঞ্জির ছেড়ে উর্ধ্বজগতে চলে যায়নি তো! জবাবে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন,আল্লাহ ছুবহানাহু তায়ালা আমার উম্মতের জন্য একটি পুরস্কারের সুসংবাদ দান করেছেন। যে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য আমি এই দীর্ঘ সেজদা করলাম।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে , যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তাকে দশটি নেকী দান করবেন। পরবর্তীতে এ স্থানটিতে তরীকুস সাফেলা নামক মসজিদটি নির্মিত হয়েছে । –[জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মহবুব] ঃ

মসজিদুল বাক্বী ঃ মদীনার কবরস্তান জান্নাতুল বাক্বীর বর্তমান প্রধান ফটকের পার্শ্বে বের হওয়ার সময় হাতের ডান দিকে মসজিদটির অবস্থান। এই মসজিদে বিখ্যাত সাহাবী হযরত ওবাই ইবনে কাব নামায পড়াতেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বহুবার এ মসজিদে তশরীফ এনেছেন এবং নামায আদায় করেছেন। তিনি এরশাদ করতেন "লোকজনের যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে আমি মাঝে মাঝে এই মসজিদে নামায পড়তাম।

এই একটি মাত্র বাক্য দ্বারাই মসজিদটির বৈশিষ্ট্য এবং ফযীলত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া যায়! মসজিদে নববী শরীফের ব্যাপক সম্প্রসারণের পর থেকে এ মসজিদে আর নামায হয় না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মসজিদটির কাঠামো বিদ্যমান। -[জযবুল -কুলুব]

মসজিদুল ফাত্হ ঃ মদীনা মোনাওয়ারার বিখ্যাত সীলা পর্বতের পশ্চিম ঢালে "মসজিদু-ফাতহ'র" অবস্থান। এর আশে পাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে। এ গুলো একত্রে মসজিদে খামছা নামে অভিহিত হয়। যদিও এগুলোর সংখ্যা পাঁচের অধিক। হিজরী পঞ্চম সনে অনুষ্ঠিত আহযাব যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ মদীনা মোনাওয়ারার প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে যে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল, তার তাঁবুগুলো এখানেই অবস্থিত ছিল। এসব তাঁবুতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) অবস্থান করতেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাহু আলাহি ওয়সাল্লাম সে তাঁবুগুলোতে কোন না কোন সময় নামায আদায় করেছেন, সে স্থানগুলোতেই পরবর্তী সময়ে এসব মসজিদে নির্মিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যে মসজিদটিতে স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অবস্থান করতেন এবং যে মসজিদ খানাকেই 'মসজিদুল-ফাতহ' বা বিজয়ের মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়।

মদীনার তিন দিক ছিল পাহাড় অথবা খেজুর বাগোনে ঘেরা। মাত্র উত্তর দিকটিতে ছিল সমতল উপত্যকা। সম্মিলিত আগ্রাসী শক্তির পক্ষে এ দিকটিতেই সৈন্য সমাবেশের সুযোগ ছিল। প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই উপত্যকা পথটিতেই শত্রু সৈন্যদের অগ্রগতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে হিজরী পঞ্চম সনের ৮ই

www.pathagar.com

যিলক্বদ তারিখে সাহাবীগণের জামাত মোতায়েন করেছিলেন। বয়োবৃদধ সাহাবী হযরত সালমান ফারছীর (রাঃ) পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র উপত্যকা পথটিতে দশ হাত গভীর, দশহাত চওড়া এবং তিন মাইল লম্বা একটি পরিখা খনন করেন। প্রায় তিন সপ্তাহ দিন রাত কঠোর পরিশ্রমে খননকৃত এ পরিখাটি ছিল পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈনিকদের পক্ষে অনতিক্রম্য। প্রায় তিন হাজার সাহাবী এই অভিনব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দশ সহস্রাধিক আগ্রাসী সৈন্যের বিরাট বাহিনী সপ্তাহকাল ঠেকিয়ে রাখার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন থেকে শুরু করে বুধ বারের আছরের মাঝামাঝি সময়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক দোয়া কবুলের সুসংবাদ প্রেরণ করে তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্তনা দেন।

এই যুদ্বের শেষের দিনটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। সকাল থেকেই কাফেররা এমন সর্বাত্নক হামলা শুরু করে যে, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ফজর থেকে মাগরের পর্যন্ত চার ওয়াক্তের নামায আদায় করারও অবকাশ পাননি। আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার ফলে আক্রমণ স্তিমিত হয় এবং প্রিয় নবীজী (রাঃ) পূবের এশার সময় ওয়াক্তের কাযা নামায আদায় করতে বাধ্য হন। -[সীরাতুন নবী ২য় খন্ড] প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফেরদের আক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বর্তমানে যে স্থানটিতে মসজিদুল-ফাতহ অবস্থিত এখানে তশরিফ আনেন এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করতে থাকেন। এই দোয়ার সময় কোন নামায পড়েননি। তৃতীয় দিনে একই স্থানে নামায বাদ দীর্ঘ দোয়া করেন এবং মহান আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেন। এ কারণেই ঐ স্থানটিতে নির্মিত মসজিদ খানাকে 'মসজিদুল ফাতহ' বলা হয়।

তিনি আরও বর্ণনা করেন, যে কোন বিপদ বা অভাব, অভিযোগের সম্মুখীন হলে আমি মসজিদুল-ফাতাহায় উপস্থিত হয়ে দোয়া করি এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানীতে এই দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদও পেয়ে যাই। সিড়ি দিয়ে প্রবেশ করার পর যে স্থানটিতে এখন মেহরাব রয়েছে, এর নিকটে দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীজী (সঃ) দোয়া করেছিলেন। তাঁর দোয়ার ভাষা ছিল এই রূপ-আয় আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা। তুমিই আমাকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোতে নিয়ে এসেছো। তুমি যাকে লাঞ্ছিত কর তাকে সম্মানীত করার কেউ নেই। যাকে তুমি সম্মানিত কর, তাকে বিপদ গ্রস্থ করার কেউ নেই। যাকে তুমি বঞ্চিত কর, তাকে দেয়ার মত কেউ নেই। যাকে দাও, তাকে বঞ্চিত করার কেউ নেই। যাকে তুমি রিজিক দাও তাকে সে রিজিক থেকে মাহরুম করার কেউ নেই। যাকে তুমি লাঞ্ছিত কর, তাকে উন্নত করার কেউ নেই। যাকে তুমি দূরে সরিয়ে দাও, তাকে নৈকট্য দেয়ার কেউ নেই। যাকে তুমি নৈকট্য দাও, তাকে দূর করার কেউ নেই। হে ব্যর্থ দীর্ণদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী! বর্ণিত

www.pathagar.com

আছে যে, খলীফা হারুনুর রশীদ কর্তৃক হযরত ইমাম শাফেয়ীর (রাহঃ) প্রতি ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে নির্যাতন শুরু হওয়ার পর ইমাম সাহেব এই দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর উপর পতিত বিপদ দূর করে দিয়েছিলেন। হযরত মাআয ইবনে সা'আদ বলেন, যে, মসজিদুল ফাতহর নিকটবর্তী স্থানগুলোতে আরও যে কয়খানা ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে এ গুলোতেও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করেছেন। মসজিদুল -ফাতহ'র দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মসজিদটি হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)-এর মসজিদের সামান্য একটু দক্ষিণ পার্শে অবস্থিত। মসজিদটি মসজিদে -আলী(রাঃ) নামে খ্যাত। এখানে হযরত আলীর (রাঃ) তাঁবু ছিল। এরও কিছুটা দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা ছোট মসজিদটি মসজিদে -আবু বকর (রাঃ)।

ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী আহযাব যুদ্ধের সময় দীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবৎ হযরত নবী করীম (সঃ) যে সব তাঁবুতে নামায আদায় করেছিলেন, সে স্থানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো মসজিদে পরিণত করেছিলেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাহঃ)। তিনি যখন মদীনার প্রশাসক, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে-নববীর সংস্কার সাধন করেন। এরপর পর্যাযক্রমে ঐ স্থানগুলেও তালাশ করে মসজিদে পরিণত করেন, সেগুলোতে প্রিয় নবীজী (সাঃ) কোন না কোন সময় নামায আদায় করেছেন। হিজরী ৫৭৫ সনে এই মসজিদগুলো সংস্কার এবং পুনঃনির্মাণ করা হয়। হযরত আলীর মসজিদটি পুনঃনির্মান করা হয় হিজরী ৮৭৬ সনে। হযরত আবু বকরের (রাঃ) মসজিদটির বর্তমান কাঠামে নির্মিত হয় হিজরী ৯৮২ সনে।-[ওয়াফা আল ওয়াফা, মাজালেশে দারুল মা' আলেম-দারুল হিজরা]

মসজিদে বনী হরম ঃ সীলা পাহাড়ের পশ্চিম পাশ্বে এবং মসজিদুল-ফাতহর দক্ষিণ দিকে একটি প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এটি বনী হরম নামক একটি সম্ভ্রান্ত গোত্রের আবাসভূমি ছিল। এখানে একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। জনবসতি সরে যাওয়ার কারণে মসজিদটি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আবদুল আজীজ (রাঃ) এ মসজিদটিও পূনঃনির্মান করেছিলেন।

মসজিদে বনী হরম এর নিকটবর্তী শিলা পাহাড়ের একটি গুহা প্রিয় নবীজীর (সাঃ) কিছু আবেগপূর্ণ স্মৃতির সাথে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। আহযাবের যুদ্ধের সময় এ গুহাটিতে কোন কোন সময় প্রিয় নবীজী (সাঃ) বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। এতে দু'একবার রাত কাটিয়েছেন বলেও বর্ণনা আছে।

বিখ্যাত হাদীস সংকলক তিবরানী শরীফে সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, এক রাতে হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ) প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সাথে সাক্ষাত করতে এসে তাকে মসজিদ বা উম্মত জননীগণের কারো হুজারায় পেলেন না। সম্ভাব্য সব জায়গার তালাশ করার পর তিনি শিলা পর্বতের সেই গুহাটির পথ ধরলেন। গিয়ে দেখেন প্রিয় নবীজী (সাঃ) সেজদায় পড়ে আছেন। সেজদারত অবস্থায় যেন এক অপার্থিব নূরানী তাজাল্লী চারদিক আলোকিত করে

www.pathagar.com

রেখেছিল। হযরত মায়ায অবস্থা লক্ষ্য করে কিছুটা পিছিয়ে এলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পূনরায় গুহার ভিতরে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তখনও পর্যন্ত গুহার মধ্যে সেজদারত অবস্থায় পড়েছিলেন। সাহাবী এক সময় মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো! আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার পর প্রিয় নবীজী (সাঃ) সেজদা থেকে মাথা তুললেন। মায়াজ ইবনে জাবালকে (রাঃ) চিন্তান্বিত দেখে বললেন, হযরত জিবরাঈল আমার নিকট এসেছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে জানতে চেয়েছেন, আপনার উম্মতের প্রতি তাঁর ফয়সালা কিরুপ হওয়া উচিত। আমি বললাম ,এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

হযরত জিবরাঈল পূনরায় আগমন করলেন এবং সুসংবাদ দিলেন। বললেন, আল্লাহ্ পাক বলেছেন, আপনি উম্মতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার মনে কষ্ট হতে পারে এমন কোন ব্যবহার করা হবে না। এই অনন্য নেয়ামতের শুকর আদায় করার উদ্দেশ্যেই আমি দীর্ঘ সেজদা করলাম। হে মায়ায! সেজদাই বান্দাকে তার মাওলার সর্বাধিক নৈকট্যে নিয়ে যায়। -[ওয়াফা -আল ওয়াফা]

মসজিদুল ক্বেবলাতাইন ঃ মসজিদুল ফাতাহর পশ্চিম দিকে আকীক উপত্যকায় বীর-এ রোমার নিকটে বর্তমানে মদীনা থেকে উত্তর দিকে লম্বিত মহা-সড়কের পার্শ্বেই কিবলার হুকুম পরিবর্তিত হয়ে অহী নাযিল হয় এবং নামাযরত অবস্থাতেই বাইতুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে কেবলা কাবা শরীফের দিকে পরিবর্তিত করে নামায আদায় করা হয়। ফাতওয়ায়ে আলমগিরের বর্ণনা অনুযায়ী, এখন মসজিদটির উত্তর দিককার দেয়ালে সাবেক কেবলার চিহ্ন এবং দক্ষিণ দিককার দেয়ালে পরিবর্তিত কেবলার মেহরাব রয়েছে।

ওয়াফা-আল-ওয়াফার বর্ণনায় রয়েছে যে, এই এলাকায় বনী সালমা নামক একটি গোত্রের আবাস ছিল। এ গোত্রের উম্মে বাশার নামীয় জনৈকা মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রিয় নবীজী (সাঃ) তাঁকে দেখতে আসেন। এখানে দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। উম্মে বাশার (রাঃ) প্রিয় নবীজীর(রাঃ) নিকট মৃত্যুর পর মুমিন ও কাফেরদের আবাসস্থল সম্পর্কে জানতে চান। আলাপ আলোচনায় কিছুটা দেরী হয়ে যাওয়ায় জোহরের নামায কবিলার মসজিদে আদায় করতে যান। দুই রাকাত আদায় করার পর পরই কেবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয়। একারণেই মসজিদটি "যুল কেবলা-তাইন" নামে খ্যাত হয়েছে। বর্তমানে এটি অত্যন্ত সুদৃশ্যভাবে পূনঃনির্মিত হয়েছে।

মসজিদুয যুবার ঃ মদীনা মোনাওয়ারা থেকে উত্তর দিকে 'যুবার' নামক পাহাড়ের উপর অবস্থিত এ মসজিদটিকে "মসজিদুয যুবার-' বলা হয়।

www.pathagar.com

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযানে যাত্রা করে মদীনার লোকালয় থেকে বের হওয়ার পর এই স্থানটিতে প্রথম নামায আদায় করেছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, আহযাবের যুদ্ধ প্রস্তুতির এক পর্যায়ে এই স্থানটিতে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন।

কথিত আছে যে, মারওয়ানের শাসনামলকে মদীনার শাসক কর্তৃপক্ষ জনৈক অপরাধীকে এই স্থানটিতে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল। এ খবর শুনে উম্মত-জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, স্থানটিতে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করেছেন বলে প্রমান আছে, সে স্থানটিতে কারও মৃত্যুদন্ড কার্যকর কি করে বৈধ হতে পারে? স্থানটি চিহ্নিত করে হযরত ওমর ইবনে আবুদল আজীজ (রাঃ) একখানা মসজিদ নির্মাণ করেন। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মসজিদখানা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হলে এটি হিজরী ৮৪৫ সনে পুনঃ নির্মাণ করেন নানাবেক আন নাইরুযী নামক মদীনার তদানীন্তন তুর্কি আমীর। -[ওয়াফা আল ওয়াফা]

মসজিদুল ফস্‌হ ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সাহাবীগণ নিয়ে যে স্থানটি সমবেত হয়ে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেছিলেন,সে স্থানটিতে পরে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

ইবনে আবী শাইবার বর্ণনা অনুযায়ী, প্রিয় নবীজীর (সঃ) মজলিসে স্থান সংকুলানের অভাব দেখা দিলে যতটুকু সম্ভব সরে সরে অন্যকে স্থান করে দেয়ার হুকুম সম্বলিত আয়াতখানা এই মসজিদের স্থানটিতে অনুষ্ঠিত জামায়েতেই নাযিল হয়েছিল। -[মাত্বারী]

মসজিদুল -আইনাইন ঃ উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই স্থানটিতে সাহাবায়ে-কেরামকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছিলেন। হযরত হামযার (রঃ) মাযার থেকে দক্ষিণ দিকে রেমাদ পর্বতের গায়ে সমভূমি থেকে কিছুটা উচ্চতায় মসজিদটির অবস্থান । এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত হামযা (রাঃ) এ স্থানটিতেই চোরাগোপ্তা হামালার শিকার হয়ে ছিলেন।-[ওয়াফা–আল ওয়াফা]

মসজিদুল-ওয়াদী ঃ উহুদ যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তর পার্শ্বে রেয়াদ পাহাড়েই এ মসজিদটিরও অবস্থান, ইমাম মাত্বারীর (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর এ স্থানটিতেই তাঁর ক্ষত -বিক্ষত দেহ পাওয়া গিয়েছিল।

এ স্থানেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযা আদায় করে সমভূমিতে এনে দাফন করেছিলেন।

[সীরাত স্মারক '৯৭-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ভাষা চর্চায় মহানবী (সঃ)-এর আদর্শ

এ, জেড, এম, শামসুল আলম

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে মহান আল্লাহতায়ালা মানব জাতির জন্যে কল্যাণ ও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দীন প্রচারক হিসেবে তিনি ছিলেন মুসলমানদের আর্দশ। কিন্তু, পিতা হিসেবে, স্বামী হিসেবে, সুরুচিশীল সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন ধর্ম ও মত নির্বিশেষে ইয়াহুদ, নাসারা,কাফির, পৌত্তলিক- সকলেরই আদর্শ। তার ব্যবহার, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথা-বার্তা-চাল চলন যে কোন রুচিশীল এবং সুন্দর জীবন যাপনে আগ্রহী ইয়াহুদ-নাসরা-কাফিরেরই অনুকরণীয় ছিল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বজনীন আদর্শ ঃ আজকাল যেমন আমরা মুসলমান হয়েও পোশাক-পরিচ্ছেদ, চাল-চলনে, সংস্কৃতিতে হিন্দু বা খৃষ্টানদের অনুকরণ করতে চাই, রাসুল (সঃ)-এর সময় ইয়াহুদী -নাসারা-পৌত্তলিক আরবগণ আমাদের রাসুলকে (সঃ) রুচি, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য চেতনার মাপকাটি হিসেবে ধরে নিয়েছে।

দুঃখের বিষয়, নামায-রোযার ব্যাপারে আমাদের উলামা-ই-কিরাম,ইমাম সাহেবান, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ রাসুলের (দঃ) আদর্শ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতে যতটুকু সচেষ্ট, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবীকে রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তুলে ধরতে ঠিক ততটুকু অমনোযোগী । ফলে, ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে আমাদের অনেকে হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং পাশ্চাত্যের অনুসারী।

ভাষা সম্বন্ধে রাসুল (সঃ)-এর আদর্শ আমাদের সম্মুখে কি ? হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -কে আল্লাহ শিশুকাল থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

জ্ঞানের অনুপ্রেরণা ঃ রাসুল (দঃ) এমন কথা বলতেন না, যা তিনি নিজে করতেন না। কিন্তু এই সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ছিল একটি মাত্র ক্ষেত্রে , তা হলো স্বাক্ষরতা অর্জন। বদরের যুদ্ধের এক-একজন বন্দীর মুক্তির শর্ত এই ছিল যে, তারা অন্ততঃ একজন নিরক্ষর মুসলিমকে লিখতে এবং পড়তে শিক্ষা দেবেন। জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ দিয়ে যত নির্দেশ বিশ্বনবী (সাঃ) জারী করেছেন, দুনিয়ার অন্যকোন ধর্মনেতা তাঁ করেননি। কিন্তু তিনি নিজে নিরক্ষর বা উম্মী ছিলেন। এ এক রহস্য। তাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ নিজে। আল্লাহর সৃষ্টি ছিল তাঁর পাঠের উপকরণ। তিনি আল্লাহর সৃষ্টি দেখতেন, নিরীক্ষা করতেন, গভীরভাবে চিন্তা

www.pathagar.com

করতেন। আল্লাহ ব্যতীত রাসুলের (দঃ) অন্য কোন শিক্ষক থাকবে, তা আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল না। যিনি হবেন মানবতার শিক্ষক, তাঁকে হতে হবে ত্রুটিশূণ্য । মানুষের মধ্যে এমন কোন শিক্ষক, তাঁকে হতে হবে ত্রুটিশূণ্য মানুষের মধ্যে এমন কোন শিক্ষক হতে পারেন না, যিনি ত্রুটিহীন নয়।

আমাদের নবীর পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, বন্ধু ছিল, সহযোগী ছিল, শত্রু ছিল। কিন্তু কোন শিক্ষক ছিল না। রাসুলকে উম্মী বা নিরক্ষর রাখার হাকীকত আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ তাঁর রাসুল (সাঃ) কে নিরক্ষর বা উম্মী নবী বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিরক্ষর থাকুন, এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। এই উম্মী, নিরক্ষর নবীর ভাষা জ্ঞান কেমন ছিল?

যুগ-নায়ক ঃ যুগের সবচেয়ে আধুনিক, প্রগতিশীল এবং সমকালীন শিক্ষক শ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর হওয়া নবীদের সুন্নাত। আল্লাহর নবীগণ ছিলেন নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আধুনিক মানুষ। তা না হলে অন্যেরা তাদেরকে আদর্শ অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে কেন? আল্লাহ নবীদেরকে ঐসব গুনে ভূষিত করেই পাঠিয়েছেন, যে গুণাবলীতে সে যামানার লোকেরা অধিকতর উৎকর্য লাভ করেছিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ) -এর যুগে জণগণের মধ্যে গান বাজনার চর্চা হতো খুব বেশি। সে এলাকার লোকদের মধ্যে অভাব-অনটন ছিল না। তাঁরা অবসর সময় গান-বাজনার র্চচা করতেন এবং সুর সাগরে আকন্ঠ নিমগ্ন থাকতেন।

দাউদ (আঃ) কে আল্লাহ এমন সুন্দর কণ্ঠ এবং সুমধুর সুর দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যখন আল্লাহর কালাম পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করতেন। তখন শুধু মানুষ কেন, জীব জন্তু ভীড় জমাতো আকাশে উড়া পাখিও নেমে আসতো। ব্যাবিলন, এশিয়া,লিবিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অত্যাধিক ধনশালী হয়ে উঠেছিল। কারুণের অর্থ সম্পদ তো উপ-কথায় পরিণত হয়েছিল। নেবুচাঁদ নযর, ফিরাউন, সাদ্দাম, নমরুদের অর্থ-সম্পদ এবং রাজক্ষমতায় তখন মানুষ ছিল বিমুগ্ধ এবং হতবাক। আল্লাহ হযরত সুলায়মান (আঃ) কে পাঠালেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট করে। হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগে মিসরীয়রা যাদুবিদ্যায় ছিল অত্যধিক পারদর্শী। যাদুর মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে ভীতিপ্রদ যাদু ছিল সাপ বানানো। মুসা (আঃ) -কে আল্লাহ দিলেন লাঠিকে সাপ বানানোর ক্ষমতা। হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল বিশ্বে অতি উন্নত। ইউনানী বা গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু সে যুগে নয়, এ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও অনুভূত এবং সুস্পষ্ট। রোগ নিরাময় করার মাধ্যমেই ছিল সে যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ। তাই আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে

www.pathagar.com

দিলেন হাতের স্পর্শে অন্ধকে দৃষ্টিদানের ক্ষমতা। খঞ্জকে পদদান, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময়, এমন কি মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা।

আরবদের ভাষায় এক-একটি শব্দের যতগুলো প্রতিশব্দ আছে, বিশ্বের অন্য কোন ভাষায় তদ্রুপ নেই। এক ঘোড়া শব্দটিরই শোনা যায় ৯০০ প্রতিশব্দ ছিল।

আরবীয়রা ছিল স্বভাবে কবি। 'সাবয়া মুয়াল্লাকা' কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও শিল্পী-সাহিত্যেকদেরসাথে বিস্ময় উৎপাদন করে। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর চাইতে চমকপ্রদ কাহিনী বিশ্বের কোন ভাষায় আজও সৃষ্টি হয়নি।

নবী পরিবারের লোকেরা কবি স্বভাবের ছিলেন। নবীর (দঃ) মৃত্যুতে বিবি আয়েশা (রাঃ) এর এক একটি পত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের স্বাক্ষর বহন করে।

বিশ্ব গ্রন্থ আল-কুরআন ঃ আল্লাহর রাসুলের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ আল-কুরআন শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়, আরবী ভাষায় উজ্জ্বলতম সাহিত্য। বিশ্বের আর কোন গ্রন্থ নেই, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করা হয়। ছন্দের মিল থাকলে, ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে কোন ছড়া মুখস্থ করা যত সহজ হয়, ছন্দহীন গদ্য কাব্য মুখস্থ রাখা তত সহজ নয়। ছন্দ-মাধুর্যের জন্যেই কুরআন মুখস্থ করা সহজতর হয়েছে। আরবদেশে বহু খ্রীস্টান কুরআন তিলাওয়াত করে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে। আরবরা কিন্তু তা উপভোগ করে। আরবদেশে একাধিক রেড়িও স্টেশন আছে, যা থেকে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী শুধু কুরআন তিলাওয়াতই প্রচার করা হয়। কায়রোর একটি রেড়িও স্টেশন হতে দিন-রাত সব সময় শুধু কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, আর কিছু না কিছু হলেও লোক তা শুনে। বাংলা সাহিত্যে কোন কোন কবির সঙ্গিত খুব শ্রুতিমধুর এবং কালজয়ী। এ সঙ্গীত সারাক্ষণ রেডিওতে প্রচার করা হলে লোকজন শুধু স্রষ্টার প্রতি বিরূপ হবে তা নয়, রেড়িও বন্ধ করে দিতে চাইবে।

সুরা আর-রাহমানের ছন্দ-মাধুর্যের কথা বাদই দেওয়া যাক, সুরা ফাতিহা একজন মুসলমান জীবনে কতবার পাঠ করে? কেউ কি কখনও সূরা ফাতিহা পড়ে ক্লান্ত হয়েছে? বোধ হয় না। এর কারণ শুধু যে অন্তর্নিহিত বাণী তা নয়; এতে রয়েছে কাব্যসুধা-অমৃতের নেশা কাটে না। এ সূরার বাংলা অনুবাদ হলে অর্থ হয়ত ঠিক থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যমাধুর্য কোথায় পাওয়া যাবে?

আল-কুরআন দুনিয়ার শুধু শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ নয়, কাব্য-গ্রন্থও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর আলিমের ভুল ব্যাখ্যা এবং ফতোয়ার ফলে বাংলার মুসলমানরা থেকে গেছে ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি উদাসীন।

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ ভাষী (দঃ) ঃ কাব্যানুরাগী আরব সমাজে আবির্ভূত নবী মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর এবং শুদ্ধভাষী। নবী করীম (সঃ) শুধু শুদ্ধ ভাষায় নয় বরং বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। সারাজীবনে তিনি একটি মিথ্যা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। আর সারা জীবনে বিশ্বনবী একটি অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্য ও উচ্চারণ করেননি।

শিশুকালেও আমাদের নবী শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে লোকজন আশ্চর্য হতো। জিজ্ঞেস করত, ছেলেটি কোন পরিবারের।

আমাদের মহানবী (দঃ) কথায়, আচরণে, পোশাকে, চরিত্রে, পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধ থাকা পছন্দ করতেন। তাঁর জামা-কাপড়ে কোন দিন কেউ কোন দাগ দেখেনি। তাঁর চরিত্রের ন্যায়ই নিস্কলঙ্ক ছিল। তাঁর ভাষাও ছিল শুদ্ধ এবং উচ্চারণ ছিল সুস্পষ্ট।

মহানবীর বাচন ভঙ্গি ঃ ভাষার বিশুদ্বতা এবং উচ্চারণে সুস্পষ্টতা ছিল নবী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট। তাঁর কথা এমন স্পষ্ট ছিল যে, যারা তাঁর কাছে বসে থাকতেন, তাঁরা কথাগুলো শুনে মুখস্থ করতে পারতেন, লিখে নিতে পারতেন। হাদীস সেভাবেই হয়েছে। তিনি বলেছেন, অন্যরা লিখেছেন।

তখনকার দিনে কাগজ-পেন্সিল সহজলভ্য ছিল না। এত অসুবিধা সত্ত্বেও রাসুলে করীম (সঃ) -এর বাক্য এমনভাবে উচ্চারিত হতো বা বলা হতো, যাতে অন্যরা তা লিখে নিতে পারতেন। তিনি দ্রুত বাক্য বলতেন না। তাঁর কথা বলার ধরণ এমন ছিল যে, প্রতিটি বাক্য নয়,প্রতিটি অক্ষর অন্যরা বুঝতে পারতেন। আইন ও হামযার মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরো বাক্যের কোন অক্ষরটা উচ্চারিত হচ্ছে, তা শ্রোতারা স্পষ্ট করে ধরতে পারতেন।

অর্ধেক কথা মুখের ভিতরে, বাকী অর্ধেক মুখের বাইরে-এভাবে কথা মহানবী (দঃ) বলতেন না। কথা বলার উদ্দেশ্য অন্যের কানে তা পৌছিয়ে দেয়া। কথা বলার সময় আস্তে কথা বলা হলে অন্যরা বুঝতে কষ্ট হয়। অন্যকে কষ্ট দেয়া অসুন্দর আচরণ এবং বেয়াদবি।

ইলমুল ক্বিরাত বা মাখারিজ আমরা কিভাবে পেলাম? আরবী ধ্বনিবিজ্ঞান অতিউন্নত। এর উৎস কি? এর উৎস হলো সুন্নাহ। কারণ রাসুল (সাঃ) শুদ্ধভাবে কথা বলতেন। স্পষ্ট উচ্চারণ করতেন।

ভাষণ ভঙ্গি ঃ আল্লাহর নবী (সঃ) এর ভাষণ পদ্বতি এমন ছিল যে, যত বড় মাহফিল হতো তার স্বর তত উচ্চ হতো। কথা বলার সময় তিনি স্বর তত উচ্চ করতেন যাতে সবচেয়ে পিছনে যে বসে আছে, তার মনে হত যে, নবী করীম (সঃ) তার সম্মুখে বসে কথা বলছেন।

www.pathagar.com

তিনি দু'চারজনের সামনে কথা বলেছেন। আর আরাফাত ময়দানের লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে বক্তৃতা করেছেন। তখন মাইক ছিল না। তা সত্ত্বেও তার কোন কথা বোঝেনি এমন লোক ছিল না।

যে সমস্ত গুণ একটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে তার মধ্যে রয়েছে শুদ্ধ ভাষণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ।

শুদ্ধ ভাষার সুন্নাত ঃ আমাদের নবী (সঃ) তাঁর মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতেন এবং সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন।

মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলা আমাদের নবীর সুন্নাত। দাঁড়ি না রাখলে একটা সুন্নাতের বরখেলাপ করা হল। অনুরূপভাবে একটি অশুদ্ধ শব্দ এবং বাক্য উচ্চারণ করলাম, সুন্নাতের একটি খেলাফ করলাম। আমাদের অনেকে মুখ খুললেই সাথে সাথে সুন্নাতের বরখেলাফ শুরু করি।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, আরবী অশুদ্ধ বলা সুন্নাতের বরখেলাপ। অন্য ভাষা অশুদ্ধ বলা সুন্নাতের বরখেলাপ নয়। এটা কিন্তু ভুল। আমাদের নবী (সঃ) ডান হাত দিয়ে খেজুর খেয়েছেন। যদি কেউ বলে যে, বাম হাত দিয়ে খেজুর খাওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ, কিন্তু আম আর লিচু বাম হাত দিয়ে খাওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ নয়, তা ভুল হবে।

শুদ্ধ ভাষণ এবং দাওয়াত ঃ শ্রোতাদের উপর বক্তৃতার প্রভাব অনস্বীকার্য। জনগণকে বোঝাতে হবে মাতৃভাষায়, শুদ্ধ ও সুন্দর উচ্চারণে। বড় নেতাদের একটা বড় গুণ হল সুন্দর বক্তৃতা দেয়ার দক্ষতা। ভাষার উপর দখল থাকলে বক্তব্যের প্রভাব শ্রোতাদের অনেক বেশী হয়। মাতৃভাষার উপর দখল না থাকলে ভাল বক্তা হওয়া যায় না।

মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব ঃ মুসলিম জীবনে আলিমদের প্রভাব প্রচন্ড এবং অত্যন্ত গভীর। আরবী, ইরানী, তুর্কীরা তাদের মাতৃভাষা চর্চা যতটুকু নিষ্ঠার সাথে করতে পারেন, আমরা আমাদের অবচেতন মনে সংস্কারের ফলে ততটুকু পারিনি।

ভারত বিভাগের পর ভাষা সমস্যা এবং ভাষা আন্দোলন এ দেশের ছাত্র, শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবিদের যতটুকু করে ভাষা আন্দোলনের প্রতীকি দিকসমূহে শিরকী প্রবণতা লক্ষ্য করে ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। তাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজও তাদের প্রতি উদাসীন। রাসুল (সঃ) নিজ মার্তৃভাষার একটি অশুদ্ধ বাক্য সারা জীবনে উচ্চারণ করেননি। পরম পরিতাপের বিষয়, লক্ষ লক্ষ উলামা-ই-কিরামের মধ্যে সর্বক্ষণ মাতৃভাষা শুদ্ধ বলেন, এরূপ হাজার হাজার আলিম সারা বাংলায় খুঁজে পাওয়া দুস্কর হবে। দুঃখের বিষয় শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার সুন্নাত আমরা দ্বীনদার মুসলিমগণ অনেকেই পালন করি না। এ অবস্থার নিরসনকল্পে উলামা-ই-কিরাম এবং ইমাম সাহেবানকে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহী হতে হবে।

[সীরাত স্মারক '৯৭-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্

মক্কা ছিল আরব জাতির যুগ-যুগান্তরের তীর্থক্ষেত্র এবং মক্কার কুরায়েশগণই ছিল কা'বার পুরোহিত-গোষ্ঠি। তাই কোরায়েশ গোত্র ছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের জনগণের আদর্শ। সেই কোরায়েশগণই যখন নবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিল, তখন আরবের অন্য সকল স্থানের পৌত্তলিকগণ হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে গেল। আর তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সাহস থাকিল না। এতদিন নবীর প্রচারকগণ দেশে দেশে নানা কষ্ট ও নানা প্রতিকূল অবস্থায় ফল লাভ হইয়াছিল না। নবীর মক্কা জয়ের পর লোকের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আরবজাতির এই বিশ্বাস ক্রমে দানা বাঁধিতে থাকে যে, মদীনায় নবগঠিত মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ একজন সাধারন মানুষ নহেন; তিনি অতিমানুষ, অর্থ্যাৎ মহামানব, এবং বিধাতার আশ্রিত। অন্যথা যে কা'বা দখল করিতে আসিয়া আবরাহা তাহার আশিহাজার সৈন্যসহ দৈব-দুর্যোগে বিধ্বস্ত হইয়া-ছিল, সেই কা'বা মুহম্মদ হেলায় জয় করিয়া লইল! এতগুলো দেবতা, যাহাদের আর্শীবাদ ও রোষকে সমস্ত লোকে এতকাল ধরিয়া সমীহ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা এই প্রতিমা-বিধ্বস্তকারীর কিছুই করিতে পারিলনা! তবে কি দেবতা মিথ্যা? এই ধরনের নানা সন্দেহ আরবজাতিকে পৌত্তলিকতার প্রতি আস্থাহীন করিতে লাগিল। ফলে নবীর প্রচারকগণ এখান হইতে সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা পাইতে লাগিলেন। নিঃস্ব সাধুর কথায় কে কবে কর্ণপাত করে, হউক না উহা পরম সত্য। পরন্তু যাঁহার কথার পশ্চাতে শক্তির সমর্থন আছে, তাঁহার উক্তি তুচ্ছ হইলেও লোকে শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়া থাকে। তাই এতদিনে নবীর সাহাবীদের প্রচারিত ইসলাম মানুষকে সার্থকভাবে প্রভাবান্বিত ও আবির্ভূত করিতে লাগিল। আরব বাসীরা প্রনিধান করিয়া দেখিল, ইসলাম তাহাদের কা'বার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসাবে। তাহারা প্রতি সনে হজ্ব ব্রত পালন করিত; জমজম কূপকে অতি পুণ্যতোয়া মনে করিত এবং কা'বা ঘরে রক্ষিত কৃষ্ণপ্রস্তরকে পূজা করিত। সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় পূণ্যশীলা বিবি হাযেরার স্মৃতিবহরূপে আরববাসীর নিকট পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল। ইসলাম এগুলিকেও পূর্ব সম্মানে বহাল রাখিয়াছে। আরবজাতি ইহাতে খুশী হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে আসিতে লাগিল। বেদুইনগণ তো হযরতের নামেই পাগল হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করিত।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, বেদুইনরা ধর্ম কি? তাহা জানিত না; মুহম্মদের সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হইবে এই ভাবিয়া তাহারা তাঁহার বাধ্য

www.pathagar.com

হইয়াছিল। কিন্তু লুট-তরায তো কোনও দিনই নবীর বৃত্তি ছিল না। তাহারা নবীর ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিল। বেদুইন ছাড়া অন্য যে-সব আরবপল্লীতে বাস করিত তাহারাও নবীর প্রচারকদের অমূল্য শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া গ্রামকে গ্রাম নবীর ধর্মে দীক্ষা লইতে লাগিল। ভাবাবেগ অনেক সময় সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। দেখাদেখি অসংখ্য উপজাতীয় সর্দারও এইভাবে কৌতুহলী হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল। চতুর্দিকে ধর্মের এক প্লাবন চলিল। শতধা-বিভক্ত আরব সন্তানগণ সেই প্লাবনে ভাসিয়া তাহাদের যুগ-যুগ-সঞ্চিত জ্ঞাতিকলহ ভুলিয়া গেল। ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও জিঘাংসার আবর্ত কাটাইয়া তাহারা এক উদার মহা মানবতার সাগর-তীরে উপনীত হইল।

উত্তরে সিরিয়া হইতে দক্ষিণে সাগর-বেলা পর্যন্ত সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের জয় জয়কার চলিল। দেবার্চনা, পুত্তলিকতা-পূজা সর্পপূজা, প্রস্তরপূজা ইত্যাদি পুরাতন কুসংস্কার সমুহ তিরোহিত হইয়া সর্বত্র এক নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রবর্তিত হইতে থাকিল।

কোনও যুগান্তকারী পরিবর্তনে মানুষের মনে স্বভাবতঃই নানা প্রশ্নের উদ্রেক হইবার কথা। পৈতৃক ধর্ম মানুষ কি সহজে ছাড়ে? ছাড়িলেও পুরাতন আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, মানুষ দীর্ঘকাল আঁকড়িয়া থাকে। আরবদের মনেও নানা জিজ্ঞাসাই জাগিয়াছিল। তাই তাহারা এই নতুন ধর্মের বৈশিষ্ট্য ভালরূপে উপলব্ধি করার জন্য দলে দলে নবীর নিকট আসিতে লাগিল। নানা প্রকৃতির এবং নানা উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত। কতক আসিত কোনও গোত্রপতি বা উপজাতীয় সর্দারের প্রতিনিধিরূপে নবীর প্রতি তাহাদের আনুগত্য ও মৈত্রী জানাইতে। কতক আসিত নবীর নিকট ধর্মীয় উপদেশ শুনিতে। আবার কোনও কোনও দল আসিত নবীর সহিত কূটতর্ক দ্বারা ধর্মের ব্যাপারে একটা বুঝা পড়া করিতে। আরব সাগরের তীরবর্তী সুদূর বাহরায়েন, ওমান, হাদরামাউত ও ইয়ামেনের সুলতান নবীর নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ যাঞ্চা করিতে। ঐ সকল ব্যক্তি পূর্বে কখনও কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই। ঐ সব স্থানে নবী নিজে কখনও পদার্পণ করেন নাই; শুধু তাঁহার বাণী পাঠাইয়াছিলেন প্রচারক মারফৎ। আবার অনেক স্থান হইতে কৌতুহলী উপজাতীয় লোকেরা আসিত মদীনায় তাহাদের "রাজা-নবী" কে (prince prophet) শুধু দর্শন আশায়।

পঞ্চম হিজরী হইতে বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিবর্গ এইভাবে মদীনায় আসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু নবম হিজরীতে তাহাদের সমাগম অত্যাধিক বাড়িয়া যায়। তাহারা সাক্ষাতে নবীকে নানা প্রশ্ন করিয়া মনের খটকা দূর করিবে, এইরূপ বাসনা লইয়া দূর-দূরান্ত হইতে ছুটিয়া আসিত। এইসব লোক সোজা নবীর গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাকে যখন তখন ডাকিয়া উত্যক্ত করিত।

www.pathagar.com

হিজরী নবম সনে মদীনায় প্রতিনিধি সমাগম এত বেশী হইয়াছিল যে,এই বৎসরটিকে 'প্রতিনিধি সমাগম বর্ষ' (year of deputations) বলা হইয়া থাকে। মদীনায় ইহাদিগকে আশ্রয় দিবার মত পর্যাপ্ত হোটেল বা সরাইখানা ছিল না। তাই নবীর অনুরোধে তাঁহার সাহাবীগণ এবং মদীনায় অবস্থাপন্ন সাবেক অধিবাসিগণ এই সকল দূরাগত অতিথিকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া গিয়া পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিতেন এবং আরব জাতি চিরাচরিত আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এই সকল প্রতিনিধিদলে কখনও দশ বিশ বা পঞ্চাশ জন,কখনও তিন-চারি শত লোকও একত্রিত থাকিত। মদীনাবাসীরা অকুণ্ঠিতচিত্তে সকলের সমাদর করিত। গ্রাম্য প্রতিনিধিগন প্রায়ই আদব-কায়দা জানিত না এবং নম্রতার ধার ধারিত না। তাহাদের অনেকের রুচিও মার্জিত ছিল না । নবীর প্রতি কি প্রকার আদব-কায়দা প্রদর্শন করিবে, এবং নবীর সম্মুখে তাহাদের পরস্পরের সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও তাহাদের জানা ছিল না। অনেক সময় নবী আহারে বসিয়াছে এমন সময় বিরাট একদল প্রতিনিধি আসিয়া গৃহের সম্মুখে হল্লা করিতে থাকিত এবং নবীকে ডাকিতে থাকিত শীঘ্র বাহির হইবার জন্য। মরুভূমির দেশের লোক বিলম্বে অভ্যস্ত ছিল না।

এই অবস্থায় আল্লাহ একটি ওহি নাযেল করেন। উহাতে বলা হইয়াছেঃ

"হে বিশ্বাসকারিগণ,নবীর সহিত কথা বলার সময় তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠ ছাপাইয়া না ওঠে এবং তাঁহার সম্মুখে তোমরা চীৎকার করিয়া কথা বলিও না, যেমন তোমরা বলিয়া থাক নিজেদের ভিতর কথা বলার সময়।"[১]

প্রতিনিধিগন ফিরিয়া যাইবার সময় নবী তাহাদিগকে পাথেয় স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ এবং তাহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেককে মূল্যবান উপহার দিয়া বিদায় দিতেন। ইহার ফল হইত শুভ। নবী ও ইসলামী সমাজের সম্বন্ধে তাহারা উচ্চ ধারনা লইয়া দেশে ফিরিত। যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া ইহারা আসিত তাহাদের নিকট নবী শুধু দুইটি জিনিস চাহিতেন, -ইসলামে বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রিয় আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ কিঞ্চিৎ বার্ষিক রাজস্ব। ইহা ছাড়া আর কোন সুবিধা তিনি দাবী করিতেন না। অথচ ইহার প্রতিদানে নবী তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা লিখিয়া দেওয়া হইত এই মর্মে যে, তাহাদের গোত্র বা সম্প্রদায়গত সুখ-সুবিধা পূর্ববৎ বহাল থাকিবে, কোনরূপ হস্তক্ষেপ তাহাতে করা হইবে না।

প্রতিনিধিদের সহিত নবী প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন করিয়া উপযুক্ত উপদেষ্টা পাঠাইতেন। ঐসব অঞ্চলের নবী দীক্ষিতদের ইসলামী ধর্ম-কর্মে তা'লীম দিতে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার হইতে পূর্বের কুসংস্কারসমূহ দূরীভূত করিতে । নবী এই সমস্ত প্রচারককে যাত্রাকালে বলিয়া দিতেন,-তোমরা যাহাদের সংশ্রবে যাইতেছেন

www.pathagar.com

তাহাদের কাহারও প্রতি রূঢ় হইবে না; সকলের সহিত কোমল ও সদয় ব্যবহার করিবে। মনে রাখিবে, অধিকাংশ স্থলেই তোমাদের কাজ হইবে সভ্যতা-বর্জিত অজ্ঞ লোকদের লইয়া। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবে, ঘৃণা করিবে না। আবার অনেক সময় গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী বা খৃষ্টান) লোকদের ভিতর এমন লোকদের দেখা পাইবে যাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, স্বর্গের চাবিকাঠি কি? তোমরা উত্তরে বলিবে, আল্লাহর সত্যতা প্রতিপাদন ও সৎকার্য।[২]

নবম ও দশম হিজরীর ভিতর নবীর প্রচারিত তৌহিদের বাণী আরবের দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে। নীতি হিসাবে এই ধর্ম যত সহজ মনে হয়, আচরণের পক্ষে উহা তেমন সহজ নহে। ইহাতে একদিকে আছে নামায, রোযা ইত্যাদির অনুশাসন ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অপরদিকে রহিয়াছে মদ্য, পরনারী ও অন্যান্য হারাম বস্তুর বর্জন। তথাপি আরবজাতি এই নবধর্ম সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল।

আরব দেশর লোকেরা এতপূর্বে কখনও নিজ নিজ গোত্রের সর্দার ছাড়া অন্য কাহারো একনায়কত্ব মানিয়া চলিতে শিখে নাই। কিন্তু এবার যে তাহাদের কি হইল, তাহারা স্বেচ্ছায় নবীর একক নেতৃত্ব মানিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল।ইহার ফলে তাহাদের একজাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার লক্ষণ সমূহ প্রকট হইয়া উঠিল। তাহারা বহু-ঈশ্বরবাদিতার স্থলে লাভ করিল এক মহত্তর ধর্মীয় বিশ্বাস ও উচ্চতর নৈতিক আর্দশ, যার ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি, তাহার গোত্রগত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের ভাই। এই নয়া জাতীয়তার ভিতর উচ্চ-নিম্ন বলিয়া কোনও শ্রেনীভাগ নাই। ইহার কোনও স্তরে পুরোহিত বা এমন কোনও মধ্যবিত্ত সুপারিশকারী নাই যে ব্যক্তি মানুষ ও তাহার প্রভুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া ব্যবধান সৃষ্টি করিবে। ভক্ত এখানে তাহার প্রভুর সমীপে সরাসরি নিজের সুখ দঃখ নিবেদন করিতে ও অনুগ্রহ চাহিতে পারে।

মসজিদ এ জাতির উপাসনা-গৃহ, প্রচারমঞ্চ, শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের সাধারণ মিলনক্ষেত্র। এখানেই হয় তাহাদের সামরিক কুচকাওয়াজ। মোটকথা, মসজিদই এ জাতির প্রাণ-কেন্দ্র। যে ব্যক্তি মসজিদের ইমাম, প্রয়োজনকালে তিনি জঙ্গের ময়দানে সৈন্য চালনা করিতেছেন । শিক্ষার এখানে এমনই পূর্ণতা। মদ,জুয়া, পরনারী, যাহা এতকাল আরব জাতির প্রিয় ছিল, নবীর মুখের একটি ঘোষণায় তাহা সমগ্র জাতির নিকট হারাম হইয়া গেল।

কি যে বিস্ময়কর লাগিয়াছিল আরবজাতির নিকট নবীর এই নূতন ধর্ম! উহারই প্রভাবে একটি নিরক্ষর, দরিদ্র জাতি, মাত্র দশ বৎসর সময়ের ভিতর–যাহা একটি সাধারণ পরিবারের মান উন্নয়নের জন্যও যথেষ্ট নয়–তারই ভিতর সম্পূর্ণ ঢালাই-ছাঁটাই হইয়া এক সুসংবদ্ধ ও বলিষ্ট মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের বহু কালের পুরাতন ও পিতৃপুরুষগত অন্ধ বিশ্বাস এবং অপসংস্কৃত আচারসমূহ নবীর

একটি ফুৎকারে উড়িয়া গেল। তৎস্থলে তাহারা লাভ করিল এমন একটি সরল ও অনাবিল সমাজ-বিধান যাহা তাহাদিগকে দিয়াছিল সুনীতি, মার্জিত রুচি, শক্তি এবং অপরিসীম আত্মপত্যয়, যার ফলে পরবর্তী এক শতকের ভিতর বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধিতে দেশগুলি তাহাদের পদানত হইয়াছিল। তাহারা শুধু পৃথিবীর ভিতর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়িতেই সমর্থ হয় নাই, তাহারা বিশ্বকে দিতে পারিয়াছিল, সভ্যতা, রীতিনীতি, এবং বিজ্ঞান।[৩]

অথচ এই নব সভ্যতার যিনি জনক ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর এবং সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন মরুভূমির সন্তান, যাহার কোনও পাঠশালায় কখনও হাতেখড়ি হয় নাই বা সেই লোকই দিয়া গেলেন এমন একখানি গ্রন্থ যাহা আজিও, এই আলোকপ্রাপ্ত যুগেও, দুনিয়ার এক অষ্টমাংশ লোক শ্রদ্ধার সহিত শুধু পাঠ করে না, অনুসরণও করিয়া থাকে। মো'যেযা (miracle)আর কাহাকে বলে?৩

কিন্তু আশ্চর্য এই, তিনি নিজে কখনও কোনও প্রকান মো'যেযার দাবী করেন নাই। তিনি বলিতেন, আমি অন্য সকলের মতই একজন সাধারণ মানুষ। মরু সন্তানদের মতই তিনি ছিলেন নিত্যান্ত সরল। তিনি যাহা নন, অথচ তিনি তাই বলিয়া ভণ্ডামী করিয়াছেন, এমন কথা (দুই একজন পাশ্চাত্য লেখক ছাড়া) কোনও দিনকেহ বলিতে পারে নাই।

॥২॥

চতুর্দিক হইতে নবী যতই ইসলামের অনুকূলে সাড়া পাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রাণ আরবের সীমারেখা ছাড়াইয়া সারা বিশ্বের মানবের জন্য করুনাময় আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে তিনি ছিলেন তাঁহার স্বজাতির পথপ্রদর্শক–অর্থাৎ মক্কার নবী। তাহার পর তিনি আল্লাহর নির্দেশ পাইলেন সকল মানুষকে সত্যের বাণী শুনাইতে তখন তিনি হইলেন সমগ্র হিজাযের নবী। তাঁহার কর্তব্য প্রসারিত হইল এবং মক্কার সীমা ছাড়াইয়া মদীনায় বিসর্পিত হইল। মদীনাকে কেন্দ্র করিয়া উহা সারা হিজাযে বিস্তার লাভ করিল। এইক্ষণে নবীর চিত্ত আর শুধু হিজাযে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানব তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থায় আলোকে ও শান্তির জন্য অধীর হইয়া আছে এবং ব্যাকুল ভাবে মুক্তির সন্ধান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের দায়িত্ব ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই কর্তব্যবোধ কোন অজ্ঞেয় জগতের গোপন নির্দেশে তাঁহার অন্তরের ভিতর সাড়া দিয়ে উঠেছিল।

তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৌহিদের বাণী, যে বাণী তাঁহার নিজের রচনা নয়, পরন্ত কোন অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে তাঁহার অন্তর্লোকে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই বাণীর আহ্বান তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া দূত মারফৎ দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে

www.pathagar.com

লাগিলেন। তাঁহার এই আহ্বানবাণীতে কথা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং ভাষা ছিল সহজ, কিন্তু অন্তরের সত্যানুভূতি উহাকে প্রাণস্পর্শী এবং মন্ত্রশক্তিবৎ অমোঘ করিয়াছিল। তিনি যাহা লিখিলেন তার সারমর্ম এই,"হে আদম সন্তান গণ সকলে শুন, ইহা আল্লাহর আহ্বান–সকল দেশের যুগের বাণীবাহক ও পয়গম্বরগণ একই সত্যের সাধক ও প্রচারক। সেই শাশ্বত সত্যকে সকলে অবলম্বন করো। দুনিয়ার সকল মানুষ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণতি হউক। তাহাদের স্রষ্টা এক, সুতরাং ধর্মও এক। অতএব আইস, আমরা সকল মানুষ সেই একই প্রভুর উপাসক-রূপে পরস্পর প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই পৃথিবীতে এক স্বর্গ রজ্যের প্রতিষ্ঠা করি।"

এই বাণী তিনি দূত মারফৎ প্রেরণ করিলেন পারস্য-সম্রাট খসরুর নিকট, রোমক-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট, মিশরের রাজা মিকাউকাসের নিকট এবং ছোট-বড় আরও অনেক শাসকের নিকট, যাঁহাদের সঙ্গে জীবনের তাঁহার কোন দিন চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। একজন সাধারণ লোকের ভিতর এমন দুঃসাহস কে কবে দেখিতে পাইয়াছে? এরূপ দুঃসাহস থাকিতে পারে শুধু দুই শ্রেণীর লোকের ভিতর,–এক যাহারা কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত উন্মাদ, দ্বিতীয় যাহারা সকল মানুষের উর্ধ্বে, অর্থাৎ মহামানব। নবী ইহার কোন শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন, দুনিয়ার পরবর্তী ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

হিরাক্লিয়াস (Heracleus) ছিলেন বাইজেনটাইন অর্থাৎ পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের অধীনশ্বর। তাঁহার রাজধানী ছিল কনষ্টান্টিনোপলে। তিনি জাতিতে ছিলেন রোমান, ধর্মের দিক দিয়া খৃষ্টান, আচারন-ব্যবহারে গ্রীক , কারণ রাজত্ব করিতেন তিনি গ্রীকদের দেশে। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্বদিকে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং জেরুযালেম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইরাকের ভিতর দিয়া পারস্যোর পশ্চিম সীমা স্পর্শ করিত। এ কারণে পারস্যের সহিত তাঁহার সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ছিল চিরন্তন।

নবীর লিপি যখন হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত হয়, তখন তিনি জেরুযালেমে অবস্থান করিতেছেলেন। নবীর দূত সেইখানেই যান। দূতকে তিনি সৌজন্যের সহিত দর্শন দেন এবং নবীর লিপি পাঠ করিয়া উহার ঔদার্যে মুগ্ধ হন। কৌতুহল বশতঃ তিনি দূতকে নবীর বংশ মর্যাদা, সততা, সত্যাবাদিতা,জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ধর্মীয় সাধনার সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞসা করেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় আবু সুফইয়ানও বাণিজ্য-ব্যাপদেশে তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবীর বংশ ও চরিত্র সম্বন্ধে দূতের উত্তরসমূহ আবু সুফইয়ান সমর্থন করেন। ইহাতে সম্রাট নবীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষ সম্ভাবনায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতে বিরত থাকেন।

www.pathagar.com

মিসর দেশের খৃষ্টান নরপতি মিকাউকাস নবীর উদার আহ্বানে প্রীত হন এবং উহার সারবত্তা ও মহৎ উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া নবীর প্রতি দূত মারফৎ হৃদ্যতা ও প্রশংসার বাণী প্রেরণ করেন।

আবিসিনিয়া (হাবশী) দেশের খৃষ্টান নৃপতি আসহামা (Nwgus) পূর্ব হইতেই নবীর সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এইক্ষণে তিনি নবীর সুস্পষ্ট আহ্বান পাইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং নবীর প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

আরব উপদ্বীপের পূর্ব-পক্ষিণ প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে বাহরায়েন ও ওমান নামক দুইটি প্রদেশ ছিল দুই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য। তথাকার নৃপতিরাও নবীর আহ্বানে সাড়া দেলেন এবং বহু প্রজাসহ ইসলামে দীক্ষা গ্রহন করিলেন।

পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে ইয়ামেন প্রদেশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমী। উহার পশ্চিমে লোহিত সাগর ও দক্ষিণে আরব সাগর। ইয়ামেনের অন্তর্গত প্রাচীন সাবা শহর ও উহার রাণী বিলকিসের কথা তওরাত ও বাইবেল উল্লেখিত আছে। এই সময় ইয়ামেনে পারস্য সম্রাটের নিয়োজিত একজন স্থানীয় শাসনকর্তা অবস্থান করিতেন। তাঁহার নাম ছিল বাজান। যে আশ্চর্য ঘটনা-পরমপরার ভিতর দিয়া এই অগ্নি উপাসক শাসনকর্তাটি স্বীয় প্রজাবৃন্দসহ ইসলাম গ্রহন করেন সে কথা পরে বলিতেছি।

পশ্চিম ইয়ামেন এবং পূর্বে ওমান, উভয় দিক হইতে ইসলামের তরঙ্গ আসিয়া হানা দিতে থাকায় মধ্যবর্তী হাদারামাউত নামক সুদীর্ঘ প্রান্তিক দেশটিও সেই তরঙ্গে প্লাবিত হইল। উহার সর্দার ও উপজাতীয় অধিবাসিগণ একযোগে নবীর ধর্মে দীক্ষা হইল।

হিজাযের উত্তরে সিরিয়া প্রদেশ। উহা ছিল রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের শাসনাধীন। ইসলামের আমন্ত্রণ সে দেশে কোথাও সাদর কোথাও বিরূপ সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিল। উহার করুণ পরিণতি ঘটে নবীর দেহত্যাগের অল্পকাল পরে।

সিরিয়ার পূর্বপ্রান্তে ইরাক। ইরাকের পূর্বেই পারস্য দেশ। পারস্য সম্রাট খসরু পারভিজের নিকটও নবীর দূত যথাসময়ে উপস্থিত হইল। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী এই পুরাতন রাজবংশের ঐশ্বর্য, আভিজাত্য ও ক্ষমতার গর্ব পারস্য সম্রাটকে অতিরিক্ত দাম্ভিক করিয়াছিল। তিনি নবীর দূতকে শুধু অপমানিত ও তিরস্কৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নবীর পত্রখানাও টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। কথিত আছে, নবী এই দুঃখের সংবাদ শুনিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, উদ্ধত খসরুর বিশাল সাম্যাজ্যও একদিন ঐরূপ টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। নবীর সে বাণী সত্য হইয়াছিল।

www.pathagar.com

খসরু তাঁহার নিয়োজিত ইয়ামেনের শাসনকর্তাকে হুকুম পাঠাইলেন অবিলম্বে মুহম্মদকে বাঁধিয়া পারস্যের রাজ-দরবারে প্রেরণ করিতে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব খসরু কি করিয়া জানিবেন, তাঁহাকে অগ্রে বাঁধিয়া লইতে মালিক-উল-মউত তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। ইয়ামেনের শাসনকর্তা বাজানের নিকট উক্ত আদেশ যখন পোঁছে। তার পূর্বেই খসরু তাহার বিদ্রোহী পুত্র সাইরাস কর্তৃক নিহত হন।

অতঃপর ইয়ামেনের গভর্ণর বাজান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে ইয়ামেনের বহু অধিবাসীও মুসলমান হইয়া যায়। বুদ্ধিমান বাজানের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, পারস্য-রাজা মদীনার যে লোকটিকে লইয়া খেলা শুরু করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন। এ লোক বিধাতা প্রেরিত না হইয়া যায় না। ইহার পর, হযরত ওমরের রাজত্বকালে মুসলিমদের হস্তে পারস্য সাম্রাজ্যের কি দশা ঘটিয়াছিল ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। এই ভাবে হিজরী সপ্তম ও অষ্টম সনের ভিতর সিরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত সমগ্র দেশে বিনা রক্তপাতে তৌহিদের বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আরব উপদ্বীপের বাহিরেও নানা সভ্য দেশে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

অষ্টম হিজরীতে নবীর এক দূত চীন দেশেও পদার্পন করে। এক আশ্চর্য ঘটনার ভিতর দিয়া চীনের সহিত আরবের মুসলমানদের এই সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কথিত আছে, চীন-সম্রাট তাইসাঙ স্বপ্নে জানতে পারেন, আরবদেশে এক নতূন নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি ইহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য মদীনায় দূত প্রেরণ করেন। আরবের সহিত চীনের অতি প্রাচীনকাল হইতেই কিছু কিছু পরিচয় ছিল। আরবের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বাহরায়েন ও ওমান দেশের সমুদ্রগামী বণিকেরা যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতে জাহাজযোগে পূর্ব মহাসাগরের দ্বীপসমূহের সহিত বাণিজ্য করিত। এই সকল বণিক সিন্ধু উপত্যকা, বোম্বেই ও সিংহলে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল এবং সুমাত্রা, যাভা, বর্ণিত, ফিলিপাইন ইত্যাদি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে পণ্যের জন্য যাতায়াত করিত। ইহার ছিল চীন ও আরবের ভিতরকার যোগসূত্র। কনফুসিয়াসের দেশ চীন ছিল স্বভাবতঃ সত্যজিজ্ঞাসু। চীনের সম্রাট তাইসাঙও স্বপ্ন দর্শনের পর কৌতুহল প্রণোদিত হইয়া জাহাজযোগে আরবে দূত প্রেরণ করেন। নবী ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের এক সাহাবাকে প্রচারক হিসাবে চীন দেশে প্রেরণ করেন।

ওহাব ইবনে আবু কাবশা নামক নবীর এই বিশ্বস্ত সাহাবা সমুদ্রপথে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে চীন সাগরের উপকূলবতী ক্যান্টন প্রদেশ অবতরণ করেন। সেখানে তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হন। তাঁহার প্রচার কার্য ও সেখানে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিছু কালের ভিতর তত্রত্য বহুলোক ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে। তাদের উপাসনার জন্য ক্যান্টনে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত মসজিদ বহু ক্ষয়-ক্ষতি ও

www.pathagar.com

সংস্কারের ভিতর দিয়ে আজিও তথায় টিকিয়া আছে এবং আদি-যুগে মুসলমানদের অসাধারন সাহস, আত্মত্যাগ ও ধর্ম নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কালে উক্ত মসজিদটির সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। উহার সন্নিকটেই আবু কাবশার পবিত্র সমাধি যুগ যুগ ধরিয়া দূরাগত পথিকদের মনে তাঁহার পুন্যস্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে।

॥ ৩ ॥

দুর্নীতি, দলাদলি, অত্যাচার, অবিচার ও প্রবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণ হেতু গোটা মনুষ্যজাতি যখন উৎপন্ন যাইতে বসিয়াছিল; মদ, জুয়, সুদ ও অবাধ নারী-সম্ভোগ দ্বারা জতিসমূহের অন্তঃসার যখন নিঃশেষিত হইতেছিল, যখন ভাই হইয়া অসঙ্কোচে ভাই এর বুকে ছুরিকাবিদ্ধ করিত, অসংখ্য নরনারী পন্যদ্রব্যের ন্যায় বাজারে বিক্রিত হইত এবং মনিবগৃহে তাহার বন্য পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত, যখন পৃথিবীর যাবতীয় পুরাতন ধর্মান্ধ লোকদের হস্তে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় পৃথিবীর পাপ ভার হরণের জন্য, আরব জাতির ভিতর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মহামানব হযরত মুহম্মদ (সঃ)। তিনি অধঃপতিত মানবজাতিকে দিলেন ধর্ম, ন্যায়-নীতি এবং পারলৌকিক জীবনের বিশ্বাস। যাহার গোত্রগত অর্থাৎ রক্তের যোগ ছাড়া মানুষে মানুষে অন্য কোনও প্রকার যোগসূত্র স্বীকার করিত না, তাহাদিগকে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে এক নূতনতর ও ব্যাপকতর বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যের ভাই; একের জীবন ও ধনসম্পত্তি অপরের নিকট পবিত্র ও অন্যায় হস্তক্ষেপের বহির্ভূত। ইহার ফলে আটলান্টিকের পূর্ব উপকূল হইতে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ একদেশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার সর্বত্র এক মুসলমান হইয়াছিল আর এক মুসলমানের ভাই। ইহাদের ভিতর–'আচ্ছালোমো আলায়কুম' ছাড়া অন্য কোনও পরিচয়ের দরকার হইত না, একে অন্যের বুকে ভাই -এর আদরে স্থান পাইত, হউক না একজন মরক্কো বা স্পেনবাসী এবং আর একজন মঙ্গোলিয়া বা ক্যান্টেনের অধিবাসী।

নবী মুসলিমগিকে শুধু ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাহারাও যাহাতে সম্মানের সহিত অর্থাৎ স্বাধীনভাবে দুনিয়ায় টিকিয়া থাকিতে পারে তারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগকে দিলেন সামরিক শিক্ষা, জাতীয়তার কল্যাণে বৃহত্তর ত্যাগের শিক্ষা, নেতার আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে অসীম আত্মপ্রত্যয়। ধর্মযুদ্ধে শহীদী সেনাদের মৃত্যু নাই, তাহারা মরিয়াও অমর, এ কথা তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত হইতে সাবেত করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি অন্ধ দৃষ্টি মুমূর্ষু মানবতাকে মৃত্যু-দুয়ার হইতে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবীর অবদানের এইখানেই শেষ নয়। তিনি সমাজ হইতে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য সুষ্ঠ সমাজ বিধান প্রবর্তিত করিলেন। বিচার ও ইনসাফকে দিলেন ধর্মীয় মর্যাদা

; ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়িয়া দিলেন নূতন রাষ্ট্র-নীতি। নব-গঠিত সমাজনীতিতে অভিজাত বা পুরোহিত বলিয়া কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর স্বীকৃতি নাই। সকল মানুষের হইবে সমান অধিকার। যোগ্যতা থাকিলে আজাদ ক্রীতদাসও রাষ্ট্রের খলীফা হইতে পারিবে ইহাই হইল নবীর প্রদত্ত বিধান।

সর্বপ্রকারে অধিকার বঞ্চিত ও দাসীতে পরিণত নারী জাতিকে তিনি দিলেন আইনের দৃষ্টিতে 'ব্যক্তিত্ব' এবং সম্পত্তি অর্জনের অধিকার।

ক্রীতদাস আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ হইয়া ও সমাজে পশুর জীবন যাপন করিতেছিল। তিনি তাহাদের জন্য মুক্ত ও মর্যাদা লাভের পথ উম্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিজে তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। ক্রীতদাসীদিগকে 'রক্ষিতা' হিসাবে উপভোগ না করিয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া পত্নীর অধিকার দিতে তাহাদের মনিবদিগকে নবী নির্দেশ দিলেন। আবার পুরুষদের বেলায় তাহাদের বিবাহের সর্বমোট সংখ্যাও সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন।

ধনের একস্থান অতিরিক্ত স্ফীতি অন্যখানে নিদারুন অভাব-মনুষ্য সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং বহু অনর্থ ও অশক্তির কারণ হয়। নবী উহার সমতা বিধানের জন্য যাকাতের বাধ্যতামূলক বিধান প্রবর্তিত করিলেন এবং তদুপরি ইচ্ছাকৃত দানকে মহত্তম পূণ্য বলিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন । ইহাতে ধনী নির্ধনের ভিতরকার চিরন্তন তিক্ততা হ্রাস পাইবার ব্যবস্থা হইল।

মদ, জুয়া ও সুদকে তিনি হারাম করিলেন এবং চুরি ও ব্যভিচারের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। ফলে সমাজ লাভ করিল এক সুশ্রী জীবন, নির্মল চরিত্র এবং উন্নত রুচি।

তিনি এই নয়া সমাজকে শুধু ধর্ম, ন্যায়নীতি ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন না, তাহাদিগকে জ্ঞান ও কর্মযোগে দীক্ষা দিয়া তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিলেন অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ও কর্ম-প্রেরণা। ইহার ফলে তাহারা গ্রীকদর্শন ও জড়বিজ্ঞান আকণ্ঠ পান করিয়া রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হয় এবং অনধিক দেড়শত বৎসরের ভিতর পৃথিবীর জ্ঞানগুরুর আসন অলঙ্কৃত করে।

অথচ আশ্চর্যের কথা এই হযরত মুহম্মদ (দঃ) এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, হিজরাতের পরে, মাত্র দশ বৎসরের ভিতর, যে সময় নাকি একটি সাধারণ পরিবারের মান উন্নয়নের জন্যও যথেষ্ট নয়। আরব জাতিকে তৎকালে নিকৃষ্টতম মানবীয় উপাদান বলিয়া গণ্য করা হইত এমন একটি জাতিকে তিনি দশ বৎসরের ভিতর ঢালাই-ছাঁটাই করিয়া এমন একটি উন্নত জতিতে পরিণত করিলেন, যাহারা তাঁহার তিরোধানের পর মাত্র আশি বৎসরের ভিতর পৃথিবীর যাবতীয় সমৃদ্ধ দেশকে পদানত

www.pathagar.com

করিতে, পৃথিবীর ভিতর বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়িতে সামর্থ হইয়াছিল- যাহা রোমক জাতি আট শত বৎসরেও করিতে পারি নাই। উমাইয়া শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গমালা হইতে পূর্বে মঙ্গোলিয়ার পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত এবং উত্তরে উরল পর্বত হইতে দক্ষিণে সিন্ধু উপত্যকা ও আরব সাগর ও আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই নয়া জাতি শুধু পৃথিবীর ভিতর বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়িয়াই জগতকে চমৎকৃত করে নাই, তাহারা পৃথিবীকে উন্নত সভ্যতা, মার্জিত রুচি, এবং বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা দিতেও সামর্থ হইয়াছিল। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে লইয়া এরূপ ব্যাপক ও বিরাট বিপ্লবের নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর দৃষ্ট হয় না।

---

১. সুরা ৪৯ আল্ হুযারাত, ২ আয়াত।

২. "And You will meet with many people of the Book who will question three, what is the key to heaven? Reply to them— (the key to heaven is) to testify to the truth of God and to do good work"—History of the Saracens, by Syed Ameer Ali, page 16-17.

৩. A poor shepherd nation, roaming unnoticed in deserts ......became, in a centyry, a nation, world-noticeable and gave sciince, morality and civilisation to the world.--Carlyle. P 310-311.

[জাহানে নও এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আশুরার তাৎপর্য

-মুহাম্মদ ইলিয়াস মজুমদার

১০ই মহররম ইসলামী ক্যালেণ্ডারে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিবস। এই তারিখে প্রতিবছর গোটা মুসলিম বিশ্বে উৎপযাপিত হয় পবিত্র "আশুরা"। ইসলামের ইতিহাসে ও মুসলামানদের জাতীয় জীবনে আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে আশুরার সেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিস্মৃত প্রায়-এখন আশুরা উদযাপন একটা আনুষ্ঠানিকতা বা রসুমে পরিণত রয়েছে। এই দিনে শুহাদ্যে কারবালাকে স্মরন করা হয়, তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। কিন্তু যা করা হয়, গরীব মিসকিনকে খাওয়ান হয়, তাজিয়া বের করা হয়, আরো অনেক কিছুই করা হয়। কিন্তু যা করা হয় না তা হল -"আশুরার" ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করা। এই দিনে ১০ই মহরম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে কেন হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে সপরিবারে শহীদ হলেন? তিনি কি চেয়েছিলেন? কারবালার প্রান্তরে সংঘটিত এই হৃদয় বিদারক ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরিণাম কি হয়েছিল? মুসলিম জাতির জন্য এতে কি শিক্ষা রয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা খুবই জরুরী-কারণ তা থেকে মুসলিম মিল্লাতের এই দুর্দিনে পথ-নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

দামেস্কের অধিপতি আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র ইয়াজিদ গোটা ইসলামী দুনিয়ার খেলাফত দাবী করে বসেন। কিন্তু তাঁর এ দাবী ছিল নেহায়েতই অন্যায়, অযৌক্তিক ও অবৈধ। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর সম্পাদিত চুক্তির পরিপন্থী ছিল এ দাবী। চুক্তি অনুযায়ী ইমাম হাসান (রাঃ) এবং তাঁর অবর্তমানে ইমাম হোসাইন (রা) এর খলিফা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইয়াজিদ চুক্তি লংঘন করে এবং ভয় ভীতি প্রদর্শন ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের আনুগত্য আদায় করে নেয়। সে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর আনুগত্যও দাবী করে। কিন্তু মহানবী (দঃ) এর দৌহিত্র ও হযরত আলী (রাঃ) এর পুত্র ইমাম হোসাইন (রাঃ) এই অন্যায় দাবী মানতে অস্বীকার করেন। এতে উচ্চাভিলাষী ইয়াজিদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে নির্মম ভাবে হত্যা করে। এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ফলে গোটা মুসলিম জাহানের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল -তার জের অদ্যাবধি চলছে।

দৃশ্যত: মনে হতে পারে-এটা ছিল দু'জন উচ্চাভিলাষী শাসকের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে এ সংঘাত শুধুমাত্র দুই

www.pathagar.com

ব্যক্তির মধ্যে ছিল না, ছিল দুই আদর্শের মধ্যে। এ সংঘাত ছিল অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের। ইমাম হোসাইন (রাঃ) নিজের এবং তাঁর পরিবার পরিজনের প্রানের বিনিময়েও সত্য ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন, অসত্য ও অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। চরিত্রহীন ও স্বেচ্ছাচারী ইয়াজিদের অন্যায় দাবী মানলে মুসলিম মিল্লাতের যে অপূরনীয় ক্ষতি হত, দূরদর্শী ইমাম (রাঃ) তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। অন্যায়ের নিকট মাথানত করার অর্থ হল অন্যায়কে অনুমোদন করার বৈধতা প্রদান করা। মহানবী (দঃ) এর উত্তরসূরী আহলে বাইতের কারো পক্ষে তা ছিল অসম্ভব। খেলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে কি পার্থক্য এবং এর পরিনতিই বা কি হতে পারে, অন্যেরা না বুঝলেও তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। খেলাফতে মুসলিম জনগণের মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হন-কিন্তু রাজতন্ত্রে জনমতের কোন তোয়াক্কা করা হয় না। খেলাফতে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বাক্-স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু রাজতন্ত্রের আর্বিভাবের পর রাজা-বাদশা-সম্রাটরা হয়ে গেলেন জনগনের প্রভু, আর জনগন পরিনত হল তাদের গোলামে। যদিও দৃশ্যত ঃ দেশে শরিয়তে আইনই চালু ছিল, কিন্তু রাজা-বাদশারা নিজেরা থাকতেন আইনের উর্ধ্বে। তাদের সমালোচনা করা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। খেলাফতের জামানায় খলিফা ছিলেন কোষাগারের তথা জনগণের সম্পত্তির আমানতদার। কিন্তু রাজতন্ত্রের আমলে রাজা-বাদশাহ্‌রা হয়ে গেলেন কোষাগারের মালিক। বস্তুত ঃ পক্ষে -স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহ্‌দের আমলে খাজনা দেয়া আর কুর্নিশ করা ছাড়া রাষ্টীয় কর্মকাণ্ডে জনগণের আর কোন ভূমিকাই রইল না। যারা রাজা-বাদশাহ্‌দের কাজের সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখাতেন তাদের ভাগ্যে জুটত নির্যাতন, নির্বাসন অথবা মৃত্যু। রাজরোষে পড়ে ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মত বিশ্ব বরেণ্য ফকীহ্‌কে কারাগারে মৃত্যুবরন করতে হয়েছে, ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলের (রাঃ) ভাগ্যেও জুটেছে অকথ্য নির্যাতন। রাজরোষের কবল থেকে বাঁচার জন্য এ সময় সূফিবাদের আর্বিভাব ঘটে, -যারা ধর্মভীরু পরহেজগার তারা রাজ্যকে রাজার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মোরাকাবা মোশাহেদায় মশগুল হওয়াকেই নিরাপদ মনে করলেন। আর এতে রাজা-বাদশাহ্‌রাও নিরাপদ হলেন। হক-পন্থী আলেমদের জায়গা দখল করল দরবারী আলেমরা। তাদের কাজেই চিল স্বৈরশাসকের বৈধ-অবৈধ সকল কাজকে শরীয়ত-সম্মত ও জায়েজ বলে ফতোয়া দেয়া। গোটা মুসলিম জাহানে ভণ্ড-পীর-ফকির-দরবেশের আর্বির্ভাব ঘটল-শের্ক, বিদায়াত ও ইসলাম বিরোধী আকিদা-বিশ্বাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদাতের পর ইসলামী দুনিয়ায় যে বিভেদের বীজ বপন করা হল -তা মুসলিম উম্মাহর-ঐক্যের বুনিয়াদকেই টলিয়ে দিল। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পর মুসলিম উম্মাহ শিয়া ও সুন্নী-এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। অতপর শিয়া-সুন্নী বিরোধ স্থায়ী রূপলাভ করে এবং এই দুই গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে অসংখ্য নিরীহ নিরাপরাধ মুসলমানের প্রান যায়। এ সংঘর্ষ-সংঘাত আজও অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্র অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে ইসলামের দুশমনেরা পরবর্তী সময়ে গোটা মুসলিম জাহানকে কব্জা করে নেয়, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, আবার কোথাও পরোক্ষভাবে। যে এশিয়া আফ্রিকার বিরাট অংশ এবং ইউরোপের কিয়দাংশ মুসলমানেরা শাসন করেছে তা তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল এবং মুসলমানরা ইহুদী-নাসারাদের গোলামে পরিণত হল। বিজয়ী প্রভুদের প্রভাবে মুসলমানদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমনকি চেহারা পর্যন্ত পাল্টে গেল। আজ আমরা মুসলমানদের যে অধঃপতন ও দুর্গতি দেখতে পাচ্ছি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে-সেজন্য দায়ী রাজতন্ত্র। আজ মুসলিম উম্মাহ্ বলতে বোঝায় এক অধঃপতিত জনগোষ্টিকে, যারা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, কুসংস্কার ও দারিদ্রতা যাদের নিত্যসংগী, যারা বিধর্মী বিজাতীদের কৃপা ভিক্ষা করে জীবন যাপন করে, যাদের মান-মর্যাদার আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। এখন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন কলুষিত, পারিবারিক জীবন বিপর্যস্থ এবং তথা মুসলমানের সামগ্রীক জীবন প্রবাহের কোথাও ইসলামের অস্তিত্ব নেই, সবই চলছে বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের ইশারা-ইংগিতে, পাশ্চাত্যে রীতি ও ঢংয়ে। যারা ধর্মভীরু তারা মসজিদে গিয়ে কিংবা গৃহকোনে বসে খোদা-প্রাপ্তির পথ তালাশ করে এবং এ ভাবেই মনের পিপাসা মেটায়। এমনকি যারা দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চান তারাও তা করতে চান পাশ্চাত্য রীতিতেই। কুফরী রাষ্ট্রে নির্বাচনের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তাও বুঝতে তারা অক্ষম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবস্থা আরও শোচনীয়। সমাজ-জীবনে নিরাপত্তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নারী ধর্ষন,খুন, জখম ছিনতাই-সমাজ-জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। গনতন্ত্রের নামে দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের শাসনকে বৈধ করা হচ্ছে-নারী স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীকে পরিনত করা হচ্ছে ভোগ্যপন্যে, শিল্প-সংস্কৃতির নামে নারীর রূপ-যৌবনকে জনসমক্ষে উলংগভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, আর উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে ব্যাভিচারের সকল দরজা। শিক্ষার নামে প্রচার করা হচ্ছে, বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা। মোট কথা শয়তানের বিষাক্ত নিঃশ্বাস কুলষিত করছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে-তথা গোটা বিশ্বকে। বর্তমান বিশ্বে শয়তানী শক্তির মোড়ল হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার

www.pathagar.com

ইউরোপীয় দোসররা। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের শাসকগোষ্ঠী তাদের তাবেদারি করে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। এই শয়তানী শক্তির চক্রান্তের ফলে গোটা বিশ্বই আজ মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিনতি। এই ভয়াবহ পরিনতি থেকে মানবজাতিকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তিয়েছে মুসলিম উম্মাহর উপর। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন-ই-তাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পন করেছেন। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাদেরকে এ দুনিয়াতে ভোগ করতে হবে অপমান ও লাঞ্ছনা, আর আখেরাতেও ভোগ করতে হবে জাহান্নামের আজাব। তাই -এই মুহূর্তে মুসলমানদের কর্তব্য হলো-আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (আল-কুরআনকে) মজবুতভাবে আকড়ে ধরা এবং মহানবী (দঃ) এর প্রদর্শিত পথে সংগ্রাম (জেহাদ) করা। আসুন, আমরা আশুরার শিক্ষাকে কাজে লাগাই, ইমাম হোসাইনের শাহাদত থেকে প্রেরনা লাভ করি এবং সুখী, সুন্দর ইসলামী সমাজ গঠন করি। আল্লাহ্ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

[২৭শে মে ১৯৯৮ ইং প্রবন্ধকারে আশুরার উপর আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত]

www.pathagar.com

মহানবী'র (সঃ) মি'রাজ

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরে ২৬শে রজব দিবাগত রাত্রিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয়নবী রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (রা)- কে বেহেশত, দোজখ ও স্বর্গীয় নিদর্শন সমূহ দেখাবার জন্যে বায়তুল মোকাদ্দাস হয়ে স্বীয় সান্নিধ্যে নিয়ে যান। বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদুল আক্সায় তিনি নবীদের নামাজের ইমামতি করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সেখানে নবীদের সরদার সাইয়েদুল মুরসালীন হওয়ার দুর্লভ সম্মান দান করেন। রাসুলূল্লাহর (সা) ৫২ বছর বয়সে ৬২১ খৃষ্টাব্দে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌছে আমাদের নবী বিশ্বমানবের পরিত্রাণের জন্যে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করেন। আল্লাহ বিশ্বনবীকে 'শাফিউল মুজনাবিন' বা পাপীগণের 'শাফায়াতকারী' এ নামে ভূষিত করেছেন।

মুসলিম জীবনের তিনটি পবিত্র রজনীর মধ্যে লায়লাতুল মি'রাজ বা মি'রাজের রাত অন্যতম। অন্য দু'টো লায়লাতুল কদর এবং লায়লাতুল বরাত। লায়লাতুল কদর এবং লায়লাতুল মি'রাজের উল্লেখ আল-কুরআনে আছে। লায়লাতুল বরাত বা শবে বরাতে যদিও আমরা অত্যন্ত জৌলুস ও শান শওকত এবং আবেগের সংঙ্গে পালন করি, তা উল্লেখ আল কুরআনে নেই। লায়লাতুন মুবারক বলে আর একটি রাতের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, লায়লাতুল বরাতই লায়লাতুল মুবারক। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। লাইলাতুন মুবারক বলতে লাইতুল কদরই বুঝান হয়েছিল।

বুরাক এবং রাফরাফ ঃ ১২ হিজরীর ২৬শে রজবের দিবাগত রাতে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (রাঃ)-কে এক অপরূপ যানে আরোহন করিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁর নভোভ্রমণ শুরু হয় এবং সুবেহ্ সাদিকের পূর্বেই তিনি আবার মক্কায় ফিরে আসেন। এ ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন তা খুবই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। অতি অল্প সময়ে কি করে নভোভ্রমণ সম্ভব? আজকাল অবশ্য মানব নির্মিত যানে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে বা তার চেয়ে কম সময়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা যায়। তাছাড়া সময় একটি আপেক্ষিক ব্যাপার।

যে মানুষ হাজারো বৈজ্ঞানিক গবেষনা সত্বেও একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার স্বাভাবিক পা, ক্ষুদ্র মৌমাছির একটি ডানাও তৈরী করতে পারে না, সেই মানুষের তৈরী নভোযান বা রকেট নভোচারীর নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করতে পারে, আর আল্লাহ্র পক্ষে কুদরতী যানে তার প্রিয় বন্ধুকে নভোভ্রমণ করান কি অসম্ভব?

www.pathagar.com

একরাতে সারাবিশ্ব এবং নভোমণ্ডল ভ্রমণ এর ব্যখ্যা করতে না পেরে কেউ কি বলেছেন যে, রাসুল (দঃ)স্বপ্নে নভোমণ্ডল ভ্রমণ করেছিলেন। আসলে তা নয়। তিনি বুরাক নামক এক স্বর্গীয় কুদরতী যানে নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করেন।

'বুরাক' শব্দটি এসেছে আরবী বার্ক শব্দ হতে। বার্ক অর্থ হল বিদ্যুৎ। বুরাক ছিল একটি বৈদ্যুতিক যান। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। শব্দ শুনার আগেই আমরা বিদ্যুৎ চমক দেখি। বুরাকের গতি ছিল রকেটের গতি হতে অনেক অধিক। আলোর গতি হতেও লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। চলার সময় আমাদের নবীর দেহ ছিল আল্লাহর খাস কুদরতি পোষাকে আচ্ছন্ন।

গ্রহ-নক্ষত্র মণ্ডল অতিক্রম করে নবী করীম (সা) পৌছেন নক্ষত্র জগতের শেষ প্রান্তে সিদরাতুল মুনহাতা নামক স্থানে। সেখানে তিনি তার নভোযান বুরাক পরিবর্তন করেন এবং অন্য একটি নভোযানে আরোহন করেন। উহার নাম 'রাফরাফ। এর গতি আলোর গতি হতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। এই যানে তিনি একাই গমন করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার সঙ্গে যাননি।

এই ভ্রমণকালে মহানবী (সাঃ) স্বর্গ, নরক এবং আয়াতুল কুবরা অর্থাৎ আল্লাহর মহা-নিদর্শনসমুহ দেখেন (সূরা- নজম)। আল্লাহ্ একমাত্র আমাদের রাসুলকেই তাঁর অতি নিকট সান্নিধ্য দেন, যেখানে জীবরাঈল ফেরেশতা বা অন্য কোন নবী যেতে পারেন নি।

ইয়াকিন ঃ মহানবী (সাঃ) কে আল্লাহ মি'রাজে নিয়ে কি শিক্ষা দিলেন? বেহেশত, দোযখ, আখেরাত এগুলো সম্পর্কে রাসুল আগেও অবগত ছিলেন। এতে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তাঁর এক হাতে চাঁদ আর এক হাতে সুরুজ এনে দিলেও তিনি সে বিশ্বাস থেকে নড়তে রাজী ছিলেন না। তবে এটুকু বলা যায় যে, মিরাজে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তায় পরিণত হলো। আগে এগুলো সম্বন্ধে তিনি জীব্রাঈলের কাছে শুনে বলতেন, এবার স্বয়ং দেখে বললেন । শুনা সাক্ষ্য থেকে দেখা সাক্ষ্যের গুরুত্ব দুনিয়ার বিচারকগণ বেশী দিয়ে থাকেন।

মারিফাত ঃ মহানবী (সা) এর মিরাজ আমাদের বর্তমান কালের মুসলমানদের জন্য কি শিক্ষা রেখে গেছে, তা অনুধাবন করা দরকার। মি'রাজের প্রথম শিক্ষা মারিফাত সম্পর্কীয়। আল্লাহর দিদার এবং সান্নিধ্য লাভ করে আমাদের মহানবী (সঃ) মারিফাতের শীর্ষে পৌছেন। মারিফাতের ক্ষেত্রে তিনি চরম সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু ঐ উৎকর্ষতা লাভ করে তিনি দেওয়ানাও হলেন না। মজযুব হলেম না। তন্দ্রাগ্রস্থ হলেন না।

www.pathagar.com

বর্তমান সমাজে মারিফাত চর্চা করেন, তারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন। তসবীহ, যিকির-আযকার, তাবিজ-তুমার নিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের রাসুল (সঃ) মারিফাতের চরম শীর্ষে আরোহন করে দুনিয়াতে ফিরে এলেন। শুধু যে এলেন তা নয়, দুনিয়া তাঁকে আরো আষ্টে পৃষ্টে বাঁধল। বিশ্বনবী অধিকতর আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে দুনিয়ার মুখোমুখি হলেন।

মহানবী মতান্তরে তেইশটি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। জিহাদ, গাজওয়া, সারিয়াহ মি'রাজের পর অনুষ্ঠিত হয়; মি'রাজের পূর্বে নয়। শায়খ, মুর্শিদ, বুজুর্গগণ মারিফাতের উৎকর্ষ হাসিল করে সমাজের নেতৃত্ব ও সরদারী গ্রহণ করলে দুনিয়াতে অশান্তি, ও দুর্নীতি, শোষণ-যুলুম অনেক কম হতো।

দুনিয়া ঃ পূর্বে বিশ্বনবী যে কাজ করতেন না মিরাজ থেকে ফিরে এসে তিনি সেই কাজও শুরু করলেন। মি'রাজে যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন হযরত মুসা (আ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ন্যায় ধর্মীয় নেতা। ফিরে এসে তিনি হিযরত করলেন এবং মদীনায় প্রতিষ্ঠা করলেন ইসলামী রাষ্ট্র। মি'রাজে আল্লাহর রাসুলকে শুধু দীন ইলম নয়, সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিক্ষা সমষ্টি চেতনা ঃ মি'রাজের তৃতীয় শিক্ষা হলো, সমাজ ও সমষ্টি চেতনা। আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার পর মানুষের চাওয়া পাওয়ার আর কিছু থাকে না। মানুষের সর্বোচ্চ আকাংখা আল্লাহ্র দিদার। জীবন পরিপূর্ণ ও সার্থক হয় আল্লাহর দিদার পেলে। কিন্তু রাসুল (সা) দিদার পেয়েও সেখানে থাকলেন না। হযরত ইদ্রিস (আঃ) এতটুকু পৌছতে পারেননি,যতটুকু রাসুল (রাঃ) পৌছে ছিলেন। নভোমণ্ডলের চারটি স্তর অতিক্রম করার পরই অতি বিচক্ষণতার সংগে তিনি জিবারঈল (আঃ) এর সংগ ত্যাগ করেন। হযরত ইদরিস (আঃ) আর দুনিয়ার ফিরে আসেনি।

আমাদের মহানবী (সাঃ) অনেক উপরে উঠেও সেখানে থাকেননি। তিনি মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, ঘর থেকে বিতাড়িত হতে, বার বার আক্রান্ত হতে, আহত হতে , নিজের দাঁত ভাংতে। এর কারণ তাঁর মধ্যে ব্যক্তি চেতনা যতটুকু ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল সমষ্টি চেতনা। তিনি একা থাকতে চাননি। দুনিয়ার ফিরে এসে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। সে মহান লক্ষ্যে আমাদের নিয়ে যেতে দুনিয়ার ফিরে এসেছিলেন। এতে তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ যতই হোক না কেন।

আমালুস সালিহ ঃ মি'রাজের চতুর্থ শিক্ষা হলো আমালুস সালিহ অর্থাৎ কল্যাণ কর্ম। আল্লাহ্র রাসুল (রাঃ) এর কথাবার্তায় বা সংলাপের কিছু অংশ আমরা

www.pathagar.com

আত্তাহিয়্যাতুতে পড়ি। মিরাজে রাসুল (সাঃ) আল্লাহ্‌র ইবাদুস সালিহীনদের কথা বলেছেন এবং তাদের প্রতি দরূদ এবং সালাম পাঠিয়েছেন।

মি'রাজ থেকে ফিরে এসে মদিনায় হিজরত করে রাসুল (সাঃ) আমালুস সালিহাতে আত্মনিয়োগ করেন। যুবকদেরকে তিনি তাঁর দিকে আকর্ষণ করেছিলেন, আমালুস সালিহা বা জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে।

আমাদের দেশে গ্রামের লোক চোর-ডাকাতের উৎপাতে ঘুমাতে পারেনা। গ্রামে প্রতিরক্ষা পার্টিতে যোগ দিয়ে অন্যান্য এবাদতসহ আমরা আমালুস সালিহা করে ইবাবদুস সালিহীন এ পরিণত হতে পারে। শুধু গ্রাম কেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেরা কেন্দ্র এ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানেও লোকেরা নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে পারেনা। এখানে মহল্লা প্রতিরক্ষা সংগঠন দরকার।

সকলে মিলে নর্দমা পরিস্কার করে রাখলে অন্তত একটু আরামে ঘুমান যায়, মশার কামড় কম হয়। মসজিদ বা রাস্তার কোনে দাঁড়িয়ে মাছির অপকারিতা, মৌমাছির উপকারিতা সম্বন্ধে ঘোষণা করলেও কিছুটা আমালুস সালিহ্‌ বা সৎকর্ম হয়।

নামায রোযা আল্লাহ্‌র কাছে কতটুকু গৃহীত হবে, সে ব্যাপার কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। কিন্তু নিয়ত ঠিক থাকলে আমালুস সালিহা কবুল হয়ে যায়।

মিরাজের অনুপ্রেরণা-বিজ্ঞান চর্চা ঃ আমরা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সৌরশক্তি আয়ত্ত্ব করে ব্যবহার করতে পারি। কারণ, আল্লাহ্‌ বলেছেন সূর্যকে তোমাদের অধিনস্থ করে দেয়া হয়েছে। তেমনি চন্দ্র , সুর্য ,সাগর, বাতাস, আকাশ ও জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহ্‌ আমাদের অধিনস্থ করে দিয়েছেন। একথা আল্লাহ্‌ আল-কুরআনে বার বার বলেছেন। এগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে পারব না, যদি আমরা বিজ্ঞান চর্চা না করি।

ঝাড়, ফুক, তাবিজ–তুমার দিয়ে যারা গুটিকতক মানুষের চিকিৎসা করেন, তাদের জন্যে আমরা মাজার বানাই, খানকা প্রতিষ্ঠিত করি। এগুলো খুব ভাল কথা কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আমার তো মনে হয় অতি বড় স্মৃতিসোধ হওয়া উচিৎ আলেক জাণ্ডার ফ্লেমিং এর কবরের উপর, যিনি পেনিসিলিন আবিস্কার করেছিলেন।

বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ ঃ আল্লাহ বলেছেন, কুরআন একটি বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থকে আল্লাহ সুরাহ ইয়াসীনে কুরআনুল হাকিম বা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ নাম নিজে দিয়েছেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। বিজ্ঞানমুখী হতে হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝাতে হবে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান চর্চায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কেন উৎসাহ থাকবে না। রাসুল (সাঃ) কে যারা ভালবাসেন, বিজ্ঞান চর্চায় অবশ্যই তাদের উৎসাহ থাকা উচিত। রাসুলের কথা এবং স্বর বাতাসের ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি যা বলেছেন তা নষ্ট হয়ে যায়নি। মুসলমানগণ যদি খৃষ্টানদের তৈরী রেডিও হতে অধিক শক্তিশালী সফিষ্টিকেটেড রেড়িও বানাতে পারে। তবে তাদের পক্ষে ইথার থেকে রাসূলের কণ্ঠস্বর ধরা সম্ভব হতে পারে, আমরা রাসুল (সঃ) এর কথা নিজের কানে শুনতে পাব ইনশাআল্লাহ। যে হিকমত বা বিজ্ঞান চর্চা হতে মুসলমানগণ মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, সে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ইসলামের যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্ভব।

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। যে নক্ষত্রের আলোর গতি পৌছাতে তিন বৎসর লাগবে, সে নক্ষত্রে আজ পৃথিবীতে যে ঘটনা ঘটছে তা দেখা যাবে তিন বৎসর পর। যে নক্ষত্রে পৃথিবীর আলো পৌছতে ১৪০০ বৎসর লাগে, সে নক্ষত্রে যদি আলোর থেকে কয়েকশত গুণ তাঁর গতিশীল রকেটে চড়ে আমরা পৌছতে পারি এবং অতি শক্তিশালী টিভি বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে যেতে পারি, তবে ১৪০০ বৎসর পূর্বে এ পৃথিবীতে যারা ছিলেন তাদেরকে দেখা সম্ভব হবে।

নভো-বিজয় ঃ নভোমণ্ডল বিজয় কিভাবে সম্ভব? তা সম্ভব হয় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। কুরআন হতে বিজ্ঞানের মূল সূত্র বের করে আমাদেরকে বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। কুরআনের সূত্র অবলম্বন করে ইবনে সিনা সমকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। কুরআনের সূত্র অবলম্বন করেই ইবনে খালদুন শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ছিল বলেই আমরা আমাদের মধ্যে আলবেরুনী, আল-জাবীর, ইবনে হাইয়াম, আল-ফা'রাবী.রাজী, ইবনে বতুতা, আল-ইদরিসী প্রমূখকে পেয়েছিলাম।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ভুলে আমরা দুনিয়ার অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়েছি। ১০০ কোটি মোসলমান এর মধ্যে তিনজন এখন পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পায়নি। সারা মুসলিম বিশ্ব আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতে আচ্ছন্ন। যে দু'জন মুসলিম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাদের একজন কাদিয়ানী, অপরজনের মন মানসিকতা ইসলামবিরোধী এবং ইহুদী মিত্র বলেও তার দুর্নাম আছে।

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এখন নভোমণ্ডলের দিকে। ইউরোপ, আমেরিকা, নভোমণ্ডল বিজয়ের সাধনায় ব্যস্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম জাহান তলোয়ার নিয়ে সুন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত আগ্নেয়াস্ত্র আবিস্কার করে সারা মুসলিম জাহানকে গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করে। একবিংশ শতাব্দীতে নভোমণ্ডলে আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব

www.pathagar.com

হলে আবার মুসলিম দুনিয়া পরাশক্তির তাবেদার হয়ে তাদের গোলামীর জিঞ্জিরে হয়ত আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

শ্রেষ্ঠ নভোচারী ঃ মিরাজের অর্থ উর্দ্ধে আরোহণ ও নভোমণ্ডল ভ্রমণ। মাবনজাতির ইতিহাসে যত ভ্রমণকারীর আবির্ভাব হয়েছে বা হবে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারী এবং নভোমণ্ডল বিচরণকারী হলেন আমাদের নবী (সঃ)। তিনি বিলাত ফেরত, আমেরিকা ফেরত বা নভোমন্ডল ফেরত ছিলেন না। তিনি কতদূর গিয়েছিলেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে সে যুগে দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল মুসলমানরা। এখন জীবিত থাকলে রসুল (সাঃ) হয়ত আমাদেরকে আমেরিকা, কানাডা, জাপান, জার্মানী যেতে বলতেন।

কারো কারো মতে, মি'রাজের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রধান শিক্ষা হলো বিজ্ঞান -চর্চার নির্দেশ। সে সম্বন্ধে আল্লাহ আল-কুরআনে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কারীদেরকে হুকুম দিয়েছেন ঃ তোমরা বিশ্ব জাহানে আল্লাহর আয়াত এবং নিদর্শনসমূহ পাঠ করবে। শুধু দুনিয়ার অল্প একটু মাটি নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো না, বিশ্বজাহানই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ ফিরিশতা থেকে শ্রেষ্ঠ। ফিরিশতা নভোমণ্ডল ভ্রমনে যতটুকু যেতে পারেনা, তোমরা তার থেকে অনেক বেশী যেতে পারবে।

মহানবী (সাঃ) আল্লাহর কুদরতে নভোমণ্ডল বিচরণ করেছে এবং আমাদের সামনে আলোকবর্তিকা হিসাবে বিরাজ করেছেন। আল্লাহ নবীকে নভোমণ্ডল ভ্রমণের যে ফর্মুলা দিয়েছেন তা হলো -নভোমণ্ডল ভ্রমণের জন্যে মারিফাত বা কুদরতী ফর্মুলা। ঐ ফর্মুলা মানুষের জন্যে সম্ভাবনাময়। মানুষকে বুদ্ধি বিবেচনা গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চা করে অগ্রসর হতে হবে।

মি'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের অসাধারণ শক্তির সম্ভাবনা জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ গবেষণা ও বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে শুধু যে উপগ্রহে বা চাঁদে যেতে পারে তা নয়, গ্রহ নক্ষত্রের জড় জগত পার হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে আরও উর্দ্ধে যেতে পারে। নভোমণ্ডল এবং তদুর্দ্ধ ভ্রমণ হবে আমাদের মহানবী (সাঃ) এর সুন্নাত।

[লেখক সাবেক সচিব, আল-বারাকা ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ]

www.pathagar.com

হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর গীতি

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

জার্মান মহাকবি গ্যেটে আঁ-হযরতের জীবনী অবলম্বনে একটি নাটক রচনার সংকল্প করেন; কিন্তু এই গীতিটি ব্যতীত এই সম্বন্ধে তিনি আর কিছু রচনা রাখিয়া যান নাই। আঁ-হযরতের ওফাতের পূর্বে তাঁহার গৌরব উজ্জ্বল জীবনের বিষয় লইয়া হযরত আলী (রাঃ) এই গাঁথা আবৃত্তি করেন-গ্যেটে এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছে। এই গীতিতে রসূলূল্লাহকে গিরি প্রস্রবণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" কবিতার সহিত ইহার আশ্চর্য মিল আছে। আমি বহু পুর্বে জার্মান হইতে ইংরেজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত গ্যেটের স্মৃতি-সভা উপলক্ষে এই বঙ্গানুবাদটি করা হইয়াছিল।

॥ ১ ॥

দেখ ঐ গিরি প্রস্রবণ
আনন্দে উজ্জ্বল
যেন তারার এক চমক;
মেঘের উপরে
পালে তারে তরুণ বয়সে
সদয় আত্নিকগণ
চূড়াগণ মধ্যবর্তী ঝোপের মাঝারে।

॥ ২ ॥

তরুণ ও তাজা সে
মেঘ হতে নেচে পড়ে
নীচে মর্মর প্রস্তর 'পরে'
আবার লাফিয়ে উঠে স্ফুর্তিতে।

॥ ৩ ॥

গিরিবর্ত্ম-মাঝে
তাড়িয়ে নিয়ে সে চলে রঙিন উপল রাজি,
আবার নেতৃসম অগ্র পদক্ষেপে,
ছিঁড়ে নিয়ে যার তার ভাইপ্রিয় প্রসবণগুলিকে
তার সাথে আগে আগে।

www.pathagar.com

॥ ৪ ॥

নীচের উপত্যকা মাঝে ফোটে
তার পদক্ষেপ-তলে ফুলরাশি।
আর প্রান্তর
জীবন পায় তার প্রশ্বাস হতে।

॥ ৫ ॥

তবুও নামাতে পারে না তারে ছায়াময় কোনো উপত্যকা;
অথবা কোনো ফুল-দল
জানু ঘিরে' জড়ায়ে ধীরে
তাদের প্রেমময় চোখে পারে না
আটকাতে তারে।
সমতল ছুটে তার গতি
সর্পসম গতিতে ।

॥ ৬ ॥

মিশুক ঝরনাগুলি মিশে
তার সাথে। তখন সে চলে
সমতল' পরে রূপালী গৌরবে।
আর সমতল গৌরব করে তারে নিয়ে।
উপত্যকার নদীগুলি
আর পাহাড়ের ঝরনাগুলি
স্ফূর্তিতে চেঁচায় আর বলে, ভাই,
ওরে ভাই, নে তো ভাইগুলিকে সাথে,
সাথে করে তোর প্রাচীন বাপের কাছে–
–সেই শাশ্বত সাগরের কাছে–
সুপ্রসারিত বাহু নিয়ে
আছেন যিনি তোদের প্রতীক্ষায়।
আহা! বৃথা তারই বাহু-প্রসারণ
আলিঙ্গিত তার প্রার্থীদেরে।
কেননা নিঃশেষ করে মোদের মরু-প্রান্তরে
পিয়াসী বালুকা, উর্ধ্বে সূর্য
চুষে নেয় মোদের রক্ত; একটি পাহাড়

www.pathagar.com

হ্রদ মাঝে মোদের ঘিরে রাখে! ভাই,
নে তোর সমতলের ভাইগুলিকে
নে তোর পাহাড়ের ভাইগুলিকে
সাথে ক'রে তোর পিতার কাছে।

॥ ৭ ॥

তবে এস তোমরা সকলে;
এখন ফুলিছে সে
প্রভুরূপে; একটি গোটা জাতিকে
তার রাজকীয় স্রোতে উঠার উর্ধ্বে,
এবং সঞ্চরমান জয়যাত্রায়
দেয় সে নাম দেশকে; নগর
জন্মে তার পদতলে।

॥ ৮ ॥

সতত অবাধগতি ধায় সে দূরতর,
ছেড়ে সে চলে টুঙ্গি অলোক চূড়াময়,
মর্মর প্রাসাদগুলি, সৃষ্টি
তার পূর্ণতায়, দূরে পশ্চাদভাগে।

॥ ৯ ॥

দেবদারু গৃহগুলি বয় 'আতলাস'
তার রাক্ষস-স্কন্ধে পত্ পত্ শব্দে উড়ে
মস্ত উপরে তার;
সহস্র পতাকা মলয় পানে,
দেখায় তার প্রভুত্ব।

॥ ১০ ॥

এরূপে বয়ে নিয়ে যায় সে তার ভাইগুলিকে,
তার ধনভান্ডারগুলোকে,তার শিশুগুলিকে
প্রতীক্ষমাণ জনকের কাছে,
আনন্দ-চীৎকারে তাঁর বক্ষ-মাঝে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় নাতিয়া

আবদুল কাদির

আদিযুগে বাংলা কাব্যগুলি পালা, পাঁচালী বা পুরাণ-কথা রূপে গীত হইত। শ্রোতাদের অভিরুচি অনুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টাস্তুতি বর্ণনা করিয়া কাব্যারম্ভ করা সে যুগের বিশেষ রেওয়াজ ছিল। বঙ্গে তুর্কী-অভিযানের (১২০১ খ্রীঃ) প্রাক্কালে রামাঞি পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' বিরচিত হয়; তাহাতে সৃষ্টিপত্তন বর্ণিত হইয়াছে এভাবে–

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বর্ন্ন চিন্।
রবি শশি নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল ন ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ ॥....
শূন্যেতে ভ্রমেন প্রভু শুন্যে করি' ভর।
কাহারে জন্মাব প্রভু ভাবে মায়াধর।।
বিশাইর উপরে প্রভুর উপজিল দয়া।
আপনি সৃজিল প্রভু আপনার কায়া ॥
দয়ার সাগর প্রভু হয়ে গেল থিত্।
দেহ হৈতে পূনর্জন্ম আচম্বিত ॥

মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি অধিকারের অনেক আগে হইতেই বাঙলায় ওলি-দরবেশগণের অনুপ্রবেশ চলিয়াছিল; কাজেই তাঁহাদের সৃষ্টি রহস্য-ব্যাখ্যার সঙ্গে তৎকালীন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের কিছু পরিচয় লাভ অসম্ভব নহে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত হাদিস গুলির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে–

"আল্লাহ্ ছিলেন এবং আর কিছুই তাঁহার পূর্বে ছিল না।" –(হাদিস ঃ বুখারী)

আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ আকাশ ও মৃত্তিকা পয়দা করিবার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মখলুকাতের ভাগ্য লওহ্-মহফুজে লিপিবদ্ধ করান। তৎকালে তাঁহার আরশ পানির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। –(মুসলিম) আল্লাহ তায়ালার উক্তি –"আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ন্যায় ছিলাম। অনন্তর আমি ভালবাসিলাম যেন আমি পরিচিত হই। অনন্তর আমি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিলাম।"–(হাদীস)

বৌদ্ধ-দর্শনে শূন্যবাদ (Doctrine of Essencelessness) স্থান কাল-ভেদে নানা মত ও তত্ত্বের উদ্ভবের হেতু হইয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধ মহাযানের শূন্যবাদ হইতে শূন্যপুরাণোক্ত শূন্যবাদের পার্থক্য কতখানি এবং সেই পার্থক্যের মূলে

www.pathagar.com

মুসলমান মা'রেফত পন্থীদের প্রভাব কিছু মাত্র ক্রিয়া করি'য়াছে কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞগণই বলিতে পারেন।

বুদ্ধদেবের শিক্ষায় পূজা-পাঠের কথা নাই; কিন্তু তিনি যে শাশ্বত সত্তার আসন 'শূন্য' (void) রাখিলেন সেই 'শূন্যতার' (nothingness) স্থানে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাকেই স্থাপন করিয়া বিবিধ প্রকার পূজা-পদ্ধতির প্রবর্তন করিল-কালক্রমে বুদ্ধ হইলেন 'ধর্মঠাকুর' (Lord of 'substantion Phenomena')। ধর্মঠাকুরের পরিচয় প্রসঙ্গে শূন্যপুরাণে বলা হইয়াছে-

বম্ভা বিষ্টু মহেস্বর জাহাব তনএ।
রজ সত্ত তম আর্দি সর্ব গুণমত্র ॥

সদ্ধর্মের এই ঘোর বিকারের দিনে হিন্দুদের নানা দেবদেবী বৌদ্ধতন্ত্রে প্রাধান্য লাভ করে,-বুদ্ধদেব 'নৈরাত্ম্যদেবীর' সহিত শুন্যে লীন হইয়া যান ও বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুয়ানীতে লোপ হইয়া যায়। পরবর্তীকালে বিকৃত বৌদ্ধের 'নিরঞ্জন' শুধু স্মৃত হইয়াছেন সৃষ্টির 'আদিপুরুষ' রূপে। বাঙালী হিন্দুর আদি-কবি কৃত্তিবাস তাঁহার 'রামায়ণ' কাব্যে বলিয়াছেন-

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিনজন ॥

-('সর্যবংশ বিবরণ' অধ্যায়)

সেই হইতে ঐশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুর কাব্যে হিন্দু দেব দেবিগণের 'বন্দনা' স্থান পাইয়াছে। কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় চৈতন্য-যুগে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৪৯৬-১৫৮২) তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শুরু করিয়াছেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩), নিত্যানন্দ (১৪৭৩) ও অদ্বৈতচন্দ্র (১৪৩৪-১৫৫৭), এই তিন প্রভুর জয়-ঘোষণা করিয়া-

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দেঁ, তিনে মোন নাথ ॥

-('আদিলীলা' প্রথম পরিচ্ছেদ)

কিন্তু এ-শ্রেণীর চরিতাখ্যানগুলি কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। গৌর-ভক্তদের ভাববিহ্বলতার বেগ প্রশমিত না হইতেই দেখা গেল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৫৩৭-?) তাঁহার ' চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'প্রথমে বন্দিব দেব ধর্ম নৈরাকার " বলিয়া 'দিগবন্দনা' করিতেছেন-

www.pathagar.com

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন ॥
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃজনের উপায় কারণ ॥

কিন্তু 'ধর্ম নৈরাকার' তখন এদেশের অনার্য ঐতিহ্যের ভেজালে এতখানি বিকার লাভ করিয়াছেন যে, মানিক গাঙ্গুলী (১৪৭৬), ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১১), সহদেব চক্রবর্তী (১৭৪০) প্রভৃতির রচিত ধর্মমঙ্গলগুলিতে দেবলীলা বর্ণনার ভার বৌদ্ধত্বের নাভিশ্বাস ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙলার মুসলমান লেখকগণের লেখনীতে সৃষ্টিতত্ত্ব ক্রমে একটি সুপরিণত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথম যুগে শেখ ফয়জুল্লাহ্ সৃষ্টি-প্রকরণ লক্ষ্য করেন এভাবে–

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভূবন।
নানা রূপে কেলি করে না জাএ লক্ষণ ॥
তবে প্রণামিয়ে তান্ নিজ অবতার।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার ॥....
আকাশ পাতাল মধ্যে সৃজন করিয়া।
অদ্য আছেন্ত অনাদ্য আহুতিয়া ॥
সৃষ্টিকে স্থাপিয়া আদ্য অনাদ্যের বেশে।
যোগ পরিচয় হেতু এক স্থানে বৈসে ॥
আদ্য বলে, অনাদ্য তোমাকে বুঝাই।
উৎপত্তি প্রলয় সমর্পিলা সব আমি হইছি ভিন ॥
তোমার সমর্পিলা কার ঠাঁই ॥
তোমার আমার জান এক অংশে চিন ॥

–(গোরক্ষ বিজয়, সৃষ্টিপত্তন)

বৌদ্ধধর্মের পতনের পর বাঙ্গলা দেশে নাথমার্গের প্রার্দুভাব ঘটে। 'গোরক্ষ-বিজয় 'কাব্যে নাথগুরুদের মাহাত্ম্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব তাহাতে নাথ দর্শনের সৃষ্টি-ব্যাখ্যা স্থান পাওয়া অস্বাভাবিক নহে্। উপরোক্ত বর্ণনায় 'করতার'ও ' অবতার' যে যথাক্রমে 'আদ্য' ও 'অনাদ্য', তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক করে না। এই আদ্য-অনাদ্যের প্রসঙ্গে হায়াত মামুদ (১৬৮০–১৭৬৩) বলিয়াছেন–

www.pathagar.com

আমরা আহাদ কহি, হিন্দু কহে আদ্য।
আহম্মদ কহি মোরা, হিন্দু সে অনাদ্য ॥
—(হিতজ্ঞানবাণী)

আদ্য-অনাদ্যের কথা রামাঞি পন্ডিতের 'ধর্ম'পূজা-বিধানে'ও আছে—

আদ্যের পুষ্পগাছি নাঞি তান পাত।
আপনি নিরঞ্জন তাহে দিরা পদ্মহাত ॥
তবে ধর্ম কর্ম মর্তে হবেক প্রকাশ।
কহিল রামাঞি পন্ডিত অনাদ্যের দাস ॥

শুধু আদ্য-অনাদ্য নহে, শিব-দুর্গা রাম-রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতিও ধর্মপূজা বিধানে স্থান পাইয়াছেন। এ-সকল দেবদেবীর স্তুতি-লাঞ্ছিত গাথা-গান বাঙলার মুসলমানগণ বহু দিন শ্রবণ করিয়াছেন । সৈয়দ সুলতান (১৫৫০–১৬৪৮) সে ধারার মোড় পরিবর্তন করিয়া বাংলা কাব্যে পবিত্র ইসলামী আদর্শ প্রবর্তনের প্রয়াস পান। তিনি তাঁহার 'নবীবংশ' প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন—

কত দেশে কত ভাষে কোরানের কথা।
দ্বিন মহাম্মদী বুঝি দেয়ন্ত ব্যবস্থা ॥
কর্মদোষেব ঙ্গেতে বাঙ্গালী উৎপন্ন ॥
না বোঝা বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
আপন দ্বিনের বোল এক না বুঝিল;
পশুর চরিত্র হই' সে সব রহিল ॥
সদায় পড়য় রাম কৃষ্ণের যে কথা,
শুনিয়া আমার মনে লাগে অতি ব্যথা ॥
এত ভাবি' 'নবিবংশ' পাঁচালী রচিলুঁ;
বোঝে হেন মত করি' যা কিছু কহিলুঁ ॥
যে রূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন,
যেরূপে সৃজন জান সুরাসুরগণ,
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল,
যেরূপে যতেক পয়গাম্বর উপজিল,
বঙ্গেতে এ-সব কথা কেহ না জানিল।
'নবিবংশ' পাঁচালীতে সকলে শুনিল ॥
—(ওফাতে রসূল)

www.pathagar.com

আরবী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার মুসলমানগণ "সদা রাম ও কৃষ্ণের কথা পাঠ করে" দেখিয়া সৈয়দ সুলতান পাঁচালী ছন্দে তাঁহার বিরাট কাব্য 'নবী-বংশ' রচনা করেন। তিনি তাহাতে বলেন–

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
আদ্যে জে আছিল তাহা করিমু প্রচার ॥
যেরূপে আদম ছফি হৈল্য উৎপন।
কহিবাম সে-সব কিঞ্চৎ বিবরণ ॥
দ্বিতীএ প্রণাম করি'প্রভু নিরঞ্জন।
নূর-মহাম্মদের কহিমু বিবরণ ॥

তাঁহার "শব-ই-মি'রাজ" কাব্যে নূর নবীর বেহেশ্‌ত্‌ পরিভ্রমণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। মোস্তফা চরণে শরণ ভিন্ন যে পাতকারি তারণ নাই, এই প্রত্যয় তাঁহার মধ্যে দৃঢ়মূল–

রছুলের পদে কহে ছৈদ ছুলুতান।
তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন ॥
–(শবে মি'রাজ)

সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাবের পূর্বে 'রসূল-বিজয়' কাব্য সংরচন করেন জৈনুদ্দীন (১৪৭১) ও সাবিরিদ খান (১৫১৭) । তাঁদের ভণিতা–

কামেল-চরণ-রেনু শিরেত করিয়া।
হীন জৈনুদ্দীন কহে পাঞ্চালী রচিয়া।।
শ্রীযক্ত উছপ খান জ্ঞান গুণবন্ত।
রছুল-বিজয়-বাণী কৌতুকে শুনন্ত ॥
–(জৈনুদ্দীন, রসুল-বিজয়)

সাবিরিদ খানে কহে রছুল-বিজএ।
'শুনি' বুধ-কর্ণ পরি' সুধা বরিখএ ॥
–(সাবিরিদ খান, রসুল-বিজয়)

কিন্তু 'রসুল-বিজয়' কাব্য গুলিতে উদ্ভট কল্পনার খেলা সমধিক, –তাহাতে ঘটনার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক মর্যাদা প্রায়শঃ রক্ষিত হয় নাই।ফলে হজরত মোহম্মদের অসামান্য জীবনের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা পাঠকদের হয় না। পরবর্তীকালে শেখ চান্দ (১৬৬৬–১৭২৫) 'রসুল-বিজয়' নামে যে কাব্যখানি রচনা করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত ইতি-ভিত্তিক। তিনি ভণিতায় বলিয়াছেন–

www.pathagar.com

ফতে মোহম্মদ-সুত শেখ চান্দ নাম
গুরুর আজ্ঞায় পাঞ্চালি রচিল অনুপাম ॥
কাছাছোল-আম্বিয়া এক কিতাবেত শুনি'
পাঁচালীর বন্ধে রচে পুস্তকেতে পুনি ॥

'কাছাছোল- আম্বিয়া' অথবা 'খোলাসাতল্-আম্বিয়া' অবলম্বনে যাঁহারা বাঙালায় নবী-কাহিনী রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষার গঠন শিথিল ও কল্পনার ধারা গতানুগতিক। পক্ষান্তরে যাঁহারা ফারসী বা হিন্দী রোমান্টিক কবিদের নিকট পাঠ নিয়াছেন., তাঁহাদের নবীপ্রশস্তিতে শক্তি ও সৌন্দর্য অবাধ প্রকাশের অবকাশ পাইয়াছে।

'কাছাছোল- আম্বিয়া' শ্রেণীর সৃষ্টিপুরাণগুলিতে ইউসূফ জোলায়খার প্রেমোপাখ্যান আছে; সেই সুপ্রাচীন কাহিনীটির ফারাসীতে আবদুল কাসেম ফিরদৌসী (৯৩৬–১০২৬) 'আহসান-আল-কসস্' নামে মসনভী-আকারে এবং শেখ আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ আনসারী (১০০৬–১০৮৮) গদ্য-রীতিতে পরিবেশন করেন। কিন্তু মাওলানা নূরউদ্দিন আবদুর রহমান জামী(১৪১৪–১৪৯২) বিরচিত ফারসী মসনভীঃ 'ইউসুফ-জোলায়খা' সমধিক প্রচার লাভ করে। এ-বিষয়ে বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম শাহ্ মোহাম্মদ সগিরী 'ইছফ-জোলায়খা' নামে কাব্য প্রণয়ন করেন; তাহার প্রারম্ভে বিভুস্তুতির পরা নব-প্রশস্তি কীর্তি হইয়াছে এভাবে–

ঈশ্বর অগ্রত তাক ধরিল দর্পণ।
দৃষ্টিগত মথিয়া সৃজিলা ত্রিভূবন ॥
জীবাত্মায় পরমাত্ম মহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম ॥
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মহাম্মদ হস্তে কৈলা তা সব রতন ॥
নিরঞ্জন কারক প্রেমে সে মজিলা।
এহি লক্ষ্যে যত জীব সৃজন করিলা ।॥
পরম ঈশ্বর তানে বুলিলেক বন্ধু ।
সপ্ত স্বর্গ মুক্তি পাএ তান পদবিন্দু ॥
তান্ প্রেম-অনুভাবে সৃজিল জগৎ।
কহিতে পারিএ কত তাহান্ মহত্ত্ব ॥
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবিকুলে।
মহাম্মদ সকল প্রধান আদ্যমূলে ॥

www.pathagar.com

তান্ গুণ কীর্তি কত কহিমু বাখান।
বিস্তারিআ না লিখিুঁ অল্প সমাধান ॥
অনন্ত ছজিদা মোর সর্ব অঙ্গ ভরি।
অনেক প্রণাম তান পদ অনুসরি ॥
মহাম্মদ ছখিরি দাসক দাস তান্।
তাহা হন্তে বাড়া বাগ্য মোক নাহি আন ॥

মওলানা জামী ফারসীতে লায়লী-মজনুর প্রেম-কাহিনীও প্রণয়ন করেন। তাহার পূর্বে শেখ নিজামী গঞ্জভী (১১৪০-১২৩০) এই জনপ্রিয় আরব-উপাখ্যানটি লইয়া মসনভী লিখিয়াছিলেন। নিজামীর অনুসরণে দিল্লীর শাহী-দরবারের কবি হযরত আমীর খসরু (১২৫৪-১৩২৫) তাঁহার চতুর্থ রোমান্টিক মসনভী 'মজনুঁ-লায়লা' রচনা করেন। ইঁহাদের হইতে উপকরণ লইয়া দৌলত-উজীর বাহরাম খান বাংলা ছন্দোবন্ধে তাঁহার বিষাদান্ত কাব্য 'লায়লী-মজনুঁ' বিরচন করেন, (১৫৬০-১৫৭৫খৃঃ)। তাহাতে "প্রণামহুঁ আল্লা" নিবেদনের পর 'না'ত" অধ্যায় বলা হইয়াছে-

প্রণামহুঁ তান্ সখা মহাম্মদ নাম।
এ তিন ভূবনে নাহি যাহার উপম ॥
আদি অন্তে মহাম্মদ পুরুষ অতুল।
স্থল শূন্য না আছিল, আছিল রছুল ।॥
আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবণ।
যার প্রেম-রস হন্তে হইতেছে সৃজন ।॥
যার জ্যোতে দিবাকর কিরণ প্রকাশ।
যার জ্যোতে নিশাপতি তিমির বিনাশ ॥
মহাম্মদ দিনমণি মহিমা দিবস।
সহজে তাহান্ দ্বিন-কমল বিকাশ ॥
আর যত দ্বিন সব উজল না হয়।
শশী বিনে প্রদীপেত যেন ঘোরময় ॥
ত্রিভূবন নিস্তারিয়া নবী মহাম্মদ ।
যাহার কলেমা হস্তে তরিবা আপদ ॥
যার নাম শ্রবণে খণ্ড এ জন্মপাপ।
যার পদ দরশনে খণ্ডএ দুঃখ তাপ ॥
ধন্য ধন্য উম্মত যথেক সব তান।

www.pathagar.com

সাফল্য জনম জান আমরা সভান ॥
উম্মত-সহায় তুমি পরম সারথি।
পাপ তাপ আপদেত তুমি মাত্র গতি ॥
নূর নবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাত্র।
সাগর তরঙ্গ-ভয় নাহি ক তথাএ ॥
তুমি হেন নিধি যার সহায় সম্পদ।
তিল-অর্থ নাহি তার আপদ বিপদ ॥
অধম পাতকী মুঞি পতিত দুঃখিত।
অনাথ নির্ধনী মুঞি বিশেণ তাপিত ॥
অনাথের নাথ তুমি নির্ধনীর ধন।
দয়াশীল দীনবন্ধু পতিত-পাবন ॥
তুমি বিনে নাহি মোর পরম সহায়।
তুমি বিনে ত্রিভুবনে নাহি ক উপায় ॥
সর্বস্বে ভরসা মোর চরণে তোমার।
ইহলোকে পরলোকে তুমি মাত্র সার ॥

বাহরাম খানের দ্বিতীয় বিষাদান্ত কাব্য 'কারবালা'–কারবালার হৃদয় বিদারক কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত। কিন্তু বাঙলা ভাষায় মর্সিয়া-শ্রেণীর কাব্যগুলির মধ্যে নায়েব-উজির মোহাম্মদ খানের (১৫৮০–১৬৫০) 'মুক্তাল হোসেন' সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার। মোহম্মদ খানের প্রথম রচনাঃ সত্য-কলি-যুগ সংবাদ' (১৬৩৫) হিন্দুয়ানী-প্রভাবিত একটি প্রতীকী কাব্য; তাহাতে রসূল-প্রশস্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও আন্তরিকতাপূর্ণ–

নিরঞ্জন চিনিবারে নবী মাত্র লক্ষ্য।
নহে প্রভু চিনিবারে কার আছে সক্য ॥
দর্পণে দেখিএ যেন আপনা বদন।
নবীকে ভাবিলে প্রভু নিরঞ্জন ॥
দণ্ডবৎ হই পড়ি নবীর চরণ।
উদ্ধার করহ প্রভু পশিলুঁ শরণ ॥

হিন্দু-আখ্যায়িকা অবলম্বনে দৌলত কাজী (১৬০০–১৬৩৮) 'দশী ভাষে পাঞ্চালীর ছন্দে' তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী' প্রণয়ন করেন। কবি সাধন কর্তৃক 'ঠেঠ' -হিন্দী ভাষায় চৌপদী' দোহা ছন্দে' বিরচিত 'মৈনা সত' ছিল তাঁহার আদর্শ । 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রনীর ' প্রথম অধ্যায় 'বন্দনা' তাহার শেষ চারি ছত্র–

www.pathagar.com

মহম্মদ আল্লার রসূল সখাবর।
যাঁর নূরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর ॥
শ্যামতনু জ্যোতিময় সর্বাঙ্গ দাপণি।
নবুওত পৃষ্টে যেন জ্বলে দিনমণি ॥

অতঃপর দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দে দ্বাদশ শ্লোকে 'মহাম্মদের সিফত'। তাহার তিনটি শ্লোক–

আল্লার দোস্ত মহাম্মদ মানহ তাহান পদ
দরূদ সালাম বহুতর।
তাহান চরণ-ধূলি সর্বাঙ্গে চন্দন মলি'
জুড়াউক পরাণী কাতর।।
সাংসারিক দয়া ধর্ম সকলি নবীর কর্ম
নবী -সূত্র যা হস্তে সমাপ।
অঙ্গুলি-ইঙ্গিত-শরে শশী দুই খন্ডে করে
প্রলয় সমান তান দাপ।।
সেবহ রসূলে অতি বুররাক বাহন গতি
জিব্রাইল যাঁহার জোগান।
আল্লার হুজুরে হায় জুযায় দর্শন পায়
প্রেমভাবে সর্বাঙ্গে নয়না।।

এই বর্ণনায় হজরতের 'মোহরে-নবুওয়ত' চন্দ্র-বিদারণ '(শক্কুল-কমর) ও আত্মিক ভ্রমণ (মি'রায) সম্বন্ধে উল্লেখ আছে এবং তাঁহাকে ' খাতেমুন নবীঈন' বলা হইয়াছে।

আখেরী নবী হাশরে তাঁহার উম্মতের শাফায়াত্ করিবেন, এই তত্ত্বটি আলাওল (১৬০৭- ১৬৮০) তাঁহার সুবিখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্যে অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করিয়াছেন–

পুর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার;
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা;
সেই জ্যোতি-মূলে ত্রিভুবন নিরমিলা ॥
তাহান্ পিরীতে প্রভু সৃজিলা সংসার;
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার ॥
সেই দীপ-জ্যোতিএ উজ্জল ত্রিভূবন;

www.pathagar.com

হইল নির্মল জ্যোতি পাতক-নাশন ॥
ঘোরকার ছিল পন্থ নর পাপ লীন;
পূন্য প্রকাশের হেতু হৈল তাঁর দ্বীন ॥
জন্মিয়া যে জনে লইল তাঁর নাম;
তাহার হইব নরকের মাঝে ঠাম।
পাপ-পুণ্য যখন পুছিব করতার;
আগু হৈয়া করিবেক নারকী উদ্ধার ॥

আলাওলের প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী' তাহাতে যে বিভুস্তোত্র স্থান পাইয়াছে তাঁহার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে নাই। আলাওলের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ রচনাঃ 'সপ্তপয়কর' –শেখ নিজামী গঞ্জভীর 'হপ্ত পয়কর' (১১৯৮) অবলম্বনে বিরচিত । তাহাতে অন্তর্ভুক্ত রসুল–প্রশস্তি–

আদ্যেতে নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার।
চেতন স্বরূপ যদি হইল প্রচার,
অতি ঘোরতর তমঃ আকার-বর্জিত
মহা জ্যোতির হৈল ঈশ্বর-ইঙ্গিত ॥
জ্যোতির সমুদ্রে আদ্যে নূর -মোহাম্মদ
জগৎ- বিজয়ী হৈতে পাইল সম্পদ ॥
সপ্ত স্বর্গ উদ্যানের আদ্য নব ফুল;
বুদ্ধি-বাক্য শিরোমণি ভূবনে অতুল ॥
সেই পুষ্প হৈতে আদ্যে আদম উজ্জ্বল।
সকল কদর্য-পূর্ন, সেই সে নির্মল ॥
ভুবন বিখ্যাত নবীকুল-ছত্রপতি।
শরীয়ত জান তাঁর প্রভু -পাশে গতি ॥
বিনা পাঠে সর্ব শাস্ত্র হইয়া বিদিত।
আর্শের পরম কর্তা থাকে পৃথিবীত ॥
সূর্যজ্যোতি-সম ধবল অঙ্গছায়া।
সংসারে কে আছে আর ছায়াহীন কায়া ॥......
স্বর্গবাসী ফেরেস্তাতাহান্ আজ্ঞাপাল;
তাঁর স্তুতি করি' সরে গোঁয়ায়ন্ত কাল ॥
আনে কি কহিব? যাঁরে আপে করতার
কহিছেন্ত, তোমা লাগি'সৃজিনু সংসার ॥....

www.pathagar.com

অপার মহিমা তাঁর কহিবেক কনে?
যাঁর গুণ কোরানে কহিছে নিরঞ্জনে ॥

আলাওলের সর্বশেষ রচনা 'সিকান্দর-নামা',-তাহারও মূল নিজামীর ফারসী 'সিকান্দর-নামাহ্,-(১১৯১)। আলাওল তখন জরাতুর ; কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার ভাষা কিরূপ বলিষ্ঠ ছিল তাহা নিম্নের উদ্বৃতিটুকু হইতেই বুঝা যাইবে।

আপনার ঈশ্বরতা প্রচার লাগিয়া।
নিজ অংশে সুজে মিত্র পুণ্যরস দিয়া ॥
অলখা লখিতে নারে বিনে দিব্য আক্ষি।
তেকারণে মিত্র-মূর্তি নিজ-রূপ-সাক্ষি ॥
দরদ অনেক কহি যেন মুক্তাবৃষ্টি।
যাঁর ভাবে ঈশ্বরে সৃজিল সব সৃষ্টি ॥

শাহ্ মোহাম্মদ সগীর, দৌলত-উজির বাহরাম খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল প্রভৃতির রচিত এ সকল নবী -প্রশস্তিতেও ভাববস্তু অনন্য প্রকার ,- প্রামান্য সীরাত-গ্রন্থগুলিতে নবী চরিত্রের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক যে সকল লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী কীর্তিত হইয়াছে তাহাতেই ভর দিয়া উক্ত রোমান্টিক কবিগণের ভাব-কল্পনা পাখা মেলিয়াছে। পক্ষান্তরে সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও শেখ চান্দের 'শাহ দৌলা পীরের পুঁথি; প্রভৃতিতে যোগ শাস্ত্রের প্রভাব স্বাভাবতঃই কল্পনাকে জটিল তত্ত্বের গহনে নিমগ্ন করিয়াছে এবং এই গোত্রের লেখকেরই আধ্যাত্মিক ভাবের আমেজ দিয়া নবী প্রশস্তিতে কিছু বৈচিত্র্যবিধান করিয়াছেন।হাজী মোহাম্মেদের (১৫৫৫-১৬২০) 'নূর -জামাল' হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি-

জাত ছিফাত সেই নূর অনুপাম।
নূর মহাম্মদ তান্ রাখিলেক নাম॥
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা ।
সেই নূর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা ॥
এক হোন্তে হৈল দুই, দুই হোন্তে সকল।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল ॥
ফল বৃক্ষ এই তিন নাম হএ।
একে হএ তিন জান তিনে এক দুএ ॥
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহ ভিন্ন নএ।
তথাপি ফলের বৃক্ষ না যাত্র ॥
তুহ্মি আহ্মি নাম মাত্র, সকল সেই সে।
নানরূপ কেলি করে নানান যে বেশে ॥

www.pathagar.com

সাধক কবি সৈয়দ মর্তুজা (আনুমানিক ১৫৯০-১৬৬২) ;বহু মারফতী-পদে আপন মনের আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সহজিয়ার লীলাবাদ তাঁহার ভাবের বড় আশ্রয় হইলেও তিনি রসূল-চরণে সালাম নিবেদন করিয়াছেন চিরাচিরিত রীতিতেই-

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
তান্ পাছে প্রণামিএ রছুল আল্লার ॥
মুখ্য চারি ফিরেস্তারে করিএ প্রণাম।
সহস্র সহস্র তান পদেতে ছালাম।

-(যোগ কালন্দর)

বাঙলার মরমীয়া কবিদের মধ্যে আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর (১৬৯৫-১৭৮০) এক বিশিষ্ট আসনের দাবিদার। তাঁহার তত্ত্ব দর্শনের অতলে সংগুপ্ত এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ। আল্লাহ-রসূল সম্বন্ধে তাঁহার গুহ্য ব্যাখ্যা-

এক প্রভু নিরঞ্জন এক ডিম্ব ত্রিভূবন
এক তনু সকল জগৎ।
এক মোহম্মদ মুখ্য ত্রিভূবনে এক বৃক্ষ
ডাল ফল হয় নানা মত।।
সর্ব জগ এক সিন্ধু নানা রূপ জলবিন্দু
সর্বস্থানে আছে ব্যক্তময়।
যথা তথা রহে বারি চলে সর্ব স্থানে ছাড়ি'
সর্বগিয়া সাগরে মজ্জায়।।

-(জ্ঞানসাগর)

আলী রাজার পূর্বসূরী হায়াত মামুদ (১৬৮০-১৭৬০) অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর ভাষায় মারফতী প্রতীকের ছক ফাঁদিয়া আল্লাহ্- রসূলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। তিনি কল্পনা করেন যে ,"পরম সাঁই এক নূর দুই ঠাঁই " করিলেন, এবং "নবী মহাম্মদ আহম্মদ " হইলেন "আহাদ হইতে উপাদান লইয়া"-

আহাদ এক বিনে আল্লা নাহিক দোসর।
সৃজন পালন হেতু সেই সর্বেশ্বর ॥
আহাদ হইতে আল্লা কৈল আহম্মদ।
মীমাধিকে পূর্ণ সেই কৈল মহাম্মদ ॥
আহাদ আহম্মদ দুই এক করি জান।
মীমে মহাম্মদ শেষে কৈল উপাদান ॥
স্বর্গেতে সকলে জপে নাম আহম্মদ।

www.pathagar.com

মর্তপুরে জপে লোক নাম মহাম্মদ ॥
পাতালে মামুদ নাম জপে নাগগণে।
এক মীমে তিন নাম হৈল ত্রিভুবনে ॥
–(হিতজ্ঞানবাণী)

'আহাদ ' ও 'আহমদ' এর মাঝে আছে শুধু মীমের পর্দা, এরূপ তত্ত্বকথা বাঙলার বাউল কবিদের মুখে হইয়াছে এক ধরতাই বুলি। লালন শাহ্ বলেন–

সাকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা
আহাদের আহমদের বিচার হৈলে যায় জানা।।
আহমদ নামেতে দেখি
মীম হরফ লেখে নবী,
মীম গেলে আহাদ বাকী
আহমদ নাম থাকে না ॥
খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে রয় লুকাইয়ে।
আহাদে মীম বসাইয়ে
আহম্মদ নাম হলো সে না।
আহাদের তত্ত্ব ঢুঁড়ে
কারো জ্ঞান বসবে ধড়ে;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ের
ফাত্রামি সাঁই গেল না।

প্রেমতত্ত্বের বেসাতি বাউলদের বড় সাধনা। সৃষ্টির মায়া ও স্রষ্টার লীলা ব্যাখ্যাচ্ছলে তাঁহারা আত্মতত্ত্বে দেহতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। দেহ-তত্ত্ব-বিষয়ক গানে পাগলা কানাই (১৮২৪–১৮৮৯) অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পালা গানের বয়াতি এবং জারি-গানের গাঞন হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। তিনি বলিয়াছেন–

পিরীতের আলোকে রসূলুল্লাহ্ কর্যা গেছে জগৎ উজালা
সে পিরীত জানেন সেই বারিক আল্লা ।
তাই এ ভবে এসে তাঁর চরণ কর্যাছি সার–
ভব-দরিয়ায় রসূল হইবে কাণ্ডার ॥

এই বাউল বয়াতিদের যুগেই বাঙলার পল্লীতে আরবী-ফারসী-উর্দু-মিশেল বাঙলা জবানে রচিত মুসলমানী পুঁথির প্রচলন হইয়াছিল সর্বাধিক। এই মিশ্র ভাষায় আদি-

www.pathagar.com

করি শাহ্ গরীবুল্লাহ আনুমানিক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ছহিবড় আমীর হামজা' প্রথম পর্ব রচনা করেন; তাঁহার প্রারম্ভে -ভাগে আছে–

একা সেই করতার কেহ নাহি ছিল আর
নূরে নবী কৈল পয়গাম্বর।
আপনার নূর দিয়া পহেলায় পযদা কিয়া
মেহের বড় হৈল তার পর।।
এলাহি বুঝিয়া কাম রাখিলা তাঁহার নাম।
নূরনবী নূর মহাম্মদ ।
সেই ত নবীর নূর পয়দা কৈল সবাকারে
চৌদা ভুবন হদাহদ।।
সেই দোস্ত বড় তাঁর, এয়ছা কেহ নাহি আর;
জেবা কেহ আছে তাঁর দ্বীনে,
তাহাকে করার এই বেহেস্তখানা পায় সেই
ফকির গরীব শাহা ভণে॥

হায়াত মামুদের উত্তরসূরী শাহ গরীবুল্লাহ্‌র এই মিশ্র ভাষায় হইয়াছিল পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)। পরবর্তী কালের বাঙলা কাব্যের সাধারণ ভাষা। এই ভাষাতে সৈয়দ হামজা (১৭৫৫–১৮১৫) তাঁহার অসম্পূর্ণ কাব্য ' আমীর হামজা' ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। সৈয়দ হামজার চতুর্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাঃ 'হাতেম তাই'। তাহার সূচনায় রসুল প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে–

একেলা আছিল যবে সেই নিরঞ্জন
আপনার নূরে নবী করিল সৃজন ॥
মহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া
আপনার নূর তারে রাখে ছাপাইয়া ॥
দুনিয়া করিয়া পয়দা তাহার কারণ
আসমান জমিন আদি চৌদ্দ ভুবন ॥
সেই যে নবীর নূর তামাম আলম
বেহেস্‌ত্ দোজখ আর লওহ্-কলম ॥
পয়গাম্বর এক লাখ চব্বিশ হাজার
তার বিচে মহাম্মদ সবের সরদার ॥

যে বাক্‌সৌকর্যে এই প্রশস্তি বিমন্ডিত, তাহা পাঠক-চিত্তকে বিশেণ উদ্দীপিত করে না। প্রকৃত কথা এই যে, পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাঙ্গালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

জবিনেও ঘটিয়াছে ঘোর অধোগতি। ফলে প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত মুসলিম বাঙলা সাহিত্যে কোনো গগনস্পর্শী প্রতিভার আবির্ভাব দেখা যায় না।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়; এই কলেজের পন্ডিতদের তৎপরতায় বাঙলা ভাষা সংস্কৃত শব্দ-ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবরূপ ধারণ করে। সে-বছরই মে মাসে সিপাহী-বিপ্লব আরম্ভ হয়। পূর্ব হইতেই সেজন্য প্রস্তুতি চলিয়াছিল। সমাজের শিক্ষিত ও শোষিত স্তরে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল । এই জাগরণের মুখে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী তাঁহার 'ভাব-লাভ' গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার শুরুতে মর্ত্যভূমিতে বন্দনা করা হইয়াছে–

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রসূল -চরণ ॥
তৃতীয় প্রণাম করি পিরিস্তারগণ।
চতুর্থে প্রণাম করি এ তিন ভূবন ॥

বাঙ্গালী মুসলমানকে ইসলামের সঞ্জীবনী-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মুন্সী মালে মোহাম্মদ রচনা করেন 'আহকামোল জোমা' (জুমা'র নামাজ সংক্রান্ত পুঁথি), তাজদ্দিন মহাম্মদ ও খাতের মহাম্মদ ফারসী হইতে অনুবাদ করেন ষোল খন্ড 'খোরাসাত-আম্বিয়া' । প্রথম খণ্ডে গোড়ার দিকে তাজদ্দিনের রচিত রসূল-প্রশস্তি–

মহাম্মদ মোস্তফা নবী আখেরী দেওয়ান।
যাঁহার কারণে হৈল লওহলা মাকান ॥
যাঁহার কারণে হৈল জমনি আসমান।
যাঁহার কারণে হৈল এ দোন জাহান ॥
যাঁহার নুরেতে পয়দা চৌদ্দ ভুবন।
যাঁহার নুরেতে হৈল দুনিয়া রৌশন ॥
দরূদ ছালাম যে এমন নবী ' পরে ।
যাঁহার নুরের গুণে তরিব হাশরে ॥
তাঁহার আওলাদ আর আছহাব যতেক,
সবার জনাবে মোর ছালাম-আলেক ॥

সিপাহী বিপ্লবের বছর (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) মুনশী জান মোহাম্মদের 'হাজার মসলা' গরীবুল্লাহর 'ইবলিশ নামা' জয়নুল আবেদীনের 'ছহি আবু শাহামা' ফকির

www.pathagar.com

মোহাম্মদের 'ইমাম চুরি', মোহাম্মদ দানেশের 'গুল ও ছানোয়ার' মোহম্মদ এবাদ খাঁর 'সূর্জ-উজাল বিবির কেচ্ছা', এবাদতউল্লার 'কুরঙ্গ ভানু' প্রভৃতি বহু পুঁথি প্রকাশিত হয়। সে বছর প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রবোধ-প্রভাকর' কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক কালিদাসের নাটকের অনুবাদ 'বিক্রমোর্বশী,' যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা-চিত্তচাপল্য', কৃষ্ণ-কমল ভট্টাচার্যের 'দূরকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ' প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে বাঙ্গালী মুসলমানের এই আবেদন সামান্য মনে হইবে না। কিন্তু অতঃপর যেখানে ১৮৫৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' টেকচাঁদ ঠাকুরের ' আলালের ঘরের দুলাল, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক ও মহাভারত' 'প্রথম খণ্ড , ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ও কালীপ্রসন্ন সিংহের'মালতী-মাধব' নাটক, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'ও মহাভারতের উপক্রমণিকা পর্ব, টেকচাঁদ ঠাকুরের 'রামরঞ্জিকা' দীন বন্ধু মিত্রের' নীলদর্পণ' নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ও একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন. 'পদ্মাবতী নাটক ও 'তিলোত্তমা-সম্ভব ' কাব্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানে তুলনায় মুসলমানদের রচনা তুচ্ছ মনে হইবে বৈকি। শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রেই নয় সিপাহী বিপ্লবের বিপর্যয়ের দরুন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের ঘটিয়াছে এমন পশ্চাদপদতা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ' সদ্ভাবশতক', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়োর প্রথম কাব্য 'চিন্ত-তরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, সে-বছর মোহম্মদ সাঈদের উর্দু গ্রন্থের অনুসরণে রেজাউল্লাহ আমিরুদ্দীন ও আশরাফ আলী ৫৬৮ পৃষ্ঠার বিরাট 'কাছাছোল-আম্বিয়া ' প্রণয়ন করেন। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি খাতের মোহম্মদ (১৮৩৯-১৮৯১)। তিনি ফিরদৌসীর 'শাহ্নামা' অনুসরণে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'ছহিবড় শাহ্নামা' রচনা করেন, তাহাতে খোদা তায়ালার গুণানুবাদের পর বলা হইয়াছে-

ফের আমা সবাকারেরাহা বাতাবার তরে
মেহের করিয়া নিজ গুণে।
আপনার নূর দিয়া নূর-নবী পয়দা কিয়া
ভেজিলেন দুনিয়া জাহানে।।
যাঁর শানে কৈলা সবি, কি কব তাঁহার খুবি,
দরূদ ছালাম তাঁর পরে।
তাঁহার আওলাদ আর যে কেহ ছাহাবা তাঁর ছালাম
ছালাম তছলিম সবাকারে।।

www.pathagar.com

ইহা 'মুসলমানী বাঙ্গালায় ' রচিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নবাব ফয়জন্নেছা চৌধুরানী তাঁহার অপূর্ব আখ্যান-কাব্য 'রূপ-জালাল' প্রকাশ করেন, তাহাতে বন্দনা-অংশ এরূপ–

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যাঁহার সৃজন হয় এ তিন ভূবন ॥
তৎপরে বন্দনা করি নবীর চরণ।
যাঁহার প্রভাবে হবে অন্তিমে তরণ ॥
রছুল বিহনে গতি নাহি মুক্ত হতে।
সে পদ ভাবহ সবে কায়মনোচিতে।
নিজ নূরে নিরঞ্জন নবীকে সৃজিয়ে ।
ত্রিজগৎ নির্ম্মিলেন তাঁর নূর দিয়ে ॥
কৃপা ক'রে গুপ্তভাবে রাখি মুক্তাবনে।
সব নবী' পরে রাষ্ট্র করে এ কারণে ॥
মহাম্মদ্দিন পরে প্রকাশ সবার ।
হাশর যাবৎ ইচ্ছা স্থিতি রাখিবার ॥

মুনশী মালে মোহম্মদ প্রমুখ পুঁথিকারগণ যে চলিত বাঙ্গালা জবান ব্যবহার করেন, তাহাতে তখন অসংখ্য মর্সিয়া কাব্য রচিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জনাব আলী ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে 'শহীদে কারাবালা'সংরচন করেন; তাহাতে রসুল-প্রশস্তি–

নুর নবী পাক মহাম্মদ।
যতা আর নবী হৈল এয়ছা দরজা না পাইল,
তেনা হৈতে পয়গাম্বরী হদ।।
সে নবীর নূর খোদা সকলি করিল পয়দা
যত দেখ জমিন আসমানে।
সে সব বয়ান ভারি কোরানেতে আছে জারি
ফরমিয়াছে পাক ছোবহানে।।

পরের বছর আজিমদ্দীন আহমদ, জনাব আলী ও মহাম্মদ মুসা এজমালীতে প্রণয়ন করেন 'মজমুয়ে ফতুহ-শ্বাম'। বিশ্ববিশ্রুত আরব ঐতিহাসিক আবু আবদুল্লাহ বিন ওমর আলওয়াকিদি (১৩০ হিঃ মোতাবেক ৭৪৭ খৃ -২০৭ হিঃ মোতাবেক ৮২৩খৃঃ) প্রণীত 'ফতুহ্ -আল শাম-ওয়াল-ইরাক (সিরিয়া ও ইরাক বিজয়) এবং 'ফতুহ আল-বুলদান- ওয়াল মিসর' (নগর পুঞ্জ ও মিসর বিজয়) গ্রন্থদ্বয়ের উর্দু

www.pathagar.com

ভাবানুবাদ অবলম্বনে ৬৫৪ পৃষ্ঠায় বিরাটকায় 'মজুমুয়ে ফতুহশ্বাম ও ফতুহর মেছের' পদ্যরীতিতে বিরচিত হইয়াছে । আজিমদ্দীন আহমদ কর্তক রচিত তাহার নবী প্রশস্তিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল–

এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর।
মহাম্মদ মোস্তফা নবী সবার সরদার ॥
মে'রাজ নছিব নাহি হইল কাহার ।
কেবল নছিব হৈল নবী মোস্তফার ॥
খোদার পেয়ারা নবী দ্বীনের লাগিয়া।
কত কষ্ট উঠাইল হায়াতে থাকিয়া ॥
অবোধ উম্মত তাঁহার কিসে জ্ঞান পায়।
সততা ছিলেন তিনি এই ত চিন্তায় ॥
অবোধ উম্মত কিসে আসে সুরাহায়।
ছিলেন সদাই তিনি এই ত চেষ্টায় ॥
অবোধ উম্মত তাঁর কিসে আপন খোদায়।
জানে আর চিনে তারা হেদায়েত পায় ॥
অবোধ উম্মত কিসে দোজখ হইতে।
নাজাত পাইবে, কিসে থাকে ধেয়ানেতে ॥
অবোধ উম্মত কিসে কোফরী ছাড়িয়া।
এসলামে দাখিল হয় খোদারে চিনিয়া ॥
শেরেক বেদাত আদি বড় বড় গোনা।
কেমনে দুনিয়া হতে হয়ে যায় পানা ॥
কেমনে খোদার খাছ বান্দা তা'র হয়।
তারিকে কুফরী টুটে শেরেকী বিলয়।
উম্মতের ভেলা তিনি উম্মত কারণ।
উম্মতি উম্মতি ব'লে করিবে রোদন ॥
সে নবীর পরে ভেজি হাজার ছালাম।
আর তাঁর আল আর আছহাবে তামাম ॥

এরূপ মিশ্রভাষাতেই জনাব আলী রচনা করেন। তাঁহার 'তাজকিরাতুল-আউলিয়া,' সৈয়দ নাসের আলী, হাবিবুল হোসেন ও আয়াজউদ্দিন আহম্মদ রচনা করেন 'আলেফ-লায়লা' (১৮৯৭)। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পদপাত হইতেই কাব্যের ভাষাভঙ্গীতে পরিবর্তন সূচিত হয়। নবাব ফয়জন্নেছা চৌধুরানী যে ভাষায় তাঁহার

www.pathagar.com

'রূপ-জালাল ' প্রণয়ন করেন, সেই সুমার্জিত ও সাবলীল ভাষার দিকে প্রত্যাবর্তনই কবি-লেখকগণ অধিকতর কাম্য মনে করেন। হজরতের পূণ্যজীবন অবলম্বনে শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২ -১৯৩৬) অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'পরিত্রাণ ' কাব্য প্রণয়ন করেন; ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথামংশ মাসিক 'প্রচারক' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। কুরাইশগণের উদ্দেশ্যে এক স্থানে বলা হইয়াছে-

জলিবে না হৃদে
ইসলামের তেজোময় একত্ব অনল?
উঠিল না এক তানে কোটি কণ্ঠ হতে
'আল্লাহ আকবর'? যেই বজ্রধ্বনি
পবিত্র করিবে এই আকাশ অবনী।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ' পরিত্রাণ' কাব্য মুনশী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহর আনুকূল্যে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। তাহার আগের বছর (১৯০২ খৃষ্টাব্দে) মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) গদ্যে-পদ্যে তাঁহার 'বাঙ্গালা মেলুদ শরিফ' প্রকাশ করেন; তাহাতে ৩২টি শ্লোকে একটি দরূদ আছে। শেষ দুইটি শ্লোক-

গাইব তোমার গান
হৃদ বল করো দান
দাও পদে বিন্দু স্থান -
মোহাম্মদ এয়া রসূলুল্লাহ ।
দাও অন্তে পদাশ্রয়
ওহে নবী দয়াময়;
করজোড়ে কবি কয়-
মোহাম্মদ এয়া রসূলুল্লাহ।।

হজরত মোহাম্মদের পবিত্র জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া মীর মশাররফ হোসেন পদ্য রীতিতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিবি খোদেজার বিবাহ . 'হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ,' ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'মদিনার গৌরব' ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'মোসলেম বীরত্ব' এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গদ্যে-পদ্যে 'এসলামের জয়' রচনা করেন। 'মদিনায় গৌরব' কাব্যে মোট ১৪ টি সর্গ; তৃতীয় সর্গে আকাবা-গিরিগুহায় সমবেত মদিনাবাসীদের উদ্দেশ্য হজরত আব্বাস বলিতেছেন-

অবিদিত নহে কথা সর্বত্র প্রচার,
হাশেম বংশের মান জগতে অপার।
সেই বংশে মহাম্মদ জনম লইয়া,

www.pathagar.com

উজ্জ্বল করছে বংশ ধর্ম প্রকাশিয়া।
নিশ্চয় ইসলাম জগতে ছাইবে,
পৃথিবীর কোন অংশ বাকী না রহিবে ॥

মীর মশারফ হোসেনের কাব্যভাষায় মুসলসমানী পুঁথির প্রভাব কিছু আছে। কিন্তু হেম-নবীনের প্রাঞ্জল সাধু ভাষায় মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩) তাঁহার 'হজরত মহাম্মদ ' কাব্য প্রথম খন্ড ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তাহাতে 'হজরতের মার্তৃগর্ভে অবস্থান ' হইতে হজরত আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ' পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। 'হজরতের জন্মগ্রহণ' অধ্যায়ের পর 'সালাম' তাহাতে ২৫টি স্তবক। পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে ইহা একটি 'উর্দু সালামের বঙ্গানুবাদ ।' নিম্নে ২২ নং স্তবক ও শেষ স্তবকের দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইল–

সংকীর্ণ কবর মাঝে ভয়াবহ স্থানে
যেবে দেবদূতদ্বয় আসি' লবে পরিচয়
বাঁচাইও তথা প্রভু সাহায্য প্রদান।
এই ক'রে আর, যেন না ডরি তথায়;
হেরে তব সৌম্য মূর্তি চিনি গো তোমায় ॥
শেষ, শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর তুমি বিধাতার,
সালাম তোমারে করি সালাম হাজার ॥

এ সময়ে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১–১৯০৭) তাঁহার মেহেরুল-ইসলাম' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার প্রারম্ভে রসূলের গৌরব কীর্তন করিয়া যে নাত আছে, তাহা তৎকালে ধর্ম সভা গুলিতে গজলের সুরে গীত হইত। তাহার 'ধুয়া' ও প্রথম স্তবক--

গাও রে মোসলেমগণ নবীগুণ গাও রে!
পরাণ ভরিয়ে সবে ছাল্লে আলা গাও রে!
আপনা কালামে নবীর সালামে তাগিদ করেন বারী;
কালবেতে জান, কহিতে জবান, যে তক্ থাকে গো জারি ॥
যে বেশে যে ভাবে যে দেশেতে যাও রে
গাও গাও গাও সবে ছাল্লে আলা গাও রে ॥

ইসলাম ধর্ম প্রচারে মুনশী মেহেরুল্লাহর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ। তিনি তাঁহার 'আসল বাঙ্গালা গজল' (১৯০৮) নামক গীতি সংগ্রহের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, মীর মোশাররফ হোসেনের 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ'

www.pathagar.com

পাঠেই মুনশী মেহেরুল্লাহ্ ও তিনি গজল রচনার প্রেরণা লাভ করেন। জমিরুদ্দিনের একটি গজলের দুইটি শ্লোক–

তিনি সত্য আদি নূরী
উজলিছে স্বর্গ পুরী,
বাজাও আনন্দ-তরী.
মোহাম্মদ ইয়া রছুলোল্লাহ।
সত্য ধরমের' পরে
রাখিতে তাবৎ নরে
আসিলেন ভব' পরে
মোহম্মদ ইয়া রছুলোল্লাহ্ ॥

তাহার আগের বছর (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) মোহম্মদ দাদ আলীর (১৮৫২–১৯৩৬) 'আশেকে রসুল' প্রকাশিত হয়। তাহাতে 'মোহাম্মদর রাসূলোল্লা' শীর্ষক নাতিয়ায় বলা হইয়াছে–

যদি জুড়াইতে চাহ মর্ম্মজ্বালা,
ভব-বারিধি তরিতে চাহ ভেলা'
মন-সাধ মিটাইয়া গাহ এই বেলা–
গাও গাও মোহাম্মদ সাল্লে আলা।
পড় দরূদ সর্বদা নবীর পরে।
করো সালাম ও চারি সাহাবারে,
নবীবর- আদেশ ধরো হে শিরে ;
গাও গাও মোহাম্মদ সাল্লে আলা ॥

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে খান বাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২ –১৯২৭) প্রণীত 'জন্মোৎসব বা মৌলুদ নফীসা' প্রকাশিত হয়। তাহাতে হজরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)র গৌরব-গাথা সংক্ষেপে বর্ণনার পর " মহা-পয়গম্বরের আবির্ভাব-জন্য সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য " ঘোষণা করিয়া বলা হয়, তওরাত ইঞ্জিল ও ইব্রাহীমের–

ভবিষ্যৎ বাণী
সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য তাহা জানি।
সেকালের ঋষিগণ গাইতে লাগিল,
অর্থর্ব্বন বেদধ্বনি স্বরগে উঠিল।.....
হও হে উদয় তুমি শেষ অবতার,
সত্যযুগ আবিভূর্ত হউক আবার।......

www.pathagar.com

সত্য হোক, সত্য হোক , অর্থব্ব বাণী,
সত্য হোক অল্প সূক্ত সত্য তাহা জানি ।....
হও প্রকাশিত ওহে প্রথম চেতনা,
আদি বুদ্ধি পূর্ণ হোক সবার কামনা ।
হও প্রকাশিত ওহে তুমি আদি জ্যোতি,
ধন্য হোক ধন্য হোক আদম-সন্ততি ।
সভকতি সহ প্রেম; তোমায় সালাম,
স্বরগে মরতে হোক অহর্য্যাম ।

আঁ-হজরতকে 'পুরাণে বর্ণিত কল্কি' ও 'বিষ্ণুদ্রোহিগণে'র 'বিনাশী ' রূপে কল্পনা করা কুরআন মজীদের অনুবাদক তসলিমুদ্দীন আহমদের চিন্তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বটে ।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'তারেকোচ্ছালাত' প্রণেতা আবুল খয়ের ছয়েফউদ্দিন আহমদ 'ইসলামী কবিতা মালা' নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা -সংকলন বাহির করেন, তাহাতে কায়কোবাদ (১৮৬৩–১৯৫১), মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ শেখ জমিরুদ্দীন , মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩), সালিমউদ্দিন আহমদ ('সুপথ-সোপান' প্রণেতা), আফতাবউদ্দিন আহম্মদ (সদ্ভাব সরোজ' প্রণেতা) প্রভৃতির কয়েকটি ভক্তিমূলক কবিতাও অন্তর্ভূক্ত হয় । মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের একটি কবিতায় বলা হয়–

নাহি ক বিদ্যার বাতি,
নাহি ক জ্ঞানের বাতি,
ঘোর অন্ধকার
দিশাহারা সবে, হায়!
ছিল যারা অগ্রগামী
এর তারা নীচে নামি,
দুঃখ কারে কব আমি
হেরে বুক ফেটে যায় ।
নাই একতার বল,
শৌর্য বীর্য রসাতল
সর্ব কাজে হতবল
কে রে আমাদের ন্যায়?
হে দয়াল নূর নবী
স্বর্গের পবিত্র ছবি,

www.pathagar.com

কাতরে নিবেদে কবি
রক্ষ আমা সবাকায় ॥

বাঙালী মুসলমানের তৎকালীন সাংস্কৃতিক ও সাংসারিক অধোগতির প্রতি এই বেদনাময় দৃষ্টিপাত বাস্তবমুখিতার পরিচায়ক।

ইতিমধ্যে বাংলা গদ্যরীতিতে মুসলমান লেখকদের রচিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তম্মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) প্রণীত 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি'। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সুফী মধু মিঞার 'শান্তিকর্তা বা হজরত মোহম্মদ (দঃ) প্রথম খন্ড ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খন্ড ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, ও তৃতীয় খণ্ড ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে, শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোকাভঞ্জন' ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে , খান বাহাদুর আহ্‌সানউল্লাহর ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, খান বাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদের 'সম্রাট পয়গাম্বর ' ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে; মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) এর জীবন-চরিত ' ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) প্রণীত 'মরু-ভাস্কর' ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এবং কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুফিমধু মিয়ার মিঞার শান্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের স্থানে 'হামদ' ও 'নাত' ধরনের খন্ড কবিতা আছে; দ্বিতীয় খন্ডের শেষে একটি 'আহ্বান-সঙ্গীত' আরম্ভ হইয়াছে এভাবে-

দীনবন্ধু সত্যসিন্ধু, হৃদয়-মাঝারে এস হে।
খোদাতায়ালার প্রেরিত -পুরুষ হৃদি-সিংহাসনে বস হে।।
অজ্ঞান তিমির করিয়া বিনাশ
সত্য -আলোক করিলে প্রকাশ,
তৃষিত জনের মিটাও পিয়াস,
সকল সন্দেহ নাশ হে ॥

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯২৯) 'বাঙ্গালা মউলুদ শরিফ' প্রকাশ করেন। ৫২ পৃষ্ঠায় এই কাব্যখানিতে অমিল -মুক্তক অক্ষর বৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ সব ক্ষেত্রে অসার্থক হয় নাই। একটু নজির-

জনম ফুরায়ে গেল;
শুকাইল সুবাসিত যৌবন কুসুম।
কোন দিন শাখা হতে পড়িবে ঝরিয়া,
ফুরাবে ভবের লীলা।

www.pathagar.com

কিন্তু কবে এবাদত করিলে খোদার,
রসূলের নাম আর লইলে বা কবে?

১৯২০ খৃষ্টাব্দে, ১৩২৭ শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে' কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়াপারের তরণী' প্রকাশিত হয়। সেই সুবিখ্যাত কবিতাটির ভাব-সম্প্রসারন করিয়া,, সেই চতুর্মাত্রাপর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই, সে-বছরের চৈত্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' গোলাম মোস্তফা লেখেন 'হজরত মোহাম্মদ (দঃ)'। মানব-কল্যাণ ও সমাজ-সাম্য তাহার বড় লক্ষ্য; কিন্তু তাঁহার এই ভাবনার অন্তরালে প্রবাহিত ভক্তির ফল্গুধারা। তিনি হায়দরাবাদের নিজাম নবাব মীর ওসমান আলী খান ফতে-জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক হজরতের জন্মোপলক্ষ্যে লিখিত একটি ফার্সী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এভাবে–

ব্যাথার যখন তুই দাওয়া আর তুই তবির,
আমার হিয়ায় আসছ না কেন, এ্যয় হবিব?
দেখ্‌নু হাজার সিজদা চেয়ে সুখ আমার–
তোমার দ্বারে ঠুকলে মাথা একটি বার।
দেখাও যদি বন্ধু তোমার ও-মুখখান
মরার সময় হেসেই এ জান্ করব দান।
পথ-না চলা পথিক আমি নিঃসহায়,
হা-হুতাশের কারণ আমার এই ত, হায়!
করবে শাফা 'ওসমানে' রোজ-হাশর মাঝ–
খোদার এটা খুবই নেহাৎ যোগ্য কাজ ॥

আলোক-পিয়াসী ভক্ত চিত্তের কামনা ফুটিয়াছে তাঁহার 'মরু-দুলাল' কবিতাটিতে–

আমার হৃদয় আজি আঁধারে কাঁদে
বাঁধা আমি মোহ-জালে-মায়ার ফাঁদে;
আমার আকাশে এস হে প্রিয় আমার!
খুলে দাও জিঞ্জির- মনের দুয়ার।....
আজিকার এই দিনে ভেঙে দাও ভুল,
আমারে মুরিদ করো, হে প্রিয় রসুল!

নজরুলের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহমঃ আবির্ভাব' ১৩২৭-অগ্রহায়ণের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়; পরের বছর রবিউল-আউয়াল মাসে ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'মোসলেম ভারতে' তাঁহার 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহমঃ তিরোভাব' আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

তাহার এ সকল কবিতা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও আঙ্গিকের গুণে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের উচ্চ-পর্যায়ের হইয়াছে। তাঁহার রচিত গজল নাতিয়ায় হজরতের মহিমা-কীর্তন এমন মোহনীয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহার ফলে সঙ্গীতের প্রতি বাঙলার মুসলমান সংরক্ষণশীল সমাজের বিরূপতা বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক নাতিয়ায় বর্তমান জীবনের ম্লানিমা ও গ্লানি হইতে উত্থানের আকাঙক্ষা লক্ষণীয়। হজরতের বিরাট জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উদার মানবিকতার ক্ষেত্রে তিনি কামনা করিয়াছেন বিশ্ব-মুসলিমের জাগরণ, দুনিয়ায় আবার মুসলমানের 'সোলতানাত্' –জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ।

নজরুলের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সকল দেশের সর্ব কালের সকল জাতির জন্য আল্লাহ্র রহমত-স্বরূপ প্রেরিত হন। তাঁহার অসামান্য জীবন-সাধনায় ও অমৃতমুখী শিক্ষায় রহিয়াছে মানুষের সকল ঐহিক ও পারত্রিক সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান। তাঁহার পরম-প্রোজ্জ্বল জীবনাদর্শ, চরিত্র-মাধুর্য ও কর্ম-মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া ইরানের অমর কবি শেখ সাদী (১১৮৪–১২৯১) উচ্চারণ করিয়াছিলেন এই অপূর্ব-সুন্দর প্রশস্তি–

বালাগাল উলা বেকামালিহি
কাশাফুদ্ দুজা বেজামালিহি
হাসুনাৎ জামীউ খেসালিহি
সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি।
তাঁর গুণাবলী চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে
তাঁর সৌন্দর্যে সব অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে,
তাঁর সমস্ত আচরণ সর্বাঙ্গ সুন্দর;
তাঁর ও তাঁর আউলাদের প্রতি পাঠ করো দরূদ ॥

ইহারই ভাবানুসরণে নজরুল রচনা করেন নিম্নোদ্ধৃত গজল-নাতিয়া–

কুল্ মখলুক গাহে হজরত
বালাগাল উলা বেকামিলিহি।
আঁধার ধরায় এলে আফতাব
কাশাফাদুজ্জা বেজামালিহি।।
রৌশনীতে আজো ধরা মশ্গুল,
তাই তো ওফাতে করি না কবুল,
হাস্নাতে আজো উজালা জাহান
সাল্লু আলায়হে ওয়া আলিহি ॥

www.pathagar.com

নাস্তিরে করি নিতি নাজেহাল–
জাগে তৌহিদ দ্বীন-ই-কামাল,
খুশ্‌বুতে খুশী দুনিয়া বেহেশ্‌ত্‌–
সাল্লু আলায়হে ওয়া আলিহি ॥

হজরত মোহাম্মদের সমগ্র জীবন কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি মহানবীর আবির্ভাব হইতে কা'বার পূনঃনির্মাণ পর্যন্ত ঘটনাবলী তিনটি সর্গে রচনা করেন। দুঃখের বিষয় যে, এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না হইতেই তিনি মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার অসমাপ্ত রচনাটি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'মরুভাস্কর' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁর 'শাক্‌কুস-সাদর' (হৃদয়-উম্মোচন) অধ্যায়টি পাঠেও বুঝা যায় যে, অতি-প্রকৃত শক্তিতে নজরুলের প্রত্যয় সুগভীর। মুসলমানী পুঁথির সুপরিচিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে 'অনাগত' অধ্যায়ে; কিন্তু যেভাবে তখন হজরতের আবির্ভাব আকাঙক্ষা করা হইয়াছে তাহা অভিনব–

খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জিন' পরী, হুর পাগল-প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!.....
উৎপীড়িতের নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবী কোথায়!........
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত-ব্যথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায়!
আদি ও অন্ত যুগ-যুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চির-সুন্দর তুমি কোথায়!
বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায়–
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বের কেতাবী-লাকেতাবী নির্বিশেষে সকল মতের, শ্রেণীর ও গোত্রের মানুষের আকাঙিত ত্রাণকর্তা এই চিন্তা এখানে বলবত্তর। তসলিমুদ্দীন আহমদের বক্তব্যের জের টানিয়া 'নও কাবা' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে–

যে সিদ্দিক ও আমীন খুঁজিছে বাইবেল আর ঈসা,
তওরাত দিল বারে বারে যেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যার অনাগত গীতি,
যে 'মহামর্দ্দে, অথর্ব্ব-বেদ-গান খুঁজিতেছে নিতি,
সে অতিথি এল, কত কাল ওরে–আজি কতকাল পরে,
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল! বিশ্ব উঠিল ভরে,–

www.pathagar.com

আলোকে পুলকে,ফুলে ফলে,রূপে রসে বর্ণ ও গন্ধে;
গ্রহ তারা লোক পতিতা ধরায় আজি পুজা করে, বন্দে!

মূল হীব্রু বাইবেল 'মোহাম্মদীন' নামের অস্তিত্ব, হজরতের শৈশবকালে বক্ষ-বিদারণ (শাক্কোচ্ছাদর), অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চন্দ্র-বিদারণ (শক্কুল-কমর), মোহরে নবুওত, এছরা ও মি'রাজ, হেরা-গুহায় মাকড়সার জাল প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারে তাৎপর্য ভাবিয়া বিশ্বের বহু মনীষী কূটতর্ক তুলিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে মুসলমান মহলে সাধানণতঃ দ্বিমত নাই যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর সৃষ্ট আদি জ্যোতিঃ, এবং সেই জ্যোতিঃ (মোহাম্মদী নূর) হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে কুল-মুখলুকাৎ। মুসলমানের এই মতবিশ্বাসের মূল বিস্তারের সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছে এ-সকল শাস্ত্রবচনী–

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেনঃ আমি বলিলাম; হে রসূলুল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হউন, আপনি বলুন, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কোন্ পদার্থ সৃষ্ট করিয়াছিলেন? রসুলুল্লাহ জওয়াব দিলেন, সকল পদার্থের পূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নিজের নূর হইতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেন।

–(মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, মিলাদে মোস্তফা)

এবরাজ ইবন ছারিয়া বলেন, রসূলুল্লাহ বলিয়াছেনঃ 'হজরত আদম যখন মৃন্ময় মূর্তি মাত্র ছিলেন, বস্তুতঃ তখনই আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী রূপে নির্ধারিত ছিলাম।'–(হাদীস)

মুমিন মুসলমানের মনে এই বিশ্বাসও বদ্ধমূল যে, "যাহাদের অন্তরে শস্যকণা পরিমাণ ঈমানও আছে তাহাদিগকেও শেষ বিচারের দিনে শেষ নবী শাফায়াত করিবেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সৃষ্টির কারণ, আদি নবী ও শেষ নবী হাশরের দিনে নারকীকে করিবেন ত্রাণ,–এই নিগূঢ় প্রত্যয়কে কেন্দ্র করিয়াই এ-যাবৎ বাঙলা নাতিয়া দল মেলিয়াছে। এই প্রত্যয়ের ছবি মুসলমানী বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও সুপরিস্ফুট।

কিন্তু একালে জাগতিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পারত্রিক জীবনের কল্যাণ কল্পনা করা হয় না, এরূপও হয়ত বলা চলে যে, আধুনিক কালে সামগ্রিক জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তির দিকেই মানুষের দৃষ্টি সমধিক। ফলে নজরুল যুগের কিছুসংখ্যক নাত রচনায় এই সুরই প্রধান হইয়া ফুটিয়াছে যে, ঐহিক জীবনের সকল অপচয় ও অধোগতি রোধ করিয়া মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের দুরূহ পথে হজরতের পূণ্যাদর্শ উজ্জ্বলতম আলোকবর্তিকা। আলোকের স্তবগানে কবিকণ্ঠে চিরকাল মূখর । সুতরাং যত দিন মানুষের অন্তরে আলোর পিপাসা অন্তর্নিহীত না হইবে ততদিন নূরনবীর প্রশংসা-কীর্তনে কাব্য কোবি গণ অপার্থিব আনন্দ বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

[জাহানে নও অবলম্বনে]

www.pathagar.com

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রসূল-প্রসঙ্গ

আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন

বাঙ্গালা দেশে মুসলিমগণের আগমন হয় বিজয়ী বেশে খৃষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। কিন্তু ইহারও পূর্বে আরব দেশীয় বণিক ও ওলী দরবেশগণ আগমন করেন। কিন্তু মুস্‌লিমগণ কর্তৃক বাংলা ভাষার চর্চা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বে শুরু হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং বাংলায় হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জীবনী লেখার তাকীদও পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ সহজেই বোধগম্য। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে প্রধানতঃ আরবী ও ফারসী চর্চাই ছিল প্রধান। সুতরাং এই সময় হাদীস, তফসীর, ইতিহাস, জীবন-চরিত, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রই প্রধানতঃ আরবী ভাষাতেই শরু হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ফারসী ভাষাতেও শুরু হয়। উর্দুর তখনও সম্ভবতঃ জন্মই হয় নাই বা পরবর্তীকালে এই সময় বাংলা ভাষার ইসলামী শাস্ত্রগুলির আলোচনা শুরু না হওয়া আদৌ বিস্ময়কর নহে।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী আলোচনা করেন কবি যইনুদ্দিন (রচনাকাল ১৪৭১-১৪৮১)। এই গ্রন্থখানি গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৪৭৪ - ১৪৮১) যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাঁহার আদেশে রচিত হয়। এই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আদেশেই মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। ইহার পূর্বে কয়েকখানি 'মনসা মঙ্গল' কাব্য রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই মুসলিম শাহযাদা শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শ্রবণ করিবার পূর্বে স্বভাবতঃই রসুলুল্লাহ্‌র জীবন-কথা বাংলায় রচনার আগ্রহ করিবেন, তাহাই স্বাভাবিক। (পুঁথি পরিচিতি ৪১৯ পৃঃ) কিন্তু গ্রন্থখানির নাম 'রসুল-বিজয়' হইলেও ইহাতে জয়কুম রাজার সহিত হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর কল্পিত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ দেওয়া সম্ভব। রচনা-নীতি, ভাষা, সবই তৎকালীন প্রচলিত হিন্দু-রীতি ও ভাষার অনুকরণ। কিন্তু কাব্যখানি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মদীনা হইতে ছয় মাসের পথ দূরে জয়কুম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। জয়কুম রাজার রাজ্যে পৌছিয়া উভয় পক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধের পর জয়কুম রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে একশত কূপ খনন করিয়া কৌশলে উহাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখেন। পরদিন যুদ্ধ শুরু হইলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া পুর্ববৎ হইলেন। পরদিন হযরত আলী প্রতিশোধ

www.pathagar.com

গ্রহনেচ্ছায় যুদ্ধে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন ও বিজয়ী হন। (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৬০)

পরবর্তীকালে কবি সারিবিদ খাঁ বা শাহ্ বারীদ খাঁ (১৫১৭-১৫৫০) একখানি 'রসুল-বিজয়' কাব্য রচনা করেন। ইহাও পূর্বোল্লিখিত কাব্যের ন্যায় কাল্পনিক ঘটনা সম্বলিত।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন কবি সাইয়িদ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮)। ইনি ইসলামী ভাবধারা প্রচারের জন্য এক বিরাট সাহিত্যিক পরিকল্পনা গ্রহন করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি পত্তন হইতে শুরু করিয়া পয়গাম্বরদের কাহিনী, শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর বিস্তারিত জীবন-কথা, চারি খলীফার ইতিবৃত্ত, কারবালার দুর্ঘটনা ও সর্বশেষ কিয়ামতনামা রচনা করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে যতটা সময়ের প্রয়োজন ছিল, দুভাগ্যের বিষয়, কবির সুদীর্ঘ জীবনেও তাহা যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -এর ইন্তিকাল পর্যন্ত কাব্য রচনা করিয়া বাকী অংশ অর্থাৎ চারি খলীফার বিবরণ, মুহররম বা মাকতালে হুসাইন (হুসায়নের হত্যাকাণ্ড; 'মুক্তুল হুসায়ন' ভুল, উহার অর্থ হয় নিহত হুসায়ন) ও কিয়ামতনামা অংশ রচনার ভার তাঁহার মুরীদ মুহাম্মদ খাঁর (১৫৮০–১৬৫০) উপর অর্পন করেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কবি সৈয়দ সুলতান নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তৎসহ বর্ণিত বিষয় গুলি রচনা করেনঃ

১। নবীবংশ। সৃষ্টপত্তন হইতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ৎ প্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাসমূহ।

২। শবে মি'রাজ। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নবী জীবনের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মি'রাজ সম্বন্ধে।

৩। রসূল-বিজয়। মি'রাজের পর হইতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর ইসলাম প্রচারের বিবরণ। জয়কুম রাজার লড়াইও এই অংশেই অন্তর্গত।

৪। ওফাতে রসূল। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের বিবরণ।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, যে এই পরিকল্পনায় 'নবীবংশের শেষাংশ রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর জন্ম বৃত্তান্ত হইতে শুরু করিয়া 'ওফাতে রসূল ' পর্যন্ত গ্রন্থগুলি একত্র করিলে কতকটা ঐতিহাসিক,কতকটা কিংবদন্তীমূলক আর কতকটা কাল্পনিক বিবরণ মিলিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর একখানি পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যায়। যইনুদ্দীনের

www.pathagar.com

'রসূল-বিজয়' ও সাইয়িদ সুলতানের 'রসূল-বিজয়ের' বিষয়সন্তু ও রচনাধারা এক হওয়ায় মনে হয়, যইনুদ্দীনের প্রভাব সাইয়িদ সুলতানের উপর গভীর রেখাপাত করিয়া ছিল। এ ছাড়া কবীন্দ্র রচিত 'পান্ডব-বিজয়ই' যে তাঁহার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাব্য রচনায় প্রেরণার মূল উৎস ছিল. তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি বলেন,–

কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।।
হিন্দু-মুসলমান তার ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসূলের কথা কেহনা সোঙরে।।

সুতরাং এখানে কবি মন যে মূলতঃ গঠনমূলক কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কবি নসরুল্লাহ্ (১৫৬০–১৬৪৫) একখানি জঙ্গনামা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা হযরত আলী সহযোগে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর দিগ্বিজয়ের কাহিনী । ইহাতেও সর্বত্রই হযরতের (সাঃ) জয়, কাফিরদের পরাজয় ও ইসলাম গ্রহণ রহিয়াছে। এদিক দিয়ে ইহার বিষয়বস্তু অতি সাধারণ ও পর্ববতী কবিগণের 'রসূল-বিজয়' কাব্যগুলির অনুকরণ মাত্র। শুধু নামগুলি বাদে কাব্যের বিষয়বস্তু সবই কাল্পনিক।

কবি শেখ চান্দ (১৫৬০–১৬২৫) একখানি 'রসূল-বিজয়' কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁহার পরে শাহ্ দওলার আদেশে এই কাব্যখানি রচনা করেন। রসূল-বিজয়ের শেষার্ধে ১২৬ অধ্যায়ের পর এক বৃহৎ অংশকে কবি 'শবে মেরাজ' নামে অভিহিত করিয়া ইহাতে হযরতের মি'রাজ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। কাব্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথাঃ

১। ইবলিসের শোক, ২। তালিব-নিধন,৩। মুবারিবের স্ত্রীর শাস্তি, ৪। গোয়ালার ইসলাম গ্রহণ, ৫। জকিনামা ৬। মুরীদের কথা প্রভৃতি । কবির বর্ণনায় মনে হয় ইহাও 'কিসাসুল্ আম্বিয়া' গ্রন্থের ভাবাবলম্বনে রচিত। (মুসলিম বাঙ্গালা সহিত্যে পৃঃ ৯৬–১০৪)।

মৌলবী সাদিক আলী মরহুম 'হালতুন্নবী' নামে হযরতের (সাঃ) একখানি অনৈতিহাসিক কিংবদন্তীমিশ্রিত জীবন-চরিত রচনা করেন । ইহা সিলেটি নাগরী হরফে ছাপা হইয়াছিল।

অষ্টদশ শতাব্দীর কবি মুহম্মদ ছমি একখানি 'রসূল-চরিত' রচনা করেন। (পুঁথি পরিচিতি, পৃঃ ৬৬৬ নং ১২৪)।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বাংলা-ভাষী অঞ্চলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী প্রধানতঃ প্রচারিত হইয়াছে 'কাছাছোলা-আম্বিয়া' (কিসাসুল আম্বিয়া) নামে

www.pathagar.com

সুবিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে। এই গন্থ সর্ব প্রথম রচিত হয় 'আরবী ভাষায় আবু ইসহাক আহম্মদ ইবনু মুহম্মদ ইবনে ইবরাহীম আস্-সা'লাবী (মৃঃ ৪২৭হিঃ-১০৩৫ খৃঃ) কর্তৃক 'আরাইসুল মাজালিস ফী কিসাসিল আম্বিয়া' নামে । ইহা ব্যতিত কিসায়ী কর্তৃক একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়। সা' লাবীর গ্রন্থখানি আবদুল ওয়াহিদ ইবনু মুহম্মদ আলমুফতী কর্তৃক ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। এতদ্ব্যতীত ফারসীতেও মৌলিক ভাবে আরও কয়েকখানি নবী-কাহিনীর পুস্তক রচিত হইয়াছিল। ফারসী হইতে গোলাম নবী ইবনে ইনায়েতুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ আলী উর্দু ভাষায় ১২৬৩ হিজরীতে ইহার অনুবাদ করেন ও ১২৭৩ হিজরীতে ইহা ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। উপরি- উক্ত তিনখানি আরবী গ্রন্থ ব্যতীত 'খুলাফাতুল-আম্বিয়া ' নামে আর একখানি আরবী গ্রন্থের কথা জানা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় 'কিসাসুল আম্বিয়া' অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেগুলির অনুবাদ বাঙলা ভাষায় হইয়াছে যৌথভাবে।

'কাছাছুল আম্বিয়া' নামে একাধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে দুইখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় কলিকাতার পুঁথি প্রকাশক কাযী শফীদ্দিন কর্তৃক । ইহা অনুবাদ করেন শুরু হইতে হযরত নূহের বৃত্তান্তের কিছু অংশ মুনশী রিজাউল্লাহ। অতঃপর মুনশী আমীর উদ্দীন হযরত নূহের বৃত্তান্তের বাকী অংশ হইতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর তদীয় পিতৃব্যের সহিত সিরিয়ায় বাণিজ্য-যাত্রা পর্যন্ত অনুবাদ করেন। তারপর শেষাংশ 'খিলাফত নামা' ও 'সাতদ (শাহাদত) নামা ' সহ অনুবাদ করেন মুনশী আশরাফ আলী । ইহা ১২৬৮ সালে সমাপ্ত হয়।

এই নামের অপর গ্রন্থ প্রকাশ করেন সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর 'আফাজদ্দীন আহম্মমদ'। উহা 'খুলাসাতুল আম্বিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া শুরুতে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বালাম অনুবাদ করেন ঢাকা জিলার গড় পাড়ার 'মুন্শী তাজউদ্দীন। দ্বিতীয় বালাম হইতে শেষ পর্যন্ত বাকী ১৫ বালাম অনূদিত হয় হাওড়া জিলার গোবিন্দপুরের 'মুনসী খাতের মহাম্মদ' কর্তৃক। এই গ্রন্থ ১২৭৩ সালের ২৫শে রমযান, মুতাবিক ২০শে মাঘ শুক্রবার আসরের সময় সমাপ্ত হয়। ১৩৩৬ সালে ইহার অষ্টাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

শেষোক্ত কিসাসুল আম্বিয়ায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই-

১। মোহাম্মদি নূরের পয়দায়েশের বয়ান,

২। আযাযীল পয়দায়েশের বয়ান,

৩। নূরে মোহম্মদী হযরত আদম হইতে বংশ পরম্পরায় আবদুল্লাহর কপালে আসে ও তথা হইতে আবদুল্লাহ ও আমেনার মিলনে আমেনার গর্ভে আসে,

www.pathagar.com

৪। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্ম,

৫। বিবি হালীমা কর্তৃক তাঁহাকে প্রতিপালন ও প্রথমবার সীনাচাক

৬। হযরতের মাতৃবিয়োগ,

৭। পিতৃব্যের সহিত সিরিয়ার বাণিজ্য-যাত্রা,

৮। বাহিরা রাহেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী,

৯। হযরতের দ্বিতীয় বার সীনাচাক,

১০। তাঁহার হযরত খাদীজার সহিত বিবাহ,

১১। কা'বা শরীফ পূননির্মাণ,

১২। হযরতের বিবিদের নাম ও অবস্থা ও হযরতের নেক খাসলতের বয়ান,

১৩। হযরতের আওলাদগণের বয়ান,

১৪। হযরতের তৃতীয় বার সীনাচাক ও ওহী আগমন,

১৫। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ,

১৬। হযরতের মোজেজা, বুজুরগী ও নেক খাসলতের বয়ান,

১৭। হযরতের মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত,

১৮। বদরে কুবরার লড়াই,

১৯। বিবি আয়েশার প্রতি অপবাদ,

২০। জঙ্গে ওহোদের বয়ান,

২১। বদরে সুগরার লড়াই,

২২। খয়বরের লড়াই,

২৩। বনি কুবায়যার লড়াই,

২৪। তবুকের লড়াই,

২৫। তবুকের বাদশাজাদির বিবরণ ও হোস্বাম জঙ্গি ও আলকামা শাহজাদার সহিত হযরত আলীর লড়াই।

২৬। হোদাইবিয়ার ছোলেহ,

২৭। ফতেহ মক্কা,

২৮। হোনাইনের লড়াই,

২৯। হাজ্জাতুল বেদা,

৩০। হযরতের ওফাত,

৩১। হযরতের ফরজন্দানের বয়ান।

উপরের সূচীপত্রটি অতিশয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নূরে-মুহম্মদীর উপাখ্যানসহ আরও এমন বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যাহার কতকগুলির আদৌ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আর কতগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। উদাহরণস্বরূপ তবুকে

www.pathagar.com

বাদশাহজাদীর বিবরণ ও হোস্বাম জঙ্গির ও আলকামার শাহজাদার সহিত হযরত আলীর লড়াই। ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এরূপ আরও বহু কাল্পনিক ও কিংবদন্তীমূলক ঘটনার উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়। অথচ জঙ্গে আহ্‌যাবে বা খন্দকের যুদ্ধের ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ইহাতে নাই। মোট কথা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চলিত বাঙ্গালা সাহিত্যে (আধুনিক নহে) খাঁটি ঐতিহাসিক বিবরণ ও কুরআন হাদীস অবলম্বনে রচিত গবেষণা-প্রসূত হযরতের (সাঃ) জীবন -চরিত আজও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও সন্ধান ও গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[প্রবন্ধটি বিগত পঞ্চাশের দশকে জাহানে নও পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এটি সংগৃহিত হয়েছে এবং এখানে সীরাত চর্চার ধারাবাহিকতার অবস্থা তুলে ধরার প্রয়োজনে সন্নিবেশন করা হলো। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সীরাত চর্চায় লেখকদের কল্পনাও কাজ করেছে, যা কোরান ও হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। বিশেষ করে পুথিশাস্ত্রের প্রভাবের সময় এটি বেশী কাজ করেছে]

ইসলামে মেয়েদের অধিকার ও কর্মসংস্থান

ইশরাত জাহান নাসিমা

বর্তমান সমাজে এবং জীবনে মেয়েদের অবস্থান নিয়ে তর্ক, আলোচনা সমালোচনা আজ কোন নতুন বিষয় নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে তাদের নিয়ে সে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে এবং যে বিকৃত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা সমগ্র মানবজাতির জন্যেই অত্যন্ত অপমানকর ও লজ্জাজনক।

এমতাবস্থা আমাদের অবস্থায় আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে, সমাজের এরূপ বুদ্ধিজীবী পুরুষ মহিলাদের চিন্তা চেতনার মূল গলদ কোথায়? মুলতঃ অনৈসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী জীবন দর্শনের সঠিক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাই এর জন্যে দায়ী।

আমরা যদি একটু সচেতনভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে, বিংশ শতকের আগে সমগ্র ইউরোপে আইনের খাতায় এবং বাস্তবেও মেয়েরাই ছিল সকল সময়ের মধ্যে মানবিধাকার বঞ্চিত। সমানাধিকারের নামে পাশ্চাত্য জগত মেয়েদের নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড ও আন্দোলন শুরু করতে থাকে। তারা পুরুষের ন্যায় একই ধরনের আচার আচরণ করতে গিয়ে নিজেদের বিসর্জন দিতে থাকে, সেই সাথে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যকেও হারাতে বসে। যার করুণ পরিনতি বাস্তব চিত্র আজকের সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজ। আজ একজন পাশ্চাত্য নারীর কর্মক্লান্ত শরীরটা যে কোথায় একটু বিশ্রামের জন্যে রাখবে সেটাই বড় সমস্যা। চারদিকে পুরুষ হায়েনার দল আসক্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। ক্রমাগত তাকে সম্ভোগের জন্যে টানে। কিন্তু ভোগের পর পরিত্যক্ত ভোগ্যবস্তুর কোন দায়-দায়িত্ব তারা গ্রহন করে না। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বৃটেনে জন্ম গ্রহনকারী প্রতি চারটি শিশুর মধ্যে একটি জারজ। অপরদিকে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা রোম ও চীন সভ্যতা এমনকি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইয়াহুদী সমাজে মেয়েদের প্রতি যে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো তা ছিলো অত্যন্ত ঘৃন্য ও মারাত্মক। এ ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সত্যিই অভূতপূর্ব অবিস্মরনীয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাহমাতুলল্লিল আলামীন রাসুলে করীমই (সা) সর্ব প্রথম অন্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলাম যে আল্লাহ ও রাসুলের পর সবেচেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মাতা। নবী (সা) বলেছেন, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত। মেয়েদেরকে মহান ইসলাম কত মর্যাদা ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে আমরা কি ভাবতে পারি? ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। ইসলামই দিয়েছে তাদেরকে বাঁচার অধিকার। কুরআনে করীমের সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

www.pathagar.com

"যখন রুহকে (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে যখন জীবন্ত কবর দেয়া মেয়েকে জিজ্ঞেসা করা হবে সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল।"

শুধু তাই নয়, মহানবী (সা) সর্বপ্রথম মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের কথা ঘোষনা করেন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর কোন অংশে বা কোন ধর্মে যখন মেয়েদের কোন উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না, সে সময়ে ইসলামেই সর্বপ্রথম মেয়েদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা দেয়া হয়। কন্যা, স্ত্রী ও মাতারূপে সবসময়ই মেয়েরা মীরাস পায়। পিতা ও স্বামী উভয় দিক থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে মেয়েরা পেয়েছে পূর্ন মালিকানা স্বত্ব এবং তা ব্যয় করার অধিকার।

মেয়েদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা বিয়ের প্রশ্নে ইসলাম দিয়েছে সহজ সমাধান।

ইসলাম সমগ্র মানব জীবনের জন্যে একটি ইনসাফপূর্ণ জীবন বিধান। এতে মানবিক অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে সকল মানুষই সমান। এ জীবনাদর্শে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই মানুষ এবং স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। পুরুষ বা স্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ণয় করা হয় না। একমাত্র ঈমান, নেক আমল ও আল্লাহ ভীতির মানদণ্ডেই একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের জাতি, গোত্রে বিভক্ত করেছি যতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই বেশী সম্মানিত যার মধ্যে অধিক তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি রয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, এ বিশ্বজগতের অসংখ্য সীমাহীন সৃষ্টির মধ্যে কোন একটি সৃষ্টি অকারন, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করিনি (সুর-রা'দ ২৭)

সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রীলোক সৃষ্টির মধ্যেও যে আল্লাহ পাকের এক মহাপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যে লুকিয়ে আছে তা সহজেই অনুভব-অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ বলেন ঃ ইন্নি জাঈলুন ফিল আরদি খালীফাহ।" অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করতে চাই। (আল বাকারাহঃ ৩০)

এ আয়াতে এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব দিয়েই আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদম (আঃ) এবং হাওয়াকে (রাঃ) সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তার এবং সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আপন প্রতিনিধি হিসেবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিপূর্ন এবং সমস্ত গুণাবলীর অধিকার তাঁর গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে আদল-ইনসাফ, হিকমত ও ন্যায়বিচার। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের উপর কখনও বিন্দু পরিমান জুলম করেন না।'' আল্লাহ্ কারো উপর তার সামর্থের অতিরিক্ত

www.pathagar.com

দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। (আল বাকারাহ ঃ ২৮৬)। আর সে জন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ শুধু পুরুষ ও স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেই নিজ দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং তাদের জন্মগত দৈহিক পার্থক্য এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য, শক্তি-সামর্থ চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

তাছাড়া এ কথা অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, মেয়েরা জন্মগতভাবেই কিছুটা শান্ত কোমল, সংবেদনশীল, আবেগপ্রবন ও সৌন্দর্য প্রিয় । আর পুরুষেরা অধিক শক্তি সামর্থ, সংগ্রাম সাধনা দক্ষ, গভীর বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ও পেশী শক্তির অধিকারী হয়। মেয়েদের তুলনায় পুরুষের এরূপ গুণ বৈশিষ্ট এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। তবে এ পার্থক্যটাও নেহায়েত উদ্দেশ্যহীন নয়। কেননা,ইসলামী জীবনাদর্শে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্যে পরিবার হচ্ছে একটি অপরিহার্য সংস্থা। সমাজের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান পরিবার। বিয়ের মাধ্যমে একজন পরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্মিলিত জীবনধারার সূচনা হয়। তারই ফলে একটি পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ পরিবার থেকে নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। সে পরিবারের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্ব এত বেশী যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই নারী ও পুরুষের মাঝে অত্যন্ত ইনসাফপূর্ন দায়-দায়িত্ব ও কর্ম বন্টনে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একটি পরিবারের অর্থোপর্জনের দায়িত্ব প্রধানতঃ পুরুষের উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। তাদের জিম্মায় কিছু অতিরিক্ত ব্যায়-ভারও অর্পিত হয়েছে, যেমন স্ত্রীর মোহরানা আদায়, স্ত্রীসহ পুত্র -কন্যা বৃদ্ধ মাতাপিতা ও নাবালক ভাইবোন থাকলে তাদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করতে পারলে আল্লাহ পাক্ পুরুষদেরই দায়ী করবেন বেশী। তিনি তাদেরকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, শক্তিসামর্থ ও সহনক্ষমতা দান করেছেন, যার জন্যে পুরুষেরা এরূপ দায়িত্ব পালনেরই উপযুক্ত। অপরদিকে মানব শিশুর গর্ভধারণ জন্মদান, জন্মদানের মত গুরুত্ব পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মূলত ঃ মেয়েদের উপরেই অর্পিত হয়েছে। তাদের উপযোগী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। শিশুর প্রতিপালনসহ পারিবারিক জীবনের সার্বিক দায়-দায়িত্বের বিনিময়েই অর্থোপার্জনের দায়িত্ব থেকে মেয়েদের অব্যহতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটা মেয়েদের প্রতি পুরুষের কোন করুণা নয়, সামাজিক কর্ম বন্টনের অপরিহার্য ন্যায় সঙ্গত শর্ত হিসেবেই এরূপ করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ জেনে রাখো, তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ” (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে তথাকথিত আধুনিক প্রগতিবাদীদের ধারণা তাহলে মেয়েরা কি অর্থোপার্জনের কোন দায়িত্বই পালন করবে না? এ প্রশ্নের সমাধান পাওয়ার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন। মেয়েরা পারিবারিক জীবনে গৃহস্থালীর যে সমস্ত কাজকর্ম করেন, স্বামী সন্তানসহ অন্যান্য সদস্যদের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করেন তা কি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত নয়? একজন মেয়েকে তার স্বামীর সংসারে স্ত্রী ও মাতা হিসেবে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সংসারে যাবতীয় কাজ কর্মের সাথে জড়িত থাকতে হয়। স্বামী যেহেতু ঘরের বাইরে অর্থোপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকেন, কঠোর পরিশ্রম করেন, সে জন্য স্বামীর খাবার-দাবার প্রস্তুত করা, কাপড়-চোপড় পরিস্কার করা, ইস্ত্রি করা এবং স্বামীর পরিবারে বৃদ্ধ মাতাপিতা ও ছোট ভাইবোন থাকলে তাদের প্রতি ও অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা, সেবা যত্ন করা নীতিগতভাবে একজন স্ত্রীরই দায়িত্ব। বিশেষ করে পরিবারে প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিনের খাবার প্রস্তুত করা, অতিথি আপ্যায়ন করা এবং রান্না-বান্নার জন্য একজন কর্মব্যস্ত গৃহিনীকে যথেষ্ঠ মনোযোগ ও শ্রম দিতে হয়। তাছাড়া, একটা পরিবারের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা একজন সার্বক্ষণিক দায়িত্বশীল গৃহিনীর দ্বারাই সম্ভব।

অতঃপর সন্তান প্রসব করে মাতৃত্ব অর্জন করা মেয়েদের স্বভাবজাত প্রকৃতির অন্যতম। স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্খা আর স্বপ্নের ফসল রূপে জন্মগ্রহণ করে একটি শিশু। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, "আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন এবং এ স্ত্রীদের থেকেই তোমাদের পুত্র-পৌত্র দান করেছেন। (সূরা আন-নহল ঃ ৭২)

আর সে জন্যেই হয়তো রাসুলে করীম (সা) বলেছেন, মেয়েরা তার স্বামীর ঘরের লোকদের এবং তার সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে। কুরআনপাকে বলা হয়েছে, আবার বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুর জন্যেই নয়, মায়ের জন্যেও উপকারী। ডাক্তারদের অভিমত, শিশুকে দুধ না দিলে মায়ের বুকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশুকে বুকের দুখ খাওয়ালে মা ও শিশুর মাঝে একটা আত্বিক সম্পর্কও গড়ে উঠে। অথচ ইচ্ছে থাকলেও অনেক চাকুরীজীবী মায়েরা তাদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন না।

এরপর আসে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিষয়টি। এ জন্যে একজন মাকে প্রায় সার্বক্ষণিকভাবেই ব্যস্ত থাকতে হয় যা বেতন দিয়ে একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে পাওয়া সম্ভব নয়। মনস্তাত্বিক দিক দিয়েও শিশুরা যেরূপ স্নেহ,-আদর, সোহাগ, শাসন

মিশ্রিত সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ তা একমাত্র মায়ের নিকট থেকেই আশা করা যায়। সার্বিকভাবে চিন্তা করলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, মানব শিশু পালনে কি সুষ্ঠ ও সুন্দর বিধানই না মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর সাম্যান্য ব্যতিক্রম হলে মাতাপিতাকেই তার চরম মূল্য দিতে হয়। বর্তমান সমাজের কিশোর অপরাধীদের খোঁজ করলে দেখা যাবে এদের অধিকাংশই কোন না কোন আদর সোহাগ স্নেহ-শাসন বঞ্চিত পিতামাতার সন্তান। প্রতিপালন করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া পরিবারে কত বড় অর্থনৈতিক কাজ। আবার একজন মুসলিম মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রতম দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানকে শিশু বয়স থেকেই ইসলামী আকিদা বিশ্বাস এবং ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে তারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তায়ালার খলীফা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সুতরাং এমনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে তার উপর অর্পিত হয়েছে ইসলাম কোনক্রমেই তার ওপর ঘরের বাইরের পুরুষের উপযোগী লৌহ কঠিন দায়িত্ব চাপাতে পারে না। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক নিজের ঘরে স্থীর হয়ে থাকবে সে মুজাহিদ পুরুষদের সমান আমলের সওয়াব পাবে।" অর্থাৎ মুজাহিদ পুরুষ ঠিক তখনি নিশ্চিন্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারে, যখন তার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে কোনই চিন্তা থাকে না, তার স্ত্রী তার ঘর ও সন্তান সন্তুতির দেখাশোনার সম্পূর্ন দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং সেই মুজাহিদ পুরুষটির অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে না বলে তার অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে। বস্তুতঃ যে স্ত্রী তার স্বামীর মনে এরূপ নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করতে পারে সেতো ঘরে বসেই জিহাদের সমান সওয়াব লাভের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পুরুষ স্ত্রীলোকের দায়িত্ব কর্তব্য ও কাজকে নিরপক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মেয়েদের কর্মই অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ। মেয়েরা যদি ঘর সংসার, আত্মীয় আপনজন এবং সন্তান সন্তুতি দেখাশুনা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে পুরুষদের আয় উপার্জন হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন এবং তা চরমভাবেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর সে জন্যেই হয়তোবা নেপোলিয়ন বলেছিলেন ঃ 'আমাকে ভাল মা দাও, আমি ভাল জাতি উপহার দেবো।'

একজন পুরুষ তার দীর্ঘদিনের স্বপ্নসাধের পরম আকাঙ্খিত একজন মেয়েকে বিয়ে করে জীবন সঙ্গিনীরূপে ঘরে তুলে আনেন নিশ্চয়ই প্রেমময় শান্তি সুখের সুন্দর-সহজ জীবনেরই প্রত্যাশায়। আর সে জন্যেই জীবনাদর্শে মানব জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের ন্যায় পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশী। দাম্পত্য

www.pathagar.com

জীবনের সুখের মূলকথাই হচ্ছে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ, ধৈয্য-সবর এবং ভালবাসা ও সহৃদয়তা। এ ক্ষেত্রে ঘরের স্ত্রী যদি বাইরের কর্মময় জীবনে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে পারস্পরিক বিশ্বাসের সুতো যে অতি সহজেই ছিড়ে যায় তা অত্যন্ত বাস্তব এবং সত্য বলেই প্রমাণিত। অতঃপর আসে 'সবরের' প্রশ্নটি। মূলতঃ স্ত্রীকেই অধিক সবর-ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। কেননা, বর্তমান সমাজে দেখা যায় স্ত্রীদের সীমাহীন চাওয়া পাওয়া এবং দুনিয়ার ভোগ বিলাসের আকাঙ্খায় স্বামীদের একটা বিরাট অংশই ঘুষ, দূর্নীর্তি স্বজনপ্রীতি, জালিয়াতি, চোরাচালানী এবং ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের ন্যায় মারাত্মক ধরনের অপরাধসমূহে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

এখানে প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সমাজের কিছু উচ্চবিলাসী স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের কলহ ও জটিলতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাতই এর প্রধান কারণ। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে যে ফায়সালা দিয়েছেন তা মেনে নেয়া ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে সংঘাত, তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। এসব কথার গুরুত্ব আরো বেশী অনুধাবন করা যায় মহানবীর (রা)-বাণী থেকে। তিনি বলেছেন ঃ "আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দান করতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্যে।"

তবে স্বামীর আনুগত্য করা যেমন স্ত্রীর কর্তব্য ঠিক তেমনিভাবে স্বামীরও উচিত তার অধিকার ও ক্ষমতা অন্যায় জুলুম আর বেইন্‌সাফির কাজে প্রয়োগ না করা। মহান আল্লাহ স্বামীদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ এবং তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে স্বদ্ভাবে জীবন যাপন করো। তারা যদি তোমাদের মনের মত না হয়, তবে হতে পারে যে, তার কোন বিষয় তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" (আল –নিসা ঃ১৯)

পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর মর্যাদা ও সম্মানকে অধিক অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ন করে তোলার জন্যে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" তিনি আরো বলেন, "সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ন। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম (নিয়ামত) হলো চরিত্রবান পূন্যবতী স্ত্রী।" (সহীহ মুসলিম)।

আজ গোটা পৃথিবীর সমাজ দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে মানব জীবনে সঠিক কোন মূল্যবোধই টিকে থাকতে পারছে না। পাশ্চাত্য সভ্যতায় চিরাচরিত বিয়ের পবিত্র বন্ধনের ধারণা আজ লুপ্তপ্রায়। ব্যভিচার, জ্বেনা আর নারী পুরুষের অবাধ মিলনকে আইন সঙ্গত করে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্যভিচারকে জীবনের স্বাভাবিক হিসেবে দাবী মেনে নেয়া হয়েছে। গর্ভপাতকে

www.pathagar.com

আইনসিদ্ধ করার দাবী উঠেছে। আমেরিকায় সিফিলিস রোগে শতকরা প্রায় ১০ জন লোক আক্রান্ত। "যুক্তরাজ্যের ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়স্ক প্রতি সাত জন মহিলার মধ্যে একজন এমন একজন পরুষের সঙ্গে বসবাস করেন যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি।" (নিউজ লেটার; মে. ১৯৯০)

যার ফলে এইডসের মতো প্রাণঘাতী রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে জারজ সন্তানের সংখ্যাও কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যাচ্ছে। নারী পুরুষের কুণ্ঠহীন অবাধ মেলামেশার ফলে প্রকৃতপক্ষে নারীরাই হচ্ছে বেশী অপানিত এবং লাঞ্চিত। একজন পুরুষকে চিহ্নিত করা হয় না অবৈধ সন্তানের জনক হিসাবে, কিন্তু মাকে করা হয়। ফলে পরিচয়হীন সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকেন অনেক নারী। নারী-জীবনের এমনি অসংখ্য বেদানদায়ক চিত্র আমাদের চারপাশে। কিন্তু কেন? তবে প্রশ্ন থেকে যায়, নারী কি চিরদিনই পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে দুঃসহ বন্দাত্বের জ্বালা সইবে? সেকি কোন সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে না?

ইসলাম কখনো এরূপ কথা বলেনি যে, মহিলারা ঘরের বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু তা কখনো নিঃশর্ত নয়। শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) প্রয়োজনবোধে (খ) আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত পর্দার নির্দেশ মেনে (গ) পৃথক কর্মক্ষেত্রে।

প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ যে পরিবারে সন্তানদের মধ্যে সবাই কন্যা সন্তান অথবা পুত্র সন্তান ছোট এবং পিতা এমন বৃদ্ধ যে অর্থোপার্জনে অক্ষম সে ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানগণ জিবীকার প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বামী যদি পঙ্গু কিংবা অসুস্থ থাকেন অথবা মৃত্যুবরণ করেন অথবা কোন মহিলা যদি তালাকপ্রাপ্ত হন এমন সব জরুরী অবস্থায় নারীদেরকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই যেতে হয় এবং ইসলামও তাদেরকে বাধা দেয়না। একজন মহিলা সাহাবী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ইদ্দত পালনকালে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর গাছের ডাল কেটে বিক্রয় করার অনুমতি চাইলে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ক্ষেতে যাও, অতঃপর নিজের খেজুর গাছ কাট আর বিক্রয় কর। এ অর্থ দ্বারা সম্ভবত ঃ তুমি দান খয়রাত অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) - এর বেগম নিজে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বাজারে বিক্রয় করে ঘর সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী করীমের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, " আমি একজন কারিগর মহিলা, আমি তৈরি করা দ্রব্য বিক্রয় করি। এছাড়া আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার জন্যে অন্য কোন উপায় নেই।" রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এভাবে উপার্জন করে তুমি

www.pathagar.com

তোমার ঘর সংসারের প্রয়োজন পূরণ করেছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।" হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে হযরত আসমা বিনতে মুহাররামা (রাঃ) নামের একজন মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসা করতেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, নারীর যদি নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য এবং ধন-সম্পদ থাকে তাহলে সে সবের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তদারকীর জন্যে তাকে বাইরে যেতে হবে। তাছাড়া জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনও মেয়েদেরকে বাইরে যেতে হবে।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্যে ফরয।" হাদীস শরীফে আরও এসেছে, মুসলিম মাহিলাদের দাবীর পরিপেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্যে সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন।

সামাজিক প্রয়োজনে যেমন বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃ সদন, মহিলা ডিস্পেন্সারী, মহিলা শিল্প খামার এবং মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং এতে কাজ করার জন্য মহিলারা বাইরে যেতে পারবে। যেহেতু মুসলিম সমাজে এসব মহিলা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পুরুষদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। সে জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ মহিলাদেরকে করতে হবে।

পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর হযরত উমার (রাঃ) হযরত সাওদা (রা) কে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং হযরত সাওদা (রা) নবী করীমের (সা) নিকট এ ব্যাপারটি ব্যক্ত করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নবীর (সা) উপর ওহী নাযিল হয়। তখন তিনি হযরত সাওদা (রাঃ) কে ডেকে বলেন ঃ "হ্যাঁ, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্যে রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই।"

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মেয়েরা যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষালাভের জন্যে বাইরে যেতে পারবে, তেমনিভাবে জীবিকার প্রয়োজনে অথবা সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যেও বাইরে যেতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে, পর্দার নির্দেশ মানতে হবে এবং মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্রের সুযোগ থাকতে হবে। কেননা পর্দার হুকুম মেনে চলা আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত একটি ফরজ বিধান। আবার নারী পুরুষকে একই কর্মক্ষেত্রে এক সাথে কর্মে নিয়োগ করার বাস্তব পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। বর্তমানে সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সঠিকভাবে পর্দার নির্দেশ মেনে চলা -এবং মহিলাদের জন্যে আলাদা কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর জন্যে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটারই একটা আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

[সীরাত স্মারক '৯৬ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

শান্তির দূত

ডাঃ মুহাম্মদ আবদুল বারী

জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব জাহান এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অসংখ্য মনগড়া দেব দেবী ও নিজেদের তৈরি মূর্তি পূঁজা করত। নানা রকম অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন, যুলুম নির্যাতন পাপ পঙ্কিলতায়-নিমজ্জিত গোটা মানব সমাজ।

অজ্ঞতা ও নির্মম অত্যাচার, শোষণ, গোত্রে গোত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তারক্তি, নারীদের প্রতি চরম অবহেলা, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর, দাস-দাসীর প্রতি লাঞ্ছনা, চুরি ডাকাতি, রাহাজানী, অপহরণ, মদ্যপান, ব্যাভিচার, নাচগান, নৈতিকতা বিরোধী আচরণ, সুদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ছিল নৈতিকতা বিরোধী শোষণমূলক ব্যবস্থা। ন্যায় বিচারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় নিরাপত্তাহীনতায় মানব জীবন ছিল বিপদাপন্ন।

এই অধঃপতিত মানব সমাজে শান্তির দূত হিসাবে আবির্ভূত হলেন মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শোনালেন শান্তির বাণী। ঘোষণা করলেন আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের কথা। সকল সৃষ্টির তিনি একমাত্র স্রষ্টা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই উপাসনার যোগ্য নহে। তৎকালীন নানা দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসী জাহিলিয়াতের ঘুনে ধরা জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে শান্তিময় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে শেষ নবী হিসেবে মনোনীত করে বিপদগ্রস্ত মানব জাতীকে হিদায়েতের জন্য পথ প্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন–তা জানিয়ে দিলেন। মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে লাগলেন। জাহিলিয়াতের যুগের প্রচলিত জীবন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তি সনদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। হজ্বের মওসুমে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকজনের মধ্যে সুযোগ বুঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথ ভুলে তারা ভ্রান্ত জীবন মেনে চলার কারণে সামাজিক বিশৃংখলা অশান্তি ও পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত তা বুঝতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বিপদগামী মানুষগুলো সত্যপথের সন্ধান পেয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। ক্রমেই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও ইসলামের দাওয়াতের পথ নিস্কন্টক ছিল না। বাপ দাদার ধর্মের সমালোচনা করার কারণে কুরাইশরা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম প্রচারে বাধার সৃষ্টি করলো।

www.pathagar.com

তবুও সকল বাধা উপেক্ষা করে দ্বীনি দাওয়াতের কাজ চালাতে লাগলেন। শুরু হলো মুসলামানদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, যুলুম ও অত্যাচার। নবুওতের দশম বর্ষে চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী হযরত খাদিজার (রা) ইন্তিকালের পর মুসলমান ও স্বয়ং রসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা চরমে পোঁছে। সাহায্য ও সহযোগিতার আশায় তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তায়েফে গমন করেন। কিন্তু সেখানে চরম অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে বিতাড়িত হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে এসে জোরে শোরে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হযরত হামযার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। অপরদিকে কুরাইশরা চরম অত্যাচার শুরু করলো। অমানুষিক নির্যাতনের শিকার এবং চাচা ও স্ত্রীকে হারিয়ে মর্মাহত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দান ও কুদরতের নির্দশন প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি মিরাজে গেলেন। পৃথিবীতে ফিরে এসে মিরাজের কথা প্রকাশ করলে কুরাইশরা উপহাস করতে থাকে। তবুও ইসলাম প্রচারে বিরত হলেন না। হজ্বের মৌসুমে মদীনা থেকে আগত লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা কবুল করে এবং মদীনায় ফিরে গিয়ে নিজেদের গোত্রের মধ্যে প্রচার করে। ফলে মদীনায় ইসলামের দাওয়াত পৌছে গেল। কুরাইশদের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে কিছু কিছু মুসলমান মদীনায় হিজরত করে নিরাপদ আশ্রয় পেল। এদিকে কুরাইশরা মহানবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে অনুমতি পেয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন।

হিজরতের পূর্বেই মদীনার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করায় অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মদীনায় বিশ্ব নবী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে শান্তিময় জীবনে ফিরে আসে। নারী দাস-দাসী সকল শ্রেণীর মানুষ পেল নিজ নিজ অধিকার। সমাজ ইহকালীন শান্তিময় জীবন ও পরকালীন চিরশান্তিময় জীবনের পথের সন্ধান পেল। শান্তির দূত সত্যের পথ প্রদর্শক। মুক্তির সুসংবাদ দাতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠা করলেন ইসলামী রাষ্ট্র। তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি ও সেনাপতি। মসজিদে নববী পরিণত হলো সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামও চারিদিকে দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগলো।

কুরাইশরা হিংসানলে জ্বলে উঠলো। ইসলামকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। একের পর এক অনেক যুদ্ধ হলো। মুসলমানগণ বিজয়

www.pathagar.com

মাল্য বরণ করেই চললো। পরিশেষে মক্কা বিজয়ের পর গোটা আরব ও আরবের বাহিরে ইসলামের দাওয়াত দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো ন্যায় ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র। অবশেষে আখেরী নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তির দূত হিসেবে যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তা বিশ্ব মানবের নিকট সঠিকভাবে পোঁছে দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর পার্থিব জীবনের অবসান হলো।

আজকের পৃথিবীর মুসলিম সমাজ তাঁরই রেখে যাওয়া ইসলাম ভিত্তিক আদর্শ সমাজের ফসল। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন।

[সীরাত স্মারক '৯৭ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মোস্তফা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কোনও নবী-রসুলের শিক্ষাকে বিচার করতে গিয়ে শুধু দার্শনিক কষ্টি-পাথরের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। এজন্য বরং বিচার করে দেখা একান্ত প্রয়োজন যে, তিনি নিজের জীবনে উক্ত শিক্ষাকে কিভাবে এবং কতটুকু প্রতিফলিত করেছেন। কারণ নিবীর শিক্ষা হলো—একটি আদর্শ (ideal), আর তাঁর জীবন হলো শিক্ষার একটি নমুনা (model)। সেই নমুনা দিয়েই আমরা সম্যক ধারণা করতে পারি তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভবপর কি না এবং সম্ভবপর হলে, তাদ্বারা অনুগামীদের স্বভাব-চরিত্র ও সমাজ-ব্যবস্থা কি রূপ ধারণ কররে। তাই কুরআনের শিক্ষার বিচার করতে হলে, রসুল করীমের (সাঃ) জীবনকেও তারি পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রসুল-চরিত্রের খোদাপ্রেম ও মানবতা-বোধ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অসামান্য জীবন নিয়ে আলোচনা করলে সবচেয়ে যে বিষয়টি বড় ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো আল্লাহ্‌র উপর তাঁর অটল বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা। জীবনের কোন মুহূর্তেই তাঁর খোদা-প্রেমে এতটুকু ফাটল ধরেনি। জীবনের চরম সঙ্কটকালে তিনি যেমন আল্লাহ্‌তে পূর্ণ আস্থা রেখেছেন, তেমনি আবার ধন-দৌলত, লোভ-লালসার আহ্বান বা বিজয়ের চরম উল্লাসও তাঁকে উক্ত বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাঁর জীবন থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মক্কাবাসীদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা ও অত্যাচার -উৎপীড়ন যখন রসুলুল্লাহ্‌কে ইসলামের আদর্শ প্রচার থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা তাঁকে ধন-দৌলত , সুন্দরী নারী ও জাতির নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব-দানের লোভ দেখিয়ে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা শুরু করলো। রসুলুল্লাহ্‌র মনের কোণে যদি ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও বিলাসিতা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় থাকতো তবে নিশ্চয়ই তিনি এই আহ্বানকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করার ব্যাপারটি রসুলে করীমের জীবনের একটি অত্যুজ্জ্বল ঐশী প্রেমের উদাহরণ।

জন্মস্থান সবার নিকটই অতি প্রিয়। আর প্রতি ধুলিকণার সাথে শৈশব ও কৈশোরের হাসি-কান্না, খেলাধুলা, যৌবনের রঙিন স্বপ্ন ও কর্ম-জীবনের ধ্যান ধারনার স্মৃতি বিজড়িত। মক্কাবাসীদের অত্যচারে হযরতের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে তাঁর জীবন-নাশের উদ্দেশ্যে সময় নির্দিষ্ট করে তারা যখন সংকল্প গ্রহণ করলো, তখন তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে গভীর রাত্রে মদীনার পথে যাত্রা করলেন এবং হযরত আবু বকরকে নিয়ে সাত্তর গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কোরেশগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। কয়েকজন শত্রু উক্ত গুহার অতি নিকটেই সুমপস্থিত। এমন কি তাদের কাথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। আবু বকর বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি হযরতকে বললেন, "শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, আর আমরা মাত্র দু'জন; কি হবে।"

হযরত শান্ত কণ্ঠে বললেন,-"আবু বকর, আপনি ভুল করছেন, আমরা দু'জন নই-আরো একজন আছেন সাথে-আমাদের আল্লাহ্ রয়েছেন।"

এই কথোপকথনটি এবং সেই সময়কার ঘটনাবলীর মাধ্যমে রসুলে করীম (সঃ) যে আল্লাহ্ তালার উপর কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন ও জীবন-পথে সর্বক্ষণ স্রষ্টাকে স্মরণে থাকতেন, তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা যে কোন বিপদ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের রক্ষা করতে পারেন, সন্দেহাতীত ভাবে তাঁর জীবনাচরণে তিনি তাও প্রমাণিত করলেন। স্রষ্টার সাথে দৃঢ় সংযোগ ঘটলে, জাগতিক দৃষ্টিতে নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় পরম শত্রুর কবলে পড়েও মানুষ কত শান্ত ও নির্বিকার হতে পারে, সহজ সরলভাবে যে কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে, সে বিষয়ে রসুলে-খোদা উম্মতদের জন্য এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

একদা কোনও বেদুঈন হযরতের পথ আগলে তলোয়ার উচিয়ে হাঁক ছেড়ে বল্লো, - "মুহম্মদ, বলো, কে তোমায় রক্ষা করবে?"

এখানে কেউ তাঁর সহায় নাই, ''মাকড়সার জাল' বোনারও সুযোগ নেই। নিমেষেই শত্রুর তলোয়ারে শির খন্ডিত হয়ে পড়বে। একটি কথাই শুধু এখন তাঁর এই সমস্যার সমাধান করতে পারে ঃ এখন তাঁর হত্যাকারীই তাঁর প্রাণরক্ষাকারী। সে ছাড়া আর কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। এই কঠিন সময় তাঁর ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেল। খোদার রসুল দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "আল্লাহ্ রক্ষা করবেন।" শত্রুর তরবারী হস্তচ্যুত হয়ে পড়ল।

ওহুদের যুদ্ধ। সাময়িকভাবে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছে। সাহাবাগণ ছত্রভংগ হয়ে পড়েছেন। রসুলুল্লাহ্ আহত । তাঁর পবিত্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত। সম্মুখের চারিটি দাঁত বিনষ্ট। খোদার রসুল মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর তিনি চেতনা ফিরে পেলেন।

শত্রুরা বিজয়-উল্লাসে মাতোয়ারা। দম্ভোক্তি ক'রে তারা প্রধান প্রধান সাহাবা ও রসলুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তাঁদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। সাহাবাগণ তার

www.pathagar.com

জবাব দিতে উদ্যত হলেন। রসুলুল্লাহ্ তাঁদের বারণ করলেন। এদিকে শত্রুরা তাদের দেবতা হুবালের জয়ধ্বনি করে বলে উঠলো,-হুবালের নিকট মুহম্মদের খোদার পরাজয় ঘটেছে"। এবার রসুলুল্লাহ্ সবাইকে তাগিদ দিয়ে বললেন, –"এখন তোমরা বসে আছ কেন?" সাথে সাথে মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুল্লেন। আল্লাহ্র অপমান তিনি কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ইসলামের আগমন। তাঁর জয়দ্বনি করাই মুমিনদের জিন্দেগীর পরম ও চরম লক্ষ্য। খোদার রসুল যুদ্ধক্ষেত্রের চরম বিপর্যযের সম্মুখীন হয়েও আমাদের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে রসুলে করীম (সাঃ) যে নামাজ, আল্লাহ্র জিকির ও ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন, আল্লাহ্র নামে সব কাজ আরম্ভ করতেন, কাজ শেষ করে আল্লাহ্রই শুকর গুজারী করতেন, এসব বিষয় এখানে না উল্লেখ করলেও চলে।

খোদা-প্রেমে যেমন রসুলুল্লাহ্ ছিলেন অতুলনীয় ও পরিপূর্ণ, তেমনি ছিলেন, মানব-প্রেমে। বস্তুতঃ তিনি যদি খোদা-প্রেমে বিভোর হয়ে বাস্তব-জগৎ থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন, তবে বোধ হয় জীবনে তাঁকে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হতো না। বস্তুতঃ সর্বকালে সর্বযুগে মানুষকে 'সুন্দর' করে তোলার জন্য, তার বাগান সুষমায় ভরে দেওয়ার জন্য রসুলে-করীমের বিরামহীন চেষ্টার দরুনই তাঁকে পদে পদে দুঃখ-দুর্ভোগ বরণ করতে হয়েছিল।

মানুষ তার মঙ্গলকাংখীর প্রতি অত্যাচার অবিচার করে ইতিহাসকে যেভাবে কলংকিত করেছে, বোধ হয়, সে শত্রুর উপরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তেমন উদাহরণ সৃষ্টি করেনি। হযরত ছিলেন মানুষের সব চেয়ে বড় কল্যাণকামী, আর তাঁর উপরেই হয়েছে ইতিহাসের সব চেয়ে বেশী জুলুম।

এক বৃদ্ধা হযরতের মতামত পছন্দ করতো না এবং সেই আক্রোশে তাঁর যাবার পথে সে প্রতিদিন কাঁটা ফেলে রাখতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটলো। রসুলে-করীম লক্ষ্য করলেন, সেই বুড়ীত এখন পথে কাঁটা ফেলে রাখছেনা। তিনি ভাবলেন, বৃদ্ধার নিশ্চয়ই অসুখ-বিসুখ করেছে। যদি তাই হয়, আহা তবে তো এই বয়সে তার সেবা শুশ্রূষার দরকার! খোদার হাবিব উদ্বিগ্ন চিত্তে বৃদ্ধার বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। তিনি তার খোঁজ-খবর নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মা, তোমার কোন সেবায় আমি লাগতে পারি?"

হযরত ওমরের এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় রসুলুল্লাহ্ তাঁকে বারণ করছেন, "মেরো না ওকে মেরো না! মসজিদ ধুয়ে দিলেই সাফ হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

মসজিদে প্রস্রাব করার দরুন যদি বেদুঈনকে প্রহার করো, তাতে তার স্বাস্থ্যের এমন ক্ষতি হতে পারে যা আর কখনও সারবে না"

সেই বেদুঈন লোকটি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাব করে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। হযরত ওমর তাঁকে শাস্তিদান করে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খোদার হাবিব অন্যভাবে শিক্ষা দিলেন। মসজিদের চেয়ে তার নিকট ছিল মানুষ বড়।

ওহুদ-রণক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ্ কাতরভাবে হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করেছেন, "এ্যায় পরওয়ারদিগার! যারা তাদের মঙ্গলাকাঙক্ষী নবীকে এমন ভাবে আঘাত হানতে পারে তারা কি করে জগতে উন্নতি করবে? হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা করো। তারা অজ্ঞ-তারা ভ্রান্ত।"

পূর্বে উল্লেখ করেছি, ওহুদের যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তিনি তাঁর জাতির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠিয়ে উপরোক্ত দোয়া করেন। এতে বোঝা যায় , নবী করীমের মানবতাবোধ কী গভীর ও অতুলনীয় ছিল। ক্ষণিক পূর্বেই যাদের অন্যায় আঘাতে তিনি জীবন হারাতে যাচ্ছিলেন, তাদের জন্যই আল্লাহ্‌র দরবারে এমন আকুতি! তাঁর নিজের কথা, সাহাবাদের কথা, শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার কথা তিনি ভাবছেন না; তিনি তখন ভাবছেন ঃ আল্লার রসুলের উপর এরূপ অকথ্য অত্যাচার করায়, খোদার গজব যেন ওদের উপর পতিত না হয়।

মক্কা বিজয়ের কথা স্মরণ করুন। মক্কা অধিকার করে, মক্কাবাসীদের এবং কোরেশদের লক্ষ্য করে রসুলুল্লাহ্ বল্লেন, "কোরেশগণ, আজ তোমরা কী ভাবছ?"

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা উত্তর দেয়, "ভাবছি আমাদের অদৃষ্টের কথা। ভাবছি, তোমার উপর দীর্ঘকাল যে অত্যাচার করেছি, আজ তার কী প্রতিফল দেবে, সেই কথা।"

খোদার প্রিয় নবী সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারী-তিনি প্রতিশোধের কথা ভাবতেই পারেন না। বিজয়ের দিনে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। কারো বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন অভিমান। আদর্শহারা দিশেহারা মানুষের জন্য হৃদয়ে তাঁর ঢেউ উঠেছে। দ্বীনের নবী হাসি মুখে বল্লেন, "আজ তোমাদের উপর আমার কোনই অভিযোগ নেই। অপরাধ তোমাদের মাফ করা হলো। তোমরা সব মুক্ত স্বাধীন।"

দুনিয়াতে আবার ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আমাদের জন্য কোন সোজা পথ নেই। ফাঁকি দিয়ে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় না, একথা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। রসুলুল্লাহ্‌র আখলাক ছিল ইসলামী আদর্শের প্রাণ স্বরূপ। আর এই প্রাণকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, তাঁর জীবন-চরিত থেকে নতুন ক'রে খোদা-প্রেমও মানব-প্রেমের সবক নিতে হবে।

[মাসিক জাহানে নও এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

রাষ্ট্র-নায়ক মোহাম্মদ

চৌধুরী শামসুর রহমান

'আনা বাশারুম্ মিস্‌লুকুম'—আমি তোমাদেরি মতো মানুষ।

মহানবী হজরত মোহাম্মদের কণ্ঠে ধ্বনিত এই বাণীর মাধ্যমে "মানব জাতির" যে গৌরব-গরিমা ঘোষণা করা হয়েছে, বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। মাটির মানুষই যে আল্লাহর নবী বা সংবাদবাহক হতে পারেন, তাঁর আগে আর কোন ভাববাদী এমন পরিষ্কার ভাষায় এ-কথা বলতে পারেননি। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে মানুষের ধারনা ছিল—ধর্ম-প্রচারকগণ স্রষ্টার অংশীদার কিংবা অবতাররূপী অতিমানব হিসেবেই সত্যের বাণী প্রচার করার ব্রত নিয়ে মানব-সমাজে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। এই প্রাচীন ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—ধ্বনি উচ্চারণ করে কুরআন-মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

"যদি পৃথিবীতে ফেরেশ্‌তাগণ বসবাস করিত, তাহা হইলে আমি একজন ফেরেশতাকেই বাণী বাহকরূপে বেহেশ্‌ত হইতে প্রেরণ করিতাম। হে মোহাম্মদ, আমি তোমাকে কেবলমাত্র শুভ-সমাচারের বাহক ও সতর্ককারী হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি।"

আল্লাহর এই বাণীতে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবী মানব-জাতির আবাস ভূমি বলেই আল্লাহ্‌র বাণীর বাহক ও সতর্ককারী হিসাবে কোন অতি মানব ফেরেশতাকে না পাঠিয়ে মানুষ-মোহাম্মদকেই আল্লাহ তা'লা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন তাঁর নবী হিসেবে। প্রকৃত পক্ষে হজরত মোহাম্মদের এই মানবীয় গুণই তাঁকে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দান করেছে যে, অপর কোন ধর্ম-প্রবর্তকের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই মানবীয় গুণাবলী হজরত মোহাম্মদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে যে, নবী মোহাম্মদ একজন মহা-মানবরূপেই আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছেন। এই মহা-মানবের মধ্যে আমরা কিশোর আল্-আমীনকে দেখেছি, যৌবনে ও পরিণত বয়সে স্ত্রী-কন্যা পরিবৃত গৃহী মোহাম্মদকে দেখেছি, বন্ধু-বৎসল ও পরোপকারী নাগরিককে দেখেছি এবং শেষ ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রণ-নিপুণ সেনা-নায়ক ও পরমবিজ্ঞ এক রাজনীতিজ্ঞকেও প্রত্যক্ষ করেছি।

www.pathagar.com

এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে, অর্থাৎ রাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্র-নায়ক হিসেবে মহানবী মোহাম্মদ যে আর্দশ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার উপযুক্ত মূল্যায়ন বর্তমান সংঘাত-বিক্ষুব্ধ বিশ্বে নিঃসন্দেহে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হতে পারে।

স্বীয় জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর থেকেই হজরত মোহাম্মদের কার্যকরী রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। কারণ, ইসলামী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদও কায়েম হয় প্রকৃতপক্ষে তখনি। অবশ্য এর আগেও নির্যাতিত একদল শিষ্যকে শরণার্থী হিসেবে আবিসিনিয়ার প্রেরণ করে হজরত তাঁর অসাধারণ রাজনীতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। মদিনায় যাওয়ার পর প্রথমেই তিনি এক অতি জটিল ও অভিনব সমস্যার সম্মুখীন হলেন। সে সময়ে নব-দীক্ষিত মুসলামানগণ ছাড়াও কতিপয় শক্তিশালী খৃষ্টান ও ইহুদী গোষ্ঠী মদিনায় বাস করত। হজরত দেখলেন যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মদিনা নগরীকে রক্ষা করতে হলে শহরের অমুসলমান নাগরিকদেরও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতা যাতে অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে, সর্বপ্রথমেই তিনি সেই ব্যবস্থায়ই অগ্রসর হলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি এক ফর্মান জারী করে খৃষ্টান ও ইহুদী নাগরিকদের অবাধ ধর্মাচারণের অধিকার ও পূর্ন নাগরিক অধিকারও স্বীকার করে নিলেন। এই ঐতিহাসিক ফর্মানে মদিনার অধিবাসী মুসলমান ও ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় ঃ

"কোরায়শ্‌ বংশদ্ভূত এবং ইয়াস্রেবের (মদিনার) অধিবাসী সকল বিশ্বাসী মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রাদয়ভুক্ত যাহারা ইহাদের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, ইহারা সকলে সম্মিলিতভাবে একটি জাতি গঠন করিবে। শান্তি ও যুদ্ধাবস্থা সকল মুসলমানের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য হইবে; তাদের মধ্যে কেহই স্বধর্মাবলম্বীদের শত্রু-পক্ষের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সন্ধিস্থাপন বা যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে পারিবে না। যে-সব ইহুদী আমাদের মিল্লাতের সহিত সহযোগী হিসাবে যোগদান করিয়াছে, তাহাদিগকে অবমাননা ও নির্যাতন হইতে রক্ষা করা হইবে। আমাদের সাহায্য-সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবে। ইহুদীগণ ইয়াস্রেবের অধিবাসী অন্য সকল লোকের সহিত মিলিত হইয়া একটি সুসংঘবদ্ধ জাতি গঠন করিবে এবং তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারিবে। অপরাধী ব্যক্তি যে-সমাজেরই হউক না কেন, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাজা দেওয়া হইবে। সকল বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইহুদীরা ইয়াস্রেববাসী মুসলমানদের সহিত যোগদান করিবে; ইহুদী ও মুসলমানদের মিত্রগণ উভয় সম্প্রদায় কর্তৃকই পৃষ্ঠপোষকরূপে বিবেচিত হইবে। অপরাধ , অবিচার কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি

www.pathagar.com

নিকটতম আত্মীয় হইলেও খাঁটি মুসলমানগণ তাহাদিগকে ঘৃণার সহিত বর্জন করিয়া চলিবে।"

এই ফর্মানের সঙ্গেই খৃষ্টান ও অগ্নি-উপাসকদের উদ্দেশ্যেও হজরত স্বতন্ত্রভাবে দু'খানা ফর্মান জারী করেছিলেন। খৃষ্টানদের ফর্মানে বলা হয় ঃ

" নাজ্রান খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই ফর্মানে তাহাদের জীবন, তাহাদের ধর্ম ও তাহাদের সম্পত্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ নিরাপত্তা ও তাঁহার রসুলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইতেছে। তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে কোন ও প্রকারের হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তাহাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হইবে না এবং কোন মূর্তি বা ক্রুশ-চিহ্নের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা হইবে না। তাহারা কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগের মত রক্তের বিনিময়ে রক্তপাতের অধিকার তাহাদের থাকিবে না।"

জরথস্ত্র-প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী অগ্নি-উপাসকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হজরতের ফর্মান অগ্নি মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিকট এক পত্রের আকারে প্রেরিত হয়েছিল। এই ফর্মানে বলা হয় ঃ

" এই পত্র আল্লাহ্র রসূল মোহাম্মদ কর্তৃক ফূরাখ্ ইব্নে শাক্সেন্ ও তাহার পরিবারবর্গ এবং তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যাহারা মুসলমান হইবে অথবা যাহারা বর্তমান ধর্মেই বিশ্বাসী থাকিবে, তাহাদের সকলের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইতেছে। এই পত্র দ্বারা তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির (এই সম্পত্তি সমতলভূমি বা পাহাড়ে –যেখানেই হউক না কেন) ব্যাপারে আল্লাহ্র রক্ষণ-ব্যবস্থা ঘোষণা করা হইতেছে। তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায়াচরণ কিংবা নির্যাতন করা হইবে না এবং এই পত্র যাহাদের সম্মুখেপাঠ করা হইবে, তাহারা অবশ্যই ইহাদের নিরাপত্তা বিধান করিতে বাধ্য থাকিবে। অগ্নি-মন্দিরসমূহ ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি তাহারা অবাধে ভোগদখল করিতে থাকিবে। তাহাদের ধর্মানুযায়ী ও সামাজিক ব্যবস্থামত যে-সব দ্রব্য পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, সেই সব দ্রব্যের ব্যবহারে কেহই তাহাদিগকে কোনরূপে বাধা দিতে পারিবে না।"

মদিনা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রচারিত উপরোক্ত তিনখানা ফর্মান থেকে মহানবী মোহাম্মদের অসাধারণ রাজনীতি-জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চারদিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত একটা নূতন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও রক্ষণ-ব্যবস্থার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সমবায়ে একটা সুসংবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা যে একান্ত জরুরী, দূরদর্শী

www.pathagar.com

হজরত মোহাম্মদ বেশ ভালোভাবেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই জন্যই রাষ্ট্র-গঠনের সূচনায় বিধর্মী সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলি ধর্মচারণের অবাধ অধিকার স্বীকার করে নিয়ে এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। পরমত-সহিষ্ণুতা ও উদারতার আদর্শে উজ্জ্বল এই নীতির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের যে শক্তিশালী বুনিয়াদ কায়েম করা হয়, মহানবীর জীবনকালেই শক্তিমত্তায় ও বিস্তৃতিতে তা' সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রবল-পরাক্রান্ত রোমক-সম্রাজ্য ও দিগ্বিজয়ী পারস্য-সম্রাটের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ মহাদেশের এক বৃহদাংশে পরিব্যাপ্ত হয়ে এই ইসলামী সাম্রাজ্য এক অপ্রতিরোধ্য বিশ্ব-শক্তি রূপেই জেগে ওঠে। নবী-করীমের প্রতিষ্ঠিত আদর্শই রাষ্ট্র-শক্তিরূপে ইসলামের এই বিস্ময়ক সাফল্যের মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে, সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্র-নায়ককে সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই সকল সময় কাজ করতে হয়। শান্তির সময়ে এবং যুদ্ধের দিনে তাঁর কাজের ধারা স্বভাবতঃই ভিন্নরূপ ধারণ করে, যদিও মৌলিক নীতির ব্যাপারে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ কখনও নীতিভ্রষ্ট হতে পারেন না। হজরত মোহাম্মদের জীবনে আমরা এরূপ দূরদর্শী রাষ্ট্র-নীতিরই পরিচয় পাই। দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে আবু- জেহলের নেতৃত্বে মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের এক সুসজ্জিত বাহিনী যখন মদিনা আক্রমণ করে ইসলামী রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে এগিয়ে এলো, তখন বদর-প্রান্তরে শত্রু-সেনার সম্মুখীন হতে গিয়ে রাষ্ট্র-নায়ক হজরত মোহাম্মদকে বহিঃশত্রুর সঙ্গে সঙ্গে একদল আভ্যন্তরীণ শত্রুরও মোকবিলা করতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে হজরত বুঝতে পারলেন যে, মদিনাবাসী ইহুদী ও পৌত্তলিকদের কাছ থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া তো দূরের কথা, সঙ্কট-মুহূর্তে বিরোধিতা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। স্বভাবতঃই শহর-রক্ষার কথাও তিনি না ভেবে পারলেন না এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান-দিগকে দুই দলে বিভক্ত করে একদলকে শহর রক্ষার জন্য মদিনায় রেখে অপর দলের মাত্র ৩১৩ জন খাঁটি ঈমানদার মুসলমানকে নিয়ে তিনি শত্রুসেনার সম্মুখীন হওয়ার জন্যে বদর-প্রান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বদরের যুদ্ধে এই মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনীই বিরাট শক্তিশালী শত্রু-সেনা দলের সহিত সংগ্রামে কিভাবে মহা-বিজয়ের অধিকারী হয়, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন। রাসুলুল্লাহ্ এই সময়ে ঘরশত্রু বিভীষণদের হাত থেকে মদিনা-নগরীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে সতর্কতামূলক

www.pathagar.com

ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তার ভেতর দিয়ে তাঁর অসাধারণ রাজনীতি-জ্ঞান ও রাষ্ট-নায়কোচিৎ দূরদৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে ওহোদের যুদ্ধে এবং মদিনা নগরীর পার্শ্বদেশে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধেও মহানবীর এহেন রাষ্ট্র-নায়ককোচিৎ দূরদৃষ্টি এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে রণকূশলতারও প্রমান পাওয়া যায়। অনেক সময় বাধ্য হয়েই রাষ্ট্র-নায়ককে রণকূশলী সমর-নায়কের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয় : ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে হজরতকে রাষ্ট্র-নায়কের দায়িত্ব ছাড়াও এই রূপে সমর-নায়কের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই মহানবী তাঁর এই দ্বৈত-কর্তব্য সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করেছিলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি রাষ্ট্র-নায়ক মোহাম্মদের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অন্যতম দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর জন্মভূমি মক্কার হজ্জব্রত পালন করিতে গিয়ে তত্রত্য পৌত্তলিক-সমাজের বিরুদ্ধতার ফলে মক্কায় প্রবেশ না করে শেষ পর্যন্ত হজরতেকে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বিরুদ্ধবাদীর সহিত এক সন্ধিপত্র সম্পাদন করে মদিনায় ফিরে যেতে হলো। এই সন্ধিপত্রে পৌত্তলিকদের অনেক অন্যায় আবদারই রসুলুল্লাহ্কে মেনি নিতে হলে সন্ধির শর্ত অনুসারেই পরের বৎসর বিনা-বাধায় তিনি মক্কায় গিয়ে হজ্ব-সম্পাদনের সুযোগ পেলেন এবং পরিণামে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মক্কা -বিজয় সম্ভবপর হলো । কুরআনে হোদায়বিয়ার এই সন্ধিকে 'ফতহুম মুবীন' বা মহা-বিজয় বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতই এই সন্ধির মাধ্যমে হজরতের নেতৃত্বের যে অসাধারণত্ব তাঁর শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারি ফলে মক্কাবাসী বহু লোক অন্তরে অন্তরে তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়ল এবং তারি ফলে এই সন্ধির দ্বারা ভাবি মহা-বিজয়ের পথ প্রস্তুত হলো, বলা যেতে পারে। হজরতের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এভাবেই বহন করে নিয়ে এলো চরম সাফল্যের সওগাত।

খয়বর অঞ্চলের বিভিন্ন ইহুদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের সবগুলি দুর্গ দখল করে নিয়েও হজরত যেভাবে বিশ্বাস ঘাতক ইহুদীকে ক্ষমা করে দিলেন, তাতেও অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, তাঁর এই উদারতা ও মহত্ত্বের কথা দিকে দিকে যখন প্রচারিত হয়ে পড়ল, স্বভাবতঃই তখন বিভিন্ন স্থানের বহু নূতন নূতন সম্প্রদায় এসে ইসলামী পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল এবং এভাবেই রাজনৈতিক দিক দিয়েও ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ হলো।

এভাবেই মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি সংহত করে নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বহির্বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তৎকালীন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নামে ইসলামের আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করে হজরত

www.pathagar.com

তাদের ইসলামে আত্ম-সমর্পণের আহ্বান জানালেন। এই রাষ্ট্র-প্রধানদের মধ্যে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হেরাক্লিয়াস, পারস্য-সম্রাট খসরু, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাসী এবং মিসরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিস ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই লিপি প্রেরণ করে হজরত 'ইসলামের দাওয়াত' জ্ঞাপন করলেন। মূলতঃ, এসব দাওয়াত-পত্র আহ্বান হিসেবে প্রেরিত হলেও, নবী মোহাম্মদ (দঃ) রাষ্ট্র-নায়ক হিসেবে এই সব পত্রের মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তার কথাও যে পরোক্ষভাবে ঘোষণা করেছিলেন তা-ও কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কার্যতও দেখা গেছে, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাসী ও মিসরাধিপতি মুকাউকিস হজরতকে শুধু নবীরূপেই নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এই ভাবেই তাঁর কাছে উপঢৌকনাদিও প্রেরণ করেছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি বহুলাংশে সুসংহত হওয়ার পর বিদ্রোহ-দমনার্থে কিংবা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্র-নায়ক হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে যে সব সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হয়, সে সব অভিযানের নেতৃত্ব-নির্বাচনে তাঁকে সব দিক বিবেচনা করে বিশেষ ভেবে চিন্তেই কাজ করতে হয়েছিল। দেখা যায়, প্রতি ক্ষেত্রেই যোগ্যতম ব্যক্তির হস্তেই নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনি অর্পন করেছিলেন এবং তাঁর এসব নির্বাচন শুধু সমর-নিপুণতার মাপকাঠিতেই সব সময়ে হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিষয়ও তিনি বিবেচনা করতে দ্বিধা করেননি। বিভিন্ন স্থানে সময় সময় তাঁকে যে সব প্রতিনিধি দল পাঠাতে হয়েছে, কিংবা বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে-সব প্রতিনিধিদলকে তিনি বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশ ও রাজনৈতিক গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে বিশেষ দূরদৃষ্টির সঙ্গে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে এবং তাঁর অনুসৃত নীতির পরিণাম-ফল সকল ক্ষেত্রেই আশ্চর্য জনকভাবে সুফলপ্রসূ হয়েছে, দেখা যায়।

বস্তুতঃ,রাষ্ট্র-নায়ক হিসেবে মানব মোহাম্মদ (দঃ) যে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, উদার ও সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা শত্রুর হৃদয়ে জয়ের যে নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করে গেছেন এবং সর্বোপরি বিধর্মী নাগরিকদের সহিত আচার-আচরণে যে সমতা ও সমঝোতার আদর্শ তিনি প্রতিষ্টা করে গেছেন, সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দশ বছর পরেও আজিকার বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার দিনে এরূপ মানবিক নীতির ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

[মাসিক জাহানে নও এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মানব কল্যাণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অবদান

আ. ন.ম. আবদুল কাইয়ুম খন্দকার

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর নিকট রহমত ও করুণা স্বরূপ পাঠিয়েছি। –আল-কোরআন।

সর্বদিক দিয়ে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মহানবী (সঃ) এর অবদান শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। সভ্যতা ও মানবতা তাঁরই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি জগতবাসীকে যা দিয়ে গিয়েছেন, তার মূল্যায়নে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মাপ কাঠিতেও সর্বোত্তম বলে স্বীকৃত। তাই আমেরিকার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ঐতিহাসিক মাইকেল হার্ট মহানবী (সঃ) কে জগতের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি একাধোরে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, একটি জাতি এবং একটি সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার গৌরব অর্জনে একমাত্র অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

মানব কল্যাণে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অবদান শীর্ষক আলোচনা এত ব্যাপক যা একটি প্রবন্ধে উপস্থাপন করা অসম্ভব। সর্বোপরি মহাসাগর তুল্য মহানবী (সাঃ) এর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তুলে ধরা আমার সামান্য জ্ঞানের আলোকে আদৌ সম্ভব নয়। শুরুতে এ দৈন্যতা স্বীকার করে কীর্তিমান মহা পুরুষের মানব কল্যাণে অসংখ্য অবদানের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হল। তৎকালীন বিশ্ব মানবতা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আকিদা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, বলতে গেলে তদানিন্তন বিশ্বের গোটা মানব সমাজ মহা ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে তদানিন্তন আরবের যে সব স্থানে প্রতিমা পূজা শিকড় গেড়েছিল, মহানবী (সঃ)-এর প্রচেষ্টার বদৌলতে তা চিরতবে বিদূরিত হয়েছিল। তাঁরই বদৌলতে আজ বিশ্বের প্রায় এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠি তাওহীদের পতাকাবাহী।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ বিশ্ব সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) এর অবদান এক অনস্বীকার্য। তিনি মুসলিম সমাজে ইসলামের সূচনাতেই এ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি প্রতিষ্ঠা করে কলহরত আরব সমাজে এক শান্তির সমীরণ প্রবাহিত করেছিলেন। তার প্রচারিত তৌহিদের আমোঘ বাণী জাতিগত ও বংশগত বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে এক সমুধুর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বেদুঈন মরুবাসী আরবদেরকে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সুদূর আফ্রিকার নিগ্রো অধিবাসীরাও ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ করে এক সমপর্যায়ের সামাজিক স্থান লাভের অধিকারী হলে এক কালের হাবসী কৃতদাস বেলাল ইসলাম গ্রহণ করে একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ঃ মহানবী (সঃ) কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেননি, তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের রূপরেখাও অঙ্কিত করে গিয়েছেন। বিশ্বের সবজাতি এবং মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্ট এবং একই আদমের সন্তান বলে সমগ্র মানব জাতির প্রতি তিনি ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নিকট সবাই ছিল আল্লাহর পরিবারভূক্ত আপনজন। তাই তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবা করে গিয়েছেন। তাই তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবা করে গিয়েছেন এবং তার পরিচালিত রাষ্ট্রে সবাইর নাগরিক এবং ধর্মীয় অধিকার অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

শিক্ষা ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রেও মহানবী (সঃ) এর অবদান ছিল অপরিসীম। মহানবী (সঃ) জ্ঞান সাধনার উপর এতই জোর দিয়েছিলেন যে, তিনি বলেছেন,– " বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয (অবশ্য কর্তব্য)"। "বিদ্যানের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও বেশী পবিত্র"। "তোমরা সুদূর চীন দেশে যেয়েও জ্ঞানান্বেষণ করো"। "দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো"। যে জ্ঞানর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে সে আল্লাহর পথে বিচরণ করে, যে জ্ঞানান্বেষণে বের হয় আল্লাহ তাঁকে বেহেস্তের রাস্তা দেখিয়ে দেন"। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় এক ঘন্টা মনোনিবেশ করা এক হাজার শহীদের দাফন ক্রিয়ায় হাযির থাকার চেয়ে বা হাজার রাত্রি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। অন্য জাতির নিকট হেকমতের কথা কিছু পাওয়া গেলে তা মুসলমানগণ তাদের হারান সম্পদ হিসেবে গ্রহন করবে যেখানেই তা পাওয়া যাবে তারা তা গ্রহণ করবে" –ইত্যাদি।

শিক্ষার ব্যাপারে মহানবী (সঃ) কেবল উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি স্বয়ং শিক্ষা বিস্তার করে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। সাফা পর্বতের নিকটই 'দারুল আরকাম' নামে তিনি সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তিনি এতে নিজেই শিক্ষা দিতেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবীর নির্দেশ এবং শিক্ষার ফলেই এক কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখে জগত বাসীকে কৃতার্থ করেছিলেন। বিশেষ করে মধ্যযুগীয় মেঘাচ্ছন্ন ইউরোপীয় গগনে ওরাই জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে বিশ্ববাসীকে পরম কৃতজ্ঞতার পার্শ্বে আবদ্ধ করেছিলেন।

www.pathagar.com

নারী মুক্তি ঃ মহানবী (সঃ) বিশ্ব নারীমুক্তির অগ্রদূত ছিলেন, যে নারী জাতি যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত ছিল, সে নারী জাতিকে এক বিরল সম্মানের আসনে সমাসীন করে গেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন সভ্যতা গ্রীসেও নারীর তেমন কোন কদর ছিলনা। এমনকি সুসভ্য এথিনিয়ানরা নারীকে অত্যাবশ্যকীয় অভিশাপ মনে করত এবং কেবল সন্তান ধারণ করার যন্ত্র বিশেষ বলে মনে করত। প্রাচীন এশিয়ায়, ব্যালিনীয়, মিশরীয় ও প্রাচীন ভারতেও নারীর স্থান অতি নিম্ন স্তরে ছিল। তদানিন্তন আরব সমাজেও পিতা কর্তৃক কণ্যা সন্তান জীবন্ত কবরস্থ করার প্রথা সর্বজন বিদিত । মহানবী (সাঃ)-এর করুণা বিগলিত প্রচেষ্টায় নারী জাতি এক সম্মানীত জাতিতে পরিণত হয়। তিনি ঘোষণা করলেন – "তাদের উপরে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে তাদের পুরুষের উপর অধিকার রয়েছে"। তিনি আরও বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"। অনুরূপভাবে " মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত" এটা তিনিই ঘোষণা করেন। স্বামী এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিবাহে দেন মোহর ধার্য্য করে তাদের মর্যাদাকে গুরুত্ববহ করে তোলেন। এমনিভাবে তিনি আদর্শ স্বামী, পিতা ও অবিভাবকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সুন্দর ও সুষ্ঠ পারিবারিক কাঠামো গড়ে তোলেন।

বিচার ব্যবস্থা ঃ ইনসাফ ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা রাসুল (সঃ) কায়েম করেন। যা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়। তিনি বলেছেন, আমার কন্যা হযরত ফাতেমাও (রাঃ) যদি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে অবশ্যই তার হাত কাটা যাবে। তাঁর অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদার চার খলিফা এমন বিচার ব্যবস্থা স্থাপন করেন যা সমাজকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। হযরত ওমর একবার নিজ হাতে পুত্র আবু সামাকে বেত্রাঘাত করে শাস্তি প্রদান করেন। যা ছিল স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়করণমুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক প্রশাসনের উজ্জ্বল নমুনা।

অর্থনৈতিক মুক্তি ঃ সুদবিহীন ও যাকাতভিত্তিক সমাজ কায়েমে রাসুলে মাকবুল (সঃ) সফল ছিলেন। সম্পদের সুষম বন্টন ও ধনী-গরীবের মাঝে বৈষম্য দূরীকরণে যা যা প্রয়োজন ছিল তা তিনিই করেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তির নিরুৎসাহীকরণ ঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সহমর্মীতা প্রদর্শন করতেন। গায়ে শক্তি আছে এমন লোককে তিনি ভিক্ষা করতে নিষেধ করতেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি খেটে খাওয়ার জন্য দিক নির্দের্শনাও প্রদান করেছেন।

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ ঃ আজকের দুনিয়ায় মানবতা মানবতা বলে চিৎকার করা হয়। সেখানে রুচির, ধর্মের ও ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটি প্রায়শই অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। অথচ রাসুলুল্লাহ (সঃ) বিশ্বনবী হিসেবে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সাদা-কালো ইত্যাদির বৈষম্য দূর করে যে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা সত্যিকারের মানবতাকে দুনিয়ার বুকে বুলন্দ করে।

এন, জি, ও তৎপরতা ঃ অধুনা বেসরকারী সংস্থার নাম করে বেশ কিছু এন, জি, ও গরীব দুঃখীকে সহযোগিতা করা, দারিদ্রতা দূরীকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে তৎপরতা দেখিয়ে চলেছে। মূলতঃ রাসুলে, আদর্শ অনুসরণ করে বিশ্বের অগনিত ধনাঢ্য মুসলমানরা দেশে দেশে নির্যাতিত, নিপীড়িত মুসলমানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করত, তাহলে বিশ্ব মুসলিমের চেহারা দুনিয়ার বুকে ভিন্ন ভাবে ফুটে উঠত।

উপসংহার ঃ আলোচনার সংক্ষিপ্ততাকে সামনে রেখে বলতে চাই যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) -এর মানবতাবাদী আদর্শের সামনে অন্য কোন আদর্শ মানবতার নাম দিয়ে চলতে পারে না। মুসলমানদের অনৈক্যতা, অনগ্রসরতা ও আন্তরিকতার অভাবে আজ ইসলাম ধর্মকে ও মহানবী (সঃ)-এর আদর্শকে আমরা দুনিয়ার বুকে যথাযথভাবে পেশ করতে পারছিনা। আজকে দেশে দেশে মুসলমানদের দূর্দিন ও বিপর্যয়ের মধ্যে রাসুলের মানবতাবাদী আদর্শকে নিয়ে যদি ঝাপিয়ে পড়া যায়, বিশ্ব জয়ের ইতিহাস হয়তো মুসলমানদের দ্বারা আবার লেখা হবে, এ অবস্থা একান্ত ভাবেই কামনা করা যায়। *[এ প্রবন্ধটি ১৪ই জুলাই ১৯৯৯ এর একটি সেমিনারে পাঠ করা হয়]*

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ) এর মহান আদর্শ ও আজকের প্রেক্ষাপট

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত

এই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ১লক্ষ ২৪ হাজার (মতান্তরে ২লক্ষ ২৪ হাজার) নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট জনপদে, যার যার কওমের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবী, সরওয়ারে কায়েনাৎ, সাইয়েদুল মোরছালীন, খাতিমুন্নাবিয়ীন, হযরত মুহাম্মদ সালুল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে, সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য, সকল মানুষ ও সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য এবং সর্বকালের জন্য।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "ওয়ামা আরছাল্‌নাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আ'লামীন (সুরা আম্বিয়া,আয়াত-১০৭), অর্থাৎ আপনাকে পাঠানো হয়েছে বিশ্ব জাহানের রহমত স্বরুপ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহে ওসয়াতুন হাসানা" (সুরা আহযাব, আয়াত-২১) অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। আর এই আদর্শ তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়ে। উপরোক্ত আয়াতগুলো পযালোচনা করলেই বুঝা যায় যে, আমাদের নবী-করীম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সমস্ত বিশ্বের রহমত এবং বিশ্ব-মানবতার সর্ব-শ্রেষ্ঠ পথ-পদর্শক। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন বলেই বিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে সৃষ্টি না করলে, অন্য কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

তিনি যে আল্লাহ তায়ালার কত বড় পিয়ারা বান্দা ছিলেন, তা তাঁকে প্রদত্ত "হাবীবুল্লাহ" নাম থেকেই বুঝা যায়। তিনি ছিলেন হাবীবুল্লাহ ওয়া রাসুলুল্লাহ। বিভিন্ন পয়গম্বরগনের নামে বিভিন্ন বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন-আদম সফিউল্লাহ, নূহ নবীউল্লাহ, ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, ইসমাইল জবীউল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহ, ঈসা রূহুল্লাহ। কিন্তু একমাত্র মুহাম্মদকেই (সাঃ) বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ, ওয়া হাবীবুল্লাহ এবং আমাদের কালেমাই হচ্ছে, " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদোর রাসুল্লাহ। "

নবী করীমের সুন্দরতম আদর্শ তুলে ধরতে হলে তাঁর শিশুকাল থেকেই এর প্রমান মিলে। গরীব দাইমা হালিমা কোন ধনাঢ্য লোকের শিশু -সন্তান না পেয়ে যখন বিধবা-মাতার এতিম পুত্র, শিশু মোহাম্মদকে (সাঃ) সানন্দে গ্রহন করলেন এবং প্রতিপালনের জন্য নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন, তখন সেই শিশু-পুত্রটি,যে বয়সে তাঁর কোন জ্ঞানই থাকার কথা নয়, তিনি তাঁর দুধ-মাতার একটি স্তন পান করে, অন্য

www.pathagar.com

স্তনটি তাঁর দুধ-ভগিনীর জন্যঁ দাইমা হালিমার স্তনে রেখে দিলেন। এরূপ দৃষ্ঠান্ত কি এই দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে? শুধু তাই নয়, তাতে এত দুগ্ধের সঞ্চার হল যে, এক স্তনের দুধই একটি শিশুর জন্য পর্যাপ্ত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে হালিমার বেড়া ছাগলগুলো এতটা মোটা -তাজা হয়ে গেল যে, তাঁদের স্তনেও বেশী পরিমান দুগ্ধের সঞ্চার হল, যা খেয়ে এবং বিক্রি করে হালিমার দারিদ্রতা মুছে গেল, আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এল। আল্লাহর কি অপার মহিমা!

এবার আমরা কিশোর ও যুবক মোহাম্মদের (সাঃ) চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই, যৌবনে সেই উম্মত্ত বয়সে তিনি নিজেকে কিভাবে সংযমী রেখেছেন এবং মানুষের কল্যানের জন্য তিনি কি কাজ করেছেন। তৎকালে আরবে 'ওকাজ মেলা' আরবীয়দের চিত্ত বিনোদনের জন্য একটি বিশেষ মেলা ছিল, যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, নারী-পুরুষ সবাই হৃদয় দিয়ে উপভোগ করত। এই মেলায় নাচ-গান থেকে শুরু করে, জুয়াখেলা, দাবা খেলা, মদ্যপান করা এবং আরো ইতর প্রকৃতির এমন কোন হীন কাজ ছিল না, যা যেখানে সংঘটিত হত না। কিশোর মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ঐ কিশোর বয়সেও এ সমস্ত হীনকাজে প্রলোভিত হন নাই এবং ঐ মেলায় যোগদান করেন নি।

যৌবনের প্রারম্ভে তারুন্যের উচ্ছলতায় তিনি তৎকালীন আরবের রীতি অনুসারে, মদ ও নারীর মোহে মোহিত হতে পারতেন, কিন্তু কোন দিনই তিনি তা করেন নি, বরং "হিলফুল ফুযুল" নামে একটি যুব সংঘ গঠন করে তাদ্বারা এতিম-অসহায় –দুঃস্থদের সাহায্য করার, জালেমদের জুলুম থেকে মজলুমদের রক্ষা করার, অন্যায় মিথ্যাচার বন্ধ করার এবং সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন।

আল-আমীন উপাধি ঃ ৪০ বৎসর নবুয়ত প্রাপ্তির পর, তিনি দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের কল্যাণে জন্য বহু কিছু করেছেন -তা সর্বলোকের জানা। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির আগেই যুব বয়সে তিনি যাদের নিকট থেকে আল-আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটা তাঁর সুন্দরতম চরিত্রের নিদর্শন। তৎকালীন আরবে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, ও অপরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই যেখানে তাঁদের প্রধান কর্ম ছিল, সেই অবস্থায় নিজেকে সমস্ত অন্যায়ের উর্ধ্বে রেখে, সর্ব-শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস ভাজন হওয়া, সহজ কথা নয়। মোনাফেকের লক্ষণ ৩টিঃ- মিথ্যা কলা বথা, ওয়াদা ভঙ্গঁ করা এবং আমানতের খেয়ানৎ করা।

যুবক মহাম্মদ (সাঃ) এ সমস্ত দোষেরই উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি কোন দিনই মিথ্যা কথা বলেন নি, ওয়াদা ভঙ্গঁ করেন নাই, এবং আমানতের খেয়ানৎ করেন নাই। যার

www.pathagar.com

জন্য সেই অবিশ্বাসের যুগেও সবাই তাঁকে বিশ্বাস করতো এবং তাঁকে আল-আমীন খেতাবে ভূষিত করেছিল। আর এই খেতাবের মর্যাদা তিনি এতটা নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করেছিলেন যে, কোরাইশদের অত্যাচারে মক্কায় টিকতে না পেরে, ৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন গোপনে মদীনায় হিজরত করেন, তখনও তাঁর নিকট গচ্ছিত জুলুম বাজদের টাকা-পয়সা, ধন সম্পদ, নিজে মেরে না দিয়ে, যার যার সম্পদ তাঁকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য হযরত আলীকে (রাঃ) তাঁর রুমে রেখে যান এবং হযরত আলী সমস্ত গচ্ছিত টাকা সবাইকে ফেরৎ দেন। চরম বিপদের দিনেও এরূপ মহান আদর্শ ক'জন দেখানে পারে?

নারীর মর্যাদা ঃ সেই সময় আরবীয় সমাজে নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না, নারীকে তখন দেখা হত শুধু ভোগেরই সামগ্রীর মত। জন্মের পর কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা হত। এহেন পরিস্থিতিতে, মাজলুম নারী সমাজকে উদার কল্পে নবীজী (সাঃ) ধর্মীয়ভাবে ঘোষণা দিলেন, ''যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানকে আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে প্রতিপালন করবে, পরকালে তার জন্য বেহেশ্‌ত নসীব হবে, অন্যথায় তাকে দোজেখে নিক্ষেপ করা হবে। এভাবে ঘোষনা দিয়ে তিনি প্রথমে কন্যা-সন্তানদেরকে কতলের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তৎপর ধর্মীয় ও সামাজিক বহুবিধ আইন প্রনয়ন করে সমাজে নারীকে উচ্চাসনে সমাসীন করেন। তিনি ঘোষনা দেন, " মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত। " তিনি আরো বুঝিয়ে দিলেন যে, "সন্তানের নিকট মায়ের স্থান, বাপেরও উর্ধ্বে" (হাদীস)। বাপের সম্পত্তিতে তিনি মেয়ের অংশ (ছেলের অর্ধেক) নির্ধারিত করে দিয়ে, আপদে-বিপদে মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, ছেলের চেয়ে মেয়েকে অংশ কম দিয়ে, মেয়েদেরকে ঠকানো হয়েছে। কিন্তু সেই নির্বোধেরা জানে না যে, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীকে $\frac{১}{৮}$ অংশের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যার মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা। তাঁরা বুঝবার চেষ্টা করে না যে, বাপের সম্পত্তিতে মেয়েকে যদি ছেলের সমান অংশ দেওয়া হত তবে দুই দিকের সম্পত্তি মিলে, ছেলের চাইতে বেশী সম্পদের মালিক হত। সেটা কি যুক্তি সঙ্গত হত?

নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, " হুন্না লেবাছুল্লাকুম ওয়া আন্‌তুম লেবাচুল্লাহুন্না" (সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৮৭) অর্থাৎ স্ত্রীরা তোমাদের ভুষণ , আর তোমরা তাঁদের (স্ত্রীদের) ভুষন। এছাড়া ইসলামে স্ত্রীদেরকে দাসী বলা হয় নাই, তাদেরকে বলা হয়েছে আঙ্গিনী ও সহ-ধর্মিনী। কাজেই সেই জাহেলিয়াতের যুগে, নারীকে পুরুষের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, তিনি যে মহান আর্দশের পরিচয়

www.pathagar.com

দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত অন্য কোন জাতি বা ধর্ম নারীকে সেই আসনে তুলে আনতে পারেনি।

এতিম ও দাস-দাসীদের প্রতি ব্যবহার ঃ এতিম ছেলে-মেয়েরা যাতে অন্যের নিকট অবহেলিত, অত্যাচারিত না হয় এবং তাদের সহায়-সম্পত্তি যে অন্যায় ভাবে ভোগ করে, সে যেন অগ্নিভক্ষণ করে। আর দাস-দাসীদের প্রতি তিনি সর্বদা সদয় ব্যবহার করেছেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহু তায়ালা আন্হা বলেছেন, আমি কখনো এমনটি দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত কারনে, কোন অন্যায় কারীকে বা দাস-দাসীকে শাস্তি দিয়েছেন। "যদিও তৎকালে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু তিনি এই প্রথাকে মোটেই পছন্দ কতেন না। তিনি নিজের ক্রীতদাস জায়েদকে বিনা পনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন উপদেশ ও ধর্মীয় আইনের ভিতর দিয়ে তাদেরকে আযাদ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। দাস-দাসীদের ব্যাপারে তিনি আদেশ দিয়ে গিয়েছেন, " তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তাই খেতে দাও, আর তোমরা যা পর, তাদেরকেও তাই পরতে দাও। "এরূপ উদার নীতি আর কোথাও খুজে পাওয়া যাবে কি?

গরীব দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি ঃ গরীব দুঃখীদের ক্ষুধার জ্বালা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন এবং সর্বোত ভাবে তা লাঘবের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের প্রতি মুক্ত হস্তে দান করার জন্য ধনীদেরকে আদেশ করেছেন এবং শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তাদের পারিশ্রামিক দিয়ে দিতে বলেছেন। তিনি হককুল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে হক্কুল ইবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন হক্কুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর হক্ক, যেমন–নামাজ, রোজা, ইত্যাদি-এবাদত আদায় করতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক্কও পুরাপুরি আদায় করতে হবে। হক্কুল্লাহর বরখেলাপ হলে, আল্লাহ করলে তাকে মাপ করতেও পারেন কিন্তু বান্দার হক্কের বরখেলাপ হলে, আল্লাহ তাকে কিছুতেই মাফ্ করেবেন না, ঐ বান্দার কাছ থেকেই তাকে মাফ্ চেয়ে নিতে হবে। হক্কুল ইবাদের কথা তিনি শুধু মুখেই বলে যাননি, ইসলামী আইন করে তিনি গরীবদের বাঁচার ব্যবস্থা করে গেছেন। তিনি গরীব প্রতিবেশীদের দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার বাসস্থানের উত্তরে দক্ষিনে, পুর্বে-পশ্চিমে ৪০ গজের ভিতরে কেউ না খেয়ে আছে কি না, তার খোঁজ খবর করে, তারপর নিজে খাও। ইসলামে যাকাতের উপর এতটা তাগিদ দেওয়া হযেছে যে, পবিত্র কুরআনে যেখানেই" আকিমুছ্ ছালা৷" রয়েছে, তার পাশেই রয়েছে "ওয়া আতুছ্ যাকাতা'। ধনীদের সম্পদ যাতে ধনীদের ঘরে আরো পুঞ্জীভুত না হয় এবং গরীবেরা যাতে না খেয়ে না মরে, সেইজন্যই যাকাতের উপর

www.pathagar.com

এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর যাকাতের সঙ্গেঁ ফেৎরার পয়সা এবং কোরবানীর গোশত ও চামড়া বিক্রির পয়সাও গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলা হয়েছে। কম্যুনিষ্টরা গরীবদের জন্য যত চিৎকারই করুক না কেন, ইসলামে গরীবদের জন্য যে সব বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, অন্য কোন ইজমই –তা করেনি।"

ভ্রাতৃত্ব ঃ আমাদের নবীজী (রাঃ) যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে গেছেন, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম-প্রচারক তা করতে পারেন নি। তিনি সারা মুসলিম জাহানকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করেছেন এবং পরিবারের সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে বলেছেন। তিনি মুসলিম জাহানকে একটি শরীরের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। শরীরের যে কোন অঙ্গে ব্যথা হলে, তা যেমন সারা শরীরে অনুভূত হয, যে কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদকেও তিনি সেই ভাবে অনুভব করতে বলেছেন।

আদর্শ বিচারক ঃ নবী করীম (রাঃ) কোন দিনই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। হিলফুল ফুযুল থেকে শুরু করে সারা জীবন তিনি ন্যায়ের পথে থেকেছেন এবং ন্যায় বিচার করেছেন। বিচারকের আসনে বসে তিনি আত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সব কিছু ভুলে যেতেন। চুরির অপরাধে এক মহিলার হাত কাটার প্রশ্নে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার স্নেহের পুত্তলী মা ফাতেমাও যদি এরূপ অপরাধ করে তবে তার হাতও কেটে দিতে আমি দ্বিধা করব না। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে , তিনি সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, একজন বিখ্যাত মুসলিমের বিরুদ্ধে একজন ইহুদির রুজুকৃত মামলায় । ন্যায় বিচারের খাতিরেই এই মামলার রায় তারপক্ষে পেয়ে তিনি নবীজী ও ইসলামের প্রতি এতটা বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন।

ক্ষমা ঃ ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। নবী করীম (সাঃ) অকাতরে মানুষকে ক্ষমা করে গেছেন। মানুষ যখনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে, অনুশোচনায় বিদগ্ধ হয়ে, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়, তবে সেইটাই হয় কৃতকর্মের সবচেয়ে বড় শাস্তি এবং ভবিষ্যতে সুপথে চলার সঠিক দিক নির্দেশনা। তাই কোন অপরাধী সত্যিকারে তওবা করে মাফ্‌ চাইলে নবীজী (সাঃ) তাকে মাফ করে দিতেন। এ ব্যপারে তিনি সর্বোত্তম আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা বাসীগণকে ক্ষমা করে দিয়ে। হুজুরে করীমের মক্কা বিজয়ের পর, কোরেশগণ যখন যার যার জীবন নিয়ে শঙ্কিত, আতংকগ্রস্থ, তখন তিনি আল্লাহর নামে ঘোষনা দিলেন" তোমরা সবাই মুক্ত" তাঁর এই উদার ঘোষনায় মক্কাবাসীগণ এতটা আপ্লুত হলেন যে, তাদের চোখ

www.pathagar.com

দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং দলে দ... লে তারা এসে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হলেন।

সাম্যঃ রাসুলুল্লাহর জীবনে সবচেয়ে বড় শ্লোগা...ন ছিল সাম্যের শ্লোগান। তৎকালে আরবে গোত্রে গোত্রে এতটা ব্যবধান ছিল যে, এ... নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি লেগেই থাকত। তাই নবীজির পলিসি ছিল, ...গাত্রে, গোত্রের এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে, তাদের মধ্যে সাম্যের বাণী প্রচার করা এ...ং তাদের সকলকে এক গোত্রে, এক আসনে সমাসীন করার জন্য তিনি ঘোষনা দিলে... "আমি সাম্যের গান গাই, মানুষে মানষে কোন ভেদাভেদ নাই।" এই ঘোষনা দিয়ে... তিনি ক্ষান্ত হলেন না, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তাঁর বানী কার্যকর ক... দেখিয়ে দিলেন যে, ইসলামে আশরাফ ও আতরাফ বলে কোন ভেদাভেদ নাই। ইস...মে সব মানুষ এবং ভাই ভাই। এটা প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নিজের ফুফাত বোন জয়নবকে ক্রীতদাস জায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং এক পর্যায়ে জায়েদকে মুতাযুদ্ধের সেনাপতি বানিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, কালো আর ধলো সবই সমান। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষনে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষনা দিলেন ঃ কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন আরবের উপর কোন কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সবাই আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে। শ্রেষ্ঠত্বের মাপ কাটি হচ্ছে ত্বাকওয়া।

আদর্শ সেনানায়ক ঃ ধর্মপ্রচারকগন সাধারণতঃ সেনা-নায়ক হন না। নবী করীম (সাঃ) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে এই নীতিই অবলম্বন করেছিলেন, এমনকি কোরেশদের অত্যাচারে টিক্‌তে না পেরে, ৬২২ খৃঃ তিনি নীরবে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে হিজরত করে, প্রথম হিজরীতেই তিনি মদীনার বিভিন্ন ধর্মীয় ও গোত্রীয় নেতাদেরকে একত্রিত করে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার জন্য "মদীনার সনদ" স্বাক্ষর করেছিলেন, যা ১২১৫ খৃঃ রাজা জনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত 'ম্যাগনা কার্টার' চাইতেও অনেক উন্নমানের চুক্তিপত্র ছিল। কিন্তু এতকিছু করেও যখন কোন ফল লাভ হল না, যখন দেখা গেল যে, মক্কার কোরেশগণ মদীনার ইহুদীদের সঙ্গেঁ গোপনে যোগাযোগ করে শত্রুতা আরো বাড়িয়ে তুলছে, তখন নবীজী যুদ্ধের নীতি গ্রহন করতে বাধ্য হলেন। কেননা তিনি দেখলেন যে শরীরে কোন জায়গায় ফোঁড়া হলে, সেটা কেটে ফেলাই শরীরকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়। আর আল্লাহর তরফ থেকে এই প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ন হলেন এবং একের পর এক বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে লাগলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর

www.pathagar.com

আদেশ ছিল, আগে আক্রমণ করবে না । . অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হলে, প্রতিরক্ষা হিসেবে তাকে আক্রমন করবে।

অসীম সাহসিকতার সঙ্গে আদর্শ সেনাপতি হিসাবে তিনি এত যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন যে, তার বর্ণনা দি ত গেলে একখান **নাতিদীর্ঘ পুস্তক** ঃ য়ে যাবে। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, তিনি নিজে ২৯টি গ **যওয়ায়** সেনাপতি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তার নির্দেশে অসংখ্য সারীয়া **রিচালিত হয়েছে**। এখানে উল্লেখ্য যে, যে সব যুদ্ধ তিনি জে সেনাপতি হিসেবে পরিচালনা করেছেন তাকে গাযওয়া বলা হয়। গাযওয়া ে কেই গাজী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ২৯টি গায্ওয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে ঃ দর, ওহুদ, খন্দক, খাইবার হুনায়ুন ইত্যাদি। গায্ওয়ায়ে হুদায়বিয়া বা হুদায়বিয়ার স্বন্ধি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতার এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ষষ্ট হিজরীতে এই স্বন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। স্বন্ধির শর্তগুলি মুসলমানদের জন্য এতটা অপমান জনক ছিল যে, কোন সাহাবী এটা মানতে রাজী ছিলেন না। কেননা এতে রাসুলুল্লাহ কথাটাই কেটে দিতে হয়েছিল। কিন্তু নবীজী এই স্বন্ধির সুফলতা তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন বলে, নিজ হাতে রাসুলুল্লাহ কথাটা কেটে দেন এবং তৎপর স্বন্ধিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই স্বন্ধির সুফল এত তড়িৎ গতিতে আসে যে, মাত্র ২ বৎসর পর, ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্ভব হয়েছিল। সময়াভাবে অন্যান্য যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হল না। দিতে পারলে, বুঝাতে পারতাম যে, বদর ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি কি দারুণ রনকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রন-নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের-অনুশাসন অনুসারে নবীজী নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে নিজেকে আদর্শ নবী, আর্দশ মানুষ, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ নানা, আদর্শ রাষ্টনায়ক, আদর্শ সেনানায়ক ও আদর্শ বিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে সবাইকে জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিযে দিয়ে গিয়েছেন। যার জন্য বর্তমান দুনিয়ার এই অশান্ত পরিবেশ দেখে মাইকেল হার্ট, তাঁর "দ্যা হানড্রেড" গ্রন্থে আমাদের নবীকে এক নাম্বারে স্থান দিয়েছেন।

নেপোলিয়ান, বেনাপার্টের মত লোকও বলে গেছেন, "কুরআনের নীতিমালাই কেবল মানব জাতীকে সুখের পথে পরিচালিত করতে পারে।" জর্জ বার্নার্ড'শ বলেছেন, "If all the world was united under ond leader, then Muhammad (s:) would have been the best fitted man to lead the peoples of varioux creeds, dogmas & ideas to peace & happiness"

www.pathagar.com

অর্থাৎ সারা বিশ্বকে যদি একজন নেতার অধীনে একত্রিত করা যেত, তাহলে মুহাম্মদই (সাঃ) হতেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বর্ণের লোকদেরকে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করার জন্য।

আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবের অতি সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত কার্যকলাপে অতীব সন্তুষ্ট হয়ে, পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, "আল ইয়াওমা আক্‌মালতুলাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আত্‌মাম্‌তু আলাইকুম নেয়ামাতি, ওয়া রাদিতুলাকুমুল ইসলামা দ্বীনা" (সুরা মায়দা, আয়াত -৩) অর্থ ঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ন করলাম এবং আমার নেয়ামতরাজি তোমাদের প্রতি সম্পূর্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে সানন্দে অনুমোদন করলাম।

আজ সারা বিশ্বে যেখানে মারামারি, কাটাকাটি , খুনাখুনি, ছিনতাই, রাহাজানি চলছে, সর্বত্র অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মানুষ যেখানে শান্তির অন্বেষায় দিশেহারা হয়ে ছুটছে, একমাত্র ইসলামই সেখানে সেই শান্তির পথের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং সেই শান্তি আসতে পারে বিশ্ব-মানবতরা সর্বশ্রেষ্ট পথ-প্রদর্শক , আমাদের প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল্লামের আদর্শ অনুসরন ও অনুকরনের মাধ্যমে।

[ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদের ১৯৯৮ ইং সালের সেমিনারে প্রবন্ধাকারে পঠিত]

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় নবী-চরিত

আবদুস সাত্তার

রসূলে করিমের বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে বাংলা গদ্য-রীতিতে আজ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে তম্মধ্যে ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের 'হজরত মুহম্মদের জীবন-চরিত; কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'মুহম্মদ চরিত' রামপ্রাণ গুপ্তের 'হজরত মুহম্মদ ও হজরত আবু বকর; শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি; মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদের 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ); তসলীমউদ্দিন আহম্মদের 'সম্রাট পয়গম্বর'; সুফি মধু মিয়ার 'শান্তিকর্তা হজরত মোহাম্মদ,' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব-মুকুট' এবং 'নূরনবী' মিসেস সারা তৈফুরের 'স্বর্গের জ্যোতিঃ মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ'র 'মোস্তফা চরিত্র;' কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্ব-নবী,' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরু-ভাস্কর , ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর শেষ নবীর সন্ধানে, মাওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দিকীর 'মানুষের নবী'; এবং মোহম্মদ বরকত উল্লাহ্র 'নবী গৃহ-সংবাদ', প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহানবীর জীবনাদর্শ শিক্ষা এবং বিচিত্র ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে এই সব মনীষিগণ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র আঁকতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্য-ভান্ডারে এঁদের অবদান যে মূল্যবান, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মোহাম্মদের জীবন-চরিত্র ও ধর্মনীতি' প্রকাশিত হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ খৃঃ) অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৭৬ বছর আগে। ৬৭০ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থটিতে হজরত মোহাম্মদ চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন হজরতের জন্মকালীন আরবের অবস্থা এবং সেই সঙ্গে রসুলুল্লাহ্র গুরুত্ব। লেখকের ভাষায় ঃ "মানব চিন্তার অতীত, মানব বুদ্ধির অগম্য মহান মঙ্গলময় বিশ্ব-কর্তা আপনার বিশ্বরাজ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত ও বিচিত্র উপায়ের প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার গূঢ় রহস্যোদঘাটন করিতে পারেন, এ ভূমণ্ডলে এমন কেহই নাই। ইচ্ছা হইলেই তিনি ফল-জল সমন্বিত নর-নারীরপূর্ণ স্থান পরিহার করিয়া কঠোর কুসংস্কারাবিষ্ট আরবের বালুকাময় মরুভুমিকে আপনার কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লইলেন। তিনি যা-যা করিলেন, তাহা অবাধে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহার মহতী শক্তির তীব্র আঘাতে সমস্ত প্রতিবন্ধক তিরোহিত হইয়া দূরন্ত মরুভূমি ফল-পুষ্প-পরিশোভিত পরম রম্যোদ্যানে পরিণত হইল। সেই জন্যই আজি আরবভূমি কোটি কোটি লোকের নিকট পূণ্যক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই আজি আরবের নাম দেশ-বিদেশে

www.pathagar.com

প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং ইহার সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথিবীর পন্ডিতমণ্ডলীর একান্ত আদরের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই অলৌকিক ক্ষমতা আজিও ইহার পবিত্র ধর্মের নামের সহিত বিজড়িত হইয়া, অগন্য লোকের পরকালের সম্বল করিয়া দিয়াছে। আমরা এই অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্লেষেণে এই পবিত্র ধর্মের বর্ণনে এবং ইহার প্রবর্তয়িতা মহাত্ম্য হযরত মুহম্মদের (দঃ) জীবন-চরিত্র ও ধর্মনীতি পাঠকবর্গকে উপহার প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।" শুধু তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়েই নয় বলিষ্ট ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায়ও চমৎকারিত্ব আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁর 'মানব-মুকুট ও নুর নবী' গ্রন্থদ্বয়ে হজরতের জীবনের মাহাত্ম্যের বিভিন্ন দিক উদঘাটন করে দেখিয়েছেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। স্বয়ং আল্লাহতায়ালাও তাঁকে 'ওসওয়াতুন হাসানা'–সুন্দরের শ্রেষ্ট আদর্শ এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন'–সমগ্র বিশ্বের মূর্তিমান কল্যাণ ও আশীর্বাদ বলে অভিহিত করেছেন। হজরত মোহাম্মদ 'মানব-মুকুট' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ মানব' কিনা এটাই বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁর মানব মুকুট গ্রন্থে। বইটির প্রস্তাবনার উপসংহারে বলা হয়েছেঃ "গৃহহীন খৃষ্ট-বুদ্ধের প্রেম ও ত্যাগ আমাদিগকে-আমাদিগের মনকে এতকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,. কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে যে, কে সেই মহাপুরুষ যিনি মানবের চিরকালের আবাস-ভূমি গৃহাঙ্গনকে তুচ্ছ না করিয়া পবিত্র ও মধুর করিয়াছেন। মানুষের বিচিত্র সুখ–দুঃখ ও আশা–আকাংক্ষাময় মরজীবনকে জীবন দ্বারা সার্থক সুন্দর করিয়া অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, মানব সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, পরন্তু মধ্যে বাস করিয়া, মানুষের সঙ্গে বিচরণ করিয়া , বিশ্ব মানবের জীবনধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ রাখিয়া কে মানুষকে ভালবাসিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন, ত্যাগের দুর্জয় সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । তিনিই মানুষের অতি আপন, প্রাণের ধন পরমাত্মীয়; মহাপুরুষের গৌরব মুকুট তাঁহারই প্রাপ্য।" উপরোক্ত প্রস্তাবনায় ধ্বনিত হয়েছে, ইসলামের অন্যতম মূল-নীতি বা পবিত্র হাদীসের একটি অংশের ব্যাখ্যা ঃ 'লা রুহ্বানিয়াতা ফিল্ ইসলাম; ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্য সাধনে মুক্ত সে আমার নয়, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহা-নন্দময়' মুক্তির স্বাদই উপভোগ করতে চেয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী।

হজরত মোহাম্মদ ছিলেন সত্য প্রতিষ্ঠার অপরাজেয় অগ্রনায়ক। ইতি পূর্বে অনেক মহাপুরুষেই হয়তো সত্য সাধনায় অনেক ক্ষেত্রে বিফল মনোরথ হয়েছেন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদই একমাত্র নজীর যিনি কোন বিষয়েই জীবনে নিরাশ হননি। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছেঃ 'অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাঁহাকে (মুহম্মদকে)

www.pathagar.com

উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন।' অন্য কোন নবীর ভাগ্যে এমন সুযোগ ঘটেনি। এ জন্যেই তিনি ছিলেন পূর্ন মানুষ। সকল সফলতায় মূর্ত প্রতীক। মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর ভাষায় ঃ 'হযরত মুহম্মদ (দঃ) মানব-নয়নে মানব-জীবনের এক মহাসূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে অন্তরে যে সত্যের সাধনা করিতেন, বাহিরে তাহাই জীবনের কার্যে রূপরাগে ফুটাইয়া তোলেন। অন্তরে তিনি যেমন করিয়া অসত্যকে অস্বীকার করিয়া আল্লাহর আসন রচনা করেন, বাহিরেও তেমনি আবেষ্টনকে অস্বীকার করিয়া, আঘাত করিয়া, চূর্ণ করিয়া, শূন্যতা হইতে সৃষ্টির নব আনন্ধঘন জীব-লোকে উপনীত হন। ----- তিনি পিতৃপ্রাণের গভীর প্রেমে কঠোর হইয়া উচ্ছাসের উপর আঘাত করেন, আঘাত তাঁহার অমৃত হইয়া দেখা দেয়। ----- তাই তাঁর দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্বে তাঁর শেষ হজ্জের সময় 'জয়-শিখরের' উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া অন্তকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উদাত্ত গভীর বিরাট স্বরে উচ্চারণ করেন, 'তোমার বাণী প্রদান করিয়াছি, আমার কার্য পূর্ণ করিয়াছি; শুদ্ধমুখ সমুন্নত মানবমন্ডলী লক্ষকণ্ঠে উত্তর দিয়াছে,-'তাহা আপনি করিয়াছেন।-----"

'নূরনবী' রূপকথার আঙ্গিকে শিশু পাঠ্যোপযোগী করে লেখা। এই বইটিও শিক্ষাপ্রদ এবং সুললিত ভাষা লিপিবদ্ধ ঃ "সাতসমুদ্র তের-নদীর পারে রাক্ষসের দেশ মেঘবরণ চুল কুচবরণ কন্যা আনিতে গিয়া রাজপুত্র কত বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তোমরা অবাক হইয়া থাক। ----- কিন্তু পাপের পাতালে শয়তানের হাত হইতে মানুষের উদ্ধারের জন্য আমাদের নূরনবী কত যে দুঃখের সাগরে সাঁতার দিয়েছিলেন------ সেই পূণ্যকথা এমন মধুর আর চমৎকার যে যাদুর দেশের ঘুমন্ত রাজকণ্যা আর সোনার কাঠি ও [illegible] কাঠির কথা তার কাছে কিছুই নয়। "

মওলানা আকরম খাঁর ৭৬২ পৃষ্ঠার 'মোস্তফা-চরিতে' ই[illegible] বিভাগেরই উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি বিজ্ঞ[illegible]-সম্মত যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষণেরই বেশী পক্ষপাতী। তিনি একস্থানে উল্লেখ করেছেন ঃ "ইসলামের কোন বিবরণ বা বিশ্বাস ঐরূপ কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বা স্থির সিদ্ধান্তের বিপরীত নহে।" কাজেই দেখা যায়, অন্যান্য সমালোচক-সাহিত্যকদের সঙ্গে তিনি কোন কোন স্থানে এক মতে উপনীত হতে পারেননি। 'নবীর বক্ষ বিদারণ', 'মিরাজ প্রভৃতির ব্যাখ্যায় অন্যান্যদের সঙ্গে মওলানা আকরাম খাঁর পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। কোন কিছুকে সত্য বলে' প্রতিপন্ন করতে হলে তাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। তাঁর ভাষায় ঃ "সাক্ষী-প্রমানের পরীক্ষা যথেষ্টরূপে করিতে হইবে। সাক্ষীর নিজের সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব কতদূর; তাহার দৃষ্টি-বিভ্রম, শ্রুতি বিভ্রম, জ্ঞান-বিভ্রম ইত্যাদি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, সাধারণভাবে সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা পর এই সকল বিষয় উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের অধিকাংশ লেখকের

www.pathagar.com

যুক্তির ধারা এই যে, তাঁহার প্রথমে যথেষ্ট ভাবপ্রবণতাপূর্ণ ভাষায় আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বশক্তিমানত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার পর এই সর্ব শক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেক আজগোবী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন।"

তিন খন্ডে সমাপ্ত কবি গোলাম মোস্তফার'বিশ্ব-নবী' হজরত মোহাম্মদের এক পূর্ণ জীবন-আলেখ্য। তাতে মহানবীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যুক্তির আলোকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, একমাত্র হজরত মোহাম্মদই 'রসুলুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র প্রেরিত সংবাদবাহক, এবং তিনি মানব-শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নবী। তাঁর ভাষায় ঃ "হযরত মুহম্মদ যে অন্যান্য পয়গম্বরদিগের অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে যে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা ছিল না, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, সমস্ত পয়গম্বরের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র 'রসুলুল্লাহ্। সকল পয়গম্বরই নবী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই 'রসুলুল্লাহ্ নামে ভিহিত হন নাই। হযরত আদমকে বলা হইয়াছে ঃ 'আদম সফিউল্লাহ্', 'হযরত কে বলা হইয়াছে, 'নূহ নবীউল্লাহ্', হযরত ইব্রাহিমকে বলা হইয়াছে 'ইব্রাহিম লুল্লাহ্', হযরত ইসমাইলকে বলা হইয়াছে 'ইসমাইল জবিহ্উল্লাহ্', হযরত কে বলা হইয়াছে 'মুসা কলি-মুল্লাহ্' হযরত ঈসাকে বলা হইয়াছে, 'ঈসা রুহ্আল্লাহ্', কিন্তু হযরত মুহাম্মদকে বলা হইয়াছে, 'মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্!' কাজেই দেখা যাইতেছে অন্য কোন পয়গম্বরকেই আল্লাহ্ 'রসূল' বলিয়া অভিহিত করেন নাই। 'ইব্রাহীম রসুলুল্লাহ্', 'মুসা রসুলুল্লাহ্ বা 'ঈসা রসুলুল্লাহ্'- এই ধরনের উক্তি কোথাও নাই। পক্ষান্তরে কুরআনের যেথানেই 'আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল 'রসুলুল্লাহ্' অথবা শুধু 'রসূল' শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানেই হযরত মুহম্মদকে বুঝানো হইয়াছে। ইহার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় ঃ রসূলের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে এবং উহা অন্যন্য সাধারণ একটি খিতাব; এই খিতাব একমাত্র হযরত মুহম্মদের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছিল। "

আলোচ্য গ্রন্থের "মুহম্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কিনা?" অধ্যায়টি খুবই মূল্যবান। এই অধ্যায়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন 'মুহম্মদ' নামের সার্থকতা। 'আল্লাহ আহাদ', আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। 'আহাদ' রূপেই আল্লাহর আত্মপরিচয়। কিন্তু আল্লাহর মনে সৃষ্টির ব্যগ্রতা দেখা দিল। তখন একটা বিচ্ছুরিত আলো পৃথিবীর আদিরূপ অনন্ত জলরাশির উপর খেলা করতে লাগলো। এই 'নূর' বা আলোই নূরে মহম্মদী। অতঃপর আল্লাহ হুকুম করলেন 'কুন', হও, আর তখনি 'ফা ইয়াকুন', হয়ে গেলো। পূর্ব পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক মুর্শিদী-গানে পাওয়া যায়।

'কোন নূরে নবীজী পয়দা,
আদম হয় কোন নূরেতে-----
ওগো, জানতে আইলাম সাধুর দ্বারেতে।---

www.pathagar.com

সাধু তখন উত্তর দেন ঃ
খোদার নূরে নবী পয়দা,
নবীর নূরে জগৎ পয়দা হয় ।---

কবি গোলাম মোস্তফা দেখিয়েছেন ঃ ''সৃষ্টির আদিতেই ছিল মুহম্মদের পরিকল্পনা। অন্য কথায় ঃ জন্মের আগেই তিনি জন্মিয়াছিলেন। কোন চিত্র বাহিরে অঙ্কিত হইবার পূর্বেই যেমন শিল্পীর ধ্যানে তাহা অঙ্কিত হইয়া যায়, হযরত মুহম্মদ তেমনি সৃষ্টির বহু পূর্বেই আল্লাহ্র ধ্যানে প্রকট হইয়াছিলেন। শিল্পী যেমন তাহার মনে সেই চৈতন-চিত্রটিকে ধীরে ধীরে রূপ দেয়, বিশ্বশিল্পী আল্লাহও ঠিক তেমনি করিয়া তাঁহার প্রধান পরিকল্পনাটিকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র 'শেষ নবীর সন্ধানে' বইটিতে পরিশিষ্ঠসহ মোট সাতটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। ভূমিকায় লেখক বলেছেন ঃ ''বিশ্বের শেষ নবীর (দঃ) জীবন বৃত্তান্তে কতকগুলি সমস্যা আছে। আমি এখানে সেইগুলিরই সন্ধান ও সমাধান দি চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে মতভেদের অবসর আছে।" ---- বলা বহুল্য, সমস্য 'সমাধান' ও সন্ধান অনেক প্রবন্ধেই তিনি দিতে পেরেছেন। তন্মধ্যে 'শবে মির প্রবন্ধটি খুবই মূল্যবান। একমাত্র হযরত মোহাম্মদই আল্লাহর খুব বেশী নৈকট্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। পবিত্র-কুরআনে মিরাজ সম্পর্কে উল্লেখ আছে ঃ ''অতঃপর তিনি (মুহম্মদ) আল্লাহর নিকটবর্তী হলেন এবং বিনীত হলেন; দু'টি ধনুকের জ্যা অথবা তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হলেন।" –মিরাজ যে শুধু কল্পনা মাত্র নয়, এ কথাই তিনি যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্'র 'নবীগৃহ সংবাদে' বিবি খাদিজার কথাই ধ্বনিত হয়েছে বেশী। 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ বলা হয়েছে ''বাংলা ১৩৩৩-৩৪ সনে বিবি খাদিজা সম্বন্ধে আমার কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ মাসিক 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। খাদিজা চরিত্র সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সম্ববতঃ উহাই বিস্তৃত আলোচনা। খাদিজা চরিত্র অঙ্কিত করিতে নবীর চরিত্রে সে আলেখ্য আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কেননা দুইটি চরিত্র ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ফুল থেকে যেমন ঘ্রাণকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি রসুলুল্লাহ্ থেকেও খাদিজাকে পৃথক করা যায় না। এই উপলব্ধিই মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ্ ব্যক্ত করেছেন– 'নবীগৃহ-সংবাদে।'

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সবগুলো গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সব লেখকেরই মূল বক্তব্য রসুলুল্লাহ্কে কেন্দ্র করে এবং এ ব্যাপারে তাঁরা সফলকামও হয়েছেন আশাতীত রূপে। এই সব মূল্যবান রচনা-সম্ভার শুধু বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ নয়, রসুলুল্লাকে জানবার এবং চিনবার উপরকরণ হিসেবেও সুদীর্ঘ কালের পাথেয়।

[জাহানে নও অবলম্বনে]

www.pathagar.com

বাংলা কাব্যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

বাংলা কাব্যে হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর প্রসঙ্গ এসেছে নানা ঐতিহাসিক সূত্রে। আখ্যান-কাব্যে হজরতের জীবন-কাহিনী বর্ণনা এবং চরিত্র চিত্রায়নের ব্যাপারে বাঙ্গালী কবিরা আরবী এবং ফারসী কাহিনী-কাব্যের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন বলা যেতে পারে, কারণ সাধারণ মানুষের মতো নবী-জীবনকে উপজীব্য ক'রে আখ্যান-কাব্য রচনার ধারাটি ইতিপূর্বে আরবী এবং ফারসী সাহিত্যেই সুপ্রচলিত ছিল। আরবী এবং ফারসী রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য অনুবাদ সূত্রে বাঙ্গালী কবিরা নবী-কাহিনী অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেন। আরবী আখ্যান-কাব্য 'কাসাসুল আম্বিয়ার' আদলে এবং বাংলা রূপান্তর 'কাসাসুল আম্বিয়া'। আম্বিয়া-কাহিনী রচনায় ঙ্গালী কবিরা সর্বত্র সরাসরি আরবীর দ্বারস্থ হননি, অনেক ক্ষেত্রে আরবী ফারসী নীর উর্দু রূপান্তরের অনুসরণ করেছেন। ফলে রূপান্তরিত কাহিনীতে কোথাও থাও প্রক্ষিপ্ত রচনা আত্মগোপন করার সুযোগ পেয়েছে। এ কথাও সত্য যে, নুদিত আম্বিয়া-কাহিনীতে দেশজ রূপরীতি ও ধ্যান-ধারনার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে আম্বিয়া কাহিনীর শাখা-প্রশাখার এমন সব কাহিনীও সংযোজিত হয়েছে, যার চরিত্র মূলতঃ মানবীয় হলেও অনেটাই ধর্ম-নিরপেক্ষ। মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' মুহম্মদ ইয়াকুবের 'জঙ্গনামা'র কাহিনী ভিত্তিক হলে এই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণে এবং অনেকটা আধুনিক মনের প্রভাবে তা অনেক কাল্পনিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা আম্বিয়া কাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন উর্দু ও ফারসী কাব্য থেকে; অন্যথায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করে তাঁরা মানবীয় কাহিনী রচনায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হতেন না। বাংলা কাব্য তখন ছিল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে মুখর এবং আলৌকিকতার ভারে আচ্ছন্ন। ফারসী কাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলিম কবিরাই সর্বপ্রথম মূর্ত-মানুষের জীবনধারাকে অবলম্বন করে রোমান্টিক কাহিনী কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, ফলে বাংলা কাব্য নতুন বিষয় সম্পদে সমৃদ্ধ এবং মানবীয় চেতনায় আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

হজরত মোহম্মদ (দঃ) বাংলা-কাব্যে উল্লেখিত হয়েছেন নানা সূত্রে এবং বিচিত্রভাবে। শুধু ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে নন, তিনি চিত্রিত হয়েছেন মানুষ মোহম্মদ রূপেও। সার্বজনীন মানব ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক হিসাবে এবং সত্যের অতন্দ্র সাধক নবী রূপেই তিনি যেমন বাঙালী কবিদের চিত্তে স্পন্দন জাগিয়েছেন, তেমনি তাঁদের

www.pathagar.com

মনে এই বোধটিও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে যে, বস্তুতঃ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)ই হলেন সৃষ্টির আদি ও মূল কারন। তাঁকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি বিকাশ লাভ করেছে এবং তা পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কবিদের চেতনায় এই বোধটি প্রখর হয়ে রয়েছে যে, যেহেতু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আদি সৃষ্টি এবং তাঁর কারণেই বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডের সূচনা, সুতরাং তাঁর বন্দনা-গীতে আত্মনিয়োগ এবং তাঁতে সমার্পিত চিত্ততাই আল্লাহ্ উপাসনার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এই ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয়বোধ শুধু মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মনেই বিস্তার লাভ করেনি, আধুনিক সমাজ সচেতন ও যুক্তিবাদী কবি মনেও তার প্রভাবের জের চলেছে।

শুধু আরবী-ফারসী শব্দ সম্বলিত চলতি ভাষার পুঁথিতেই নয়, মধ্যযুগের সংস্কৃ ঘেঁষা মুসলিম রচিত পুঁথিতেও হজরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী কাহিনী ম পুঁথিতে যেমন হজরতের জীবন কাহিনী এবং চরিত্র মাহাত্ম্য রূপ পেয়েছে, রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যের সূচনাতেই এবং প্রসঙ্গান্তরে হজরতের বন সংযোজিত হয়েছে। 'হাম্‌দ' ও 'নাৎ' প্রসঙ্গেই হজরতের সত্য-সন্ধানী মনের প এবং দয়ালু চিত্তের রূপলেখা তুলে ধরা হয়েছে। 'নাৎ -এ-রসূল' মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে এবং এই ধারা লক্ষ্য করা যায় লোক-সাহিত্যেও। 'কাসাসোল আম্বিয়া' ইত্যাদি পুঁথিতে অন্যান্য নবীদের সঙ্গে সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যেমন উল্লেখিত হয়েছেন, তেমনি স্বতন্ত্র ভাবে তাঁর উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন 'বিজয়-কাব্যে'। মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা সে সব বিজয় কাব্য রচনার আঙ্গিকের দিক থেকে হিন্দু কবিদের ধারাই অনুসরণ করেছেন। 'নবী-বংশ', 'রসূল বিজয়' ইত্যাদি কাব্যে যে আঙ্গিক ও ধারা অনুসরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে হিন্দু কবিদের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', 'হরি-বংশ' ইত্যাদি কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু ধর্মীয় প্রেরণায় এবং ফারসী কাহিনী কাব্যের অনুসরণে রচনার উপজীব্য বদলেছে মাত্র; বিষয়বস্তু নির্বাচনে মুসলিম কবিরা এক্ষেত্রে নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। ফলে 'ওফাতে রসূল' 'রসূল-বিজয়' ইত্যাদি পুঁথি রচিত হয়েছে। নিম্নে মধ্যযুগের আখ্যান-কাব্য থেকে নবী প্রসঙ্গের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

মুহম্মদ নবী নাম হৃদেয় গাঁথিয়া।
পাপীগণ পরিণামে যাইবে তরিয়া ॥
দয়ার আধার নবী কৃপার সাগর।
বাখান করিতে তাঁর সাধ্য আছে কার ॥
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেক এ চৌদ্দ ভূবন ॥

www.pathagar.com

অনিল সলিল সূর্য এ নভোমন্ডল।
হযরত কারণে সৃষ্টি জানহ সকল ॥
বন্দনায় নবী পদ নির্ণয় না হয়।
এ কারণে গুণী গণ ক্ষান্ত দিল তায় ॥
মনে ভাবি ক্ষান্ত দিনু নবীর বাখান।
পরিনামে পাই যেন নবী পদে স্থান ॥
—('মুক্তার হোসেন, মুহম্মদ খান)

পুছিলে ইয়ার সব কহ আল্মপানা।
কোন্ চিজ আগে পয়দা করিল রব্বানা ॥
কহিলেন রসূলুল্লাহ্ সবার হুজুর।
আগে আল্লাহ্ পয়দা কৈল আপনার নূর ॥
গুপ্ত রূপে একা যবে ছিল পরওয়ার।
সেই নূর বিনে ছিল সব নৈরাকার ॥
আপ কুরদত আগে করিতে জাহের ।
সে নূরে আমার নূর পয়দা কৈল ফের ॥
আমার নূরেতে পয়দা তামাম জাহান।
আরশ কুরশি আদি লওহ্ লা-মাকান ॥
—('কাসাসোল আম্বিয়া' তাজুদ্দিন মুহম্মদ)

ধর্ম বিষয়ক কাহিনীকাব্য ছাড়াও রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে হজরত মোহাম্মদ প্রসঙ্গ ও প্রশস্তি রূপ পেয়েছে। সতের শতকের কবি আলাওলের রচনায় ও তার পরিচয় মেলে। আলাওলের 'পদ্মাবতী' থেকে 'হজরতের ছেফতের বয়ান উদ্ধৃত হ'ল ঃ

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছালেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিল সংসার ॥
আপনে কহিচে প্রভু কোরাণ মাঝার ॥
সেই দ্বীপ জ্যোতিএ উজ্জ্বল ত্রিভূবন।
হইল নির্মল জ্যোতি পাতক নাশন ॥
ঘোরাকার ছিল পন্থ, নর পাপলীন।
পূণ্য প্রকাশের হেতু হৈল তান "দীন" ॥

www.pathagar.com

মুন্‌শী মালে মোহাম্মদের রোমান্টিক আখ্যান-কাব্য 'ছয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল'এ আছে ঃ

আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল ভাই দেলে জানে গাঁথি।
যে নামের বরকতে হবে আখেরে নাজাতি ॥
তাহার মহিমা লিখে সাধ্য আছে কার।
ফেরেশ্‌তা আদম জ্বীন সকলে নাচার ॥
যত পয়গাম্বর আছে আল্লার মকবুল।
আখেরী নবীর হবে শাফায়াত কবুল ॥

মন্‌শী আবদুর রহিম রচিত 'গাজি-কালূ ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি'র সূচনায় রয়েছে ঃ

প্রথমে বন্দিনু প্রভু সৃচি নিরঞ্জন।
এ তিন ভূবনে যত তাহার সৃজন ॥
তাহার পরম সখা নবী মোস্তফার।
লক্ষ কোটি সালাম দরূদ পরে তার ॥
সখা সঙ্গী যত তার আছে ভার্যাগণ।
নবী বংশে যত আর হইল উৎপন ॥
সবাকারে কোটি কোটি সালাম আমার।
সদয় রহুক প্রভু উপরে তেনার ॥

উপরে উদ্ধৃত রচনাংশ থেকে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, সৃষ্টি রহস্য, হজরতের জন্ম, সত্যপ্রচার ও ওফাতকে কেন্দ্র করেই কবিদের কল্পনা ডানা মেলেছে। মধ্যযুগের এ সব রচনায় কবির বিস্ময়বোধ অলৌকিকতার ধার ছুঁয়ে গেছে।

কিন্তু লোক-সাহিত্যে হজরতের প্রসঙ্গ এসেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে। সেই সাহিত্যে জীবনী রচনা কিংবা কাহিনী বর্ণনার বদলে রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদের জীবন-মাহাত্ম্য ও সত্য-সন্ধানী মনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। লোক কবি ও বাউলরা নিজেরাই রহস্য সন্ধানী, সৃষ্টি নিগূঢ় তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে তাঁরা নিবেদিতচিত্ত। এই সত্য-সন্ধান সূত্রেই তাঁরা হজরত মোহাম্মদের দ্বারস্থ হয়েছেন। বাউলরা কোন্ বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসে আস্থাবান নন, তবে পারলৌকিকতায় তাঁদের অনাস্থাও নেই। ফলে পারলৌকিক জীবনের কান্ডারী হিসাবেই তাঁরা হজরত মোহাম্মদ বারে বারে 'সাই' ও 'চেতন গুরু' রূপে উল্লেখিত হয়েছেন। বাউল কবি লালন শাহের বহু গানে রসূল প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। নবীপ্রেম মারফতী ও মুর্শিদা গানের পরতে পরতে জড়ানো। লালন শাহের একটি গান এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

www.pathagar.com

রসূলকে চিনলে পরে
খোদা চিনা যায়।
রূপ ভাড়ায়ে দেশ বেড়ায়ে
গেলেন সেই দয়াময় ॥
মাঠে ঘাটে রাসুলেরে,
মেঘে রয় যে ছায়া ধরে।
দেখ দেখিরে লেহাজ করে
জীবের সেই দরজা হয় ?
জন্ম যাহার এই মানবে,
ছায়া এই মানবে,
ছায়া তার পড়ে না ভূমে।
দেখ দেখি তাই বর্তমানে
কে এল এই মদীনায়।
আহম্মদ নাম লিখিতে
মিম হরফে হয় নফি করতে,
সিরাজ কয় লালন তোকে
কিঞ্চিত নজর দেখাই।

মধ্যযুগের আখ্যান-কাব্য রচনার ধারা একাল পর্যন্ত প্রলম্বিত। যদিও চিন্তাধারা এবং রচনারীতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য, তবুও জীবনী-কাব্য রচনায় একালেও সর্বত্র আধুনিক মনে প্রতিফলন ঘটেনি। আধুনিক কালে হজরত মোহম্মদের জীবন-কাহিনীভিত্তিক যে কয়টি আখ্যান-কাব্য রচিত হয়েছে, তাতে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার অনুসরণ লক্ষণীয় না হলেও জীবনী বিন্যাস এবং কাহিনীর সূত্র রক্ষায় মধ্যযুগীয় ধারা অনুসৃত হয়েছে বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি, মধ্যযুগীয় কবিদের বিস্ময়বোধ আলৌকিকতার ধার ছুঁয়ে গেছে; এবং লক্ষণীয় যে, বিস্ময়বোধের এই ধারা আধুনিক কবিদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। এদিক থেকে ষোড়শ শতেকের কবি সৈয়দ সুলতান, সতের শতকের মুহম্মদ খান, আঠার শতকের হায়াত মামুদ, উনিশ শতকের তাজউদ্দিন মুহম্মদ এবং বিশ শতকের কাজী নজরুল ইসলামের মনোভঙ্গীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য দৃষ্টিগোচর নয়। অবশ্য নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত 'মরুভাস্কর' কাব্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী রওশন ইজদানী তাঁর 'খাতেমুন নবীঈন' কাব্যে অনুসরণ করেছেন লোক সাহিত্যের ধারাকে–তাঁর রচনায় পুঁথি কাহিনীর আঙ্গিকই লক্ষনীয় । কবি কল্পনা ও সৃষ্টিক্ষমতার

www.pathagar.com

তারতম্য অনুসারে উপরোক্ত কাব্যে দু'টির শিল্প। সার্থকতা ভিন্ন মানের হলেও বিষয় উপস্থাপনা এবং কাহিনী-বিন্যাসরীতি প্রায় সমধর্মী। এ ক্ষেত্রে উভয়েই মধ্যযুগের কাহিনী-কাব্যের দ্বারস্ত হয়েছেন। এঁদের সামনে আদর্শ হিসাবে ছিল নবী-জীবনীমূলক পুঁথি কাহিনী।

তবে আধুনিক কবিদের রচনায় যে কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেনি তা বলা যায় না। আধুনিক কবিরা কখনো কখনো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং সংস্কারের আবিলতায় নিরুদ্ধমান জীবনে হজরতের জীবন ও আদর্শকে আলোক বর্তিকারূপে কামনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে কবিতা প্রত্যক্ষতার সীমানা চাড়িয়ে কখনো কখনো প্রতীক কিংবা রূপকের চরিত্র লাভ করেছে। অবশ্য আধুনিক কবিরাও ঐতিহ্যের ধারাবহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং গতানুগতিতার অনুবর্তনের ফলে বিবৃতিধর্মী কিংবা বিবরণমূলক কবিতা রচনা করেছে, যাতে হজরতের জীবন-মাহাত্ম্য নিপুনভাবে চিত্রিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আধুনিক কবিদের কাহিনী বিন্যাস কৌশল লক্ষণীয়। আঙ্গিকের দিক থেকে কোথাও কোথাও মধ্যযুগীয় রীতি অনুসৃত হলেও আধুনিক কবিদের রচনায় সমকাল ও ছায়াপাত করেছে। ফলে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা-মূলক জিজ্ঞাসা। আধুনিক মনের এই প্রতি ফলন আখ্যান-কাব্যের চেয়ে বরং নবী-বিষয়ক খন্ড-কবিতায়ই সমধিক। যেহেতু খন্ড-কবিতা অনেকটা নির্বস্তক এবং ভাবনির্ভর সে কারণে তাতে মনের প্রতিফলনের বিস্তৃতির অবকাশ সমধিক।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য এবং মুসলামানদের বীর্যবত্তার কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নবী-প্রসঙ্গ এসেছে ধর্মীয় আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে। এদেশের ইংরেজ রাজত্ব কায়েম এবং ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের পর মুসলমানের ধর্মীয় পবিত্রতা সংরক্ষণের দিকে বিশেষভাবে নজর পড়ে-ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একদিকে খৃষ্টধর্মের প্রভাব, অন্যদিকে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে আত্মমুক্তির আকুলতা-এই দুই ধারার ফলেই ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য অনুধাবনের চেষ্টা হয়েছে-এবং কালে তা আন্দোলনের চরিত্র লাভ করেছে। ওহাবী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় আন্দোলন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত; এমন কি পাকিস্তান আন্দোলনের মূলেও ধর্ম-ভিত্তিক সংস্কৃতির প্রেরণা কার্যকরি ছিল। ওহাবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সংস্কারমুক্ত ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের ধর্মীয় আচরণগত দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলা কবিতায় এই আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে এবং সে প্রসঙ্গেই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নানা ভাবে কীর্তিত হয়েছেন। বাংলা কাব্যে হজরত মোহাম্মদ যেমন ধর্মীয় মহিমা নিয়ে সমুপস্থিত, তেমনি তিনি উল্লেখিত হয়েছেন

www.pathagar.com

ইতিহাসের নায়করূপে। ইসলামের ধর্মীয় মহিমার কথা যেমন প্রত্যক্ষভাবে রূপ পেয়েছে, তেমনি তা এসেছে সাংস্কৃতিক প্রেরণার উৎস হিসাবে। বুদ্ধের বাণী এবং গীতা উপনিষদের মর্মকথা যেমন বাংলা কাব্যে রূপ পেয়েছে এবং সে-সব চিত্রিত হয়েছে সাংস্কৃতিক চেতনার সারাৎসার রূপে তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রেরণা এবং হজরতের মোহনীয় আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে বাংলা কবিতায়।

আধুনিক বাংলা-কাব্যে ইসলাম ধর্ম ও হজরত মোহাম্মদ প্রসঙ্গ এসেছে নানা সূত্রে। আখ্যান-কাব্য, গান ও খন্ড-কবিতায় এবং দোয়া দরূদে হজরত মোহাম্মদ উল্লেখিত হয়েছেন। মীর মোশারফ হোসেন মোহাম্মদ ইয়াকুবের 'জঙ্গনামা' পুঁথিকে অবলম্বন করে গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করেন; এই গদ্য-কাব্যে হজরত মোহাম্মদ প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। মোশারফ হোসেন কবিতার মাধ্যমে মুসলমানের ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন কামনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গেই তাঁর রচনায় হজরত মোহাম্মদ কীর্তিত হয়েছে। মোশারফ হোসেন রচিত বাংলা ভাষার দরুদে তাঁর ধর্মপ্রবন মনের পরিচয় মেলে ঃ

তুমি হে এসলাম রবি
হাবিবুল্লাহ্ শেষ নবী
নতশিরে তোমায় সেবি,
—মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ্।
তুমি সত্য উদ্ধারিলে
মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে,
প্রভু বাণী শুনাইলে
—মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ্।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্'র রচনায়ও নবী-প্রশস্তির সন্ধান মেলে। তাঁর রচনার চরিত্র সংস্কারকামী। সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রচনাতেও এই সংস্কারকামিতা লক্ষণীয়। সিরাজীর 'মহাশিক্ষা' কাব্যে প্রসঙ্গক্রমে হজরত মোহাম্মদের উল্লেখ রয়েছে। মোজাম্মেল হকের 'হজরত মুহাম্মদ' কাব্যই বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে প্রথম জীবনী-মূলক কাব্য। মোজাম্মেল হক কাহিনী-বিন্যাসে পুঁথিকাব্যের অনুসরণ করলেও ভাষা ব্যবহারে 'দোভাষী' পুঁথির অনুসরণ করেননি, এ ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন মুসলিম কবি জৈনুদ্দীন, মুহম্মদ সগীর, আলাওল, সৈয়দ সুলতান প্রমূখের রসুলের জীবনীমূলক কাব্যের ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছেন।

www.pathagar.com

'দোভাষী'-পুথিকাব্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামই আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার রীতিকে সুপ্রচলিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় হজরত মোহাম্মদ প্রশস্তি রূপ পেয়েছে। সমালোচকদের ধারণা, ফারসী সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যে হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কিত এমন মনোরম গানের সন্ধান মেলে না। নজরুলের 'সাহারাতে ফূটলরে ফুল', 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে', তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে, 'তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম' ইত্যাদি গান-গজল এবং 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহমঃ 'আবির্ভাব ও তিরোভাব' প্রভৃতি কবিতা বাঙ্গালী পাঠকদের চিত্তে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। নজরুল ইসলাম নবী-প্রশস্তি মূলক গজল গান রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছেন। পরবর্তী কবিদের ইসলাম ধর্ম -সম্পর্কিত এবং নবী-প্রশস্তিমূলক রচনায় এ ধারার প্রভাব অপরিসীম।

নজরুলের 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাব্যটি পুর্ণাঙ্গ না হলেও এতে নজরুলের ভক্তি বিহ্বলচিত্ত ও নিবেদিত মনের চমৎকার পরিচয় ফটেছে। বিষয় অনুসারে কাব্যটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনায় ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে নজরুল পুঁথিকাব্যের ধারা অনুসরণ করেছেন। 'অনাগত' অধ্যায়ে বলেছেন–

সহসা জাগিলে সাধ,
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।
অটল মহিমা গিরি-গুহা-ত্যাজি -কে বুঝিবে' তার লীলা
বাহিরিয়া এলো সৃষ্টি প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলারাজ
ভাবিল সৃজিবে পুতুল খেলার মানুষ সৃষ্টি মাঝ।
আদিম মানব "সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন যাও কর খেলা ঐ ধরার অঙনে গিয়া!
কহিলেন প্রভু "ভয় নেই,দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে–জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।
আমা হতে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো–
মোহাম্মদ সে, দিনু তাঁহারেই তোমারি বাসিয়া ভালো!

নজরুলের পূর্বসূরী কবি গোলাম মোস্তফার 'মানুষ' শীর্ষক খন্ড কবিতাটিতেও সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার এই প্রচলিত ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। কবি গোলাম মোস্তফা অবশ্য কবিতাটির শেষাংশে নতুন অর্থ আরোপের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'বনি আদম' শীষক কাব্য কাহিনীতেও একই ধারার অনুসৃতি রয়েছে।

www.pathagar.com

অন্তরীক্ষে থাকি'
কহিলেন খোদা সব ফেরেশতারে ডাকি-
"শোন ফেরেশ্‌তারা আমি দুনিয়ার পরে
অপূর্ব নূতন এক জীব-সৃষ্টি তরে
করেছি মানস। "আদম " তাহার নাম;
তারি মধ্য দিয়ে আমি মোর মনস্কাম
পূর্ণ করে নিতে চাই। সে হবে আমার
একমাত্র প্রতিনিধি; দেহ হবে তার
দুনিয়ার মৃত্তিকায়, আত্মা হবে নূর,
আমারি জ্যোতিতে তার চিত্ত ভরপুর
হয়ে রবে নিশিদিন। নিখিল সৃষ্টির
সার সৃষ্টি হবে সেই। -(মানুষ)

নজরুলের উত্তরসূরী কবি ফররুখ আহমদের রচনায় হজরতের আবির্ভাব দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে অনুপম কবি-ভাষায়। আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে ফররুখ আহমদ নজরুলের অনুসারী, কিন্তু ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে এবং উপমা উৎপ্রেক্ষা রচনার সৃজন-শীলতায় তিনি উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যেও তাঁর ঝোঁক প্রতীক ব্যবহারের দিকে।

ঐ আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুকে ঘন হয়ে উঠে নীল মর্‌কত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বপদ রাত্রি আহত সুপ্ত নিমেষ মাঝে,
থির বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।

(সিরাজাম মুনিরা)

হজরতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতায় সংস্কারকামী মনের প্রতিফলন ঘটেছে এই ভাবে:

তবু ভাঙালো কি, ঘুম ভাঙালো কি , ঘুম ভাঙালো এ অন্ধদের
আজবিস্মৃতি তোলে যে আড়াল তোমায় দিনের এই দিনের।
এখানে যে ম্লান কদর্য তার ছবি আর ক্ষুধা যায় কি সেথা,
গড়ায় বিপুল অজগর তার লেলিহান ক্ষুধা বিপুল ব্যথা
আকাশে আকাশে তারি বিষাক্ত প্রশ্বাসে হেরি মূর্ছাতুর
আলো বিহঙ্গ ভোলে হে সূর্য তোমার শেখানো পথের সুর।

(সিরাজাম মুনিরা)

www.pathagar.com

ইসলামের আদর্শচ্যুত হতমান জীবনের ক্লান্তি-কীর্ণ রূপ চিত্রিত হয়েছে ফররুখ আহমদের পূর্বসূরী কবি আবদুল কাদিরের রচনায়। তিনি হজরত মোহাম্মদের শরণ নিয়েছেন অধঃপতিত জীবনের উত্থান-কামনায়।

জড়তার রূঢ়স্পর্শে মূহ্যমান মোদের জীবন,
ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, বিকৃত, পাণ্ডুর।
হৃস্তের স্তিমিত শিখা মন্ত্রমে হে নিভেছে কখন;
পদধ্বনি শুনি যে মৃত্যুর।
তপস্যারে বিস্মরিয়া চলিয়াছি গতানুগতিক;
তোমারি দোহাই দিয়া সাজিয়াছি অন্ধ পৌত্তলিক।
চাহি না জীবন-স্বাদ, বুদ্ধিতীপ্ত আত্মার সৌরভ,
দৃষ্টি অভিনব,
জীবনের উচ্ছাসে এ যোগ নিদ্রা ভেঙে দাও ত্বরা,
করো করো জাগ্রত মহান।
প্রত্যয়ের শিখা-রূপে সত্য-দীপ্তি দাও প্রাণ-ভরা,
দৃঢ়কণ্ঠে করহ আহ্বান ॥
সংঘাতে সংকটে দাহে প্রেমে বন্ধে অনন্ত পথের।
বিচিত্র জীবন তব তুলি, ধরো সম্মুখে মোদের।
কর্মে কর্মে বিকশিয়া ছুটে যাই অসীমের পানে
নির্ভীক পরানে ॥

–ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম।

তালিম হোসেনের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে রিক্ত যুগের আর্ত হাহাকার। রিক্ত দীন মানবতার উত্থান কামনায় তিনি হজরত মোহাম্মদের করুণা-প্রার্থী হয়েছেন। বিশ্বাসের প্রোজ্জ্বল শিখায় তাঁর চেতনা ভাস্বর কারন তিনি জানেন, হজরত যে করুণার প্রতীক ছিলেন। তার প্রভাবে যুগের বিরাণ মাঠে পুনরায় ফুল-ফসলের সমারোহ দেখা দিতে পারে।

করুণার মেঘ আনো চেতনার উষর প্রান্তরে
যুগের ক্রন্দন শোন রাহ্মাতুল্লিল আলামীন।
সমুদ্র নিখোঁজ হলো আদিগন্ত এই বালুচরে
মৃগতৃষ্ণিকার চক্রে কণ্ঠে জাগে তৃষ্ণা অন্তহীন।
মেঘ নাই বৃষ্টি নাই, চাহি নাই সে স্নিগন্ধ আর্দ্রতা
নিষ্পলক রৌদ্র দাহে বিদগ্ধ এ নির্মম মানস;

www.pathagar.com

যুক্তির সবিতৃ তলে জ্বলে রিক্ত দীন মানবতা
সত্য অন্বেষার নামে আত্মরতি বস্তু-পরবশ।
সুদূর সমুদ্র হতে এ মরুতে আনো বন্যা মেঘ
অশ্রান্ত শ্রাবণ তার এনে দিক আশ্বিনের সোনা
রৌদ্রদগ্ধ মাঠে মাঠে' আজিকা অশান্ত উদ্বেগ
প্রীতির আবেগ হয়ে শ্যামচ্ছায়া করুক রচনা।
ফুল ফসলের মাঠে নিষ্করুণ বন্ধতার ঘাঁটি
আবার নিশ্চিহ্ন হোক, এনে দাও প্রাণ-পলিমাটি।

–রাহমাতুল্লিল আলামিন

মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের বাংলা কাব্যে হজরত মোহাম্মদের প্রসঙ্গে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নবী প্রশস্তিমূলক কবিতার ধারায় ক্রমান্বয়ে ভক্তিবাদের বদলে আধুনিক যুক্তিবাদী মনে প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে কাব্যের আঙ্গিকের যেমন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তেমনি তাতে দেখা দিয়েছে যুগ-সমস্যার ছায়া এবং সেই সমস্যা-উত্তরণের আর্তি। কাহিনী নির্ভরতার বদলে বর্তমানে কাব্যের উপজীব্য হয়েছে ইসলামী আদর্শ ও হজরত মোহম্মদের সত্য-সন্ধানী জীবনের মহান শিক্ষা। সেই আর্দশ ও শিক্ষাই আধুনিক কবিদের নবী-বিষয়ক কবিতায় আলোক শিখার মতো বিচ্ছুরিত।

[জাহানে নও এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মাদকাসক্তি ও অপসংস্কৃতিমুক্ত সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ব মানবের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন আদর্শ মানব ও শ্রেষ্ঠ রাসুল রূপে। তাঁর নবুয়ত লাভের পূর্বে বিশ্বে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। পৃথিবী অপসংস্কৃতি, অনাচার, অত্যাচার ও কুফরী, ধর্ষণ, স্বাধীন নরনারী ও শিশুকে জোর পূর্বক বিক্রি করা, রাজা বাদশা ও গোত্রীয় প্রধানকে পরম পূজনীয় মনে করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা, সাধারণ ব্যাপারে গোত্রে গোত্রে অনেক বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, বিবাহ, তালাক ও ক্রয়-বিক্রয়ে অদ্ভুত প্রথার অনুসরণ, কন্যা সন্তানকে জীবিত কবরস্থ করা, জুয়া, পাশা, মাদকাসক্তি দেব-দেবীদের নামে পশু উৎসর্গ করা, খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তৈরী মূর্তিকে সাদরে ক্ষুধার তাড়নায় ভক্ষণ করা একজন পুরুষের বহু নারী বিবাহ করা, একজন নারীর বহু পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিবস্ত্র অবস্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ করা, বিভিন্ন মূর্তির নাম সংযোগ করে হজ্জের তালবিয়া পড়া, বেচা-কেনা ও লেন-দেনে প্রতারণামূলক পন্থা অবলম্বন, নারী জাতিকে বিরক্ত করা, ওজনে কম দেওয়া, অভিজাত্যের অহংকা ও বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি অপসংস্কৃতিতে সমাজ ছিল জরাগ্রস্থ। এ ছিল তৎকালীন সমাজের সাধারণ চিত্র। তবে তাদের মধ্যে অনেক সৎগুণও ছিল। সে অন্ধকার সমাজেও অনেক জ্ঞানী লোক মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতেন, সূরা পান করতেন না, মেহমানের সেবা, পথিক মুসাফিরের সেবা করাকে পূন্য কাজ মনে করতেন। তবে তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না।

উপরোক্ত অপসংস্কৃতি ও মাদকাসক্তিতে পূর্ণ একটি সমাজকে আল্লাহর প্রিয় নবী বিশ্বসংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থায় কিভাবে পরিশুদ্ধ করলেন এবং মুর্তির যারা পূজা করতো তাদের দ্বারা মূর্তি পূজার অবসান ঘটালেন, যাবতীয় অপসংস্কৃতি থেকে সমাজকে মুক্ত করলেন, এমনকি সে সমাজকে তিনি রূপান্তরিত করলেন আদর্শ সমাজে, রূপান্তরিত করলেন তাঁর অনুগামীদেরকে সৎপথের নক্ষত্ররূপে। সে পরিশীলিত সমাজে ছিল না কোন অপসংস্কৃতি, ছিল না কোন মাদকাসক্তি , ছিল না অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন, ছিলনা কোন ঘুষ, সুদ ও অন্যায়ের সুপারিশ। হযরত উসামা (রাঃ) একবার সুপারিশ করলে মহানবী (সাঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন, আল্লাহর বিধান প্রয়োগ না করার জন্য তোমরা সুপারিশ

www.pathagar.com

করছো। আল্লাহর কসম, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরির অপরাধ করত তবে আমি তার হাতও কর্তন করতাম। যে সব অপরাধে শাস্তি কঠোর যেমন প্রস্তর নিক্ষেপ করে প্রাণ সংহার, সেসব অপরাধ নিজে স্বীকার করে শাস্তি প্রয়োগের জন্য নিজেকে মহানবীর (সাঃ) আদালতে হাযির হয়ে কাকুতি করার নজীর এ সমাজের, এ সংস্কৃতি একটি অনুকরণীয় চিত্র। এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সঃ) কত বড় সংস্কারক, কত মহান পরিশুদ্ধকারী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদত্ত রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় দলীয় লোক, নিকটাত্মীয় এবং প্রিয়জনদের বেলায় কোন ছাড় ছিল না, আইনের প্রয়োগ ছিল সবার জন্য সমান। মহানবীর (সাঃ) সংগে একজন খাদেম ছিলেন যিনি মালে গনীমতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। তার মৃত্যু হলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। সাহাবীগণ দেখলেন যে, সে একটি জুব্বা অনুমতি ছাড়া গনীমতের মাল থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। (বুখারী শরীফ ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২)।

ন্যায়-নীতির অনুসরণে মহানবী (সাঃ) নিজেও ছিলেন অতি কঠোর। একবার তিনি তাঁর শয্যায় একটি খেজুর পেয়ে আহার করলেন। পরক্ষণেই খেয়াল হল যে, এ খেজুরটি সাদকার নয়তো? এ চিন্তায় তিনি সারা রাত ঘুমালেন না। একবার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে হাত তুলে দোয়া করে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! কিন্তু সে যা আহার করে তা হারাম, যা পান করছে তা হারাম, যা পরিধান করছে তা হারাম, সে লালিত হয়েছে হারাম দ্বারা, তাই তার দোয়া কবুল হবে কিরূপ?

হযরত বিশর ইবন হারিস (সাঃ) বলেন, আমার গোশত খাওয়ার বাসনা হয়। কিন্তু হালাল দিরহামের ব্যবস্থা করতে না পারাতে আমি চল্লিশ বছর যাবত গোশত আহার করিনি। বিশ্বনবীর (সাঃ) আদর্শ মেনে চলা, আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতা ইত্যাদি মৌলিক ন্যায় -নীতির প্রতি বিশ্বাসী হয়ে চলা ছাড়া আদর্শ সমাজ গঠন, অপসংস্কৃতি ও নৈতিক অবক্ষয় রোধের অন্য কোন বিকল্প নেই। আমাদের ব্যক্তি জীবনে সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, শিল্পে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে যেসব অন্যায় ও অপসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে সেগুলো থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে মহানবী (সাঃ) যেভাবে চেষ্টা করেছেন মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে এবং অন্তরে তাকওয়া ও আনুগত্য সৃষ্টি করতে সেভাবেই চেষ্টা করতে হবে। যখন কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবা শরীফের দিকে পরিবর্তন করা হলো । এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর মদীনার পবিত্র মসজিদে নববীতে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হল। মদীনার অন্য এক মসজিদে যারা দু'রাকাত সালাত আদায়ের পর সালাতের মধ্যেই ঘোষণা শুনতে পেলেন যে, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত

www.pathagar.com

আদায়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাঁরা সালাতে থাকা অবস্থায় অবশিষ্ট দু'রাকাত কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আদায় করলেন। এই ছিল সাহাবীগণের আনুগত্য। অনুরূপ সূরা নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে মদীনার বাসিন্দাগণের মধ্যে যারা সূরা পান করতেন তারা এমন আনুগত্য প্রকাশ করলেন যে, কারো হাতে সূরার পাত্র আছে এক চুমুক পান করেছেন, হুকুম শুনার পর পাত্র মুখ থেকে পৃথক করে ফেলেন এবং দ্বিতীয় বার আরেক চুমুক পান করা থেকে বিরত থাকলেন এবং পাত্র হাত থেকে ফেলে দিলেন। যাদের ঘরে সূরা মওজুদ ছিল তারা সব সূরা নালা-নর্দমায় ফেলে দেন। মহানবী (সাঃ) মানুষের মনে নৈতিক উন্নয়নের যে বিপ্লব সৃষ্টি করেন তা ছিল অনন্য ও অসাধারণ । এরূপ পরিবর্তন সাধন ওহী প্রাপ্ত নবী অথবা তাঁর আনুগামী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে মাদকাসক্তি ও অপসংস্কৃতির চিত্র ঃ বর্তমান বিশ্বে মাদক সমস্যা একটা মারাত্মক সমস্যা, মাদক দ্রব্যের ছড়াছড়িতে বিভিন্ন দেশে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। মাদক দ্রব্যের পাচারের কারণে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং দেখা দিচ্ছে নানা ধরণের অপরাধ। এ অপরাধ প্রবণতা সামাজিক জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে এবং যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। যুব সমাজের এ বিভ্রান্তির ফলে জাতীয় জীবনের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সহিংসতা, সন্ত্রাস, মাস্তানী ও জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদিতা। বৃদ্ধি পাচ্ছে হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, লুটতরাজ, ডাকাতি এবং পকেট মারার মত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। এ অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্বের সামাজিক পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নিবে শিগগিরই। বিড়ি -সিগারেট, পাইপ- হুঁকো, নস্যি, গুল, দোক্তা, জর্দাপাতা, কোকেন, হিরোইন, ওপিয়াম, গাঁজা, ফেনসিডিল সবই ক্ষতিকর। সাম্রাজ্যবাদ একদা তার উপনিবেশের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থানকে অবদমনের নীরব মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছিল নেশাকে। ইংরেজরা ভারতে আফিম আবাদে উৎসাহিত করেছিল। ধুমপান, গাঁজা মদ ইত্যাদি থেকে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। তামাকের মারাত্মক বিষ প্রতিবছর কমপক্ষে ৩০ লাখ জীবন ছিনিয়ে নেয়। ধোঁয়া বিহীন তামাক সিগারেটের চেয়ে মারাত্মক।

ধুমপানে ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এক প্যাকেট সিগারেট পানিতে গুলে সে পানি ইঁদুর কিংবা খরগোসকে খাওয়ালে সেই ইঁদুর কিংবা খরগোস তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। তামাক ব্যবহারে সহজে যে সব রোগ হতে পারে, সেগুলো হল, ঠোঁটের ক্যান্সার, গলার ক্যান্সার, জিহবার ক্যান্সার, জরায়ুর ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণতা, কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ব্রংকাইটিস ইত্যাদি। আমেরিকা ও

www.pathagar.com

বৃটেনের ক্যান্সার সমিতি ১৯৫৪ সালে দু'টি পৃথক জরিপে প্রমাণ করে যে, ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যু হার অধিক। তামাকের উৎপাদন অর্থনৈতিক দিক থেকে যতটুকুন সুখকর, মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের দিক থেকে তা হাজারগুণ বেশি অসুখ ও ক্ষতির উপকরণ। বর্তমানে দেশী-বিদেশী মদ, সিগারেট ও গাঁজার নেশা গ্রাস করতে বসেছে যুব সমাজকে। গ্রাম-গঞ্জের খালবিলে, বন-জংগলে, ঝোপ-ঝাড়ে, আম-কাঁঠালের বাগানের আড়ালে -আবডালে এক শ্রেণীর উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরার দল গাঁজার আসর জমায়। পাড়ার মাস্তান, গ্রামের টাউট-বাটপার ও ভণ্ড পীর-ফকীরদের আস্তানায় তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ ও চেলার দল গাঁজার আসর জমায়, এক রকম প্রকাশ্য স্থানেই। কোন কোন গাঁজার আসরে সমস্বরে কোরাস চলে ঃ

গাঁজা কে খাবিরে আয়
গাঁজা খেলে স্বর্গ পাবি বসে নিরালায়।
গাঁজা কে খাবিরে আয় ॥
একছিলিমে যেমন তেমন
দুই ছিলিমে মজা।
তিন ছিলিমে ওজির নাজির
চার ছিলিমে রাজা।
গাঁজা কে খাবিরে আয়
গাঁজা খেয়ে শুয়ে থাকি
টুয়াতে আংগিনা দেখি,
বাজার দেখি তাল গাছের আগায়।
গাঁজা কে খাবিরে আয়।
গাঁজা কে খাবিরে আয় ॥

পরিমাণ ও প্রকারের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করাটাই শয়তানী ও কুৎসিত কাজ বলে ইসলামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং নেশার জিনিস হবার ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ও ধরণ পরিমাণের প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। কি দিয়ে তৈরি, দেশী না বিদেশী, কম বা বেশির প্রশ্ন কিংবা উপকারের দোহাই দেওয়ার কোন অবকাশ নেই।

যা বেশি পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার এক ফোঁটাও হারাম। মাদকের নাম যাই হোকনা কেন তা হারাম। দৈনিক ইনকিলাবে "মাদকাসক্তের আর্তি" শিরোনামে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে মাদকাসক্তদের অবস্থার অনুমান করা যায়।

একজন বললো, হেরোইন সেবন করি বলে আমার সংগে স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা কথা বলে না। আরেকজন জানালো, আমার মেয়ের তালাক হয়ে গেছে। এক মায়ের করুণ

www.pathagar.com

আর্তি, মাদক সেবন করে এক ছেলে মারা গেছে, আরেকটি আর হারাতে চাই না। দশম শ্রেণীর এক ছাত্র জানালো, গাঁজা খেলে মনে ফুর্তি থাকে, লেখা পড়া ভাল হবে, একজনের এরূপ উপদেশে গাঁজা সেবন করা ধরেছি। এখন বুঝি কি ভুল করেছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের বাঁচান। (ইনকিলাব, আগষ্ট ১৯৯৫ ইং)।

কোন কোন রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশে বছরে ৫০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য আসছে। আর ধূমপায়ীদের সংখ্যা ১ কোটি ৪০লাখের উর্ধ্বে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, যে দুনিয়াতে শরার পান করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে উষ্ণ পানি পান করতে দেবেন। শরাব সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। প্রথম আয়াত হল সুরা নাহলের---------।

'আর খেজুর গাছের ফল ও আংগুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন– আয়াত ৬৭।

দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় হযরত উমর ও মুয়ায ইবন জাবল (রাঃ) এর প্রশ্নের উত্তরে। লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন উভয়ই মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। বাকারা ঃ ২১৯।

যেহেতু পাপ অধিক. তাই অনেকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর একদম ছেড়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাসংগিক ঘটনা ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) এর ঘরে কয়েকজন সাহাবীর দাওয়াত ছিল। মদ পান করার পর তাঁরা মাগরিবের সালাতে দাঁড়ালেন। ইমাম সূরা 'কাফিরুন' তেলাওয়াত করলেন, এত যত 'লা' অক্ষর আছে সব বাদ দিয়ে পাঠ করলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ন হল ঃ

'হে মুমিনগণ, মদ্যপানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না। (নিসা ঃ ৩৩)

উতবান ইবন মালেক (রাঃ) এর ঘরে দাওয়াত ছিল। খাওয়া-দাওয়া হল। এতে হযরত সাদ ইবন ওয়াক্কাস (রা)ও শরীক ছিলেন। একজন কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাতে আনসারদের নিন্দা ছিল। একজন আনসারী সে কবির মাথায় আঘাত করলো। নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে এ ঘটনা জানানো হলো। হযরত উমর (রাঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এ ব্যাপারে স্পষ্ট হুকুম নাযিল করুন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক সূরা ঘৃন্য বস্তু শয়তানের কাজ। তাই তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। মায়িদা ঃ ৯০।

www.pathagar.com

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও সালাত আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না। ৫ ঃ৯১।

সাহাবা (রাঃ) গণ এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বললেন, আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।

এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল এ জন্য যে, ইসলাম সব পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণকে মানুষের সকল প্রয়াস প্রচেষ্টা, ইচ্ছা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্র ও অভীষ্ট লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। দীন ও ইসলাম এর মানেই হচ্ছে বান্দা তাঁর প্রভুর সন্তুষ্টির সামনে মাথা নত করে দিবে এবং যাবতীয় কাজে তাঁর ইচ্ছার অনুগত থাকবে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে। মানুষ তাঁর স্রষ্টার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে সামনে রেখেই তার জীবনের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিবে, সে এমন কোন কাজ করবে না, এমন কোন কথা বলবে না যাতে তার প্রতিপালক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। মনে রাখতে হবে, কেবল মাত্র বৈষয়িক উন্নতি যাতে আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নেই তা মানুষকে কখনো স্বস্তি দান করতে পারে না।

শিশু ও সাহিত্যের যাবতীয় কর্ম --মন্দ অন্যায় ও অশ্লীলতা দমনে সহায়ক না হলে তা ইসলামী সাহিত্য -শিল্প বা সংস্কৃতি হতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতির আসল কথা হল, পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সচ্ছলতা, মানবীয় মর্যাদা, ঈমান, তৃপ্তি ও সত্যপথ অনুসরণে উৎসাহিত করা। ইসলামী সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তার সংবিধান হল, আল কুরআন, তার লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি, এ সংস্কৃতি মানুষকে সসীম, সীমাবদ্ধ রাখে না বরং তাকে নিয়ে যায় অসীমের দিকে।

ডঃ ইকবাল বলেন ঃ নিজেদের মিল্লাতে ইসলামীয়াকে তোমরা পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও তাদের সংস্কৃতির সাথে তুলনা করো না, কারণ রাসুলে হাশেমীর উম্মতের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের, যা অন্য সম্প্রদায়ের আচার ও রীতিনীতির সাথে তুল্য নয়।

কাফির সম্প্রদায় পৃথিবী ও পরিবেশ নিয়ে মত্ত থাকে। আর মুমিনের পরিচয় হল, পরিবেশ তাকে ঘিরেই সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবী তার পিছনে চলে।

আজকের উন্নতির দাবীদার সম্প্রদায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানবতার জন্য কি উৎসর্গ করবে! তারা তো জাতীয় স্বার্থে প্রতিমা পূজার উর্ধ্বে এখনো উঠতে পারেনি।

www.pathagar.com

তারা দেহের তৃপ্তি ছাড়া আত্মার তৃপ্তি, আখিরাতের সাফল্য সম্পর্কে মানবজাতিকে কিছুই দিতে পারেনি। এ সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। মহানবী (সাঃ) উভয় জাহানের কল্যাণের শুধু সন্ধানই দেননি, তিনি দু'জাহানের কল্যাণ লাভের বাস্তব পথে নিজেও চলেছেন এবং মানব জাতিকে সে পথে চলতে উৎসাহিত করেছেন। সাহাবীগণ (রাঃ) সে পথে চলে নিজেরাও সফলকাম হয়েছেন এবং মানবজাতির অভূতপূর্ব কল্যাণ ও উপকার সাধন করেছেন।

'আল্লাহর কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি কামনা কর--চোখের নুর ও অন্তরের নূর এক জিনিস নয়। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনেক রকমের অপসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে। আমরা এসব সম্বন্ধে সতর্ক না হলে এবং এসবের প্রতিরোধে সোচ্চার না হলে আমাদের সমাজের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে পড়বে।

আমাদের একশ্রেনীর ব্যবসায়ী নারী মূর্তি তৈরী করে দোকানে প্রদর্শন করছে। অথচ এসব শরীয়তে নিষিদ্ধ, কিন্তু তারা তা লংঘন করছে।

পণ্য দ্রব্য বিক্রির জন্য মডেল কন্যার ছবি ব্যবহার করছে। এখন প্রায় দোকানে ক্রেতা পণ্য ক্রয় করতে গেলে তিনি দেখতে পাবেন দোকানে এমনকি রাস্তায় ও স্থানে পণ্যের বিজ্ঞাপন সম্বলিত মডেল কন্যার ছবি। এসব অপসংস্কৃতি ও গর্হিত কাজ। যে স্থানে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশেতা প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন, অর্থাৎ তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন।

সুন্দরী প্রতিযোগিতা আমাদের দেশে ছিল না। পাশ্চাত্যে মেয়েকে ভোগ্যপণ্য মনে করা হয়, মা বা বোন বা কন্যা মনে করা হয় না। মনে করা হয় ভোগ্যপন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীজাতির সৌন্দর্যকে পণ্যদব্য হিসেবে ব্যবহার ও তার মর্যাদাহানি করা মহাপাপ। এদের দাইয়ূস বলা হয়। এটা অপসংস্কৃতি। কিন্তু পত্রিকা মারফত প্রকাশিত হল যে, আমাদের দেশের রাজধানী ঢাকাতেও এ গর্হিত শয়তানী কাজটি চালু হয়ে গেছে।

বিউটি পার্লার ঃ অতি অল্পদিনের মধ্যে এর অনেক শাখা বিস্তার লাভ করেছে। এর মাধ্যমে অনেক অসামাজিক কর্মকাণ্ড সমাজে প্রসার লাভ করছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। এগুলো অপসংস্কৃতিরই অংশ। এর প্রতিরোধ করা না গেলে সমাজ অধঃপতনে যাবে উত্তরোত্তর।

লটারী ঃ এ ব্যবসা হারাম, কিন্তু সবার চোখের সামনে এ হারাম কাজটি চলছে। এর প্রচার চলছে প্রকাশ্যে। প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা বা উদ্যেগ নেই। হারামের প্রসারে সমাজের পতন অনিবার্য।

www.pathagar.com

এছাড়া আরো অনেক অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে। ইবাদত, লেনদেন, বেচাকেনা, সমাজনীতি, প্রেমনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি কর্মকান্ডে অনেক অন্যায় ও অপসংস্কৃতি ঢুকেছে। যথাসময়ে সেগুলোর প্রতিরোধ না করলে এবং সমাজকে এসব অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে না পারলে আমাদের পতন অবধারিত।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ, পরিশীলিত ও অনুসরণীয় ধর্ম। নবী করীম (সাঃ) আমাদের অপসংস্কৃতি মুক্ত সমাজ উপহার ও আমানত রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা সে পরিশীলীত ধর্মকে তার আসল রূপে টিকিয়ে রাখতে পারিনি। নানা কুপ্রথা ও অপসংস্কৃতি এতে স্থান পাওয়াতে আজ আমাদের মর্যাদা ও গৌরব ভুলুণ্ঠিত। সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায় আজ বিপর্যস্ত । কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হওয়া মুমিনের শান নহে। সারা বিশ্বের অপসংস্কৃতি দূর করতে, মানুষকে মুক্তির দিশা দিতে মুসলিম যুব সমাজ ও হক্কানী আলেম ও মুজাহিদদের এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর প্রেম, মানুষের প্রেম, মানুষের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ প্রেমের পথ দেখিয়ে মানব সমাজকে বিধ্বংসী নেশা ও যাবতীয় অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করে প্রকৃত কল্যাণ ও আল্লাহর মুহাব্বতের পথ দেখাতে হবে।

আমরা অনাবাদী জমি দেখে নিরাশ নই-সামান্য যত্ন ও স্বল্প পানিই এর আবাদের জন্য যথেষ্ট। কেননা, এ মাটি খুবই উর্বর।

[প্রবন্ধটি পবিত্র সীরাতুন্নবী ১৪১৬ হিজরী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে পঠিত]

www.pathagar.com

ইলমে হাদীস ঃ পরিভাষা সংজ্ঞা ও পরিধি

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল খালেক

সহীহ বুখারী ও মুসলিম-এর ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে যে, সাহাবী ঐ প্রত্যেক মুসলিমকে বলা হয় যিনি রাসুল (সঃ) এর দর্শন লাভ করেছেন, যদিও কিছুক্ষণের জন্য হোক। সাহাবীর পরিচিতিতে এটাই বিশুদ্ধ মতবাদ। এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু আব্দুল্লাহ আল-বুখারী এবং সম্মিলিত মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত।

ফিকহ্ শাস্ত্রবিদদের অভিমত ঃ ফিকহ শাস্ত্রবিদ ও মূলনীতিবিদদের অধিকাংশের অভিমত হলো যে, মুসলিম রাসুল (সঃ) -এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁকে সাহাবী বলা হয়।

কারো কারো মতে ঃ সাহাবী সেই মুসলিম ব্যক্তিকে বলে, যিনি রাসুল (সঃ)-এর অনেক সাহচর্য ও ধারাবাহিক সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

মু'জামুল অসীত গ্রন্থকারের উক্তি ঃ সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি ঈমান সহকারে রাসুল (সঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন। সাহাবীর পরিচয়ে এ উক্তিটিই বাস্তবানুগ ও সর্বজনবিদিত।

সাহাবীগণের মর্যাদা ঃ সাহাবীদের ব্যাপারে মহানবী (সঃ)-এর বাণী হলো- 'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আমার পরে আমার সাহাবীদের মতভেদ সম্পর্কে আমি মহান আল্লাহকে প্রশ্ন করলে আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের তারকামন্ডলী সদৃশ। তাঁদের মধ্যে অন্যের তুলনায় শক্তিশালী এবং তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই নূর বা জ্যোতি রয়েছে। সুতরাং তাঁদের মধ্যে পরস্পর বিরোধমূলক যে কোন বিষয় কোন ব্যক্তি গ্রহণ করুক না কেন সে আমার নিকট হিদায়াত প্রাপ্ত। অতঃপর রাসুল (স) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণ তারকারাজির ন্যায়। তোমরা তাঁদের থেকে যে কোন একজনের অনুসরণ করলে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।

সাহাবীদের সম্পর্কে সমালোচনা করা, বা বিরূপ ধারণা করা জায়েয নেই। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাঁদের ব্যাপারে কটুক্তি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

তাবেয়ী ঃ রাসুল (সঃ) -এর প্রতি ঈমান পোষণকারী যে সব লোক সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন, কিংবা অন্তত কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তাদেরকে 'তাবেয়ী' বলা হয়।

www.pathagar.com

তাবে'-তাবেয়ী ঃ রাসূল (সঃ) -এর প্রতি ঈমান পোষণকারী যে সকল লোক উক্ত তাবেয়ীদের কারোর নিকট দ্বীনি ইলম এবং বিশেষভাবে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তাঁদের সহচার্য গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে তাবে' -তাবেয়ী বলা হয়।

মুহাদ্দিস ঃ যাঁরা হাদিস চর্চা করেন এবং হাদিসের সনদ-মতন, বিশুদ্ধতা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন, তাঁদেরকে 'মুহাদ্দিস' বলা হয়।

শায়খ ঃ হাদিস শিক্ষাদানকারী মুহাদ্দিসকে তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কের জন্য 'শাইখ' বলা হয়।

হাফিযে হাদিস ঃ যে মুহাদ্দিস সনদ ও মতনের বিস্তারিত বিবরণসহ হাদিস আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন, তাঁকে হাফিজে হাদিস' বলা হয়। আর এরূপে সমস্ত হাদিস আয়ত্তকারীকে বলা হয় 'হাকেমে হাদিস'।

সিহাহ সিত্তাহঃ সিহাহ সিত্তাহ মানে ছয়খানা সহীহ হাদিস গ্রন্থ। যেগুলো হচ্ছে-

১. **সহীহ্ বুখারী ঃ** রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রঃ) (১৯৪-২৫৬ হিঃ)

২. **সহীহ মুসলিম ঃ** রচয়িতা মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রঃ) (২০২-২৬১ হিঃ)

৩. **জামে তিরমিযী ঃ** রচয়িতা আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) (২০৯-২৭৯ হিঃ)।

৪. **সুনানে আবু দাউদ ঃ** রচয়িতা আশ'আস ইবনে সুলাইমান (রঃ) (২০২-২৭৫ হিঃ)।

৫. **সুনানে নাসায়ী ঃ** রচয়িতা আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী (রঃ) (২১৪-৩০৩হিঃ)

৬. **সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ** রচয়িতা মুহাম্মদ ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (রঃ) (২০২-২৭৩হিঃ)।

হাদিস ও সুন্নাহ ঃ সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো **কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি,** কর্মনীতি ও চলার পথ। উসূলে হাদিসের পরিভাষায় রাসুল (রঃ) -এর প্রবর্তিত কর্মপন্থা ও কর্মনীতেকে 'সুন্নাত' বলা হয়।

প্রাচীন ওলামায়ে কিরামের ভাষায় হাদিস এবং সুন্নাহর মধ্যে তেমন কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়নি । তাঁরা যা রাসুলের কথা, কাজ বা সমর্থনকৃত হতো তাকে কখনো সুন্নাহ বলতেন, আবার কখনো হাদীস বলতেন। তবে কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য দেখিয়েছেন।

উভয়ের মধ্যকার তারতম্য ঃ উভয়ের মধ্যে ব্যবহারিক তারতম্য নিম্নরূপ-

* হাদিস হলো যাবতীয় ব্যাপারে মহানবী (সঃ) কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও আচার-আচরণের বিবরণ। পক্ষান্তরে, সুন্নাহ হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর শরিয়ত সম্পর্কিত যাবতীয় নীতিমালা ও কর্মপন্থা।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবন বিধানের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কল্পে পবিত্র কুরআনে হাকিমের পরবর্তী স্থান আল-হাদিসের। আর মহানবী (সঃ)-এর মুখ নিঃসৃত এ বাণীসমূহ যুগে যুগে হয়েছে সংরক্ষিত। যা মহানবী (সঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় সংকলন প্রয়োজন পড়েনি। পরবর্তী সময়ে এগুলো নির্ভূল তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে ।

মহানবী (স) ও সাহাবীগণের সময় হাদিস শাস্ত্র সংকলিত না হওয়া কারণ ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের সময় হাদিস শাস্ত্র সংকলিত না হওয়ার যে সব যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান, তা নিম্নরূপ ঃ

১. **মহানবী (স) এর নিষেধাজ্ঞা ঃ** মহানবী (সঃ) নিজেই ইরশাদ করেন তোমরা আমার থেকে হাদিস লিখে রেখো না, আর যদি কেউ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রাখ, তাহলে তার উচিত তা (হাদিস) মুছে ফেলা। নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল, কুরআনকে হাদিসের মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখা।

২. **সাহাবীগণের তীব্র স্মৃতিশক্তি ঃ** সাহাবীগণের স্মৃতিশক্তি ছিল সুতীব্র। তাঁরা শ্রবণ করেই তা অনেক দিন যাবত সরাসরি মুখস্থ রাখতে পারতেন। তাই হাদীস সংকলন প্রয়োজন পড়েনি।

৩. **কুরআন ও হাদিস একত্রিত হওয়ার আশংকা ঃ** মহানবী (সঃ) এর কাছেই কুরআন শরিফ নাযিল হত। আর পবিত্র কুরআন তখন বিক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল। তাই হাদিস লিখে রাখলে কুরআনের সাথে মিলে যেতে পারে এ ভয়ে হাদিস সংকলন তখন বন্ধ ছিল।

৪. **উপকরণের অপ্রতুলতা ঃ** মহানবীর (সঃ) সময়ে লেখার প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল অনেকাংশেই কম। এ ছাড়াও লেখার পদ্বতি ছিল অনুন্নত এবং স্বাক্ষর জানা ব্যক্তির সংখ্যা ছিল অতি-নগন্য। পাথরে খোদাই করে লিখন পদ্ধতি কঠিন ও মুখস্থকরণ পদ্ধতি সহজ হওয়ার সাহাবীগণ সংকলন করার পরিবর্তে মুখস্থ করে রাখতেন।

৫. **লেখকের সংখ্যাল্পতা ঃ** লেখার উপরকরণের অপ্রতুলতার মতই তখনকার সময়ে লেখকেরও ছিল অনেক অভাব। তাই যেসব লেখক ছিলেন, তাঁরা কুরআন সংকলনে ব্যস্ত থাকায় হাদিস সংকলন করেননি।

হাদিস সংকলনের পটভূমি ঃ সাহাবায়ে কিরামের সময়-কালের পরবর্তীতে খারিজী, রাফিজী, মু'তাযিলা ও বিদ'য়াতী প্রভৃতি মতামতের উদ্ভব হলো তারা অনেকেই মহানবী (সঃ) এর হাদিসে পরিবর্তন- পরিবর্ধন করে স্ব স্ব মতবাদের

www.pathagar.com

পোষকতায় হাদিস বর্ণনা শুরু করে। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে হাদিসের সত্যাসত্য নির্বাচন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এ সময়ও বেশ কয়েকজন সাহাবা জীবিত ছিলেন। তাঁদের থেকেই সঠিক হাদিস সংকলন শুরু হয়।

প্রথম হাদিস সংকলনকারী ঃ সর্ব প্রথম হাদিসশাস্ত্র সংকলন করার মহৎ কাজে কে ব্রতী হয়েছেন, তা নিদিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে পরবর্তী মুহাদ্দেসীনে কিরামের মতামত অনুযায়ী নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) ও হযরত রাফে ইবনে খুদাইজ (রঃ) সর্ব প্রথম বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে হাদিস সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। এ সময় অনেক সাহাবীই হাদীস সংরক্ষণে আপন শক্তি ব্যয় করেন। তাঁদের প্রবর্তিত এ গতি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়কাল পর্যন্ত ছিল। অতঃপর তিনি মদীনার কাযী আবু বকর ইবনে হাযমকে হাদিস সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। আবু বকর তৎকালীন প্রখ্যাত সুধীজন মুহাম্মদ ইবনে শিহাবের সহায়তা গ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রের আনাছে-কানাছে তিনি মুহাদ্দিস, ওলামায়ে কিরামসহ সকল সুধী মহলে সঠিক হাদিস সংকলনের নির্দেশ দেন। এ সময় থেকেই প্রধানত হাদিস লিখন শুরু হয়। এদিক থেকে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে প্রথম সংকলনকারী না বললেও প্রথম বাস্তব উৎসাহ প্রদানকারী ও হাদিস সংকলনের যথার্থ সাহায্যকারী বলা যায়। আর ইবনে শিহাব হলেন হাদিস সংকলনের প্রথম রূপকার। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ইন্তিকালের পরবর্তীতে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ আরো বেগবান ও শক্তিশালী হয়। অতঃপর– ইমাম মালিক রচনা করেন **'মুয়াত্তা'**। তাছাড়া আমর (সিরিয়ায়), আওযাই (সিরিয়ায়) সুফিয়ান সাওরী (কূফায়), সালামা (বসরায়) হাদিস সংকলন করেন।

হাদিস সংকলনে মুহাদ্দিসগণের দুর্দম্য ও অজেয় মনোভাব হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সংকলিত হয় মহানবী (সঃ) এর হাদিসের অমর বাণী, যা আমাদের জীবন বিধানকে ইসলামী মূল্যবোধের স্বর্গীয় ছাঁচে গড়ে তুলতে অতুলনীয় মাধ্যম হিসেবে গণ্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মুখনিঃসৃত সুললিতবাণী ও তার কর্মকাণ্ডই হাদিস, যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য অত্যাবশ্যক। ইহা এক সময়ে বিধৃত হয়নি বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে, আর লাভ করেছে ক্রমবিকাশ।

হাদিসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (রঃ) বলেন, অভিধানিক ভাবে হাদিস হলো কোন একটি অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ। ইহা

www.pathagar.com

মৌলিক ও অমৌলিক উভয়ই হতে পারে। এ সূত্র বিশ্লেষণই হাদিসের সাধারণ সংজ্ঞা দাঁড়ায় এরূপ, মানুষের নিকট ওহীর মাধ্যমে কিংবা স্বপ্নাবস্থায় বা জাগরণকালে যে কোন ফলদায়ক কথা পৌছে তাকেই হাদিস বলে।

ডঃ আদীব সালেহ্ এর ভাষায় ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দেসীনে কিরাম ও বিখ্যাত আলিমগণ আল-হাদিস সংকলনের ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে হাদিস গ্রন্থায়িত করণের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন। যথা- ১. লিখন পদ্ধতি ২. সংকলন পদ্ধতি ৩. গ্রন্থাবদ্ধকরণ পদ্ধতি।

প্রথম যুগ ঃ

লিখন পদ্ধতি ঃ রাসূল (সঃ) এর যুগ থেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় কালে নিজস্ব উদ্যোগে অনেকেই বেশ কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অনেক শ্রম সাধনার মাধ্যমে ও তাঁরা সত্য সঠিক হাদিস এভাবে লিখতেন। এ লিখন পদ্ধতিকেই হাদিস সংকলন ক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতি বলা হয়।

সংকলন পদ্ধতি ঃ প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষের দিকে ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে স্বনামধন্য তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীই সর্বপ্রথম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাদিস মালা সংকলন করেন।

আবু যিনাত (রঃ) বলেন- আমরা (হাদিসের ক্ষেত্রে) হালাল-হারাম সম্পর্কিত হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম। অথচ ইবনে শিহাব যুহরী যার নিকট যা শুনতেন, তা-ই লিখতেন।

পরবর্তীতে যখন সকল প্রকার হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইবনে শিহাব যুহরীই আমাদের মধ্যে সমধিক হাদিস জ্ঞাত। আবদুল আযীয দারাওয়ার্দীর মতে ইবনে শিহাব যুহরীই সর্বপ্রথম ইলমে হাদিস তাদভীন করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থাবদ্ধ করণ পদ্ধতি ঃ গ্রন্থাবদ্ধ হাদিসসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়- অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, উপধ্যায় ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হয়। ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) তাসনীফ সম্পর্কে বলেন, ইবনে শিহাব যুহরী (রঃ) সর্বপ্রথম খলিফা দ্বিতীয় ওমরের নির্দেশে হাদিস তাদভীন করেন। অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়লে তাসনীফকরণ শুরু হয়, যাতে অধিক জনকল্যাণ মূলক হাদিস তাদভীন করেন। কারো মতে, ইবনে জুরাইজ সর্বপ্রথম হাদিস তাসনীফ করেন।

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ)-এর আমলে হাদিস লিখন ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় কালেও কিছু লিখন পক্রিয়া ছিল । যেমন - হযরত আবূ হুরায়রা (রঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ব্যতীত রাসুলে কারিম (সঃ) -এর কোন সাহাবীই আমা হতে অধিক হাদিস অবগত নন। তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) এর ব্যতিক্রম। কারণ তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।

প্রাথমিক স্তরের তাবেয়ীদের হাদিস লিখন ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রঃ) থেকে হযরত বাশীর ইবনে নাহিক অসংখ্য হাদিস লিখে রাখেন। ইমাম ইবনে মুনাব্বিহ হযরত আবু হুরাইরা (রঃ) থেকে শতাধিক হাদিস লিখে রাখেন। হযরত সা'লাবা বলেন- আমি হাব্বনেকে হযরত আনাস (রঃ)-এর নিকট কাষ্ঠ ফলকে লিখতে দেখেছি। এসব বর্ণনায় প্রমাণ করে যে, তাবেয়ীগণ হাদিস লিখে রাখতেন।

তাবেয়ীদের দ্বিতীয় স্তরে হাদিস সংকলন ঃ

দ্বিতীয় হিজরী হতে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কেই হাদিসের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় ধারা বলা হয়। এ সময়কার হযরত কাতাদাহ (রঃ) ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। তিনি শুধুমাত্র একবার শুনেই সহীফায়ে জাবির মুখস্থ করে ফেলেন। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইর এক নিকট এক লাখ হাদিস ছিল। ইমাম যাহাবী (রঃ) ১১০০ হাফিজে হাদিসের জীবনী নিয়ে তাযকিরাতুল হুফফাজ গ্রন্থ রচনা করেন।

এতেই প্রমাণিত হয় যে, তাবেয়ীনদের যুগে অন্তত ১১০০ জন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছিলেন। ইবনুন নাদীম দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত অর্ধশত হাদিসের কিতাবের নাম উল্লেখ করেন। এ সময়কালের উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো- ১. মুযাত্তায়ে মালিক (রঃ) ২. মুসনাদ-ই আহমদ (রঃ) ৩. কিতাবুল উম্ম ৪. জামেউস সগীর ৫. জামেউল কবীর ইত্যাদি।

হাদিস সংকলনের তৃতীয় স্তর (তাবে' -তাবে'য়ীনের স্তর) ঃ

এ সময়কালে ইমাম বুখারী (রঃ) প্রায় ৬ লাখ হাদিস সংগ্রহ করে তা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদিস নিয়ে রচনা করেন সহীহ বুখারী শরিফ। এছাড়াও ইমাম মুসলিমের সহীহ মুসলিম শরিফ, ইমাম আবু ঈসা তিরমিযির জামে তিরমিযী শরিফ, ইমাম আবু ঈসা ইবনে সুলাইমান সুনানে আবু দাউদ শরিফ, ইমাম আহমদ ইবনে শো'য়াইবের সুনানে ইবনে মাজাহসহ বহু নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থ বিরচিত হয়। এর পরবর্তী যুগকেই তাকলিদ এর যামানা বলা হয়। এ সময়ে হাদিস শাস্ত্রের উপর গবেষণা চলতে থাকে। এটা হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হাদিসের গবেষণা অব্যাহত আছে।

www.pathagar.com

যুগে যুগে হাদিস সংকলিত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে এসে বড় বড় হাদিস গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমান সময়েও চলছে হাদিস শাস্ত্রের উপর বিপুল গবেষণা। যাতে শক্তিশালী হচ্ছে হাদিস শাস্ত্র। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্মরণীয় কথা মালা বিবেচনায় ও বর্ণনা প্রকৃতির বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেনী ও বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সু **বিন্যস্তকরনের মাধ**্যমে সহজবোধ্য করা হয়েছে আল হাদিসের অমর বাণী।

হাদিসের প্রকারভেদ ঃ

১. মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষায়-ইলমে হাদিস বস্তুগতভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা– উক্তি মূলক হাদিস; কর্মমূলক হাদিস; সমর্থনসমূলক হাদিস।

২. শুদ্ধাশুদ্ধির স্তরভেদে হাদিসকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন– সর্বগুণে বিশুদ্ধ হাদিস; কতিপয় গুনে উত্তম হাদিস; দুর্বল হাদিস।

৩. বর্ণনাকারীদের সংখ্যামান বিবেচনায় হাদিস আবার দু' প্রকার- (১) অগণিত ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস; (২) কতিপয় ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস।

৫. সনদ এবং মতনের গুণাগুণ বিবেচনায় হাদিস তিন প্রকার- (১) সুরক্ষিত হাদিস; (২) বিরল হাদিস; (৩) বাহ্যিক বিষয় সংযোজিত হাদিস।

৬. বর্ণনার দুষণীয় দিক বিবেচনায় হাদিস আবার তিন প্রকার- সংক্ষিপ্ত হাদিস; পরিত্যক্ত হাদিস; ঘৃণিত হাদিস।

৭. বর্ণনাকারীর উর্দ্ধ ধারাক্রমের সমাপ্তির বিবেচনায় হাদিস তিন প্রকার, যেমন- রাসুল (সঃ) পর্যন্ত ধারা সমাপ্ত হাদিস; সাহাবী পর্যন্ত ধারা সমাপ্ত হাদিস; তাবে'য়ী পর্যন্ত ধারা সমাপ্ত হাদিস।

বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

১. **হাদিসে কাওলী ঃ** মহানবী হযরত (সঃ) -এর উক্তিমূলক হাদিসই হলো– কাওলী হাদিস।

২. **হাদিসে ফে'লী ঃ** মহানবী (সঃ) -এর কর্মের মাধ্যমে যে সব হাদিস প্রতিভাত হয়েছে অর্থাৎ, যা মহানবী (সঃ) নিজে সম্পাদন করেছেন কিন্তু কাউকে বলেননি।

৩. **হাসিসে তাকরীরী ঃ** মহানবী (সঃ) থেকে কোন সাহাবীর কাজ বা কথার প্রতি সমর্থন থেকে যে সব হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ যা মহানবী (সঃ) -এর সামনে করা হয়েছে অথচ মহানবী (সঃ) তাঁর প্রতিবাদ করেননি।

৪. **হাদিসে সহীহ ঃ** মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন– উহা এমন খবরে ওয়াহেদ যার বর্ণনাকারী সনদ ধারাবাহিক। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত এবং পূর্ণ স্মৃতি যুক্তধারা, অথচ হাদীসটি মুয়াল্লাল বা শায হবে না।

www.pathagar.com

৫. **হাদিসে হাসান ঃ** যার বর্ণনাকারীর সবগুণ বর্তমান থাকা অবস্থায় কেবল যবত তথা স্মৃতিশক্তি কম হয়, তাহলে সে রাবীর হাদিস হবে হাদিসে হাসান।

৬. **হাদিসে দায়ীফ ঃ** যে হাদিসে বিশুদ্ধ হাদিসমুহের শর্ত অনুপস্থিত, তাকে দায়ীফ বা দূর্বল হাদীস বলে।

৭. **হাদিসে মুতাওয়াতির ঃ** মীযানুল আখবার প্রণেতার মতে– যে হাদিস এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যে, মিথ্যার উপর তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ধারণা গ্রহণ করা অসম্ভব। এই রূপ বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরে বিদ্যমান থাকে। উহাই মুতাওয়াতির হাদিস।

৮. **আহাদ ঃ** যে সব হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাত্তয়াতির বর্ণনাকারীদের পর্যায় পৌছেনি এবং যে গুলোতে মুত্তাওয়াতিরের এর শর্তসমূহ অনুপস্থিত, তা হাদীসে আহাদ

৯. **মাশহুর ঃ** সাইয়্যেদ আমীমুল ইহ্‌সান বলেন যে, হাদিস বর্ণনা ধারা দুয়ের উর্ধ্বে সীমাবদ্ধ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন অথচ আতওয়াতুর-এর সীমায় পৌছেনি, তাকে হাদিসে মাশহুর বলে।

১০. **আযীয ঃ** যে হাদিস প্রাথমিক স্তুরে মাত্র দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদিসে আযীয বলা হয়।

১১. **গরীব ঃ** যখন কোন হাদিসের রাবী প্রাথমিক স্তরে মাত্র একজন হয়, তাকে গরীব হাদীস বলে।

১২. মাহফুজঃ হাদিসের রাবী যদি বিশ্বস্ত হয়, আর একই হাদিসের অন্যরাবি সনদে ও মতনে পরস্পর বিরোধী হয়, তবে অগ্রধিকার প্রদানের পন্থা হলো-অধিক স্মরণশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনার অগ্রধিকার প্রদান। অগ্রধিকার প্রদত্ত হাদিসকে মাহফুজ বলা হয়।

১৩. **শায ঃ** উপরোল্লেখিত সংজ্ঞায় পশ্চাধিকার প্রাপ্ত হাদিসকে শায বলা হয়।

১৪. মুদরাজ ঃ যখন একই হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা সনদ এবং মতনে বিভিন্নতা দেখা দেয়, তখন তাকে বলে মুদরাজ

১৫. **মাওফু ঃ** সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসানের মতে– বর্ণনাকারী যদি অপবাদ প্রদত্ত ব্যক্তি হন, আর যদি তিনি হাদিস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন, তবে তার বর্ণিত হাদিসকে মাওফু বলে।

১৬. **মাতরূক ঃ** মুফতী আমীমুল ইহসান -এর ভাষায় হাদিসের বর্ণনাকারী যদি হাদিসের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী না হয়ে ব্যক্তিগত কথা-বার্তায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়, তবে তার হাদিসকে মাতরূক বলে।

www.pathagar.com

১৭. **মুনকার ঃ** যে হাদিসের বর্ণনাকারী দুর্বল এবং তাঁর বর্ণিত হাদিস যদি অন্য দূর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসের পরিপন্থী হয়, তবে এমন হাদিসকে মুনকার হাদিস বলে।

১৮. **মারফু ঃ** মুনকার হাদিসের বর্ণনা ধারা সরাসরি মহানবী (সঃ) পর্যন্ত পৌছে, মাঝখানে কোন রাবী বাদ পড়েনি, তাকে হাদিসে মারফু বলে।

১৯. **মাওকুফঃ** যে হাদিসের বর্ণনা ধারা সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, মহানবী (সঃ) পর্যন্ত সরাসরি পৌছেনি, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে।

২০. **মাকতু ঃ** যে হাদিসের বর্ণনা ধারা মহানবীর (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত না পৌঁছে শুধু তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে,তাকে হাদিসে 'মাকতু' বলে।

মহানবী (সঃ)-এর হাদিস সবই অকাট্য সত্য। তবে বর্ণনা ও বর্ণনাকারীদের দুর্বলতাসহ বিভিন্ন ক্রটির জন্য কিছু কিছু হাদিসের বিধান দুর্বলতায় রূপান্তরিত হয়।

বাস্তবতার কষ্টি পাথরে ও বিভিন্ন দিক বিচেনায় শুদ্ধশুদ্ধি যাঁচাই করার মাধ্যমে চির ভাস্বর হয়ে ওঠে মহানবী (সঃ) এর হাদিস। বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সময়ের সেতু পেরিয়ে, যুক্তি-তর্কের দেয়াল অতিক্রম করে মহানবী (সঃ)-এর হাদিসের এক সিংহ ভাগ প্রমাণিত হয়েছে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ পদ্ধতি ঃ যে সকল পন্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর হাদিসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যায় ইলমে হাদিস বিশারদগণের নিকট তা তিন প্রকার। যেমন- ১. রিওয়ায়াত; ২. দিরায়াত ও ৩. আল কুরআনের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ।

রিওয়ায়াত ঃ হাদিস বর্ণনাকারীদের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সনদের শুদ্ধাশুদ্ধি বিশ্লেষণকেই বলা হয় রিওয়ায়াত। এটা কতগুলো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন-

১. হাদিস বর্ণনকারীর সাথে তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর তথা উস্তাদের সাথে সুসম্পর্ক ও ধারাবহিকতার বিচারকরণ।

২. প্রথম বর্ণনাকারী সাহাবী মহানবী (স) থেকে সরাসরি হাদিস শুনেছেন কিনা, তার বাস্তবতা নিরীক্ষাকরণ ও বর্ণনাকারীর নাম, উপনাম, বংশ পরিচয় ও পেশার সঠিক পর্যালোচনাকরণ।

৩. বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে যদি কারো চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলুষতাও পরিলক্ষিত হয় তাহলে সে হাদিস গ্রহণ না করা।

৪. বর্ণনাকারীদের চরিত্রে দুর্বলতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা প্রতীয়মান হলে, সে হাদিস গ্রহণযোগ্য না হওয়া।

৫. বর্ণনাকারীদের কেউ যদি কোন সময় অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে হাদিস গ্রহণ না করা।

www.pathagar.com

৬. বর্ণনাকারীর ব্যাপারে একটি মাত্র মিথ্যার অভিযোগ বিদ্যমান থাকা এবং তাঁর বর্ণনায় সামান্যতম সন্দেহ প্রমানিত হলেও তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য না হবার অন্যতম কারণ।

এছাড়াও হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাওয়ায়েতের ক্ষেত্রে যেসব শর্তাবলী জরুরী তা হলো–

মাঝখানে কোন রাবীর অনুপস্থিতি না থাকা। পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী সাথে পরবর্তী স্থান-কালের দুরত্ব এত অধিক না হওয়া, যাতে তাঁদের মধ্যে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়। একই হাদিসের একাধিক বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতন নিয়ে গরমিল না হওয়া। মহানবী (সঃ) পর্যন্ত রাবীদের ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে সক্ষম হওয়া। হাদিস শ্রবণের সময়, বর্ণনা দেয়ার সময় বর্ণনাকারীর বয়প্রাপ্ত হওয়া। আসমাউর রিজাল এর মাধ্যমে বর্ণনাকারীদের চরিত্র পরীক্ষা করে হাদিস গ্রহণ করা।

দিরায়াত ঃ কোন হাদিসের মতন বা বর্ণিত বিষয়ের যৌক্তিকতা ও বিশুদ্ধতা বিচার পদ্ধতিকে দিরায়াত বলে। এর জন্য নির্ধারিত কিছু মূলনীতি অপরিহার্য। যেমন–

১. মহানবী (সঃ) এর কথা এবং কাজের বর্ণনাকালে কোন অস্পষ্টতা না থাকা। ২. কোন বর্ণনা ঐতিহাসিক বিশুদ্ধ বর্ণনার বিরোধী না হওয়া। ৩. বর্ণনা স্বাভাবিক যুক্তি এবং ইসলামী মূলনীতি ও ইসলামী শিক্ষার বিরোধী না হওয়া। ৪. শিয়া অথবা, খারিজী মতাদর্শীদের বর্ণনায় স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রশংসামূলক বর্ণনা এবং অপরের কুৎসা রটনা না হওয়া। ৫. কোন বর্ণনায় সাধারণ অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি এবং সামান্য সৎকাজের জন্য বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিমূলক উক্তি না থাকা। ৬. হাদিসের বাচনভঙ্গির মধ্যে মহানবী (সঃ) -এর মর্যাদা হানিকর বা অশ্লীল উক্তি বিন্দুমাত্রও না থাকা। ৮. হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সনদের মধ্য থেকে মাত্র একজন বর্ণনাকারী অনুল্লেখিত হওয়া। ৯. হাদিসের মধ্যে বর্ণনা আমলে স্ববিরোধী কিছু না থাকা এবং বর্ণনাকারীর স্বীয় বর্ণনা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও না থাকা। ১০. হাদিসে ইসলামী সমাজে কোন নতুন দল সৃষ্টির ইঙ্গিত না থাকা এবং ১১. হাদিস বর্ণনার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে হাদিসের জালিয়াতির প্রমান বহন না করা। এ সকল শর্তের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যে হাদিস সঠিক সীমানায় সত্যের সোনালী আলোতে প্রতিভাত হবে, তা-ই গ্রহণযোগ্য।

কুরআনের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ ঃ মহানবী (সঃ) -এর হাদিসের যথার্থ সত্যতা বিশ্লেষণ করার তৃতীয় অন্যতম মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআনে হাকিমের আলোকে তাঁর পরিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তার যাবতীয় দিক নিয়ে নিখুঁত আলোচনা পর্যালোচনা করা। পবিত্র কুরআনে হাকিমের সাথে আল-হাদিসের যাবতীয়

www.pathagar.com

হুকুম ও উহার বক্তব্য ইত্যাদির মিল খুঁজে দেখা। কুরআনে হাকিমের সাথে কোন হাদিসের কোন প্রকার গরমিল প্রত্যক্ষ হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাদিস মালাকে নির্ভূল ও পুরোপুরি বিশুদ্ধতা যাচাই করণের জন্য উপরোক্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন করে মুহাদ্দিসগণ সফলতা অর্জন করেছেন। হাদিস সন্দেহের বেড়াজাল হতে পূর্ণমুক্ত হয়েছে, যা ইসলামী শরিয়তের জন্য অন্যতম দ্বিতীয় উৎস।

ইলমে হাদীসের ধারাবাহিকতা ঃ

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যাঁরাই আধিক্য লাভ করেছেন, তাঁদের আলোচনাসহ সাহাবীগণের বিশ্বস্ততার উপর সঠিক ও জোরালো মতামতগুলোই প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রখ্যাত সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ও স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাদ্দেসীন সাহাবীদের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। যেমন -

প্রথম স্তর ঃ প্রথম স্তর অধিক বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ছয় জন। যেমন–

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ); ২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ); ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ); ৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ); ৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং ; ৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, প্রথম স্তরের হাদিস বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৭ জন। তাঁদের মতে, ৭. হযরত আবু সাঈদ আল–খুদরী (রাঃ)-কে প্রথম স্তরের ধরা হয়।

দ্বিতীয় স্তর ঃ দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন চার জন। যেমন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ); ৩. হযরত আলী (রাঃ) ও ৪. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)।

তৃতীয় স্তর ঃ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরে যেসব সাহাবীদের নাম প্রখ্যাত হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫। যেমন–

১. হযরত উম্মে সালমা (রা); ২. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ); ৩. হযরত আবূযর গিফারী (রাঃ); ৪. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ); ৫. হযরত সাহল ইবনে সা'দ আনসারী (রাঃ); ৬. হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) ৭. হযরত আবু দারদা (রাঃ); ৮. হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রাঃ); ৯. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ); ১০. হযরত মা'য়ায ইবে জাবাল (রাঃ); ১১. হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা): ১২. হযরত আবু বুক্রাহ্ (রাঃ): ১৩. হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ); ১৪. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ); ১৫. হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ); ১৬. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ); ১৭. হযরত উসামা

www.pathagar.com

ইবনে যায়েদ; ১৮. হযরত সালমান ইবনে আমের (রাঃ); ১৯. হযরত বুরাইদা ইবনে হাসীবা (রাঃ); ২০. হযরত আবু মাসউদ (রাঃ); ২১ হযরত আকাবা ইবনে ওমর (রাঃ); ২২. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ); ২৩. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব ফাজারী (রাঃ); ২৪. হযরত জারির ইবনে সামুরা (রাঃ) ও ২৫. হযরত আবু বকর (রাঃ)।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাহাবী হলেন ৩২ জন। যেমন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ); ২. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ); ৩. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ); ৪. হযরত কা'ব ইবনে মালিক আসলামী (রাঃ); ৫. হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ -জুহানী (রাঃ); ৬. হযরত আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহল (রাঃ); ৭. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ); ৮. হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ); ৯. হযরত আবু রাফে কিবতি (রাঃ); ১০. হযরত আওফ ইবনে মালিকুল আশযাঈ (রাঃ); ১১. হযরত আছ ইবনে মালিকুল আশযাঈ (রাঃ); ১২. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী আওফা (রাঃ); ১৩. হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ); ১৪. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ); ১৫. হযরত সালমান ফারসী (রাঃ); ১৬. হযরত হাফসা বিনতে আবু বকর (রাঃ); ১৭. হযরত বুরাইদা বিনে মুতঈম কোরাযী (রাঃ); ১৮. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ১৯. হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা কালাবী (রাঃ)। ২০. হযরত উবাই ইবনে আমের জুহানী (রা); ২১. হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ আনসারী (রাঃ); ২২.হযরত উমর ইবনে উতবা (রাঃ); ২৩. হযরত কা'ব ইবনে আমর আনসারী (রাঃ); ২৪. হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ আসলামী (রাঃ); ২৫. হযরত মাইমুনা (রাঃ); ২৬. হযরত উম্মে হানী (রাঃ); ২৭. হযরত আবু হযাইফা ইবনে ওয়াহাব সাওরী (রাঃ); ২৮. হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ); ২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ); ৩০. হযরত মিকদাদ ইবনে আস কূফী (রাঃ); ৩১. হযরত হাকিব ইবনে হিযাম আসাদী (রাঃ) ও ৩২. হযরত সালামা ইবনে হানীফ আনসারী (রাঃ)।

অধিক হাদিস বর্ণনাকারীগণ হাদিসের ক্ষেত্রে যে বিশাল খেদমত করেছেন তা অনস্বীকার্য। হুযুর (সঃ)-এর প্রতিটি কথা, কাজ, নড়া-চড়া ধীরতা-স্থিরতা সর্ব বিষয়ের প্রতি নজর রাখতেন এবং এসব থেকে তাঁরা শরিয়তের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য হাদিস সংযোজন করেছেন । যেমন–

১. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) খায়বর বিজয়ের পরে ২৪ বছর বয়সের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মহানবীর সংস্পর্শে এসে হাদিস সংরক্ষণে মনোনিবেশ করেন। মহানবী (সঃ) থেকে অধিক মাত্রায় হাদিস সংগ্রহ ও তা বর্ণনা করার জন্যই তিনি আস-হাবুস সুফফাহর এর অন্তর্ভুক্ত হন। এ ছাড়াও তিনি

www.pathagar.com

সদাসর্বদা মহানবী (সঃ)-এর সাথে সাথে থেকেই হাদিস ধারণ করতেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল সর্বাধিক প্রখর। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন-

" আমি হুযুর (সঃ)-এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার অনেক কথা শুনি, কিন্তু সব কথা আমার স্মরণ থাকে না। তিনি ইরশাদ করলেন, চাদর বিছিয়ে দাও। আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম। তিনি ঐ চাদরে ফুঁ দিয়ে দোয়া করে দিলেন। এরপর মহানবী যত হাদিস বলেছেন তা সবই আমার স্মৃতির পাতায় অংকিত আছে।"

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর বর্ণিত সর্বাধিক সংখ্যক ৫,৩৭৪ টি হাদিস। যা ইসলামের এক বিশাল সম্পদ হয়ে কাজ করেছে।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর চাচাত ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। তাঁর ৭১ বছরের জীবনে ২,৬৬০টি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেন। মহানবী (সঃ) তাঁর জন্য সরাসরি দোয়া করেছেন। যার ফলে হাদিসের সেবায় তিনি হয়েছেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। হাদিস বর্ণনার পাশাপাশি তিনি একজন প্রখ্যাত মুফাসসিরও ছিলেন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই বলেন, " আমি যখন কারো নিকট কোন হাদিসের সন্ধান লাভ করতাম, তখন অবশ্যই তার কাছে গিয়ে সে হাদিস সংগ্রহ করতাম। "

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর ইন্তিকালের সময় যেহেতু তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। তাই তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদিসই মারফু না হলেও তা মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য।

৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ঃ হাদিস বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর সেবা অতুলনীয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হবার জন্য তিনি অধিক নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনার সুযোগ লাভ করেন। ৬৫ বছরের জীবনে তিনি ২,২১০ টি হাদিস বর্ণনা করেন। মসনদে আহমদের মধ্যে তার রেওয়ায়েতসমূহ ২৫৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্যাপৃত হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মোয়ামালা সম্পর্কীয় হাদিসের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর হাদিস অধিকতর গুরুত্বের দাবিদার। অগণিত তাবেয়ী ও সাহাবী তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ঃ স্বীয় ৮৫ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে ১,৬৩০টি হাদিস বর্ণনা করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করে ১৪ বছর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সাহাবী থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকেও অসংখ্য তাবেয়ী হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ঃ সুদীর্ঘ ৯৪ বছরের জীবনে হযরত জাবির ইবনে আব্দূল্লাহ (রাঃ) হাদিস শাস্ত্রের বিশাল সেবা আঞ্জাম দেন। তাঁর সাধনার ফসল দাঁড়ায় ১,৫৪০ টি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে সরাসরি তিনি অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বিরাট এক দল বর্ণনাকারী বিভিন্ন হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করেন ১০৩ বছর। আর এরই মধ্যে তাঁর হাদিস সাধনার ফলাফল দাঁড়ায় ১,২৮৬টি উল্লেখযোগ্য হাদিস। যার মধ্যে বোখারী ও মুসলিমের ঐক্যমতে হাদিসও রয়েছে ১২৮টি।

৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ঃ ৮৪ বছর জীবনকালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্ভূল তথ্যের ভিত্তিতে ১,১৭০টি হাদিস বর্ণনা করেন। হাফিজে হাদিস ও বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ণ চিন্তাশীল আলিমদের মধ্যে তিনি অন্তর্ভূক্ত। তার থেকে বিরাট একদল বর্ণনাকারীও হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মহানবী (সঃ) -এর সকল মহান সাহাবীবৃন্দ ইলমে হাদিসের সেবায় সর্ব মোট ১৫, ৮৭০ টি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করে স্মরণীয় ও বরণীয় যেমন হয়েছেন, তেমনি হাদিসশাস্ত্রও হয়েছে সমৃদ্ধ।

মুহাদ্দেসীনে কিরামের পরিভাষায় এমন সব হাদিস বর্ণনাকারীগণ, যাদের হাদিসের সংখ্যা ৫০০ থেকে বেশী হাদিস তাঁরা বর্ণনা করেছেন কিন্তু এক হাজারের কম। এ শ্রেণীর সাহাবী হলেন মাত্র চার জন। যেমন–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ); ২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ); ৩. হযরত আলী (রাঃ) ও ৪. হযরত ওমর (রঃ)।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) ঃ হাদিস বর্ণনায় তিনি আজীবন সাধনা করেছেন। আর এ সকল সাধনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর জীবনে ৮৪৮টি হাদিস, যা ইসলামি শরিয়তকে শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রঃ) ঃ তাঁর বর্ণিত হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর চেয়ে ১৪৮টি কম। তিনিও মহানবীর সাহচর্য লাভের মাধ্যমে সঠিক ও তথ্যবহুল হাদিস বর্ননা করেছেন। তার সাধনালব্ধ সঞ্চায়নে জমা হয়েছে ৭০০ টি মুল্যবান হাদিস।

৩. হযরত আলী (রা) ঃ হাদিসের খিদমতকল্পে হযরত আলী (রাঃ)-এর অবদান অনস্বীকার্য। জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ বিগ্রহের সংঘাতে লিপ্ত থাকাসত্ত্বেও তিনি মহানবীর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৫৮৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

কিশোরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের প্রতি সর্বাধিক অনুরক্তি প্রকাশ করেন।

৪. হযরত ওমর (রাঃ) ঃ যুদ্ধের মহান নায়ক, সত্যের মহান দিশারী, ন্যায়ের জীবন্ত উপমা হযরত ওমর (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নৈকট্য লাভ করণের মাধ্যমে জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় বর্ণনা করেন অতি মূল্যবান ৫৩৯টি হাদিস। হাদিসের ক্ষেত্রে তাঁর খেদমত অতুলনীয়। হাদিস বিশুদ্ধকরণেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। মধ্যমপন্থী এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গ জীবনে বহুবিধ ধর্মীয় কর্মকান্ডে জড়িয়ে থাকার ব্যস্ততায় লিপ্ত না হলে হয়ত আরো অধিক হাদিস বর্ণনা করতে পারতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র হাদিসের অসীম বাণী সকল সাহাবায়ে কিরামের অধিক সংখ্যক বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য সব সাহাবীর পক্ষে সংখ্যায় অধিক পরিমাণ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে অসম্ভব।

হাদিস সংকলন ও শিক্ষাদানে উমর ইবনে আব্দুল আযীযের অবদান ঃ

তিনি ৯৯ হিজরী সনে খলিফা নির্বাচিত হন এবং খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই হাদিসের বিক্ষিপ্ত সম্পদ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করেন। তিনি বুঝেছেন যে, ইসলামী জীবন-যাপন ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হাদিস এক অপরিহায্য সম্পদ। অনতিবিলম্বে এর সংকলন ও পূর্ণ সংস্কারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই সম্পদ হতে গোটা উম্মত বঞ্চিত হবার আশংকা রয়েছে। তিনি ইসলামী খিলাফতের সর্বত্র ফরমান জারী করে দেন যে, নবী করিম (সঃ)-এর হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু কর। খলিফার ফরমান পেয়ে সর্বত্রই হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের অভিযান সুষ্ঠভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে সময় প্রায় সকল জীবিত হাদিস বিশারদ ব্যক্তিই হাদিস সংকলনের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁদের সংকলিত বিরাট সম্পদ মুসলিম সাম্রাজ্যের নিকট চিরকাল অমূল্য ধন রূপে গন্য ও সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। তিনি নিজেও হাদিস সংগ্রহের কাজ করেছেন। ইমাম শা'বী; ইমাম যুহরী; ইমাম মাকহুল দামেশকী; ও "ইমাম কাযী আবু বকর ইবনে হাযমের সংলিত হাদিস গ্রন্থাবলী তাঁরই খিলাফত কালের অমর অবদান।

প্রখ্যাত তাবে'য়ী মুহাদ্দিসগণের নাম ঃ

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রঃ) ২. ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রঃ) ৩. আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রঃ) ৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রঃ) ৫. সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) ৬. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রঃ) ৭. কাশিম ইবনে মুহাম্মদ (র) ৮. না'ফে মাওলা ইবনে ওমর (রঃ) ৯. ইবনে শিহাব যুহরী (রঃ) ১০. আবুয যানাদ (রঃ) ১১. ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রঃ) ১২. আতা ইবনে আবু

www.pathagar.com

রিবাহ (রঃ) ১৩. আবু যোবাইর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রঃ) ১৪. আশ শা'বী ইবরাহীম আন নাখয়ী (রঃ) ১৫. আলকামা ইবনে কায়েস (রঃ) ১৬. আল হাসান ইবনে আবুল হাসান (রঃ) ১৭. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন কাতাদাহ (র) ১৮. উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ১৯. মাকহুল কুবইছাহ (রঃ) ২০.কা'য়বুল আহবার (রঃ) ২১. আবুল খায়ের মারসাদ (রঃ) ২২. ইয়াযিদ ইবনে হাবীব (রঃ) ২৩. তাইমুম ইবনে কাইসান (রঃ) ২৪. ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ প্রমূখ (রঃ)।

তাবে'য়ীদের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গঃ

ইবনে শিহাব যুহুরী (রঃ) ঃ তিনি ইলমে হাদিসের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রঃ), সহল ইবনে সা'য়াদ (রঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কিরাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে বিপুল সংখ্যক তাবেয়ী তাঁর নিকট হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২০০টি।

ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রঃ) ঃ তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ)-এর মুক্তি প্রদত্ত ক্রীতদাস ছিলেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা দান করেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রঃ) ঃ তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ জ্ঞানপিপাসু। হযরত আবু হুরাইরা (রঃ) ছিলেন তাঁর শ্বশুর। এ সম্পর্কের কারণে আবু হুরাইরা (রঃ) হতে তাঁর হাদিস ও জ্ঞান আরো অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়।

সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) ঃ তিনি ছিলেন মদিনার শীর্ষ স্থানীয় তাবেয়ীনদের অন্যতম। আল্লামা ইবনে সা'য়াদ তাঁকে বহু হাদিস বর্ণনাকারী ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রঃ), আতা ইবনে আবু রাবাহ (রঃ); ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ); হাসান বছরী (রঃ) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রঃ) প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ বিশিষ্ট তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

মহানবীর এ আদেশ কঠিন বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাঁচাই করে দেখা যায় যে, মহানবী (সঃ)-এর নিষেধ ছিল মাত্র অল্প সময়ের জন্য। এটা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল না বরং তিনি ক্ষেত্র বিশেষে হাদিস লিখে রাখার কথাও সরাসরি ঘোষণা দিয়েছেন ।

নিম্মোক্ত প্রমাণ থেকে তা প্রতিভাত হতে পারে– ১. মহানবী (সঃ) নিজেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আস (রঃ)-এর নিমিত্ত হাদিস লিপিবদ্ধ করার লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তিনি যে সকল হাদিস লিখে রেখেছিলেন, তা বিরাট একখানা পুস্তকে পরিণত হয়েছিল। তিনি উহাকে (ছাদাকা) নামে অভিহিত করেন, যা বুখারী শরিফ ১ম খন্ড ২২ পৃষ্ঠা, তাহাভী শরিফ ২য় খন্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ শরিফ ২য় খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) রাফে 'ইবনে খাদীজকে লিখার অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যা আল মাজমা প্রথম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

৩. তিরমিযী শরীফের ২য় খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, অপরাপর লোকদেরকেও মহানবী হাদিস লিখার অনুমতি প্রদান করেছেন।

৪. মহানবী বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে হাদীস লিখিয়ে পাঠায়েছিলেন।

৫. বাণী বা ফরমান, যা প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে লিখিতভাবেই প্রেরণ করতেন। তাই মহানবীর সময়কার বহু পান্ডুলিপি পরবর্তীতে বিরাজমান ছিল।

সাহাবায়ে কিরামের যামানার লিখিত প্রমাণ ঃ

১. বিখ্যাত তাউযিহ কিতাবের ৮ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আল ফারায়েজ এর উপর একখানা পুস্তক রচনা করেন।

২. ইবনে নাদীমের ফিরিসত নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রঃ) ও হযরত আলী (রঃ) এর লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ নিয়ে তিনি নিজেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) কে ৫০০ হাদিস বিশিষ্ট একটি কিতাব রচনা করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির জন্য তিনি তা বিলুপ্ত করতে বাধ্য হন। [কানযুল উম্মাল ৫ম খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা।]

সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাদিস লেখকবৃন্দ ঃ সাহাবায়ে কিরাম হতে উল্লেখ যোগ্য যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ হাদিসে রাসুল লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে– ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) ২. হযরত আনাস (রঃ) ৩. হযরত আবু রাফে' (রঃ) ৪. হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী ৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) ৬. হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রঃ) ৭. হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রঃ) ৮. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রঃ) ৯. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) ১০. হযরত আমর ইবনে জুনদুব (রঃ) ১১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রঃ) ১২. হযরত ওয়াসেলা ইবনুল আছকা (রঃ) প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ।

তাবে'য়ীগণ থেকে উল্লেখযোগ্য হাদিস লেখক বৃন্দ ঃ

তাবেঈন থেকে ও হাদিস লেখক বিদ্যমান ছিলেন । যেমন– ১. হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ); ২. হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রঃ) ৩. হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফী (রঃ) প্রমূখ।

প্রকৃত পক্ষে হাদিস লেখার কাজেও অসংখ্য সাহাবী ব্রত ছিলেন। আর এ লেখার বিষয়টা নিষেধাজ্ঞার সাথে যুক্তির আলোকেই বিরোধী প্রমাণিত হয় না। কারণ, কয়েক জন সাহাবীকে মহানবী হাদিস লিখা হতে বিরত থাকতে বললেও কতিপয় সাহাবী বিভিন্ন কাজের জন্যই মহানবীর সম্মতিতে হাদিস লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

www.pathagar.com

হাদীস প্রচার ও প্রসারের সেই স্বর্ন যুগ

আ. ই.ম. নেছার উদ্দিন

যুগে যুগে হাদিস শাস্ত্রের উদার চর্চা চলে এসেছে ও প্রথম থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত তা ছিল তুঙ্গে। এ সময়কালে মুক্তভাবে হাদিস পর্যালোচনা করার কারণে হাদিসের বিভিন্ন মূল্যবান কিতাব বিরচিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনায় তা ফুটে উঠবে।

তৃতীয় শতকে হাদিস চর্চা ঃ এ সময়কার উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম মক্কা শরিফ; মদিনা শরিফ; কূফা; বসরা ও সিরিয়া ইত্যাদি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে হাদিস শাস্ত্র পর্যালোচনা ও হাদিসের বহু সংকলন সাধন করেন।

এ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদিস গ্রন্থের নাম ঃ তৃতীয় শতকে যে সকল হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে , তাঁর মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ৬ খানি কিতাব হলো

১. সহীহ বুখারী; ২. সহীহ মুসলিম; ৩. সুনানে নাসাঈ; ৪. সুনানে আবু দাউদ; ৫. জামে তিরমিযী ও ৬. সুনানে ইবনে মাজা।

বিস্তারিত পর্যালোচনা ঃ

সহীহ বুখারী পরিচিতি ঃ ইমাম বুখারী (রঃ) -এর ১৬ বছরের সাধনার ফসল বিশ্ব বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ - সহীহ বুখারী শরীফ।

এতে ৭২৭৫ টি হাদিস সন্নিবেশিত আছে। এ সংকলন ৬ লাখ হাদিস থেকে নির্বাচিত বিশুদ্ধ সংকলন। এর প্রতিটি হাদিস লেখার পূর্বে তিনি অযু গোসলের পরে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। তাঁরপর ইস্তেগফার করে প্রতিটি হাদিস লিখতেন। বুখারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে- আছাহহুল কুতুবি বাদা কিতাবুল্লাহি আছ ছাহিহুল বুখারী অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধ কিতাব ছহীহ বুখারী।

সহীহ মুসলিম ঃ ইমাম মুসলিম (রঃ) এর সুদীর্ঘ ১৫ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফসল সহীহ মুসলিম।

তিন লাখ হাদিস থেকে বাছাই করে মাত্র চার হাজার সহীহ হাদিস নিয়ে ইহা বিরচিত। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদিস ইমাম আবু যুরযার (রঃ) এর সম্মতিক্রমে প্রতিটি হাদিস এ কিতাবে গৃহীত হয়েছে। ইমাম নিজেই বলেন, মুহাদ্দিসগণ ২০০ বছরও যদি হাদিস সংগ্রহে লিপ্ত থাকেন তাহলে এ বিশুদ্ধ গ্রন্থটির উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

হাফিজ মুসলিম ইবনে কুরতুবী (রঃ) বলেন, "ইসলামে এরূপ গ্রন্থ আর বিরচিত হয়নি। (মুকাদ্দামাতুল ফতহুল বারী)

www.pathagar.com

নিসায়ী ঃ ইমাম নাসাঈ (রঃ)-এর সুনানুল কুবরা নামক বিশুদ্ধ ও সামান্য ক্রুটিযুক্ত হাদিস পুঞ্জের মাধ্যমে বিরচিত গ্রন্থের সঠিক ও যাচাইকৃত সংস্করণ বের হয় আসসুনান নামে। এ গ্রন্থ প্রণয়নের পরেও ইমাম নাসাঈ পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। তাই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রঃ) -এর নীতি অনুসরণ করে পরবর্তীতে তিনি রচনা করেন তৃতীয়বারে আল-মুজতবা -যা সুনানে নাসাঈ নামে পরিচিত। যাহরুর রুবার মুকাদ্দামর মধ্যে তিনি নিজেই এ কিতাবের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলেন, হাদিসের সংকলন 'মুজতবা' নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদিসই বিশুদ্ধ। নাসাঈ শরীফের শরাহ্ প্রণয়ন করেছেন আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) ও আল্লামা সিন্দি (রঃ)।

সুনানে আবু দাউদ ঃ ইমাম আবু দাউদ (রঃ) পাঁচ লাখ হাদিস হতে অশেষ সাধনার পর ৪৮০০ হাদিস নিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেন। বলা হয়ে থাকে বুখারী মুসলিম শরিফের পরেই এ গ্রন্থের স্থান।

ইমাম আবু দাউদ ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তদ্বীয় সংকলিত গ্রন্থে সমস্ত ফিকহের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন।

সুনানে তিরমিযী ঃ ইমাম তিরমিযীর (রঃ) এ গ্রন্থ জামে তিরমিযী নামেই খ্যাত। ইহা পাঁচ লাখ হাদিস হতে বাছাইকৃত মাত্র ১৬০০ হাদিসের এক অপূর্ব সমাহার। বুখারী ও আবু দাউদ শরিফের অনেকটা অনুকরণ এ গ্রন্থে বিদ্যমান। এতে শরিয়তের দ্বাদশ শাখায় বিস্তৃত বিষয়ে হাদিস সন্নিবেশিত হওয়ায় এটাকে জামে বলা হয়।ইমাম নিজেই বলেন, যার ঘরে এ কিতাবখানি থাকবে, মনে করা হবে যে তাঁর ঘরে স্বয়ং মহানবী নিজেই বিদ্যমান আছেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ ইবনে মাজাহ (রঃ) -এর জীবনের অক্লান্ত সাধনার ফসল কয়েক লাখ হাদিস হতে যাঁচাইকৃত মাত্র চার হাজার হাদিসের সমাহার এ কিতাব খানা। এতে ৩২টি পরিচ্ছেদ ও ১৫ শত অধ্যায় আছে। দুদিক থেকে এটা মর্যাদার আসনে সমাসীন- ক. উহার রচনা শৈলী; সংযোজন সজ্জায়ন; ও সৌকর্য অতি উত্তম। খ. এর হাদিস গুলো অপর কোন সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে নেই।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর সংকলিত উল্লেখযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ ঃ

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর যে সকল হাদিস গ্রন্থ অতি সমাদৃত হয় , তা হলো–

১. আল–মুস্তাদরাক; ২. আল ইলযামাত ও কিতাবুস্ সুনান ৩. আল মুজিম ও ৪. তাহাবী শরিফ।

বিস্তারিত পর্যালোচনা ঃ

১. আল মুস্তাদরাক ঃ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এমন কতগুলোসহীহ হাদিস যা তাঁদের সহীহ গ্রন্থে স্থান পায়নি ঐ গুলোকে নিয়ে আল্লামা হাকিম নিশাপুরী (র) সংকলন করেন আল-মুস্তাদরাক।

www.pathagar.com

২. **আল ইলযামাত ও কিতাবুস সুনান ঃ** যুগশ্রেষ্ঠ হাফিয ও প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা হাকিম নিশাপুরী (র) সংকলন করেন আল ইলযামাত।

২. **আল-মুজিম ঃ** আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমদ আত তিবরানী আল - মু'জিম রচনা করেন। যা তিন ভাগে বিভক্ত- ১. আল মু'জামুল কবীর; ২. আল মু'জামুস সগীর ও ৩. আল মু'জামুল আওসাত।

৪. **তাহাবী শরিফ ঃ** চতুর্থ শতকের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আল্লামা তাহাবী (র) 'তাহাবী শরিফ' সংকলন করেন। যা এ শতকের অনেকের কাছেই এক পরম বিস্ময়, আর পরবর্তী আলিমদের জন্য বিশাল প্রেরণা।

তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে যে সকল হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, তা আবহমান কালের মানুষের জন্য জীবন চলার অতুলনীয় পাথেয়। ইসলামী শরিয়তের চুলচেরা যুক্তিভিত্তিক সমাধান এর মাঝে নিহিত।

হাদিসের ইতিহাস বলতে হাদীসের প্রচার , প্রসার এবং উলূমে হাদীস সংকলনের ঐ সমস্ত যুগ ও কালকেই বুঝায়, যা নবী করিম (স)-এর সময় হতে অদ্যাবধি চলে আসছে। বিভিন্ন যুগ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হাদিসের ইতিহাসকে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি।

প্রথম যুগ ঃ এ যুগে ' হাদিস'কে লিপিবদ্ধ না করে স্মৃতি শক্তিতেই বেশি সংরক্ষণ করা হত এবং মৌখিকভাবে সেগুলো প্রচার করা হত।

দ্বিতীয় যুগ ঃ এ যুগে হাদিসের কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ করা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে 'ইলমুল হাদিস' রূপে প্রকাশ পায়।

তৃতীয় যুগ ঃ এ যুগে হাদিস শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মুহাদ্দিসগণ সহীহ এবং বিশুদ্ধ হাদিস সংকলন করেন।

প্রথম যুগ ঃ এ যুগ নবী করিম (স)-এর সময় হতে শুরু করে প্রথম শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত শেষ হয় এবং এ যুগে হাদিসসমুহের লিপিবদ্ধ করে রাখার চেয়ে অধিকাংশ মুখস্থ করে রাখা হত। প্রাক-ইসলামী যুগে আরববাসীরা তাদের পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতি, চাল-চলন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাদের স্মৃতি পটে সংরক্ষণ করে রাখত এ নিয়মেই হাদিসপুঞ্জ স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতে থাকে।

নবী করিম (সঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেও তাদের পূর্ব পুরুষের প্রাচীন কীর্তি, আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং নবী করিম (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ, চরিত্র ইত্যাদি বিবরণ আরববাসীদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। হাদিস শাস্ত্রের এটাই প্রথম বুনিয়াদ। মহানবী (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কুরআন সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু হাদিস সংরক্ষণের উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বস্তুত ঃ সাহাবায়ে

www.pathagar.com

কিরামের স্মৃতিপটে হাদিসমূহ সংরক্ষিত ছিল এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁরা সেগুলো আলোচনা করতেন।

তদুপরি পাম্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সাহবীগণ কুরআন হাদিসের আলোকে ফতোয়া এবং মাসায়েল বর্ণনা করতেন।

দ্বিতীয় যুগ ঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত এ যুগ হিসাবে গন্য হয়। এ যুগের সূচনালগ্নে সাহাবায়ে কিরাম এবং প্রখ্যাত তাবেয়ীনের যুগ প্রায় শেষ । মাত্র দু' একজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। যাকে তাবেয়ীনের মধ্যযুগ বলা হয়। এ যুগে রেওয়ায়েতে হাদিসের সিলসিলাসহ ইসলাম আরব ভূখন্ড থেকে অনেক দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করে।

দ্বিতীয় যুগে এমন একদল লোকের উদ্ভব ঘটে যারা মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে স্বীয় মতবাদ প্রচার করা শুরু করে। যার ফলে প্রকৃত হাদিসসমূহকে সনদসহ বর্ণনা ও সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তাতে সহীহ হাদিস বানোয়াট হাদিস থেকে পৃথক হয়ে যায়। ইতোপূর্বে কুরআন সংকলনের কাজ সম্পন্ন করা হয়; কিন্তু কুরআন ও হাদিসের কোন সংমিশ্রণ যেন না হয়; সে জন্য উমাইয়া বংশীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায় এ ফরমান জারী করেন যে, দেখ এবং রাসূল (সঃ) এর হাদিস সমূহেকে একত্রিত কর। বিশেষ করে তিনি মদিনা মনাওয়ার প্রশাসক আবু বকর ইবনে হাযমের নিকট এ কথা লিখেন যে– হাদীসে রাসুলের প্রতি নজর দিন, কেননা আমি অনেক হাফেজে হাদিসের ইন্তেকালে শংকিত। আবু বকর ইবনে হাযম হাদিসের একটি সংকলন তৈরি করেন। (যুরকানী) সা'য়াদ ইবনে ইবরাহীম বর্ণনা করেন যে, আমাদরকে উমর ইবনে আবদুল আজীজ হাদীস সংকলনের আদেশ দেন। আমরা গ্রন্থবদ্ধ করে সেগুলো বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিই।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম ইমাম যুহরী (রঃ) রাসুল (সঃ)-এর মাগাযী (জিহাদ) সম্পর্কিত হাদিসসমূহ একত্রিত করেন। হাদিস সংগ্রহ ও একত্রিকরণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি মদিনায় এক একজন আনসারীর গৃহে উপস্থিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তা লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি ইমাম শা'বীর ইলমে ফিকহ এর অধ্যায় হিসেবে হাদিসের একটি কিতাব লিখেন।

রাসুল (সঃ)-এর হাদিস সংগ্রহ ও একত্রিত করার ফরমান জারী করার পর খলিফা নিজে বেশি দিন জীবিত ছিলেন না; কিন্তু হাদিস সংগ্রহ করার প্রতি আলিমদের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের আনাছে কানাছে মুহাদ্দিসগণ

www.pathagar.com

হাদিসে নববী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তা উল্লেখিত হলো-

ইবনে জুরাইজ (রঃ)-মক্কায়। আওযায়ী- সিরিয়ার। সাওরী -কুফায়। রবী ইবনে সাবী এবং হাম্মাদ ইবনে ছালেম- বসরায়, শাইম- ওয়াসেতে। মা'মার-ইয়ামানে, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-খুরাসানে, ইমাম মালিক (রঃ)-মদিনা মুনাওয়ারায়। এ সব মনীষীরা বিভিন্ন এলাকায় হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরাও হাদিস লিপিবদ্ধ ও সংকলন করেন-

১. মাকহুল (রঃ)। ২. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ)। ৩. সা'দ ইবনে আরুবা (রঃ)। ৪. ইবনে আবি যেইব (রঃ)। ৫. শো'বা (রঃ)। ৬. লাইছ (রঃ)। ৭. ইবনে লুহাইয়া (রঃ)। ৮. সুলাইমান ইবনে বেলাল (রঃ)। ৯. আবু মা'মার (রঃ)। ১০. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ)। ১১. আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী (রঃ) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ হাদিসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।

পরবর্তী কালে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) কিতাবুল আছার এবং কিতাবুল খারাজ লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) কিতাবুল হজ্জ এবং কিতাবুল আছার লিপিবদ্ধ করেন। মুআফী ইবনে ইমরান কিতাবুস সুনান, কিতাবুয- যুহদ, কিতাবুল আদাব এবং কিতাবুল ফিতান ইত্যাদি রচনা করেন। মুহাম্মদ ইবনে ফজল কিতাবুয-যুহুদ এবং কিতাবুদ দু'আ রচনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব 'আহওয়ালুল কিয়ামাহ' এবং জামে' কিতাব রচনা করেন। ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম হাদিসের সত্তরটি কিতাব রচনা করেন। ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্ম লিখেন। উল্লেখিত হাদিসের কিতাব এবং পাণ্ডুলিপিসমূহ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া-

১. তায়ালেসী (রঃ); ২. আবদুর রাযযাক (রঃ); ৩. হুমাইদী (রঃ); ৪. আবু বকর ইবনে আবি শাইবা (রঃ) ; ৫. উসমান ইবনে আবি শাইবা (রঃ); ৬. সাঈদ মদনী (র); ৭. আবু উমর (র); ৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) যুগের সুবিখ্যাত সংকলক এবং হাদিসের ইমাম ছিলেন।

তৃতীয় যুগ ঃ এ যুগ ছিল হাদিসের কিতাব লিপিবদ্ধ করার চরম উন্নতির যুগ। এ যুগে হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর স্বতন্ত্রভাবে কিতাব রচিত হয়। এ যুগে মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসসমূহ একত্রিকরণের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন।

এ যুগ তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ হতে শুরু হয়ে পঞ্চম শতাব্দীতে শেষ হয়। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ লগ্নে হাদিস সংকলনের কাজ পূর্ণতা লাভ করে।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিসগণ সাহাবীদের আছার এবং তাবেয়ীণদের মতামত বাদ দিয়ে নবী করিম (স)- এর হাদিসসমূহকে স্বতন্ত্রভাবে একত্রীকরণের প্রতি মনোযোগী হন এবং পরবর্তীতে এ কাজ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এ যুগের পূর্বে পুস্তক প্রণেতাগণ সাধারণত ভুল এবং সন্দেহমুক্ত সর্বপ্রকার হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনের একটি দল শুধুমাত্র সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য হাদিসের পুস্তক রচনা করেন।এ যুগে নবী করিম (স) এর হাদিসের উপর যথেষ্ট খিদমত সাধিত হয় এবং 'আসমাউর রিজালের' উপর এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় যে, তারা একে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেন।

হাদিস গ্রন্থের বিভিন্ন স্তর ঃ হাদিস সংকলনের তৃতীয় যুগের সমাপ্তি যে সকল হাদিস গ্রন্থ লিপিব্দ্ধব হয়েছে, ঐগুলোক পাঁচ স্তরে বিভক্ত করা যায়-

প্রথম স্তর ঃ শুধুমাত্র সহীহ হাদিস সম্বলিত গ্রন্থ গুলো এস্তরের জন্য নিদিষ্ট, যা হল- মুয়াত্তা; সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তরের গ্রন্থরাজি ঃ এ স্তরের গ্রন্থের হাদিস গুলো এমনই যা দলিল স্বরূপ ব্যবহার করা যায় এবং যা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। তুলনামূলক কম হলেও এ সব কিতাবের মধ্যে দূর্লভ হাদিসও রয়েছে। যেমন--

* সুনানে নাসায়ী * সুনানে আবি দাউদ; * সুনানে তিরমিযী; * মুসনাদে দারেমী ইত্যাদি।

তৃতীয় স্তরের গ্রন্থরাজিঃ এ স্তরের কিতাবগুলোতে সহীহ, হাসান, মুনকার এবং দুর্বল হাদিসও রয়েছে; যা হলো-

সুনানে ইবনে মাজাহ; মুসানাদে তায়ালেসী; যিয়াদতে আহমদ; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর; মুসনাদে আবি লায়লা; মুসনাদে বাযযার; মুসনাদে জরীর; মুসান্নাফে তাহাবী; তাহযীবুল আছার তিবরী; তাফসিরে ইবনে জরীর; তাফসিরে ইবনে মরদুবীয়া; সুনানে দারে কুতনী; হুলইয়ায়ে আবি নঈম; সুনানে বায়হাকী; শুআবুল ঈমাণ ইত্যাদি।

চতুর্থ স্তরের গ্রন্থরাজি ঃ এ স্তরের হাদিসের কিতাবের মধ্যে বেশির ভাগই দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যা শ্রবণ মাত্রই দুর্বল হাদিস বলে মনে হবে। যেমন-হাকীম তিরমিযীর নাওয়াদেরুল উসূল; মসনাদুল ফেরদাউস; উকাইলির কিতাবুয় যুআফা; ইবনে আসিরের আল-কামিল; তারিখে খাতিব প্রভৃতি। এ স্তরের হাদিস সমূহ আহকামের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। তবে ফাযায়েল এবং তারিখের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

www.pathagar.com

পঞ্চম স্তরের গ্রন্থরাজি ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ শুধু দুর্বল হাদিসের বর্ণনায় লেখা হয়েছে। যেমন-

মাওযূআতে ইবনে জাওযী। আল-লা'য়ালিউল মাসনু'য়াতু ফিল মাউযু'য়াত। হাদিস সংকলনের প্রাথমিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য হাদিসের পুস্তক লেখা হয়েছে; যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো- কাশফুয যুনূন; এত্তেফাকুল নুবালা। এ সকল কিতাবের মধ্যে বিশেষ ভাবে ছয়টি কিতাব সর্বজন সমাদৃত ও গ্রাহ্য হয়েছে। আর সেগুলো হল- ১. সহীহ বুখারী; ২. সহীহ মুসলিম; ৩. সুনানে নাসাঈ; ৪. সুনানে আবি দাউদ; ৫. সুনানে তিরমিযী; ৬. সুনানে ইবনে মাজাহ।

কোটি মানুষের হৃদয়ে বিভিন্ন স্তরে এসব মহামনীষী ইলমে হাদিসের অমর সেবা করে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। মহানবী (স)-এর হাদিস চর্চায় তাঁরা ব্যয় করে গেছেন তাঁদের সাধনার, চরম পরাকাষ্ঠা।

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে, যুগে যুগে হাদিস সংকলনের সোনালী অধ্যায়ের। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত জ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় হাদিস শাস্ত্র কালান্তরের ঘূর্ণিপাকেও রয়েছে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত। আব্বাসী খলিফা মুত্তাওয়াক্কিল বিল্লাহ হাদিস সংরক্ষণ ও তাঁর সার্থক প্রচারে উদ্যোগী হন। তিনি সুন্নাতে রাসুলের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি খলিফা হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বে হাদিস সংরক্ষণ ও তাঁর ব্যাপক প্রচার ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সময়কার শ্রেষ্ঠ হাদিসবিদ আবু বকর কুফায় হাদিস শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন ও শিক্ষা দান করেন। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ত্রিশ হাজার ছাত্র একত্রিত হয়। এরপরে তাঁরই ভাই উসমান ইবনে আবু বকর জামে আল-মানসুর -এ হাদিস শিক্ষা দানে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর নিকটও অনুরূপ হাদিস শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয়। হাদিস শিক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য ইতিহাসে আল-মুতাসিম বিল্লাহকেও গভীরভাবে স্মরণ করে। অন্যদিকে বিভিন্ন ভাবে বাছাই করে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের পর সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হাদিসের সমন্বয়ে উন্নত ধরনের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ আব্বাসী শাসনামলে ব্যাপক মর্যাদা সহকারে সুসম্পন্ন হয়। আব্বাসীয় যুগে আল্লাহর অনুগ্রহে কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব হয়। হাদিস সংকলনের সে সব স্বর্নযুগের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা চলছে। অনাগত ভবিষ্যতেও তা চলবে।

www.pathagar.com

ইত্তেবাউস্ সুন্নাহ
(সুন্নাতের অনুসরণ)
ডঃ এ.বি. এম. ছিদ্দীকুর রহমান

"সুন্নাহ হল ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় মূলনীতি। রাফেজী বা জিন্দিকরাই শুধু বলে থাকে হাদীছে আমলের কোন প্রয়োজন নেই এবং সুন্নাহ শরীয়াতের দ্বিতীয় দলীল নয়। কুর'আন-ই শুধু শরীয়াতের দলীল। পাকিস্তানের "আহ্লুল কোরআন" নামে এক দল লোক আছে যারা হাদীছ মানতে নারাজ। অনুরূপ শুনা যাচ্ছে লিবিয়ার একটি দলও সুন্নাহকে ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে স্বীকার করে না। আমাদের কথা হল যে, রাসূলের (সঃ) হাদীছকে যে অস্বীকার করে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে সে কাফির। আর সে মিল্লাতে ইসলামীয়ার বহির্ভূত। ইয়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য কাফেরদের সাথে তার হাশর হবে।

রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে আমরা কুরআন পেয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের উপর রাসুলের (সঃ) অনুসরণ ফরজ করেছেন এবং তার নাফরমানি হারাম করেছেন। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের শর্ত হল, রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমান আন।"

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সমান। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান রাখে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার জন্য রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমানের সাথে অঙ্গাংগি ভাবে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ মানুষের উপর তাঁর অহী ও তাঁর নবীর সুন্নাহ এর অনুসরণ ও অনুকরণ ফরজ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তাদের জন্য রাসুল রয়েছে যাঁরা কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে "কিতাব" দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে এবং 'হিকমাত' দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে।

সুন্নাহ্ এর আভিধানিক অর্থ ঃ

সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পথ বা রাস্তা। চাই উহা ভাল পথ হোক অথবা মন্দ পথ হোক। রাসুল (সঃ) বলেনঃ

তোমরা তোমাদের পূর্বর্তীদের পথের অনুসরণ অনুকরণ করবে, বিঘত ও হাত বহাত। অর্থাৎ আমার--উম্মাতের এমন এক সময় আসবে, যখন তারা ইয়াহুদ নাসারা তথা বিজাতিদের নিখুঁত ভাবে অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

অন্য হাদীছে তিনি বলেন ঃ

যে লোক ইসলামে ভাল রাস্তা আবিস্কার করল, সে এর সওয়াব পাবে এবং যে উহাতে আমল করবে তার-সমান সওয়াব পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রাস্তা আবিস্কার করল, সে উহার পাপ ভোগ করবে এবং যে ঐ মন্দ রাস্তার আমল করবে, তারও সমান পাপের ভাগী হবে। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। (মুসলিম)

সুন্নাহর এর পরিভাষাগত অর্থ ঃ

মুহাদ্দেসীনের পরিভাষায় সুন্নাহ এর মানে হচ্ছে, যা রাসূলের (সঃ) কথা বা কাজ অথবা অনুমোদন সূত্রে পাওয়া গেছে। (তাওজীহুননাজার ইলা উলুমিল হাদীছ ঃ২)

আল্লামা আবদুল আযীয আল-হানাফী বলেন ঃ সুন্নাহ বলতে বুঝায়, রাসূলের (সঃ) কথা ও কাজ। এ'ছাড়া রাসূল (সঃ)ও সাহাবীগণের বাস্তব-কর্মনীতিকেও সুন্নাহ বলে। (কাশফূল আসরারঃ ২৫৯)

পবিত্র কুরআনে এই সুন্নাতকে-ই "সিরাতুল মুসতাকীম বা সরল পথকে বুঝনো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে আমার সঠিক ও সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করে চলবে। তোমরা এ পথ ছাড়া অন্যান্য পথ ও মতের অনুসরণ কর না, তা হলে তোমাদের এ পথ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। (সুরা আল আনআম ঃ ১৫৩)

অত্র আয়াতে "সিরাতুল মুসতাকিম' বলতে সুন্নাতকে বুঝান হয়েছে। সিরাতুল মুসতাকীম হচ্ছে আল্লাহ্র পথ, যা অনুসরণের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাই হল সুন্নাত। সুন্নাতের বিপরীত বিভিন্ন পথ বলতে বেদআ'তকে বুঝান হয়েছে। (আল-ইতেসামঃ১/৩৫)

সাহাবীগণ রাসূলের (সঃ) যুগে তাঁর থেকে শরীয়াতী আহকাম গ্রহণ করতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ইজমাল (সংক্ষিপ্ত) ও মুতলাক (শর্তহীন) ভাবে অবতীর্ণ হত, যেমন ঃ নামাযের আদেশ সূচক আয়াত সমূহ। যাতে নামাযের রাকাতের সংখ্যা, ওয়াক্তত ও নামায আদায়ের নিয়মাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা নেই। অনুরূপভাবে কুরআনে যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আয়াতে যাকাতের নেসাব বা যাকাত আদায়ের জন্য পরিমিত মালের বর্ণনা নেই এবং উহার শর্ত ইত্যাদিরও বর্ণনা নেই। অনুরূপ বহু আহকাম, যা কুরআনে মুজমাল ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যার শর্ত, রোকন ইত্যাদির ব্যবহারিক রূপ দেয়ার জন্য একমাত্র ভরসাস্থল হলো রাসুল (সঃ)। তিনি শরীয়তের মুজমাল আহকামকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

তদ্রূপ বহু বিষয়, যে সম্পর্কে কুরআনের সরাসরি কোন আয়াত নেই। সেগুলোও আমরা রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে পেয়েছি।

তিনি হলেন আল্লাহর পক্ষ হতে মুবাল্লিগ। আর একমাত্র তিনিই আল্লাহ্‌র শরীয়াতের প্রবর্তক, রাসূল (সঃ) তা আমাদের মধ্যে পৌছিয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌ কুরআনে রাসুলের (সঃ) প্রয়োজনীয়তা ও তার করনীয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, রাসুল হলেন প্রকৃত পক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের প্রতি যে হুকুম আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে তা বর্ণনা করেন। যার ফলে অবশ্যই তারা চিন্তা ভাবনা করবে। (সুরাহ আন্নাহাল-৪৪)

অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা তার নির্দেশ মেনে নেয়া ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

আমি আপনার নিকট কিতাব (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি শুধু এজন্য যে, আপনি মানুষদের কাজে তাদের মধ্যকার মতবিরোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্পষ্ট সমাধান দিবেন। আর এটা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (সূরাহ আন-নাহল ঃ ৬৩২) এখানে মানুষের মধ্যে পরস্পর মত বিরোধ হলে রাসুলের (সঃ) ফয়সালা মেনে নেয়া ওয়াজিব করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন ঃ আপনার প্রভুর শপথ, তারা কখনো মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আপনার ফয়সালা মেনে নিবে না। অতঃপর রাসুলের (সঃ) ফয়সালাকৃত বিষয়ের উপর তাদের কোন দ্বিধা দ্বন্ধের অবকাশ থাকবেনা এবং আপনার ফয়সালাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিবে। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, আমি মুহাম্মদকে (সঃ) কিতাব ও হিকমত দিয়েছি, যা দ্বারা সে মানুষকে তাদের দ্বীন শিক্ষা দিবেন। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহ্‌ অবশ্যই মু'মনিদের উপর ইহ্‌সান করেছেন, তাদের মধ্যে তাদের জাতি থেকে একজন রাসুল পাঠিয়ে, যিনি তাদের উপর কুরআনের আয়াত পাঠ করবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও হিকমত শিক্ষা দিবেন। যদিও তারা ইতিপুর্বে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে ছিল। (আল ইমরানঃ ১৬৪)

অত্র আয়াতে 'হিকমাত' এর কথা বলা হয়েছে। একথার উপর আলিমগণের ঐক্যমত যে, আয়াতে 'হিকমাত' দ্বারা সুন্নাত কে বুঝান হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর কিতাব এর কথা বলেছেন। এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল কুরআন এবং ' হিকমত' দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'সুন্নাতে রাসুল'।

www.pathagar.com

আমাদের কথা হচ্ছে, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ কিতাব এর পর সুন্নাতের কথা বলেছেন। সুতরাং যেমনি ভাবে কিতাবের উপর আনা ওয়াজিব, অনুরুপভাবে সুন্নাত এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। তদ্রূপ ভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য শর্ত হল, রাসূলের (সঃ) উপর ঈমান আনা। (আর রিসালাহ্, ইমাম শাফেয়ী ঃ ৭৮)

ইমাম শাফেয়ীর কথায় এটাই প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে (সঃ) হিকমাত অর্থাৎ সুন্নাহ দিয়ে বড়ই ইহসান করেছেন। আর ইহসান হক্ক বস্তুর উপরই হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআনের উপর যে ভাবে আমল করা ওয়াজিব তদ্রূপ সুন্নাহ এর উপরও আমল ওয়াজিব।

আল্লাহ্ রাসুলকে (সঃ) কুরআন দিয়েছেন, অনুরূপ ভাবে তার সাথে কুরআনের মতই অন্য একটি বস্তু দিয়েছেন তা হল সুন্নাহ্। এ বিষয় আল্লাহ্ বলেনঃ

তিনি মানুষকে মারূফ বা সৎকাজের এবং মুনকার বা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেছেন। এখানে মারূফ দ্বারা সুন্নাত কাজকে বুঝান হয়েছে এবং মুনকার দ্বারা বিদআত বা গর্হীত কাজকে বুঝানো হয়েছে। আল্লামা হাদ্দাদী তার তাফসীরে লিখেছেনঃ মারূফ হচ্ছে সুন্নাত এবং মুনকার হচ্ছে বা বিদআত (রুহুল মায়ানী ১/৩৬৫)

মহান আল্লাহ্ রাসূলের (সঃ) আদেশ নিষেধ পালন করা ওয়াজিব করেছেন। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ তোমাদেরকে রাসুল (সঃ) যা দিয়েছেন, তা পালন কর। আর যা থেকে বারণ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক। (সুরাহ আল-হাশর ঃ ৭)

আল্লাহ্ বহু আয়াতে রাসুলের (সঃ) অনুসরণকে তার (আল্লাহ্র) আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র অনুগত হও এবং রাসূলের (সঃ) অনুসরণ কর। তাহলে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (আল-ইমরান ঃ১৩২)

আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে রাসুলে (সঃ) এর ডাকে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যেমন এরশাদ হয়েছে, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসুলের (সঃ) ডাকে সাড়া দাও। কারণ তাদের ডাকে সাড়া দিলে আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান জীবিত করবেন। অর্থাৎ তাতে তোমরা মুমিন হিসেবে জীবিত থাকতে পারে। (আল-আনফাল ঃ ৩৪)

আল্লাহ্ রাসুলের অনুসরণকে তার আনুগত্যের সমমর্যাদা দিয়েছেন। যে রাসুলের অনুকরন করবে, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল। (নিসা–৮০)

রাসুলের (সঃ) অনুসরণ ও অনুকরণকে আল্লাহ্র মহাব্বতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

'তোমরা যদি আল্লাহর মুহাব্বত চাও, তবে আমাকে অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশী মোচন করবেন'। (আল ইমরান ঃ ৩১)

আল্লাহ্ মানুষকে তার বিরোধীতা হতে ভীতি প্রদর্শন করেছেন ঃ যারা তার আদেশ নিষেধের বিরোধীতা করে, তারা যেন এ ভয় করে যে তাদের দুনিয়াতে ফিতনা এবং আখিরাতে যন্ত্রদায়ক শাস্তি আপতিত হতে পারে (আন্ নূর ঃ ৬৪)

আল্লাহ্ রাসুলের (সঃ) বিরোধীতাকে সরাসরি কুফরির হুকুম দিয়েছেন, হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রদর্শন করো এবং আমার অনুসরণ কর। আর যদি তোমরা এর বিপরীতটি কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ কাফিরদের ভাল বাসেন না। (আল-ইমরান ঃ৩২)

আল্লাহ্ মু'মুনিদের জন্য মোটেও রাসুলের (সঃ) আদেশ নিষেধ অমান্য করা বৈধ করেননি।

কোন মু'মিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীর জন্য কশ্মিন কালেও এটা উচিৎ নয় যে, যখন আল্লাহ্ ও তদ্বীয় রাসুল (সঃ) কোন নির্দেশ করেন, তখন তাদের কোন স্বাধীনতা থাকা। আল্লাহ্ ও রাসূলের সকল আদেশ নিষেধ তাদেরকে সর্বান্তকরনে মেনে নিতে হবে। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) অবাধ্যতা করে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত হবে। (সুরাহ আল-আহযাব ঃ ৩৬)

আল্লাহ্ তার রাসুলের (সঃ) ফয়সলা মেনে না নেয়াকে নেফাকী (কপটতা) বলে ঘোষণা করেছেন। (মুনফিকরা বলে) আমরা আল্লাহ্ ও রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাদের অঙ্গিকার থেকে পিছু হটে যায়। তারা প্রকৃত মুমিন নয়। (সুরা আন-নূর ঃ ৪৭)

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল, রাসুলের (সঃ) প্রতি ঈমান আনা। রাসূল (সঃ) প্রতি ঈমান আনার মানে হচ্ছে তার সুন্নতে আমল করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনে। অত্র আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরিশুদ্ধতার জন্য রাসুলের প্রতি ঈমান আনাকে শর্ত করা হয়েছে।

[পাক্ষিক তাবলীগের সৌজন্যে]।

www.pathagar.com

হাদীস সংরক্ষনের ইতিকথা

আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন

কুরআনুল করীম সংরক্ষনের জন্য প্রধানত দুটি পদ্ধতি বেশীর ভাগ সময় ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাহাবায়ে কেরামের তীক্ষ্ণ মেধার আলোকে মুখস্থকরণ পদ্ধতি, আর অপর পদ্ধতিটি হচ্ছে লিখন পদ্ধতি। বিভিন্ন গ্রন্থাদির মাধ্যমে যতটুকু জানা যায়, প্রায় চল্লিশ জন সাহবী কুরআন শরীফ লিখনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছাব্বিশ জন সাহাবী প্রখ্যাত ও উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন সাহাবী হিসেবে পরিচিত। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত জায়েদ ইবনে সাবীত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়ীদ, হযরত আমর ইবনুল আস, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ দু'প্রকারের কুরআন শরীফ সংরক্ষণের জন্য উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে চিরকালের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাশ্বত বাণীকে হেফাজতের ব্যবস্থা করে দিলেন। একই সাথে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর অগণিত বাণী (হাদিস) সংরক্ষণের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণকে প্রেরণার উৎস হিসেবে অনুসরণের সুযোগ করে দিলেন। ঠিক রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস সংরক্ষণের জন্য প্রধানত এ দু'টি পদ্বতিই অবলম্বিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং মানুষের মানবিক প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা। এ পর্যায়ে বিস্তারিত ও ঐতিহাসিক আলোচনা এখানে পেশ করা হলো।

স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত ব্যবস্থা

হাদীস সংরক্ষণের এ ব্যবস্থায় তিনটি ব্যাপার বেশী গুরুত্বের দাবীদার প্রথম- তৎকালীন আরব বাসীদের স্বাভাবিক স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতা। দ্বিতীয়- সাহাবায়ে কেরামের যথেষ্ট জ্ঞান পিপাসা জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের অভূতপূর্ব তিতীক্ষা। তৃতীয়- ইসলামী আদর্শ ও জ্ঞান বিস্তারের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ।

এ কথা আমাদের সকলেরই জানা যে, তৎকালীন আরব জাতির স্মরণশক্তির আলোচনা করলে, তা এক ঐতিহাসিক বিস্ময় বলে স্থান পেতে বাধ্য। কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণের জন্য এটির যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফের সূরায়ে আনকাবুতের ৪৯ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন, "বরং এ কুরআন সুস্পষ্ট আয়াত সমষ্টি , এটা জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মানস পটে সুরক্ষিত।"

www.pathagar.com

এ আয়াতে মুসলিম মনীষী তথা সাহাবায়ে কেরামের অস্বাভাবিক মেধা ও স্মরণ শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুফাসসীরগণ এ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম এমন ভাবে মুখস্থ করার জন্য অভ্যস্ত ছিলেন যে, বিকৃতি বা রদ-বদলের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

সর্বকাল ও সর্বযুগের ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আরবদের মেধাশক্তি ছিল তাদের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য। অনেকে আরও মন্তব্য করেছেন যে, আরবগণ এমনিতেই মেধাশক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করতো। আরবদের দীর্ঘ কবিতা আবৃতির প্রতিযোগিতা ও বিতর্কও তার এক অসাধারণ প্রমাণ। যে কেউই হোক কবিতার দু'চারটি পংক্তি তাদের মুখস্থ থাকতোই। কথিত আছে যে, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) আবু রাবিয়া নামক এক প্রসিদ্ধ আরব্য কবির দীর্ঘ একটি কবিতা একবারেই মুখস্থ করে নিয়েছিলেন।

আমরা সকলে এই কথা অবগত আছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সকল সাহাবীই আরব জাতির লোক ছিলেন। তদুপরি তাঁরা লেখাপড়ায় পারদর্শী ছিলেন না। তাই তাঁরা সকলেই একমাত্র স্মরণশক্তির উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। এর প্রমান স্বরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁদের দীর্ঘ বংশ তালিকা, পূর্ব পুরুষদের নানা রকম ঐতিহাসিক তথ্য লিখনী ব্যাতিতই ক্রমানুসারে নির্বিঘ্নে তাঁরা প্রকাশ করতে পারতেন।

আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিক স্মরণ শক্তি সম্পন্ন আরব জাতির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নবুওয়াত ও রিসালাতের সংরক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। আর তাঁর সাথে সাথে আল্লাহর বাণী ও রাসুলের (সাঃ) মর্মবাণী মুখস্থ করার জন্য এসব প্রখর স্মরণ শক্তি সম্পন্ন হৃদয়কে প্রস্তুত করে দেন। আর এ কারণেই কুরআন মজীদ নাজিল হওয়ার সংঙ্গে সংঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখে শোনা মাত্রই মুখস্থ রাখার জন্য তারা সক্ষম হয়েছিলেন। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কুরআন শরীফ ছোট খাট কোন গ্রন্থ নয়, বরং মতান্তরে ৬৬৬৬ আয়াতের অর্থাৎ বিরাট এক গ্রন্থের মুখস্থ করণে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। কিন্তু উমাইয়া বংশের শাসক মারওয়ান ইবনে হিকামের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি হযরত আবু হুরায়রাকে (রাঃ) কিছু হাদীস শুনানোর অনুরোধ জানালে তিনি অকপটে তা শুনিয়ে দেন। পরীক্ষার জন্য মারওয়ান পর্দার আড়ালে থেকে লেখার জন্য ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনার ঠিক এক বছর পর আবু

www.pathagar.com

হুরাইরা (রাঃ) কে আবার ঐ হাদীসসমূহ শুনানোর অনুরোধ জানান। তিনি তা শুনিয়েছিলেন। মারওয়ান লিপিবদ্ধ হাদীসসমূহের সাথে মিলিয়ে কোনরূপ গরমিল লক্ষ্য করলেন না। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) মত এমন অনেক সাহাবীই এমন তীক্ষ্ণ মেধা ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। হযরত ইমাম ইবনে শিহাব জহুরীর (রাঃ)ও স্মরণ শক্তির এক ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া যায়। একবার তদানীন্তন বাদশাহ হিশাম তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু সংখ্যক হাদীস লিখে দিতে অনুরোধ করেন। ইমাম জহুরী তখন চারশ' হাদীস লিখে পাঠান। অনেক দিন পর ঐ হাদীসগুলো পুনরায় লিখিয়ে দেন। বাদশাহ উভয় বার লিখিত হাদীসসমূহকে মিলিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন যে, দ্বিতীয়বারে প্রথম বারের একটি অক্ষরও বাদ পড়েনি।(তাযকিরাতুল হুফফাজ)।

এ প্রসঙ্গে ইমাম জহুরী (রা) নিজেই বলেছেন, " আমি যখন বকী বাজারের নিকট যাতায়াত করতাম তখন আমার কর্ণদ্বয় এই ভয়ে বন্ধ করে নিতাম যে, কানের ভিতরে যেন কোন অশ্লীল কথা প্রবেশ না করে। কেননা আল্লাহ্‌র কসম, আমার কানে কোন মন্দ বা কথা প্রবেশ করলে আমি তা কখনো ভুলে যাই না। তিনি আরো বলেছেন, " আমার নোট বইয়ে আমি যা লিপিবদ্ধ করেছি, তা-ই আমি মুখস্থ করেছি।

এভাবে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীস সংরক্ষণকারীর এমন অনেক নজির পাওয়া যায়। হযরত ইমাম শাবী, অকী, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, মুহাদ্দিস কাতাদাহ (রাঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

স্মরণশক্তির প্রখরতার উপর তায়েবীগণের যুগেও অনেক মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন যে, রাজধানী বাগদাদে মুহাদ্দিস আবু জুরআ (রঃ) থেকে অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দেখা যায়নি। কেবলমাত্র কুরআন শরীফ সম্পর্কীয় দশ হাজার হাদীস তিনি মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর ইসফাহানী (রাঃ) তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। হযরত ইমাম বোখারীর উস্তাদ হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রাঃ) এত বেশী হাদীস বলতেন যে, হাজার হাজার হাদীস তিনি ছাত্রগণকে লিখে দিতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, সত্তর সহস্র হাদীস আমার চোখের সম্মুখে ভাসমান থাকে। ইমাম বুখারী (রঃ) সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেন। তাহার সহশিক্ষার্থী এক ব্যক্তি বলেছেন-আমরা যখন হাদীস পড়া শুরু করতাম তখন আমাদের উস্তাদ কর্তৃক হাদীস বর্ণনার সঙ্গেই

www.pathagar.com

তা লিখে নিতাম। কিন্তু ইমাম বুখারী তা করতেন না (লিখতেন না)। অথচ তিনি এমনভাবে তা মুখস্থ করতেন যে, আমাদের লিখিত হাদীসগুলোর ভুল ত্রুটি তার থেকে সংশোধন করে নিতাম ।

উপরের ঘটনাসমূহ হতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হাদীস সংরক্ষণের জন্য যদি সে যুগে স্মরণ শক্তি ও মুখস্থ বিদ্যার মত সম্পদ না থাকত, তাহলে কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। বস্তুতঃ এটা ছিল তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম নেয়ামত। যার ফলে আজ আমাদের নিকট এ সব অমূল্য সম্পদ নিখুঁত ভাবে এসে পৌছেছে। এ ব্যাপারটির আরও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যে, মানব জাতির দেহে যত গুলো শক্তি ও সামথ্য দান করা হয়েছে, এর একটি যদি দুর্বল হয়, তাহলে অন্যটি সাধারণত সবলতম হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তির এক চোখ অন্ধ থাকে, এক চোখে অত্যন্ত বেশী দেখে। আরব জাতির হাদীস সংরক্ষণের বেলায়ও এমনটি কাজ করেছে। লেখার প্রচলন না থাকার দরুন তখন লেখার পরিবর্তে মুখস্ত করার উপরই তারা নির্ভরশীল ছিল। ফলে হাদীস সরক্ষণের প্রথম পর্যায়ে স্মরণ শক্তি এক নম্বরে স্থান দখল করেছিল।

রাসুল (সঃ) এর নির্দেশ ঃ

হযরত রাসুলে করীম (সঃ) এর জীবন দ্বারাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা রূপায়িত হয়েছে । এ কারণে মুসলিম মিল্লাতের জন্য এটি এক অমূল্য সম্পদ। এক দিকে রাসুল (সঃ) যেমন আল্লাহর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ বা কথা বলতেন না, অন্যদিকে সহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসুলের (সঃ) অতন্দ্র প্রহরী। এ দুয়ের সমাবেশে সারা জীবনের কথা, কাজ ও রাসুলের গতি বিধি সাহাবায়ে কেরামগণের উপলব্ধির বাইরে যেত না। এমনকি তাদের মধ্যে পালা বদলের নিয়ম চালু ছিল। অর্থাৎ একদল সাহাবী প্রাত কালে রাসুলের সান্নিধ্যে আসলে অন্যদল তখন নিজেদের সাংসারিক কাজে যেতেন , আবার তারা ফিরে আসলে প্রাতকালীন দল ছুটি পেত। আনন্দের কথা যে, প্রাতকালের দলকে তাদের অবস্থানের সমস্ত ঘটনবলী ও রাসুলের বাণী আগতদের কাছে বর্ণনা করতে হত। আবার তাদের বেলায় এমন নিয়মই পালন করা হত। সাহাবায়ে কেরামের এরূপ একান্ত আগ্রহ ও রাসুল প্রিয় হওয়ার সুবাদে ও সাহাবগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই রাসূলের (সাঃ) সকল কথা ও কাজ সঞ্চিত ও পূঞ্জীভূত হয়।

তারপরও শুধু উপরের ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল ছিল না। নবী করিম (সাঃ) নিজেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ।

www.pathagar.com

তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছেন, আল্লাহ্‌ সেই ব্যক্তিকে চির সবুজ চিরতাজা করে রাখবেন, যে আমার নিকট কোন কিছু শুনলো অন্য লোকের কাছে তা পৌঁছে দিল। কেননা, পরে যাহার নিকট উহা পৌঁছে সে প্রথম শ্রোতার তুলনায় উহাকে অধিক হেফাজত করে রাখতে সক্ষম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসুল বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকজ্জ্বল করবে দিবেন, যে আমার কথা শুনে তা স্মরণ করে দিল । আর তাকে হেফাজত করল এবং অপরের নিকট পোঁছেয়ে দিল অনেক জ্ঞান বহনকারী আছে যে, যার কাছে সে পৌছাল সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেন,এই কথাগুলি তোমরা পুরাপুরি স্মরণ করে রাখ, উহাকে সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের অবহিত কর। (বুখারী) তিনি আরও বলেছেন, মুসলিম উম্মতের মধ্যেযে ব্যক্তি চল্লিশ হাদীস মুখস্থ করবে, আল্লাহ তাকে একজন ফিকাহবিদ বানিয়ে দিবেন। আর আমি কিয়ামতের তার জন্য শাফায়াতকারীও সাক্ষী হব (মিশকাত)।

অন্যদিকে আরবদের প্রখর মেধা তার উপর রাসুলের নির্দেশ হাদীস সংরক্ষণের কাজ জোরদার হয়েছে। রাসুল (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা তারা সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে এঁকে নিতেন। বাজ পাখী শিকারীর জন্য যেমন ওঁত পেতে থাকে সাহাবায়ে কেরামও রাসুলের প্রতি তার চেয়ে সর্তক ছিলেন। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব বলেছেন, রাসুলের বাণী মুখস্থ করতাম।(মুসলিম) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আঁমরা রাসুলের নিকট থেকে এভাবেই হাদীস মুখস্থ করতাম। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ ভাগে রাসুলে করিম (সাঃ) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, এখানে উপস্থিত লোকরা যেন অনুপস্থিত লোকদের এ কথা গুলি পৌছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের নিকট পৌছানো হবে তারা অধিক হেফাজতকারী হতে পারে।" সাহাবায়ে কেরামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাসুলের হাদীস সংরক্ষণের তাগিদ বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুযোগ সাহাবায়ে কিরামের নিকট এসে যায়।

সাহাবায়ে কেরামের হাদীসের অনুশীলন ঃ

নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস মুখস্থ করেই সাহাবায়ে কেরাম ক্ষান্ত হননি বরং নিজেদের ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছেন। যখনি রাসুল (সাঃ) কর্তৃক কোন ফরমান জারি হয়েছে তৎক্ষণাত শুরু হয়ে যেত তার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। এমনকি কোন নির্দেশই বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার

www.pathagar.com

বাকী ছিলো বলে প্রমান পাওয়া যায়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ আমাদের মধ্যে কেহ দশটি আয়াত শুনলে তদানুয়ায়ী আমল করার আগে যে অন্য কিছু শোনার জন্য আগ্রহী হত না। এখানে প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম (সাঃ) হতে সাহাবায়ে কেরাম যা শুনতেন বা শিখতেন তা অনতিবিলম্বে তা নিজের আমলে পরিণত করতেন। নবী (সাঃ) -এর অসংখ্য বাণীও এ সংক্রান্ত পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ ঠিক সেভাবেই নামাজ আদায় কর (বুখারী)। হজ্জ সম্পর্কে এক হাদীসে পাওয়া যায়, 'তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্ব উদযাপনের নিয়ম কানুন শিখ।" অর্থাৎ হজ্বের সময় আমি যে সব কাজ করছি তোমরা তারই অনুসরণ কর। কোন ভুল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দেখতে পেলে তিনি তা সংশোধন করিয়ে দিতেন। যেমন একদিন এক সাহাবীকে মসজিদে নববীতে নামাজ শেষে রাসুল (সঃ) বললেন, ফিরে যাও, নামাজ পড়া হয়নি এভাবে তিনবার বললেন, অর্থাৎ যেভাবে নামাজ পড়া দরকার সেভাবে হচ্ছে না। এভাবে রাসুলের সংস্পর্শে সাহাবায়ে কেরাম শুদ্ধ পদ্ধতিতে হাদীসের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ লাভ করেছেন।

রাসুল আরো বলেছেন, 'তোমাদের নিকট আমি চরিত্রকে উত্তমতায় পরিণত করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।' রাসুল তাই চরিত্র এবং আমলিয়াতের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমি "আমি রাসুলকে এমন ভাবেই নামায পড়তে দেখেছি।" হযরত আনাস দশ বৎসর যাবত রাসুলের খিদমতে কাটিয়েছেন। এই সব আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত কথাগুলি সুস্পষ্ট বের হয়ে আসে।

(১) রাসুলে করীম (সঃ) দ্বীনের কোন কাজ কিভাবে করতেন তা অনুসরণ করা ও অনুকরণ করার জন্য রাসূল (সঃ) নিজেও তাগিদ করতেন এবং নিজেদের প্রয়োজনেই তা পালন করতেন। কারণ দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় ছিল রাসুলের কথা গ্রহণ ও অনুধাবন এবং হাতে কলমে তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

(২) দ্বীন সম্পর্কে লোকেরা কিছু জানতনা, এ জন্য আল্লাহ পাক রাসুলে মাকবুলকে দ্বীনের শিক্ষা দাতা হিসেবে দ্বীন জানাবারও বুঝাবার ব্যবস্থা করেছেন।

(৩) দ্বীনের কাজকর্ম রাসুল যেভাবে করতেন সাহাবায়ে কেরামও হুবহু সেভাবে করতেন, আর এরূপ পালনের মধ্যে দিয়েই দ্বীনের একটি বাস্তব নমুনা নিজেদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

হাদিস শিক্ষা দানে সাহাবায়ে কেরাম ঃ

হযরত (সঃ)-এর ইন্তিকালের পরপরই সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শরীফ শিক্ষা দান ও প্রচারের পাশাপাশি হাদিস শিক্ষা দানে এবং প্রচারে কোনরূপ অলসতা প্রদর্শন করেননি। তাদের এই অলসতা বিহীন কার্যক্রমের ফলেই হাদিসের বিশাল সংখ্যায় গ্রন্থের সৃষ্টি করেছে। নিম্নে কয়েকজন হাদীসের বিশিষ্ট প্রচারক ও শিক্ষাদাতা সাহাবীর উল্লেখ করছি ঃ

(ক) হযরত আবু ইদরীস (রাঃ) বলেন, আমি হিমস শহরের মসজিদে এক মজলিসে একত্রে বহু সাহাবীকে হাদিসের শিক্ষাদানে রত দেখতে পাই, একজন সাহাবী শেষ করলে দ্বিতীয় জনের পড়ার পালা আসত।

(খ) নসর ইবনে মাসেমুল লাইসী বলেন, আমি কুফা জামে মসজিদে এক মজলিসে এক ব্যক্তির পানে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম হাদীস শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। জিজ্ঞাসার পর জানলাম হাদীস শিক্ষাদাতা সাহাবী হুজাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)।

(গ) হযরত আয়েশা (রাঃ) অনেক সময়ই মদীনায় হাদীস শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকতেন। এক সঙ্গে দুইশত লোকের অধিক হাদিস শুনতেন। অনেক মহিলাও তার শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত থাকতো।

(ঘ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিয়মিতভাবে হাদীসের দরস দিতেন। জানা যায় যে, তাঁর দরসের মজলিসে কমবেশী চার সহস্র হাদীস শিক্ষার্থী জমায়েত হত।

(ঙ) হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশকে হাদীস শিক্ষা দিতেন। বিপুল সংখ্যক হাদিস শিক্ষার্থী তাঁর দরসে উপস্থিত থাকত। কথিত আছে যে, আবু দারদা (রাঃ)-এর দারসে ষোলশত শিক্ষার্থী উপস্থিত হত।

(চ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইলমে হাদিসের জন্য রাসুলের ইন্তিকালের পর ষাট বৎসর পর্যন্ত হাদিস শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মদীনায় নিয়মিতভাবে হাদীসের দারস দিতেন। তিনি ঘরে ঘরে গিয়েও হাদিসের দারস দিতেন।

(ছ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ মসজিদে নববীতেই একটি হাদীস শিক্ষা দান কেন্দ্র স্থাপন করে হাদীস শিক্ষা দিতেন।

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা ঃ

www.pathagar.com

নবী করীম (সঃ) যেমন হাদীস প্রচার সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে উহার উপর সতর্কতার উপর ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। মনগড়া মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ কথা প্রচার বর্ণনা করতে কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তাহার আশ্রয় স্থল জাহান্নামে খোঁজ করে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যে যেন জাহান্নাম তাহার আশ্রয় বানিয়ে লয়। এমনিভাবে রাসুলের অসংখ্য হাদীস এ বিষয়ে পাওয়া যায়। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম হাদিস প্রচার ও শিক্ষায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কথিত আছে যে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে একবার হাদিস বর্ণনা করতে বলেন, তিনি ইনশায়াল্লাহ বলে হাদিস বর্ণনা থেকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। অর্থ্যৎ তিনি হাদীসের বর্ণনার প্রতি উৎসাহী ছিলেন না, তা নয় বরং এ ছিল হাদীস বর্ণনায় প্রতি যার পর নেই সর্তকথার প্রমাণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাদীসের মহাসমুদ্র থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাদিস বর্ণনা করা পছন্দ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের খুব কম হাদিস বর্ণনা করতেন। তিনি রাসুলের হাদিসের উপর মিথ্যা বলার হাদীসের সর্তকতার আলোকেইএ নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

[সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় প্রকাশিত]

www.pathagar.com

মহানবীর জীবনাদর্শ

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

রবিউল-আওয়াল মাসের অনুষ্ঠান স্মরণে প্রথমেই মনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হজরত মুহম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাই হে-চ্ছালামের অতুল্য সাধনার মহান দৃশ্য, আর সে সাধনার অপূর্ব সাফল্যের কথা।

মহানবীর মা হতে না পারার আফছোছ মক্কার বহু নারী জীবনপাত করেন। তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় জননী আমিনার ঘরে বেহেস্ত থেকে সুশ্রূষার জন্য বহু পুণ্যময়ী নেমে আসেন, বাল্যে তিনি যখন বাহিরে যেতেন মেঘেরা তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করে চলত। এসব কথা যারা বলেন তাঁরা মহানবীর সাধনা-জীবনকে লোকচক্ষে ছোট ক'রে ফেলেন কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

শৈশব থেকেই যদি তিনি অমন অদ্ভুত ঐশী অনুগ্রহের অধিকারী থাকতেন, পয়গম্বরীর ছনদ যদি তিনি হাতে নিয়ে দুনিয়ার আসতেন তবে লোকে বলতঃ উনি না চেয়েই তা সব পেয়েছেন, তাঁর নিজের কৃতিত্ব তবে রহিল কোথায়?

এখানে আসল কথা আরবের আর দশজন শিশুর মত শিশু মুহম্মদও ধরায় এসেছিলেন। কোন অসাধারণ, অদ্ভুত ঘটনা তাঁর জন্ম বা শৈশব বাল্যকে বিস্ময়ের বিষয় করে তোলে নাই। বড় ঘরের শিশু লালন করে আরবের বেদুইন বালারা সেকালে পয়সা কামাই করত। অমন শিশু সংগ্রহের জন্য কতিপয় বেদুঈন বালা যখন মক্কার কোরায়েশী মহল্লায় আসে, তখন তার গরীব বিধবা আমিনার ঘর বাদ দিয়ে আগে আর সব ঘরে যায়, অবশেষে বিবি হালিমা তার ন্যাড়া উটে তুলে আমিনার শিশুকে নিয়ে যান। তিনি মহানবী যা হয়েছিলেন, তা প্রধানতঃ তাঁর অসাধারণ সাধনা বলেই হয়েছিলেন। প্রধানতঃ বলছি এই জন্য যে, তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর চিত্তে বিপুল দোলা দিয়েছিল। কেবল মক্কার পরিবেশ নয়, কেবল আরবের পরিবেশ নয়, তৎসঙ্গে সিরিয়ার পরিবেশও যেন নিশ্বাস রোধ করে দিন গুণছিল এমন একজন সংস্কারকের প্রতীক্ষায়, যে সংস্কারক যুগ যুগ সঞ্চিত তৎকালীন কদাচার ও কুসংস্কারের কবল থেকে মানব সমাজকে মুক্তি দিবেন।

মহাপুরুষ মুহাম্মদের (দঃ) এ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি যে, তিনি পরিবেশের আকুল আহ্বান শুনতে পেরেছিলেন। তারো চেয়ে তাঁর বড় কীর্তি, তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে আমরণ বিনিদ্র সাধনা করে গেছেন।

মহানবীর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তিই হচ্ছে এই সাধনা। দশ-এগারো বছর বয়সে তাঁর এ সাধনা শুরু হয়। ময়দানে তিনি মেষ চরাতেন, আর রাখালেরা দুরন্ত

www.pathagar.com

কোলাহলে মরু-বুক মুখরিত করে নানা রকম খেলা-ধুলায় মেতে উঠত। তিনি একলা কোন বাবলা গাছের ছায়ায় বসে অপলক চোখে চেয়ে থাকতেন সেই সব কাফেলার দিকে, যারা মক্কার মেলার পানে চলত। তিনি ব্যথিত চিত্তে ভাবতেন–এরা মেলায় যাবে, সওদা কেনাবেচা করবে, মদ খাবে, জুয়া খেলবে, তারপর তুচ্ছ কথা নিয়ে একে অন্যের বুকে বেদেরেগ খঞ্জর হানবে, রক্ত স্রোতে মেলার বুক লালে লাল হয়ে উঠবে। তনি ভাবতেন –"কবে–হায়, কবে তাঁর দেশ এ অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে?"

কিশোর মুহম্মদ চাচা আবু তালেবের সঙ্গে সওদাগরী কাফেলায় শরীক হয়ে সিরিয়ায় গেলেন। পথে পথে শহরে ঐ একই অনাচার দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল ঃ মক্কার সীমিত দঃখ-বেদনার কথা ভুলে গিয়ে সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের অধোগতি দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন, এ সমাজের মুক্তির জন্য কিছু করা যায় না?

অলস ব্যথার বিলাসে তিনি আপন কর্তব্য সমাপ্ত করলেন না। তিনি চারদিকে চেয়ে দেখলেন, এ অধোগতি রুখতে কেউ এগিয়ে আসছে না। তিনি সংকল্প করলেন, এ কর্তব্যের বোঝা তিনি একাই বহন করবেন।

২৫ বছর বয়সে তিনি ধনবতী বিধবা খাদীজা বিবিকে নিকাহ করেন। অসাধারণ ছিলেন এই মহিয়সী মহিলা। তিনি স্বামীর মহান সংকল্পে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে ষোল আনা সাহায্য সহানুভূতি করে চললেন,।

দীর্ঘ ১৫ বছর তক হীরার নির্জন গুহায় বসে কঠোর সাধনা করার পর তার কিশোর বয়স থেকে ৪০ বছর তক হিসাব করলে বলতে হয়, মহানবী তাঁর মহান কর্তব্যের প্রস্তুতি হিসাবে দুর্গত মানুষের মুক্তির পথ পাওয়ার জন্য সিকি শতাব্দীরও উর্ধ্বকাল পর্যন্ত চিন্তা করেন, আর এর অন্ততঃ ১৫ বছর কাল তিনি কঠোর তপস্যায় ডুবে থাকেন।

আজকের মুসলিম সমাজে এ সাধনার আদর্শ কোথায়? মিলাদ -মাহফিলে আমরা মহানবীর নামে উঠে দাঁড়াই। তাজিমের সাথে বুকে হাত বাঁধি, উচ্চ সুললিত কণ্ঠে দরুদ পড়ি, চোখে হাত বুলাই-যেন তিনি আমাদের কাছে আঁখির পুতুলের চেয়ে প্রিয়, বুকে ঠোঁটে আঙুল লাগাই–উদ্দেশ্য তাঁর দস্ত মোবারককে চুমা দিতে । এসবই ভাল কথা। কিন্তু তিনি এই যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুকঠোর সাধনা করে গেলেন, আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্য, অমন সাধনার জন্য আকুতি কোথায়?

www.pathagar.com

মানুষের মুক্তির পথের খোঁজে মহানবী শুচিশুদ্ধচিত্তে সিকি শতাব্দী কাল পর্যন্ত অতন্দ্র তপস্যা করেছেন। সে তপস্যার ফল ভক্ত শিষ্যদের কানে কানে মন্ত্রস্বরূপ দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য সমাধা করেন নাই। কোন পন্ডিত ডেকে তাঁর তত্ত্বকথাকে থিসীস-রূপে লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়ে কর্তব্য সাধনের তৃপ্তি লাভ করতে চান নাই। তাঁর জীবনের বাকী ২৩ বৎসর কাল তিনি তাঁর তপস্যা-লব্ধ তত্ত্বকথাকে, তাঁর সেই মুক্তির বাণীকে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য দুঃসহ দুঃখ বরণ করেছেন, নিঃসঙ্গচিত্তে বার বার মৃত্যুর মোকাবেলা হয়েছেন।

মানুষের মঙ্গলের জন্য এই যে আকুল আকুতি, এই যে বিনিদ্র তপস্যার পথে সত্যের সন্ধান এবং সত্য লাভের পর মানব সমাজে সে অমৃত বিলিয়ে দেওয়ার জন্য এই যে আমরণ কৃচ্ছ্রময় দুঃখবরণ, আমাদের জন্য মহানবীর জীবনের এ এক অনুপম আদর্শ।

[জাহানে নও পত্রিকা অবলম্বনে]

www.pathagar.com

সকল মানুষের নবী

আবুল ফজল

হজরত মুহম্মদের (দঃ) আগে পৃথিবীতে যে-সব ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের আবেদন ছিল কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি। তাঁরা কথা বলেননি সর্ব মানুষের প্রতিনিধি হয়ে বা সকল মানুষকে লক্ষ্য করে। অন্য নবীদের মতো হজরত মুহম্মদের (দঃ) ও জন্ম এক বিশেষ গোষ্ঠী ও এক বিশেষ ভৌগলিক সীমায়। কিন্তু আশ্চর্য, আজন্ম তিনি এমন এক সহজাত ও স্বাভাবিক উদার দৃষ্টিভংগীর অধিকারী ছিলেন যে, যখনই কথা বলেছেন তখনই গোষ্ঠী , জাতি ও ভৌগোলিক সীমাকে ছাড়িয়ে গেছেন–তখন তিনি সর্ব মানুষের প্রতিনিধি, সকল দেশেরই লোক-শিক্ষক। তিনি যে যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন সে যুগের জন্য এ সার্বজনীন ভূমিকা সত্যই বিস্ময়কর ও তুলনাহীন। তখন গোটা পৃথিবী ও গোটা মানবজাতির কোন ধারণাই মানুষের ছিল না– আজকে যাকে আমরা আন্তজার্তিকতা বা আন্তর্জাতিক মনোভাব বলছি, সে দিন তা মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল, ছিল ভাব রাজ্যেও অনুপস্থিত।

সে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ সংকীর্নতার রুদ্ধশ্বাস বেড়াজাল ও লৌহ যবনিকা ছিন্ন করে প্রথম বিশ্ব নাগরিকের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হলেন তিনি হজরত মুহম্মদ (দঃ)। তিনি যে বাণী ও জীবন দর্শন প্রচার করলেন তার লক্ষ্য সারা পৃথিবী, তার আবেদন সমস্ত মানবজাতির প্রতি। হযরত মুহম্মদ (দঃ) ছিলেন পুরোপুরি ঐতিহাসিক মানুষ। তাঁর সব কাজকর্ম নীতি ও উপদেশ এবং জীবনের সব খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসে।তাঁর আচার ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র আর দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্বন্ধে ধারণা ও মূল্যায়ন জন্য কোন রকম কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল উম্মুক্ত-কোন রকম অলৌকিকতা বা অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগ তা কখনো হয়নি আচ্ছন্ন।তাছিল যেমন সহজ সরল, তেমনি স্পষ্ট ও ঋজু।

তাঁর কোন কাজ বা বক্তব্য মিষ্টি-সিজমের নামে রহস্যাবৃত হয়নি-তাই তা নেহাৎ বদ্দু বা অজ্ঞজনের কাছেও হয়ে ওঠেনি অবোধ্য। বিখ্যাত সমালোচক keneth Rexroth বলেছেনঃ Mohammed lived in the light of history. We can form a pretty close idea of what he was like, and he was n't very prepossessing in some ways. He was just naively direct.With the simple-mindedness of a camel driver he cut through the welter of mataphysics and mystification in the Near East of his time . (Albert camus লিখিত 'The Rebel' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

www.pathagar.com

সাধারণতঃ ধর্মপ্রচারকরা কিছুটা গোঁড়া হ্রস্বদৃষ্টি হয়ে থাকেন। আর তাঁরা তাদের অনুবর্তী আর নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণকেই মনে করেন একমাত্র কল্যাণ। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (দঃ) এরকম সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ন মুক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সার্বিক ও সার্বজনীন। নিম্নে উদ্ধৃত হাদিসগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করলে তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা সহজেই বুঝতে পারা যাবেঃ

'সব সৃষ্ট-জীবই আল্লাহর পরিবারভুক্ত– তিনিই আল্লাহর কাছে প্রিয়তম যিনি তাঁর সৃষ্ট-জীবের প্রতি সবচেয়ে বেশী উপকার করতে চেষ্টা করেন।'

'মানুষের প্রতি যে সদয় নয়, আল্লাহ্ও তার প্রতি সদয় নন্।

'যে নিজের জন্য যা কাম্য মনে করে, তা অন্যের জন্যও কামনা করে না, সে কখনো প্রকৃত ঈমানদার নয়।'

'যাঁর দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়, মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম মানুষ।'

'ক্ষুধিতকে খাবার দাও, পীড়িতকে দেখতে যাও এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিতকে সাহায্য কর।

'ধর্মের পর জ্ঞানের প্রধান অংশ হচ্ছে মানব-প্রেম আর পাপী পূণ্যবান নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গল সাধন।

'যার হাত ও জবান থেকে মানবজাতি নিরাপদ তিনিই খাঁটি মুসলমান।'

শুধু যে তিনি মানুষের কথাই ভেবেছেন আর মানুষের প্রতিই সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করেছেন তা নয়-তাঁর সহানুভূতির দিগন্তরেখা থেকে পশু-পাখীও বাদ পড়েনি। যে যুগের মানুষ গোষ্ঠী-স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝত না-বৃহত্তর মানবতার কথা বা মানব-স্বার্থের কথা যে যুগে মানুষের কল্পনায়ও উদয় হয়নি-তখনই হজরত এক অখন্ড সত্য-দৃষ্টির সাহায্যে সমস্ত মানব-জাতিকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই সমস্ত মানুষের সমস্য তাঁর জীবনে ও বাণীতে রূপায়িত হয়েছে। যখন মানুষ মানুষকেই প্রায় পশুর মত ব্যবহার করত-তখন হজরতের সহানুভূতি ও করুণা মানুষকে ছাড়িয়ে পশু-পাখীর প্রতিও হয়েছিল সম্প্রাসারিত। দেড় হাজার বছর আগে মানবেতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতাও যে নিষ্ঠুরতার কথা কে ভাবতে পেরেছিল? কে করেছিল উপলব্ধি? যখন মানুষের কল্পনায়-Society for prevention of creuelty to animals বা 'পশু নির্যাতন নিবারণ সভার' কথা উদয়ও হয়নি তখন হযরত এ সমস্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে দিয়েছেন কঠোর নির্দেশ ঃ

'সওয়ারের পশু ক্লান্ত হলে তার উপর থেকে নেমে পড়।

www.pathagar.com

একবার এক সাহাবী কতকগুলি পাখীর বাচ্চা ধরেছিল, হযরত দেখতে পেয়ে তখনি নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ 'যেখান থেকে ওদের ধরেছ এক্ষুণি সেখানে রেখে এসো এবং ওদের মাকে ওদের সঙ্গে মিলতে দাও।'

হযরত একবার একটি উষ্ট্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন, উষ্ট্রটির পেট-পিঠ প্রায় এক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেনঃ 'জীব-জন্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। সুস্থ অবস্থায় ওর উপর চড় আর অসুস্থ অবস্থায় ওকে ছাড়ো।' (অর্থাৎ চড়তে চড়তে ওকে একেবারে কাহিল করে ছেড়ো না।)

খাবার না দিয়ে বেঁধে রেখে একটি বিড়ালের মৃত্যু ঘটাবার জন্য একটি স্ত্রীলোককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

হযরতের এ সব বাণী ও শিক্ষা তাঁর উদার ও সার্বিক দৃষ্টিভংগীরই পরিচায়ক। এই সার্বিক দৃষ্টিভংগীর জন্যই তিনি বিশ্বনবী। তিনি এমন কোন নির্দেশ দেননি যা কোন মানুষের পক্ষে, তিনি যে দেশের, যে আবহাওয়াও পরিবেশেরই হোন না কেন পালন করা সম্ভব নয়।

সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদ (দঃ) আশ্চর্যভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত হাদিসঃ 'বস্তুতঃ তোমরা এখন এমন এক যুগে আছ যখন তোমাদের কেউ যদি যা নির্দেশ করা হয়েছে তার এক দশমাংশও ছেড়ে দাও তার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এর পর এমন এক যুগ আসবে তখন তোমাদের কেউ যদি যা নির্দেশ করা হয়েছে তার এক দশমাংশও পালন করে সে নিশ্চয়ই নাজাত বা মুক্তি পাবে।'

দেড় হাজার বছর আগে সমাজ ছিল ছোট, লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম–ছিল না তাতে এত সব জটিলতা। সে স্বল্পসংখ্যক সরল মানুষের সমাজে পান থেকে চুন খসলেও বিপর্যয় ঘটতো–ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভারসাম্য হতো নষ্ট। তেমনি সমাজে লঘু পাপে গুরু দণ্ডতাই প্রয়োজন ছিল। এখনকার মতো তখন মানুষকে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের চাপে পড়ে পদে পদে বিভ্রান্ত হতে হতো না–নিছক বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে হতে হতো না প্রতি মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত। জীবন ছিল তখন অনেকখানি ছকে আঁকা সরল রেখার মতো। সামান্য আঘাতেই সে সরল রেখায় ফাটল ধরা ছিল অনিবার্য। তাই আক্ষরিক নিষ্ঠার প্রতি তখনকার যে দাবী তা যুগের চাহিদা আর প্রয়োজনেরই দাবী। সমাজে এখন আর তা নেই– ব্যক্তি মানুষ পর্যন্ত এখন অসম্ভব জটিল হয়ে গেছে, সামাজিক মানুষেরত কথাই নেই। লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় অপরিমিত। বিজ্ঞানীদের হিসেবে এ অনুপাতে লোকসংখ্যা বেড়ে চললে কয়েক হাজার বছর পরে পৃথিবীতে মানুষ দাঁড়াইবার জায়গায়ই পাবে না। এমন অবস্থায় কোন

www.pathagar.com

দেশের বর্তমান আইনকানুন যে শুধু হালে পানি পাবে না তা নয়– ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশ-গুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা হয়ত মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের এক পূর্ণ কুটিরে বসে মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এক দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে যেন মানব-সমাজের এ ভবিষ্যৎ চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারেও অমন নির্দেশ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, পারস্পরিক সমঝোতা -ইংরেজীতে যাকে বলে Adjustment, হযরত চরিত্রে এও ছিল এক বড় বৈশিষ্ট্য। জীবনে বারে-বারে তিনি এ সমঝোতা বা Adjustment-এর পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কোন ব্যাপারে অনমনীয় গোঁড়ামি বা একগুঁয়ে গোঁয়ার্তুমির পরিচয় দেননি। অন্য ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে এখানেও তাঁর এক বড় পার্থক্য।

তাঁর এ হাদিসটিও স্মরণীয়ঃ ' নগরবাসীর বিরুদ্ধে পল্লীবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।'

এখানেও তাঁর অসাধরণ সমাজ সচেতনতারই পরিচয় পাচ্ছি। সমাজ সচেতনতা মানে শুধু দীন-দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ বা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের উপলব্ধি নয়-সামাজিক জটিলতা ও পরিবেশ-পরিবেষ্টনের পার্থক্য আর জীবিকার বিভিন্নতা মানব চরিত্র ও দৃষ্টিভংগীতেও যে রূপান্তর ঘটায় তারও উপলব্ধি। শহর ও পল্লীর সমাজ জীবন সমস্যার মোকবেলা করতে হয় তা পল্লীর মানুষের পক্ষে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তেমনি পল্লী মানুষের সমস্যার সঙ্গেও শহরবাসীর কোন সাক্ষাৎ-পরিচয় বা অভিজ্ঞতা নেই। এমন দুই বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হলে তা কখনো ন্যায় বিচারের সহায়ক হতে পারেনা। হযরত তাঁর উপরোক্ত হাদিসে যে বাস্তব-বোধ ও সত্যানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যেই বিস্ময়কর ভাবে তাঁর জীবন ও বাণী গুলির বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি শুধু কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতির কথা ভাবেননি–সমস্ত মানুষের কথাই ভেবেছেন, সাধনা করেছেন মানুষের সকল সমস্যার মোকাবেলা করার। এদিক থেকে তিনি ছিলেন সকল মানুষের নবী।

[জাহানে নও পত্রিকায় প্রকাশিত]

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বে কামালিহি

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

দুনিয়ার ইতিহাসে এক যুগে এক এক জন মহামানব জন্মগ্রহণ করে নিজের দেশ জাতি আর সমাজকে অন্ধকারের পাপ-পঙ্ক থেকে তুলে এনে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে গিয়েছেন। জাতির ভাগ্যগুণে এমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আবির্ভাব হয়। তাঁদের কেউবা শৌর্য ,কেউবা সংগঠন প্রতিভা, কেউবা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আবার কেউবা অনুপম ব্যক্তিত্বের গুণে আপন আপন জাতির গৌরব বাড়িয়ে মহাকালের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর চরিত্রে একাধারে ঘটেছিল সব মহৎ গুণের সুন্দর সমন্বয়। তিনি কেবল পতিতোন্মুখ আরব জাতিকেই রক্ষা ক'রে তাদেরই ঐক্যবদ্ধ ক'রে একমাত্র তাদেরই নেতৃস্থানীয় ব'লে স্বীকৃতি হননি, তিনি আরব জাতির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সকল কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর লোকোত্তর চরিত্র জ্ঞান কর্ম আর প্রেমের যে অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছিল, সে কথা চিন্তা করলে, মানবানত্মার ঐশ্বর্য দেখে অন্তর বিস্ময় আর আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। তাঁর সে মহিমার স্বরূপ সম্যকরূপ উপলব্ধি করতেও চাই প্রেম আর সাধনার পরিশীলন।

আরব দেশ প্রাচীন কাল থেকেই শৌর্য, বীর্য, সাহস, অতিথিসেবা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সে দেশেও একদিন নেমে এলো অন্ধকার। সারা দেশ হয়ে গেল অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন। বিভিন্ন গোত্র পরস্পর কলহে ব্যাপৃত হলো। তাদের নৈতিকতা নেমে এলো অবনতির নিম্নস্তরে। নরহত্যা, শিশুহত্যা হলো তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম। নারীর প্রতি অবমাননা চরমে পোঁছল। ব্যভিচার অনাচার আর কুসংস্কার মনুষ্যত্বকে করলো লাঞ্ছিত-হেয়। মানুষ তার আত্মার উৎকর্ষ হারিয়ে ফেলে ভুলে গেল তার প্রতিপালকের মহিমা।

মানুষের এরূপ চরম দূর্দশার দিনে অধঃপতিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু দেবতাবাদী আত্মপ্রত্যয়হীন উচ্ছৃঙ্খল আরব জাতির মধ্যে স্রষ্টার শুভাশীষের মতোই আবির্ভূত হলেন রাহমতুল্লিল আলামিন, মহামানব হযরত মুহম্মদ (সঃ) শান্তির বাণী ও আশার আলো নিয়ে । তিনি নীতি ধর্ম আর ইহ-পরকালে বিশ্বাস এনে দিয়ে মুমূর্ষু মানবতাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনলেন। মানবের আত্মজাগৃতির ইতিহাসে এমন নজীর খুব বেশী মিলবে না। তিনি সমাজ থেকে দূর্নীতি দূর করে সুষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। রাষ্ট্র গড়ে উঠল ন্যায় আর সাম্যের ভিত্তিতে, রাজ্যে সুবিচার ইনসাফ আর শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা হলো। তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিত

www.pathagar.com

বা অভিজাত বলে কেউ থাকলো না। যোগ্যতাই হলো পদমর্যাদার মাপকাঠি। মানুষ সেখানে পণ্য-দ্রব্যের মতো বিক্রী হতো, আর মানুষের কাছে মানুষ পশুর মত ব্যবহার পেত, সেখানে হেয় মানুষেরও মর্যাদা ভ্রাতৃত্বে উন্নীত হলো। সে সমাজে ক্রীতদাসও স্বীয় গুণ বলে রাজ্যের খলিফার পদ পাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকৃতি পেল। নারীর অধিকার ঘোষণা করে তিনি বললেন ঃ তোমাদের জান্নাত তোমাদের মায়ের পায়ের নীচে। আইনের চোখে নারীর জন্য সম্পত্তিতে রইল নির্দিষ্ট অধিকার। তিনি সমাজকে উন্নত রুচি, নির্মল চরিত্র আর সুশ্রী জীবনবোধের অনুশীলনীতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সুদ, জুয়া, মদ হারাম হলো। চুরি ও ব্যভিচার দূর করার জন্য তিনি শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা দিলেন।

ভাবলে অবাক হতে হয়, কি করে একজন মানুষ একা সমগ্র আরব জাতিকে জীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুললেন। তাঁদের মধ্যে জাগিয়ে দিলেন কর্ম ও জ্ঞানের অদম্য আকাঙ্খা। তাঁর গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান, গনিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষী ইত্যাদি শাস্ত্র মন্থন করে সাধনার অক্ষয় কীর্তি রেখে গেলেন দুনিয়ার বুকে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন মাত্র দশ বছরে। দশ বছরে তিনি একটা নিকৃষ্ট মানবীয় উপাদানকে ঢালাই, ছাটাই করে এমন এক উন্নত স্তরে তুলে দিলেন যে, তাঁর তিরোধানের পর মাত্র আশি বছরের মধ্যে আরবেরা বহু দেশ জয় করে দুনিয়াতে বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। উমাইয়্যাদের সময় মুসলিম সাম্রাজ্যে পূর্বে সিন্ধু নদ ও মঙ্গোলিয়া থেকে পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর এবং আটলান্টিক পর্যন্ত আর উত্তরে উরল পর্বত থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোমকরা আট'শ বছরের চেষ্টায়ও সাম্রাজ্যের সীমা অতটা বাড়াতে পারেননি।

হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে কেবল মানব-জীবনের মহিমাময় রূপটিই ফুটে ওঠেনি, মানুষের স্বাভাবিক প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ-ময় দিকটিরও এক অতি স্পষ্ট চিত্র রূপায়িত হয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁর অসামান্য জীবন তাঁকে সাধারন মানুষের কাছে করে তুলেছে পরম আপন, আদর্শ অনুকরণীয়। তিনি মানবতার যে মহিমা দেখিয়ে গেছেন, তা অতুলনীয়। মুহূর্তের মৃত্যুবরণ দ্বারা নয়, বহু বছরের সাধনাময় সংগ্রাম-শীল জীবন দ্বারা মানুষের জন্য আত্মত্যাগের যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, তা সকল সময়ের সকল মানুষের সুমহান আদর্শরূপে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) দেখলেন, আত্মশক্তি সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন। যেখানে সে দেখেছে অপরিসীম শক্তি সেখানেই সে স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে গেছে। আর শক্তিমানকে করে তুলছে অতিমানব-মানুষের আয়ত্তের বাইরের অনুকরণীয় অতিমানব। হযরত মুহম্মদ (দঃ) মানুষের দুর্বলতার এ ভুল ধারণা দূর করে দিয়ে প্রমান করে দিয়েছেন, মানুষের

www.pathagar.com

শিক্ষাদাতা মহাপুরুষ তাদেরই মতো মানুষ। মানুষেরই তিনি মহত্তম আদর্শ,- মহা সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজ চরিত্রের দৃঢ়তায় আর সাধনার বৈশিষ্ট্যে। তাঁর মুখে 'আনা বাশারুম মেসলুকুম' শুনে তুচ্ছ উপেক্ষিত মানুষের আত্মপ্রত্যয় এল ফিরে, তাঁর হৃদয় হলো উন্নত, জাগ্রত হলো তার সুপ্ত পৌরুষ আর দৃপ্ত শক্তি।

এই শত দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, পাপ-প্রলোভন, মায়া-মোহ প্রভৃতির মধ্যে থেকে কি উপায়ে পূণ্যময় সুন্দর জীবন যাপন করা যেতে পারে, মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করে বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন অক্ষুন্ন রাখা যেতে পারে, এ-ই হ'ল মানুষের জীবনের জটিল সমসা।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই দূরূহ সমস্যার যুগোপযোগী স্থায়ী সমাধান দিয়ে গেছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন ঃ 'লা রুহ্বানিয়াতা ফিল ইসলাম' (ইসলামে সন্ন্যাস নেই)। দুঃখ-পাপ পাশাপাশি থাকবে, এর মধ্যে সাংসারিক জীবন যাপনেই প্রকৃত সাধনা আর ত্যাগের মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। আর তাই সত্য সুন্দর ও মঙ্গল। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এ আদর্শের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

হযরতের চরিত্রবল ছিল অসীম। তাঁর সংসর্গে কেউ একবার এলে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারত না। তিনি জীবনে কোন দিন কোন ওয়াদা খেলাপ করেননি, মিথ্যা কথা বলেননি বা কারো আমানত নষ্ট করেননি। এই জন্য লোকে তাঁকে 'আল্ আমীন'–বিশ্বাসী বলে ডাকত। তিনি বলতেনঃ যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে না তাঁর ঈমান নেই, আর যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই।

অনাড়ম্বর অথচ পবিত্র জীবন যাপনই ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি খুব মিতাহারী ছিলেন। কোন কোন সময় সামান্য যব, খেজুর বা তরমুজ খেয়ে তিনি দিন কাটিয়েছেন। দারিদ্র তাঁর চরিত্রের মহত্বকে বিন্দু-মাত্রও ক্ষুন্ন করতে পারেনি; বরং দুঃখ দৈন্যের দহনে তাঁর চরিত্র হয়ে উঠেছে আরও উজ্জ্বল আরও খাঁটি। তিনি সামান্য চাটাইয়ের বিছানায় শুতেন, কম্বল ও মাদুর পেতে বসতেন, কোন সময় বালিশ মাথায় দিতেন না। ন্যায়পরায়ণতা ও সৎসাহস ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। তিনি পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর চরিত্রে কেউ কোন দিন অহঙ্কার দ্বিধা বা হিংসা দেখেনি। তিনি কপটতা, শ্রেষ্ঠতা, কৃপনতা আর জুলুম ঘৃনা করতেন। তিনি সবাইকে সৎ পথে থাকতে আর সৎকর্ম করতে উপদেশ দিতেন, আর কুপথ কুকর্ম থেকে ফিরাতে চেষ্টা করতেন। কোন দুষ্কর্মের জন্য তিনি কোনদিন প্রতিশোধ নেননি; অতিবড় দুশমনকেও কষ্ট দেবার জন্য তিনি কৌশল বা ষড়যন্ত্র করেননি। সম্পদে তিনি কোনদিন গর্বিত বা বিপদে অধীর হননি। তিনি কখনও অনর্থক সময় নষ্ট করতেন না। তিনি সকলেরই উপকার করতে চাইতেন, কিন্তু নিজে কোনদিন কোন উপকারের প্রত্যাশা করেননি। কোন উপঢৌকন পাওয়া মাত্র তার প্রতিদান তিনি পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

তিনি ধনী গরীব উচ্চ নীচু সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। ছোট বড় সবাইকে তিনি আগে সালাম করতেন। অতি দীনের দাওয়াৎও তিনি গ্রহণ করতেন। পীড়িতের শুশ্রূষায় তাঁর ছিল অপার আনন্দ।

অতিথি সেবায় তাঁর তুলনা মেলে না। তিনি প্রতিবেশীর হক আদায় করতে সকলকে তৎপর করে দিয়েছেন এই বলে ঃ সেই ব্যক্তি কি করে মুসলমান হ'ল যে নিজে পেট পুরে খেল, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত কাটাল। তিনি আরো বলেছেনঃ মুমিন সেই ব্যক্তি যার হাত আর জিহ্বা থেকে অপর মুসলমান রক্ষা পেয়েছে। কারো পাওনা যেন মেরে দেওয়া না হয় সেজন্য তিনি তম্বি করেছেন ঃ নামাজ রোজা এসব আল্লাহ্‌র হক- হক্কুল্লাহ্ নিজের হক মাফ করতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক তিনি মাফ করবেন না যাবৎ না বান্দা মাফ করে। গায়ের ঘাম না শুকাতেই মজুরের মজুরী দিয়ে দিতে বলেছেন। এসব দেখে বুঝা যায়, তিনি কত বাস্তব পন্থী ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রমের মর্যাদা ছিল। তিনি নিজ হাতে সব কাজ করতে এতটুকু সংকোচ করতেন না। তিনি নিজে কাপড় কাচতেন, জুতা মেরামত করতেন, বকরী দুইতেন, ঘর লেপতেন, ঝাড়ু দিতেন, বাজার করতেন,-এক কথায় সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজে করতেন। সব কাজে ছিলেন আদর্শ।

ভেবে দেখবার বিষয়ঃ হযরত কোন মক্তবে লেখা পড়া শিখতে পারেননি। মা-বাবা কারো সাহায্য পাননি। ঘোর তমাসাচ্ছন্ন যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মধ্যে তিনি পালিত হয়েছেন। তাঁকে শৈশব থেকে কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে জীবিকার্জনের জন্য। ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বহু দেশ ভ্রমণের কঠোরতা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সব মানবীয় শ্রেষ্ঠ গুণের অনুশীলন করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব রূপে সম্মান লাভ করতে পেরেছিলেন। আগের পয়গাম্বর ও মহাপুরুষদের যে সব গুণ ছিল, হযরতের জীবনে সে সমস্ত গুণেরই একত্রে সমাবেশ হয়েছিল। তাই মানুষ হিসাবেও শ্রেষ্ঠ, নবী হিসাবেও সরদার। ফারসী কবি শেখ সাদী (রাঃ) এক কথায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেনঃ-

বালাগাল ওলা বে কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বে জামালিহি;
হাসুনাত জামিয়ু খেছালিহি,
ছাল্লু আলায়হে ওয়া আলিহি।

তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাঁর সৌন্দর্যে দূরীভূত হয়েছে সব আঁধার, তাঁর চরিত্রগুণ সুন্দরতম; তাঁরও তাঁর পরিবারের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক।

[দৈনিক মিল্লাত এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

আল কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষন

মাওলানা আমীরুল ইসলাম মিফতাহ

নযুলে কুরআনঃ ৬১০ হইতে ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বছরে ক্রমান্বয়ে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি উহা নাযিল হতে থাকে। ফিরিশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে মক্কা এবং মদীনায় হযরতের নিকট উহা পৌছে দেওয়া হয়।

রাসূল আকরাম (সাঃ)-এর হাদীস মতে জিব্রাঈল সব সময় একই বেশে নবীর (সাঃ) সম্মুখে আবির্ভূত হননি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও তাহাকে মানুষের আকারে দর্শন করেছেন, কখনও পাখা বিশিষ্ট এক বিশেষ সত্ত্বারূপে অবলোকন করেছেন, আবার কখনও বা শূন্যে বিরোজিত এক অস্তিত্বরূপে অনুভব করেছেন। প্রথমে ওহি লাভের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৪০ বছর। রমযান মাসের এক রাত্রিতে মক্কার অদূরে হেরা পাহাড়ের গুহায় যখন তিনি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন, তখন অকস্মাৎ একটি শব্দ তাঁর শ্রুতিগোচর হল-বলা হল, 'পড়ুন' তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা। আওয়াজ ধ্বনিত হল, "পড়ুন", তিনি বললেন, আমি কি পড়ব? এ বার আল্লাহর কালাম কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ ৫টি আয়াত শব্দিত হয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হৃদয় ফলকে অংকিত ও গ্রথিত হয়ে গেল; সেই ৫টি বাক্যের বাংলা তর্জমা এইঃ ১। পড়ুন-সেই প্রভু পরওয়ারদিগারের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন; ২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। ৩। পড়ুন-আর (জানিয়া রাখুন) আপনার প্রভু প্রতিপালক পরমদাতা; ৪। যিনি শিক্ষা দান করেন কলমের সাহায্যে ৫। শিক্ষা দেন মানুষকে সেসব বিষয়ে যাহা তাদের নিকট অজ্ঞাত।

এই আয়াত গুলো ছিল প্রথম ওহী, যা জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর নিকট হইতে মুহাম্মদ (সাঃ) -এর নিকট পৌছে দেন। এর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ওহির সিলাসিলা জারী থাকে। অবশেষে তাঁর ৬৩ বছর রয়সে উহার সমাপ্তি ঘটে।

কুরআন সম্পর্কিত কতিপয় পরিসংখ্যান ঃ

কুরআন মজিদ ৩০ খন্ডে বিভক্ত খন্ডকে বলা হয়, 'জুম' বা পারা। এতে আছে ১৪৪টি পরিচ্ছেদ-প্রত্যেক পরিচ্ছেদকে বলা হয় সুরা। প্রত্যেকটি সুরা কম বেশী বহু শ্লোক বা আয়াতের সমষ্টি। বৃহত্তম সুরা ২৮৬ আয়াত। কোন আয়াত বেশ বড়, আবার কোন কোন আয়াত অতি ক্ষুদ্র। ১৪৪টি সুরার ভিতর ৯২টি মক্কায় এবং ২২টি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। মক্কায় অবতীর্ণ সুরাগুলোতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে জ্ঞান এবং জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের উপর। আর মদীনায় অবতীর্ণ সুরা সমূহে সাধারণতঃ বেশী জোর দেওয়া হয়েছে সে জ্ঞানের বাস্তবরূপ দানের উপর।

www.pathagar.com

কুরআন মজিদে মোট আয়াতের সংখ্যা মতান্তরে -৬৬৬৬, শব্দ সংখ্যা -৭৭,৯৩৪, অক্ষর সংখ্যা ৩২৩৭৬০। আর অক্ষর গুলোর মধ্যে রয়েছে আলিফ ঃ ৪৮, ৯৯২ বা রয়েছে ১২,২২৮ তা রয়েছে ২৪৪০৪, সা রয়েছে ৩১০৫ জীম রয়েছে ৪২৩২; এইরূপে অন্যান্য সব অক্ষরের সংখ্যা অগণিত হয়েছে। কুরআন মজিদের সাড়ে সাত শত আয়াতে অর্থাৎ শতকরা ১১ ভাগ শ্লোকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে অবতারনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৯ ভাগে আইন-কানুন বিধি-বিধান, আচরন-ব্যবহার , ঈমান-আকাঈদ, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, মানবীয় শিক্ষা মূলক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইলম তথা জ্ঞান এবং উহার আনুষাঙ্গিক বিষয় ১৬০টি আয়াতে স্থান লাভ করেছে। কুরআন মজিদে ২৫ জন নবী-রাসুলের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

৭০- এর অধিক স্থানে কুরআনে পাকে আল্লাহর নিকট হুজুরের প্রার্থনা নিবেদন করতে, ৯০-এর অধিক স্থানে নামায (সালাত) কায়েম করতে এবং ১৫০-এর অধিক জায়গায় তাঁকে যাকাত প্রদান ও দান খয়রাতের নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

নবী-রসুলগণের মধ্যে হযরত মুসার (আঃ) কথা সর্বাধিক অবতারণা করা হয়েছে। চার জায়গায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে, ১১ জায়গায় রাসুল রূপে সম্বোধিত করা হয়েছে। মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ এই বাক্যংশ কুরআনের দুই স্থানে রয়েছে। (সুরা ৩৩ এবং ৪৮)

কুরআনের প্রামানিকতা ঃ

কুরআনের খন্ডাকারে প্রকাশিত হলে উহা পরস্পর অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল নয়; উহার শৃঙ্খলা এবং অংশ সমুহের ক্রামশিক অবতরণকার্য আল্লাহর সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা অনুসারে সাধিত হয়- আল্লাহর সে ইচ্ছাকে কার্যকরীরূপে প্রদান করেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সহচরবৃন্দ। এই প্রসঙ্গেই কুরআন মজিদে সূরা ফোরকানের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে "কাফেররা বলে থাকে, তার প্রতি সমুদয় কুরআন এক সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয় যেন আমি তোমার (হে রাসুল) হৃদয়কে সুদৃঢ় করে তুলতে পারি এবং আমি একে তোমার ধীর ও স্থীরভাবে ক্রমশঃ সুসজ্জিত আকারে গঠনের ব্যবস্থা করে থাকি। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরববাসীগণ ছিল সাধারণত নিরক্ষর। সে সব কবিতা এবং কুরআনের অংশ তাদের বেশী ভাল লাগত, উহার সংরক্ষণের জন্য তাদের সম্পূর্ণভাবে স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাহিত্যের সমঝদার সকলেই কুরআনকে অনুকরনীয় বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাজেই যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে ও সম্মানে তারা উহা হিফজ (মুখস্ত) করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেন।

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যাদেরকে কুরআন লিখে রাখার এবং সংরক্ষনের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাঁর ছিলেন সুদক্ষ লেখক (কাতিব) এবং বিশ্বস্ত সংরক্ষক। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখনই কোন আয়াত অথবা সুরা ওহি রূপে প্রাপ্ত হতেন, তখনই তিনি তাঁহার কাতিবকে উহা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন। লিখন সমাপ্ত হলে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং শুনতেন এবং সঠিক লিখন অনুমোদন করতেন। প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি আয়াত এবং প্রতি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি উহার সঠিক স্থান নির্দেশ করে দিতেন এবং সেই ভাবেই উহা সন্নিবেশিত হতো। ওহী প্রাপ্তি যখন সম্পূর্ন হয়ে গেল, তখন সাহাবীদের নিকট কুরআনের বহুসংখ্যক রেকর্ড মওজুদ ছিল। কোন সময় মতভেদ দেখা দিলে উহার মীমাংসার জন্য স্বয়ং রাসুল্লাহ (সাঃ)- এর নিকট তা পেশ করা হত।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন অসংখ্য সাহাবী ছিলেন সমগ্র কুরআনের হাফিজ। এতদ্ব্যতিত উহা অগণিত প্রস্তর , চর্ম, কাষ্ট ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। এই অবস্থায় ও প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মনপূত হল না। তিনি শীর্ষস্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লয়ে নবী (সঃ)-এর সর্ব প্রধান কাতিব যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশিত পন্থায় কুরআনের ক্রমবিন্যাস অনুসারে একটি আর্দশ ও পূর্ণাঙ্গ কোরআনের সংকলন করার দায়িত্ব প্রদান করলেন। যায়েদ (রাঃ) তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন এবং কুরআনের তদানিন্তন সমস্ত হাফিজগন কর্তৃক পরীক্ষিত এবং অনুমোদিত হওয়ার পর উহাই রসুলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ মুতাবেক সুবিন্যস্ত, গৃহীত এবং প্রচারিত হল।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইন্তেকালের ১৫ বছর পর হযরত উসমানের (রাঃ) খেলাফত কালে অনুমোদিত কুরআনের অসংখ্য কপি নববিজিত রাজ্যসমূহে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হল। আঞ্চলিক ও ভৌগালিক পার্থক্যের কারণে নবদীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে কুরআনের পঠনে কিছু উচ্চারণ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হল। শব্দের উচ্চারণ ও অক্ষরের ধ্বনি-বৈষম্যের ফলে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে মতভেদ এবং কলহের উদ্ভব ঘটল। হযরত উসমান (রাঃ) ত্বরিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেন। তিনি লোকদের ব্যবহৃত কোরআন মজিদের সমস্ত কপি সংগ্রহ করলেন। বলাবাহুল্য, এই কপির নির্বাচনে কুরাইশদের উচ্চারণ পদ্ধতি এবং ধ্বনি বিশিষ্ট ছিল। তদাবধি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র ঐ একই উচ্চারণ এবং ধ্বনি বিশিষ্ট সম্বলিত কুরআন প্রচলিত রয়েছে। উহার মধ্যে শব্দের, অক্ষরের, এমন কি বিন্দুর, সমপরিমান কোন কিছুরই লেশ মাত্র পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঃ

বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআনের গুণ এবং বৈশিষ্ট উপমা বিহীন। ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও একথা একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাদের তৌরাত এবং ইঞ্জিল যে আসমানী কিতাব-আল-কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে। মুসলমানরাও একথা স্বীকার করে যে, পূর্ববর্তী তৌরাত, ইঞ্জিল, জব্বুর ও আল-কুরআনের মত আসমানী কিতাব। এই কিতাব স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা নাজিল করেছেন।

ইহুদী, নাসারা কেহই, একথা দাবী করেন না যে, ঐ সব আসমানী কিতাবের আসল স্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে। বর্তমানের তৌরীত, ইঞ্জিল এবং জবুর আসল নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে হতে হিব্রু এবং গ্রীক ইত্যাদি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ইংরেজী ভাষায় আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। এটাকে সেসব কিতাবের তথা বড় জোর অনুবাদ বলা চলে।

সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ ঃ কুরআনের মত একখানি মহান গ্রন্থ যদি বিশ্বে সবচেয়ে পঠিত গ্রন্থ হয়ে থাকে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? একথা তর্কাতীতভাবে সত্য যে, আজকের বিশ্বে আল-কুরআনের পাঠক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখন ভেবে দেখুন, দুনিয়াতে আরও ধর্ম রয়েছে এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও রয়েছে। দুনিয়াতে খৃষ্টানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কুরআনের চেয়ে তাদের বাইবেলের অনুবাদ সংখ্যাও বেশী । খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্যে তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন এবং সর্বাধুনিক পন্থায় ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। সে হিসেবে ধর্ম প্রচারের বেলায় মুসলমানদের চেষ্টা নেহাতই কম। এতদসত্ত্বেও আল-কুরআনের পাঠক বিশ্বে অত্যন্ত বেশী। মসজিদে, মাদ্রাসায় এবং ইবাদত খানায় ইত্যাদিতে কুরআন পাঠ হয়ে থাকে। খৃষ্টান পাদ্রী এবং খৃষ্টান শিক্ষাবিদরা পর্যন্ত নিয়মিত কুরআন পাঠ করে থাকেন।

তারা এই জন্য পাঠ করে থাকেন যে, কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যেটা পুরোপুরিভাবে আল্লাহ নজিল করেছেন এবং তা কোন ভাবেই বিকৃত হয়নি। কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি নাজিল করেন। এ অবস্থাকেও ওহী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আড়াল হতে কোন মানুষের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলেছেন। যেমন হযরত মুসা(আঃ)-এর সাথে ঘটেছে।

ফেরেশতাকে তার নিজস্ব বেশে বা মানুষের সাধারণ বেশে পাঠিয়েছেন এবং ফেরেশতা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মানুষের অন্তরে তা অর্পন করেছেন।

মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওহী ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী তিন প্রকারেই ওহী নাজিল করা হয়েছে। তিনি ওহীর অবস্থা সম্পর্কে সাহাবাদের (রাঃ)

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তরে তিন প্রকারের ওহীর কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, কখনও আওয়াজের মত বা কখনও মৌমাছির ভন ভন আওয়াজের মত আওয়াজ অনুভব করি। সে অবস্থা আমার খুবই কঠিন মনে হয়। কোন কোন সাহাবী (রাঃ) বলেছেন, ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন এবং চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে যেত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, দারুণ শীতের সময়ও (ওহীর কঠিন অবস্থার জন্য) কপাল মোবারকে ঘর্ম বিন্দু নির্গত হতে দেখা যেত।

কুরআন যাঁদের দ্বারা লিখিত হতো ঃ

কুরআন কাদের দ্বার লিাখত হতো, এ প্রশ্নের জওযাবও কুরআনেই বিদ্যমান আছেঃ উহা (লিখিত) আছে মহিমান্বিত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরম পবিত্র সহীফাসমূহে সৎ ও মহৎ লিপিকারদের হাতে।

এই সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলে শেষ করা হয়নি যে, কুরআনে কেবল সহীফার মধ্যে লেখা হচ্ছিল, অধিকন্তু এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই মহান কিতাবের লিপিকারগণ ছিলেন নেহায়েত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, পূর্ণবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যাতে করে কোন ব্যক্তি ওহী লিপিকারগন সম্পর্কে তাদের দ্বারা কুরআনের হ্রাস বৃদ্ধি করার অভিযোগ আরোপ করতে না পারে। অতএব এ আয়াতটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কুরআন তার লেখকগণ কর্তৃক ও সর্বপ্রকার 'তাহমীম' 'তারমীম 'থেকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র । কোন কিতাব লিখার ব্যাপারে সঠিকতাও নির্ভূলতার জিম্মাদারী এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে?

কুরআনের লিপি বিভাগ ঃ

এখন আসুন, আমরা নবী করীমের (সাঃ) এই লিখন ব্যবস্থার উপর চিন্তা করে দেখি যে,এই উম্মি' নবী (সাঃ) জাহেলিয়াতের যুগেও কি মহান কীর্তি আনজাম দিয়ে গেলেন, যাতে করে আজও ইসলামের বিরাট বিরাট শত্রুরা পর্যন্ত কুরআনের যথাযথ সংরক্ষণ ও হিফাজতের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন স্যার উইলিয়াম ম্যুর লাইফ অব মুহম্মদ-এ লিখেছেনঃ

আমাদের জানা মতে সারা বিশ্বে এরূপ একটি কিতাবের অস্তিত্ব নেই, যা এর (কুরআনুল করীম) মত দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাবতীয় তাহরীফ থেকে পাক ও পবিত্র রয়েছে। হাদিসের নির্ভরযোগ্য সম্ভার দেখে মনে হয় যে, তিনি (সাঃ) কুরআন সংকলনের নিমিত্তে স্বতন্ত্র বিভাগেই খুলেছিলেন এবং তাতে বহু মর্যাদাসম্পন্ন ও দক্ষ সাহাবী নিযুক্ত করেছিলেন। যাদেরকে আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ওহী-লিপিকার বলে

www.pathagar.com

স্মরণ করা হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম তম্মধ্য হতে নিম্মোক্ত সাহাবীগণের নাম স্বীয় 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ ১. আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ২. ওমর ফারুক (রাঃ) ২. হযরত ওসমান গণি (রাঃ) ৪. হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) ৫. হযরত যোবায়ের (রাঃ) ৬. হযরত আমর বিন যোবায়ের (রাঃ) ৭. হযরত আমর বিন আস (রাঃ) ৮. হযরত কা' আব (রাঃ) ৯. আবদুল্লাহ্ বিন আকরাম (রা) ১০. হযরত সাবিত বিন কায়েস শামস (রাঃ) ১১. হানজালা বিন রবী (রাঃ) ১২.হযরত মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) ১৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাঃ) ১৪. হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)া ১৫. খালীদ বিন সায়ীদ বিন আস (রাঃ) ১৬. মুয়াবিয়া বিন সুফিয়ান (রাঃ) ১৭. জায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) ।

ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রে আরও কতিপয় নামের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮. ইয়াজীদ বিন আবী সুফিয়ান (রাঃ) ১৯. আল হাজরমী (রাঃ) ২০. আবদুল্লাহ্ বিন হাজরমী (রাঃ) ২১. মোহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) ২২. আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল (রাঃ)। সীরাতুল এরাকীতে এদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে। আর আল-কাত্তানীর কিতাবুল এদাবিয়ায় তাঁদের নামও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ওহী লিপিকারের এত বিরাট দলকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছিল যে, যদি সময়ের কালে একজনকে পাওয়া না গেল, তাহলে যেন অপর একজন তার কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। আকদুল ফরীদ গ্রন্থে ইবনে আবদী রববী হযরত হানজালার (রাঃ) আলোচনা প্রসংগে লিখেছেনঃ হানজালা বিন রবী ছিলেন রাসুলে করীমের (সাঃ) তামাম কাতিবদের (লিখকদের) নায়েব ও খলীফা। এ সম্পর্কে রাসুল করীমের (সাঃ) এন্তেজাম এতোই সুশৃংখল ও সুনিপুন ছিল যে তিনি (সাঃ) প্রবাসেই থাকতেন আর মুকীমই থাকতেন, সর্বক্ষণই ওহী লিপিকারগণকে এবং লেখকের যাবতীয় সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতেন -যেন ওহী নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা লিপিবদ্ধ করা যায়। এমনি হিজরতের সময় দোয়াত কলম এবং উৎকৃষ্ট ধরনের খন্ড চামড়া সাথে ছিল। তার প্রমাণ বোখারী শরিফের একটি বর্ণনাতেও পাওয়া যায়, যার মধ্যে নবী করীমের (সাঃ) হিজরতের কাহিনীও উল্লেখ করা হয়েছিল।

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

বিশ্বজনীন পয়গাম নিয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) আরবে এলেন কেন

উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রিয়নবী (সাঃ) এর আগমন কালে পৃথিবীতে রোম ও পারস্য মহাসাম্রাজ্য ছাড়াও চীন ও ভারতবর্ষ ছিলো সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্র। এছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্য, জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আন্তর্জাতিকতা নিয়ে বিদ্যমান ছিলো না। সীমিত পরিসরে আঞ্চলিক রাজ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক ও জীবন যাত্রা যা ছিলো কোন বিচারেই সেগুলোকে বিশ্বমানের কিংবা আন্তঃমহাদেশীয় আবেদনের অধিকারী বলা যায় না।

মানব জাতির সূচনা লগ্ন থেকে পৃথিবীতে যে সব প্রাচীন জনবসতি ইতিহাস ও ঐশী গ্রন্থে স্বীকৃত তন্মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিয়ে পারস্য, ইরাক সিরিয়া ফিলিস্তীন ও মিসর আর দক্ষিণাঞ্চলে আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরী হয়ে সমুদ্র তীরবর্তী এডেন ইত্যাদিই সমধিক বিখ্যাত।

হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত মানব জাতির জীবন ও সভ্যতার এক বিরাট অধ্যায়। এ সময়কার বসতি অঞ্চলে মধ্যপ্রাচ্যের সীমানার মধ্যেই ছিলো। মহাপ্লাবনের পর নূহ (আঃ) এর তিন পুত্রের বংশধরেরাই উপরোক্ত ভূ-ভাগে ছড়িয়ে পড়ে সাদা কালো ও মিশ্র বর্ণের বিশ্ব মানব সমাজ।

বিশ্বমানবতার আদি ও অমোঘ ধর্ম-বিধান তাওহীদ বা একত্ববাদের মহান সংস্কারক হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইসহাক (আঃ) এর ধারায় ইসমাঈল বংশীয় সকল নবী আর ইসমাঈল (আঃ) এর ধারায় একমাত্র শেষ নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম লাভ করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশধারায় মহানবীর জন্ম। তদানীন্তন বিশ্বে আরব-অনারব জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ ছিলো মক্কার কোরায়শ গোত্রের হাশেমী বংশ। আর ইহুদী ইসরাঈলীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অখন্ড শাম ও মিসরে বসত করলেও তাদের প্রতিনিধিত্বশীল একটি অংশ ছিলো মদীনার অধিবাসী। কৃষি কর্ম ও দাদন ব্যবসায় তারা ছিলো খুবই দক্ষ। এসব ইহুদীর প্রত্যাশা ছিলো, তাদের বংশেই জন্মগ্রহণ করবেন প্রতিশ্রুতি শেষ নবী। মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাবের আগেই তারা তাঁর নামে দরূদ পড়তো। কোন বিবাদ বিসম্বাদে অনাগত মহানবীর দোহাইও দিতো। স্থায়ী অধিবাসীদের এই বলে হুমকি দিতো যে, শেষ নবী এলে তাঁর সাথে মিলে আমরা তোমার শায়েস্তা করবো। কিন্তু নেতৃত্ব ও স্বার্থের লোভ এসব

ইহুদীকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়, ওদের মনে এ প্রশ্ন উঠতো যে, তাদের বংশে শেষ নবীর জন্ম না হলেও অন্ততঃ সমসাময়িক পৃথিবীর দুই পরাশক্তির রাজধানী পারস্যের মাদায়েন কিংবা রোমানদের কস্তুনতুনিয়ায় কোন শেষ নবী আবির্ভূত হলেন না? মক্কার মুশরিকরাও এ প্রশ্ন তুলতো।

তৎকালীন পৃথিবীতে নদী বিধৌত ইরাকের দজলা ফোরাত তীরের খেজুর চাষী, নীল নদের দান মিসরের কৃষিজীবী নিবতী ও মৎসজীবি কিবতী সম্প্রদায়, নদীমাতৃক ভারতবর্ষের ঝিলাম যমুনা গঙ্গা মেঘনা তীরের কৃষিজীবী জাতি গোষ্ঠীসহ উপমহাদেশের জেলে, তাঁতী, কামার কুমাররাই ছিলো মানব সভ্যতার চালিকাশক্তি। সমকালীন বিশ্বের সমৃদ্ধ এলাকা বলতেই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে এসব এলাকা।

আমেরিকার সন্ধান মানুষ তখনো পায়নি। ইউরোপ ছিলো মানবেতর যুগের মহাঅন্ধকারে নিমজ্জিত। সভ্য পৃথিবী বলতে পূর্বে-দক্ষিণ ইউরোপের দু'একটি অঞ্চল, ইরান, মধ্য এশিয়া, আরব সাগর তীরের অধিবাসী, উপমহাদেশ হয়ে দূরপ্রাচ্যের একটি অংশ।

রোমান ও ইরানী সাম্রাজ্যের প্রজাকূল আন্যায়, অবিচার, বৈষম্য, বর্বরতার ফাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। শাসক শ্রেণী ভোগ বিলাস, স্বৈরতন্ত্র ও কৃত্রিম ঐশ্বরিকতায় চরমভাবে আক্রান্ত। বিভিন্ন রাজবংশ ঈশ্বরের সূর্যের বা দেবদেবীর বংশজাত। ইরানী আর্য্যমেহের বাদশাহকূল আর রোমক নৃপতিরাও নিজেদের উপর দেবত্ব আরোপে সচেষ্ট। বিশাল ভারততো সীমা সংখ্যাহীন দেব দেবী ও অবতার চর্চা। কোটিখানিক কংবা তার চেয়েও কম নাগরিকের জন্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা। বড় কোন নামী দামী গোত্রকেই তার সন্তানেরা ঐশ্বরিকতা বা দেবত্বে ভূষিত করতে আগ্রহী। এহেন মহুর্তে আরব ভূ-খন্ডের আক্ষরিক অর্থেই এক মানব বংশের অতি সম্ভ্রান্ত ঘরে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর জন্ম হয়। তদানীন্তন বিশ্বের সকল বংশ পরম্পরের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অভিজাত, প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ, মানবিকতা সমৃদ্ধ ও বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বংশ বনু হাশিম সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেছিলেন, ভূ-পৃষ্ঠে অনুসন্ধান করে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশরূপে আমি মক্কা নগরীর হাশেমী বংশকেই চিহ্নিত করি।

ভাষাগত দিক দিয়ে আরব জাহানের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো সকল যুগেই সমান স্বীকৃত। ধ্বনি তত্ত্বের আলোকে পৃথিবীর আরব অংশের মানুষকে 'সর্বোচ্চ ধ্বনি উচ্চারক' বলা হয়।

www.pathagar.com

অনারব বিশ্বে ঠোঁট, মুখগহ্বর, কণ্ঠনালী, তালু ও জিহ্বার ব্যবহার আরবদের চেয়ে অন্যদের অনেক কম। দূরপ্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সকল জাতি গোষ্ঠী ঠোঁট ও মুখের ব্যবহারে কর্থাবার্তা বলে থাকে; অপরদিকে, কণ্ঠনালী, গলার পুরোভাগ, তালু মুখগহ্বর ও ঠোঁটের পূর্ণতার ব্যবহার কেবল আরবরাই করে থাকে। ভাষা, সাহিত্য ও শব্দতত্ত্বে আরবদের অগ্রগামিতা সহস্রাধিক বছরের বাস্তবতা। বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত ভাষা ইংরেজির মোট শব্দ সংখ্যার চেয়েও অন্ততঃ আটগুণ বেশি শব্দ প্রচীন আরবী ভাষায়ই রয়েছে। আরবরা নিজেদের 'আরব' আদি-আসল, বক্তা ও উচ্চারক আর অনারব জগতকে 'আজম' বা ভাষাহীন, নির্বোধ বলে অভিহিত করতো। মানুষের এবং বস্তু জগতের সকল বিষয়ে এত নাম, উপনাম ও প্রতিশব্দ পৃথিবীর আর কোন ভাষায়ই নাই। তদানীন্তন সভ্য জগতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও জীবন্ত ভাষায় আল্লাহপাক তাঁর কিতাব নাযিল করেন এবং বলেন, 'সাবলীল ও সরল আরবীতে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা এর মর্ম বুঝতে পারো। প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, 'আরব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তিটি আমি। মূল আরবরা তখন সাধারণত যাযাবর জবিন যাপন করতো। নাগরিক জীবন ছিলো কেবল হিজায তিহামা ও ইয়ামানের কতিপয় গোত্রের। এদের মাঝেও আবার প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা ছিলো সুস্পষ্ট। স্থায়ী আবাস বলতে পানি ও চারণ ভূমি সমৃদ্ধ এলাকা।পানির উৎস শুকিয়ে গেলে বা বর্ষণ না হলে তল্পি গুটিয়ে অন্যত্র ছুটে চলা। গৃহপালিত পশু ও মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্যে নানা জায়গায় বসতি বদল আরবদের ভিটে বাড়ি ও আবাসস্থলের অপরিহার্যতা থেকে মুক্ত রাখে।

কৃত্রিম সভ্যতার উপকরণ নির্ভরতা আরবদের স্পর্শ করেনি কখনো। নিজেদের বসতবাড়ি, তাঁবু হাঁড়ি পাতিল ও অস্ত্রশস্ত্র কাঁধে বা উটের পিঠে বহন করতে অভ্যস্ত বলেই এরা খানা বাদেরাশ তথা ঘর -সংসার কাঁধে বহনকারী।

স্বাভাবিক সমাজবদ্ধতার দাবি অনুসারে এদের মধ্যে গোত্রীয় শাসন শৃংখলা ও ব্যবসা বাণিজ্য ছিলো। কৃষি হস্তশিল্প বা চাকুরির সাথে আদি আরবরা পরিচিত ছিলো না। সমুদ্র যাত্রার অভ্যাস যে কতিপয় বণিকের ছিলো তারা সুদূর জাভা, সুমাত্রা ও চীন পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। কাঁপড়, মসলা ও অস্ত্র বেচাকেনা হতো খেজুর, জয়তুন ও আতরের বিনিময়ে।

পরাশক্তির কৃত্রিম সভ্যতা, প্রশাসনিক শৃংখলাবদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদ থেকে আরবরা ছিলো তখনো মুক্ত। এমনকি মানুষের পরিকল্পিত

www.pathagar.com

শিক্ষা দীক্ষা ও আরবদের মাঝে প্রচলিত হতে না পেরে তাদের জন্মজাত মানবিক দোষ-গুণ থেকে মুক্ত করে বুদ্ধিবৃত্তিক পরাধীনতায় আবদ্ধ করতে পারেনি। আক্ষরিক অর্থেই আদি আরবরা তখন জন্মজাত প্রাকৃত জন।

ধর্ম, সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় বিধি, শিক্ষা সংস্কৃতির কৃত্রিম শীলতা, নাগরিক জীবনের বাধ্যবাধকতা ও সহনশীলতা এদের অকৃত্রিম স্বাভাবিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যিকার অর্থেই আরবরা তখন 'উম্মী' জাতি। এবং তাদের মধ্য হতে একজন নবুওয়ত ও রিসালতের বাহকরূপে মনোনীত করেছিলেন। মন-মনন, মস্তিস্ক ও দৃষ্টি যাদের ছিলো একান্ত স্বচ্ছ আনকোরা এবং কলুষমুক্ত। নতুন জীবন দর্শনের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র। নতুন একটি জীবনাদর্শ ও ধর্মমতের ছবি অংকনের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট।

যাদের সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আল্লাহ প্রেরণ করেছেন উম্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের মধ্য থেকেই নিজ বার্তাবাহক রাসুল। যিনি আল্লাহ নিদর্শনাদি পাঠ করেন (তুলে ধরেন) জাতীর সামনে। তাদের শিক্ষা দেয় আল্লাহর কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবনাদর্শ। এবং জাতিটির শুদ্ধও সম্পন্ন করেন"। অপর জায়গায় এ সম্প্রদায়টি সম্পর্কেই এবং তাদের মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহকে)।

আল্লাহ বলেন, " তোমরা পৃথিবীর সেরা সম্প্রদায়। বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্যেই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথ আহবান জানাবে এবং অকল্যাণ ও মন্দ পথ হতে তাদের রুখবে আর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে মহান আল্লাহর উপর।"

প্রিয়নবী (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে যে জনগোষ্ঠীটির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিতদের নিকট আমার বার্তা পৌঁছে দেবে"। অপর হাদীসে বলেছেন, 'আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র আয়াত হলেও অপরের নিকট পৌঁছে দাও।"

এ নির্দেশ তাবৎ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি নিষ্ঠাপূর্ণ বাস্তবায়ন কেবল এই জাতিটির তথা আরব, জনগোষ্ঠীর দ্বারাই সম্ভব ছিলো। ঐতিহাসিক গণ লিখেছেন, লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে কেবল দশ হাজারের কবর রয়েছে মদীনা শরীফে। আর লাখো সাহাবী ছড়িয়ে আছেন প্রশান্তর থেকে আটলান্টিক আর সাইবেরিয়া থেকে ভূ-ভাগের দক্ষিণ প্রান্তে পর্যন্ত যমীনে।

আবিষ্কৃত ও জ্ঞাত পৃথিবীর শেষ পশ্চিম প্রান্তে মাগরিবের উপকূলে অতলান্তিকের বুকে ঘোড়া নামিয়ে দিয়ে মহান সাহাবী হযরত উকবা ইবনে নাফে

www.pathagar.com

(রাঃ) চিৎকার করে বলেছিলেন, "হে প্রভু তোমারা পৃথিবী কি এ পর্যন্তই। আমার যদি জানা থাকতো যে এ মহাসাগরের ওপ্রান্তেও মানুষ্য বসতি রয়েছে তাহলে আমি, সেখানেও পৌঁছে যেতাম, তোমার হাবীব (সাঃ) এর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে"।

প্রিয় নবীজির ইন্তেকালের দু'দশকের মধ্যেই বিশ্বের দুই পরাশক্তি, হাজার বছরের কায়েমী সাম্রাজ্যবাদ রোম ও পারস্য মুসলমানের পদানত হয়। চীনের রাজশক্তি কর আদায় করে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে উপঢৌকন প্রেরণ করে মহান খলীফার দরবারে। আর মাত্র একটি শতাব্দীর মধ্যে স্পেন পর্তুগালসহ গোটা পশ্চিম ইউরোপ মুসলমানদের হাতে চলে আসে। মধ্য এশিয়ার রত্নগর্ভা এলাকাগুলো ইসলামী খেলাফতের আওতায় চলে আসে। আফ্রিকাতো বটেই ভারতবর্ষ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্যে উম্মোচিত হয়। ইসলামের পতাকা পৌঁছে যায় সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরিয় প্রান্তিক প্রাচ্যে।

এ প্রচারাভিযান, বিজয়যাত্রা অপর কোন সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভব হতো না বলেই আরবদের বেছে নেয়া হয় ইসলামের নবীর স্বজাতি ও সহকর্ম রূপে। নতুন দ্বীপের জন্যে প্রান বিসর্জন, ধন-সম্পত্তি ত্যাগ, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করা, পরম ধৈর্য্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও সাধনার জিন্দেগী সবই ছিলো আরবদের জন্যে সম্ভব। এসব তারা করে দেখিয়েছেন। পৃথিবীর বুকে সুখের বাঁধার কোন লোভ যাদের ছিলো না, তারাই পেরেছেন বিশ্বব্যাপী বিশ্বধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দিতে। বিভাগীর জীবন যাপন করে পরদেশে সমাহিত হতে। মহান মুরশিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর এক অবিভাষনে এমর্মে ব[illegible]. নীলের কৃষি ও মৎসজীবী, দজলা ফোরাতের খেজুর চাষী আর গঙ্গা যমুনার কৃষাণকূলকে দিয়ে এ কাজ হতো না বলেই আল্লাহ তা'য়ালা পরম কষ্ট সহিষ্ণু, নির্দিষ্ট পেশাহীন, রাজ্য ও শৃংখলার জিঞ্জির থেকে মুক্ত, সভ্যতা সংস্কৃতির কৃত্রিম বন্ধনহীন প্রাকৃতিক জীবনে অভ্যস্ত, চরম নিষ্ঠাবান, আত্মত্যাগী, ঋজু মনস্ক, বীরত্ব ও লক্ষ্যভেদে অনন্য এক উম্মী জাতিকে মনোনীত করেছেন তার বার্তা বহনের মহান লক্ষ্যে।

প্রিয়নবী (সঃ) -এর মিশরের সাথে ঐক্য সংহতি ও দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করার এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাই তো সাহাবী হযরত সাদ বিন মুআয (রাঃ) কে বলতে শোনা গেছে, " হে প্রিয় রাসুল, চলতে চলতে যদি দূর আফ্রিকার প্রত্যন্ত গিরিসংকটেও আপনি চলে যান আমরা আপনার সাথেই থাকবো। যদি সমুদ্রে নেমে যান আপনি, আমরাও সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়বো সেই মহাসাগরে।"

প্রতিটি দিবস, প্রতিটি রজনী উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাহাবীদের মুখে এ একটি

www.pathagar.com

কথাই। "আমাদের মা বাবা উৎসর্গীত হোক প্রিয় নবীজীর তরে।" প্রাণের চেয়েও প্রিয়' বলে যে কথাটা মানুষের সমাজে প্রচলিত আছে, এরই জীবন্ত ও উজ্জ্বলতার দৃষ্টান্ত আরব জাতির সেই সুনির্বাচিত অংশ সাহাবীদের জীবন। উহুদের যুদেধ শরীক মহানবী (সঃ)-এর নিরাপত্তার সংবাদ শুনতে অধীর সেই মহান সহাবিয়ার কাহিনী কি মানবেতিহাসের একক ও অদ্বিতীয় ঘটনা নয়? যিনি কেবল একটি প্রশ্নই করছিলেন, " তোমরা বলো তো, আমার প্রিয় নবী কেমন আছেন? তিনি সুস্থ ও নিরাপদ তো? তাঁকে কোন দুশমন আঘাত করেনি তো?

পৃথিবীর ইতিহাসে কি এ ঘটনা কেবল একটিই নয়, এক বর্ণনামতে, যখন এক বিধবা সাহাবিয়া নিজ কোলের শিশুকে হুযুরের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "হযরত, আমার তো বড় কোন সন্তান নেই। হুযুর, এ শিশুটিকেই কবুল করুন।"

হুযুর বললেন, ধন্য তোমার আগ্রহ। কিন্তু একে নিয়ে কী করবো? সাহাবিয়া জবাব দিলেন, হুযুর, দুশমনের আঘাত আপনার পবিত্র বদনে লাগার পথে যদি আমার এ শিশুপুত্রের দেহখানা তরবারির সামনে ধরে দেয়া যেতো। হুযুর বললেন, ধন্য তোমার আগ্রহ। বড় হলেই সে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে। কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় কৃত্রিম সভ্যতা সংস্কৃতি, শাসক শক্তির প্রভাব, নগর সভ্যতাসৃষ্ট হীনতা, ভীরুতা ও ঐশী নির্দেশ বিবর্জিত যুক্তি বুদ্ধি শিক্ষা এবং কালচারজনিত কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই আরবের এ সমাজটি গোটা পৃথিবীর উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হয়েছে। আর আজো পর্যন্ত গোটা বিশ্বে মানবতার নৈতিক, বিশ্বাসগত ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষকতা করতে সক্ষম হন।

দুনিয়ার কোন ব্যক্তি সমাজ ও প্রতিষ্ঠান নেই যার উপর আরব বংশোদ্ভূত এই মহান নবী ও তাঁর স্বজাতীয় সহচরগণের বিপুল আলোক সম্পাত ও প্রভাব নেই।

ভূ-মণ্ডলের শুষ্ক অংশের মধ্যভাগ এবং তদানীন্তন সভ্য পৃথিবীর তিন অংশ এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলন কেন্দ্র আরব উপদ্বীপের মক্কায় মহানবী আবির্ভূত হন। এটিও তার বার্তার বিশ্বজনীন প্রচারণার জন্যে ছিলো বিশেষ জরুরী। কেননা, পবিত্র কুরআনই প্রথম মানব জাতির বিশ্বজনীন আদর্শের ধারণা ঘোষণা করে বলা হয়, (হে নবী) আপনাকে আমি গোটা বিশ্ব মানবের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বহুবিধ নির্দেশনা বা আহ্বান থেকেও ইসলামের বৈশ্বিক এবং আন্তর্জাতিক রূপ সম্পর্কে আন্দাজ করা সহজ। অথচ যে যুগে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে তখন ভারতবর্ষের

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ এ অঞ্চলটাকেও গোটা পৃথিবী বলে বিশ্বাস করতে। বলতো, এরপর রাক্ষস খোক্কাসের বাস। ইউরোপের লোকেরা মধ্যযুগীয় অন্ধকারে এতই মগ্ন ছিলে যে, ভূ-মধ্যসাগরের এ পারে কিছু আছে তা তারা বিশ্বাসই করতো না। চীনের প্রাচীর কেমনে করা হতো পৃথিবীর দেয়াল এর পর অন্য জগত। ভূ-খণ্ড ও জলবায়ূর সীমাবদ্ধ ধারণা মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা করে রাখতো। দুনিয়ার কোন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, রাজ্য বা প্রতিষ্ঠানই তখন মানবতার জন্যে কোন আদর্শ বা বার্তা লালন করতোনা ধ্বংসপ্রায় সভ্যতা, মানবিকতা, সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের শেষ সুরক্ষা ও মানবজাতির ইহ-পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্যে ইসলাম এলো। এর বাহক মহানবী মানবকূলে জন্ম নিলেন। প্রেরিত হলেন গোটা মানব বিশ্বের প্রতি, কিয়ামত কাল পর্যন্ত সময়ের জন্যে। আরবীয় বংশে তাঁর জন্ম, তাঁর সহচর শ্রেণীও আরব। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'য়ালার শেষ বার্তা ও কিতাবের ধারক এবং শেষনবী (সঃ)-এর বিশ্বস্ত অনুচর ও সহকর্মী হওয়ার জন্যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জনসম্প্রদায় ছিলো আরব জাতি। শ্রেষ্ঠ ভূ-খণ্ড ছিলো আরবভূমি। শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী ; নবীয়ে উম্মী ও আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআলিহি ওয়া সাল্লাম।

[সীরাত স্মারক '৯৮-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

মহিউদ্দীন খান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূণ্যময় জীবন চরিত বা সীরাত, তাঁর শিক্ষা ও তাঁর সাধারণ পরিপূণ্য অলোচনা বা ভাষার মাধ্যমে তার সঠিক চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর নয়। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর অনুপম সীরাতের মধ্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকেই মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা চিহ্নিত করেছেন। তেমনি তাঁর জীবনের খণ্ডিত কোন অংশ কিংবা শিক্ষা ও আদর্শের কোন দিক সম্পর্কিত আলোচনাও পরিপূর্ণ হতে পারে না।

মহাকবি জামীর ভাষায় ঃ

"যা তাঁর পাওনা সেরূপ প্রশংসা
তো সম্ভবপর নয় ;
সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই বলা যায় যে,
সৃষ্টিকর্তার পর তুমিই সর্বাপেক্ষা মহীয়ান, গরীয়ান।"

তাঁর বহুমুখী অন্যন্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে বিস্ময়কর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, আল্লাহর বান্দাদেরকে যাবতীয় তাগুতী শক্তির কবলমুক্ত করে তাদের দ্বারাই আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করতে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মহানবী (সাঃ) যে অনুপম কর্মকুশলতা এবং অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বস্তুবাদী স্থুল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সে সবের সামান্যতম মূলায়ন করাও সম্ভবপর নয়। বস্তুত ঃ মহানবীর জীবনে সিংহভাগই ছড়িয়ে রয়েছে নানা রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে। সে মতে নবী জীবনের এ দিকটার মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যবহ সন্দেহ নাই।

মহানবী (সাঃ) যখন তাঁর পয়গাম জনসমক্ষে তুলে ধরেন, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্পূর্ণ। জাগতিক উপমা উপকরণ বলতেও তেমন কিছু তাঁর হাতে ছিল না অপরদিকে তাঁর নিজের গোত্র, আশপড়শী, শহর বাসী সমগ্র দুনিয়ার মানুষেই ছিল তাঁর প্রতিপক্ষ। প্রতিকূলতা ছিল পদে পদে। এরূপ ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থায় মক্কী জীবনের তেরো বছরের মধ্যে আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী এবং আবুজর গেফারীর মতো সমাজের প্রায় বেশ কিছু সংখ্যক সেরা মানুষসহ মক্কার চারশ

www.pathagar.com

পঁয়ত্রিশ, মদীনার দু'শ এবং হাবশায় হিজরতকারী প্রায় একশ লোকসহ মোট সাড়ে সাত শতাধিক লোককে তিনি ইসলামের কাফেলায় শরীক করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সংখ্যা এক বছর সময়কালের মধ্যে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। সহীহ বোখারীর কিতাবুল জেহাদের বর্ণনা অনুযায়ী হিজরী দ্বিতীয় সনের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম জনগণের একটা পরিপূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করে একটি দফতরের মধ্যে তা সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। সম্ভবতঃ এটাই ছিল দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম লিখিত আদম-শুমারী। বোখারীর বর্ণনায় দেখা গেছে যে, তখন মুসলিম পুরুষের সংখ্যাই দাঁড়িয়েছিল দেড় হাজারে। অনুমিত হয় যে, স্ত্রীলোক এবং শিশুর সংখ্যাও এর সমপরিমাণ ছিল।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার জীবনে তাঁর দাওয়াত ও তবলীগের একটা কেন্দ্রীয় দফতর কায়েম করেছিলেন। দফতরটি ছিল পবিত্র কা'বার ঠিক পাশেই আরকামের বাড়ীতে। এখানে মুষ্টিমেয় মুসলমানগণই নিয়মিত হাজিরা দিতেন। রাসুলুল্লাহর (সাঃ) উপদেশবাণী শুনতেন। দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতেন। দাওয়াত ও তাবলীগ কাজে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো। পরস্পর মত বিনিময় হতো। সমস্যাদি সমাধাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা হতো। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর হচ্ছে কিনা তাও তদারকি করা হতো। বিভিন্ন স্থান থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করে মজলুম সাহাবীগণ আরকামের ঘরে এসে সে সব রাসুলুল্লাহর নিকট পৌছে দিতেন। মজলুম সর্বহারা নও মুসলিমগণের সব হকদারদের মধ্যে বন্টনও করা হতো। হিজরতের পর এই কেন্দ্রটিই মদীনায় মসজিদে -নব্বীতে স্থানান্তরিত হয়।

মক্কার জীবনে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থার মূল-লক্ষ্য ছিল সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন এবং প্রকাশ্য উস্কানির মুখেও প্রত্যক্ষ সংঘাত-সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে চলা। স্বল্প সংখ্যক অসহায় দুর্বল মুসলমান যেন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সূচনাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে না যান সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল খুবই সজাগ।

অপরপক্ষে নিয়মিত চর্চা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই প্রতিটি নও-মুসলিমকে তিনি এমন যোগ্যতার স্তরে নিয়ে পৌঁছিয়ে ছিলেন যার ফলশ্রুতি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের জামাতের মত একই সাথে এতগুলো যোগ্য মানুষের সমাহার যা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত ওমর ছিলেন লেখাপড়া না জানা সামান্য একজন উটের রাখাল মাত্র। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এরূপ কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। বদর যুদ্ধে

www.pathagar.com

চৌদ্দজন লেখাপড়া জানা বন্দীর নিকট যে কয়জন সাহাবী শুধু অক্ষরজ্ঞান শিখেছিলেন হযরত ওমর ছিলেন তাঁদেরই একজন। কিন্তু এই মানুষটিই খেলাফতের দায়িত্ব লাভ এমন প্রশাসনিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন যা এক কথায় ইতিহাসের একটা বিস্ময়কর অধ্যায়। বলাবাহুল্য, হযরত আবু বকর ওমর প্রমূখ খেলাফতে রাশেদার সদস্যগণ মহানবীর (সাঃ) প্রশাসনিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতারই উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন মাত্র।

মক্কার জীবনে নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছে তখন ক্ষিপ্ত স্বজনদের হাতে যাঁদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল সেরূপ একজন লোককে লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরবর্তী হাবশায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন, হাবশার মানুষগুলো হৃদয়বান এবং আরববাসীদের সাধারণতঃ সম্মানের চোখে দেখে থাকে। উপরন্তু তখন সে দেশের যিনি রাজা ছিলেন, তিনি যেহেতু ধর্মে খৃষ্টান এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সেদিক লক্ষ্য করে মহানবী (সাঃ) আশা করেছিলেন যে, মক্কার পৌত্তলিকদের হাতে নির্যাতিত এসব মজলুম বাহ্যতঃ মূর্তিপূজা বিরোধী আহলে -কিতাবদের কিছুটা সহানুভূতি লাভ করতে স্বাভাবিকভাবেই সক্ষম হবে। রসুলুল্লাহর (সাঃ) সে অনুমান যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল, হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের কাহিনীতেই সেটা সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এ হিজরতের মাধ্যমে আরো দুটি উপকার লাভ হয়েছিল, তা হচ্ছে ইসলামের বাণী আরবের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে নতুন একটা মহাদেশে প্রবেশ দ্বারে করাঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মদীনার হিজরত হওয়ার আগেই হাবশার বেশ কিছু সংখ্যক নর নারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরদিকে দুঃস্বপ্নময় সেই দুর্দিন রসুলুল্লাহর (সাঃ) সাথে একজন শক্তিমান নৃপতির বন্ধুত্ব স্থাপনের খবরে অসহায় মুসলমানগণ যথেষ্ট মানসিক শক্তি লাভ করেছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় হিজরত করার সময় মোহাজির ও আনসার মিলে মুসলমানগণের মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাতশ'র কিছু বেশী। এর মধ্যে মোহাজিরগণ ছিলেন ছিন্নমূল পরদেশী। এরূপ একটি নগণ্য জনসংখ্যা নিয়েই রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনার ধনাঢ্য ইহুদী এবং কয়েকটি প্রভাবশালী পৌত্তলিক গোত্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে। আত্মপ্রকাশ করে এই জমিনের বুকে আল্লাহর খেলাফত, ব্যতিক্রমধমী একটি নতুন রাষ্ট্র। আর সর্বসম্মতিক্রমে এ রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচিত হন খোদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং একতরফাভাবে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভ করেন মুসলমানগণ। আর এ প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্র নির্ধারিত হয় মসজিদে নববী।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর মতে মোট বায়ান্ন ধারা বিশিষ্ট সেই সনদটিই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শাসনতন্ত্র। মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলের চতুর্থ খন্ডে উল্লেখিত বিশিষ্ট সাহাবী হযরত রাফে ইবনে খাদীজের (রাঃ) একটি বর্ণনা অনুসারে মসৃণ পাতলা চামড়ায় লিখিত এ সনদটি দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট সুরক্ষিত ছিল পরে হাদীসগ্রন্থসমূহে এটি সংরক্ষিত হয়েছে।

এই অনন্য সনদটির রচনা ও তার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র কাঠামোর গোড়া পত্তন করার পিছনে রসুলুল্লাহর (সাঃ) কতটুকু বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কার্যকর হয়েছিল গবেষক মাত্রই তা অনুভব করতে পারেন।

লিখিত সনদের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামী হুকুমত যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর আয়তন ছিল মাত্র ছয় বর্গমাইল। কিন্তু মাত্র এক বছর সময়কালের মধ্যেই আশপাশের আরো অনেকগুলো গোত্রের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপনের অব্যাহত প্রক্রিয়ার দ্বারা এই রাষ্ট্রের সীমান্তরেখা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এক বছর যেতে না যেতেই সংঘটিত হয় ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বদরের মহাসমর। যুদ্ধযাত্রায় সক্ষম প্রায় সকল সাহাবীই শরীক হয়েছিলেন এই অভিযানে। প্রায় একশ মাইল দূরের এই যুদ্ধযাত্রার সময় রাজধানী মদীনা ছিল প্রায় অরক্ষিত। আশপাশের গোত্রগুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তির নৈতিক প্রভাবই অরক্ষিত রাজধানী মদিনা সুরক্ষিত রাখার নিশ্চয়তা বিধান করিছিল।

প্রাণন্তকর প্রতিরোধ এবং সংঘাত সংঘর্ষের মোকাবেলা করেই শুরু হয়েছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা। সমগ্র পৌত্তলিক আরবই ছিল ইসলামের প্রতি চরম অসহিষ্ণু। আরবের সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য সম্প্রদায় ইহুদীরাও ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম বৈরী। এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহকে (সাঃ) যুদ্ধ-বিগ্রহের বিভীষিকার মধ্যেই অবস্থান করতে হয়েছে। ছোট বড় সতেরোটি যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিযান প্রেরণ করেছেন মোট তেত্রিশটি। বিভিন্ন গোত্রের নিকট ছোট ছোট দল প্রেরিত হয়েছে আরো অষ্টাশিটি। এসব যুদ্ধ এবং অভিযান পরিচালনার, উদ্যোগ-আয়োজন এবং সৈন্য সমাবেশের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ নেতৃত্ব ও সমর কৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে, তা তদানীন্তন যুগ ছিল সম্পূর্ন অপরিচিত। সে যুগে আরবে যুদ্ধ হতো এলাপাতাড়ি ভাবে আক্রমণের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বদরের যুদ্ধে এই সনাতনী পদ্ধতির পাশ কাটিয়ে সারিবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করার নতুন পদ্ধতি গ্রহন করেন। ফলে বিপুল অস্ত্রে

www.pathagar.com

সজ্জিত তিনগুণের বেশী শত্রুসৈন্য আর প্রায় নিরস্ত্র সাহাবীগণের মোকাবেলায় অতি সহজেই পর্যুদুস্ত হয়ে যায়। আহযাবের যুদ্ধে গ্রহণ করা হয় পরিখা খনন করে শত্রুর অগ্রাভিযান প্রতিহত করার আর এক নতুন পদ্ধতি এর আগে আরবের লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে পরিখার সাথে কোন দিন পরিচিত ছিল না। ফলে আটাশ হাজার শত্রুসৈন্যের বিপুল বাহিনী শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তেমনি, মক্কা বিজয়ের সময় গ্রহণ করা হয় সম্পূর্ণ নতুন আর এক পদ্ধতি। ফলে প্রায় রক্তপাতহীনভাবেই এ মহাবিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়। সমুসা ইবনে আকাবা, ইবনে সাদ এবং ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী এই মহাবিজয়ের সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ছিল তেইশ কিংবা চব্বিশ ব্যক্তি।

রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধ্যমত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে নৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুর আগ্রাসী শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। মক্কাবিজয় অভিযানে এই নীতি অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অভিযান প্রস্তুতির কথা প্রথম অবস্থায় কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। সৈন্য দলকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এসে মক্কার প্রতিটি প্রবেশ পথের মুখে উঁচু পাহাড়ের টিলায় সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল। বলে দেওয়া হয়েছিল, রাতের খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা যৌথভাবে না করে অসংখ্য ছোট ছোট দল যেন পৃথক পৃথকভাবে চুলা জ্বালিয়ে খাবার তৈরী করেন। রাতের অন্ধকার ভেদ করে চারদিককার পাহাড়গুলোকে হাজার হাজার চুল্লি জ্বলতে দেখে মক্কাবাসীদের মনে এমন একটা ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো যে, এদের মধ্যে প্রতিরোধ করার মত মানসিক বল একেবারেই খতম হয়ে গেল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরবের বিভিন্ন প্রভাবশালী গোত্রের সাথে যেসব চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশটি চুক্তির মূল পাঠ এখনো পর্যন্ত হাদীস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা এবং গোত্রের সর্বমোট দুইশ নয়টি প্রতিনিধি দলকে তিনি সাক্ষাত দান করেছেন। অন্ততঃ তিনশ গোত্রপতির সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে শান্তিচুক্তি মেনে নিতে সম্মত করেছেন একশরও বেশী। তদানীন্তন যুগের দুই পরাশক্তি পারস্য এবং রোমে সম্রাটসহ দাওয়াতীপত্র প্রেরণ করেছেন চার শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট সেসব বিপুলায়তন কর্মকান্ডের যে সব লিখিত বিবরণ এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই রসূলুল্লাহর এমন সাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, যা সর্বকালের বিচক্ষণ কূটনীতিদের জন্যই অপরিমেয় বিস্ময়ের উপকরণ সরবরাহ করে। এ ধরণের অনুপম রাজনৈতিক বিচক্ষণতার

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতেই মাত্র দশ বছরের সময়কালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা সাতশ থেকে দশ লক্ষাধিকে উন্নীত হয়। মাত্র ছয় বর্গমাইলের ইসলামী হুকুমতের সীমান্ত পৌনে আট লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃতি লাভ করে বিদায় হজ্জেই অংশগ্রহণকালে সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল সোয়া লক্ষাধিক।

আরো বেশি বিস্ময়কর ও প্রজ্ঞাপূণ বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রয়েছে রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক নির্মিত প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মেধা; কর্মশক্তি এবং স্বতন্ত্রধর্মী বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপূর্ণ আয়োজন ছিল তার নির্মিত প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে। প্রত্যেকটি মানুষের রুচি এবং যোগ্যতার অনুকূল কর্মক্ষেত্র তেরী করে দেওয়াই ছিল তাঁর প্রশাসনিক কাঠামোর লক্ষ্য। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে জনগণের যথার্থ সেবকের ভূমিকায় উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাহাবী হযরত হোযাইফাতুল ইয়ামান (রাঃ) ছিলেন পারস্য সম্রাটের সদ্যবিজিত রাজধানী মাদায়েনের শাসনকর্তা। একদিন সকাল বেলা তিনি পথ চলতে গিয়ে দেখতে পেলেন, একজন বিদেশী বণিক একটা বড় সড় গাঁট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। অনেক তালাস করেও কোন কুলি-মজুরের সন্ধান তিনি পাচ্ছেন না। হযরত হোযায়ফার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বণিক তাঁকে একজন গরীব খেটে-খাওয়া মানুষ মনে করে গাঁটটি কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছুদূর বহন করার প্রস্তাব দিলেন। মাদায়েনের মহাপরাক্রান্ত শাসনকর্তা বিদেশী বণিকের বেকায়দা অবস্থা দেখে সাথে সাথে সে প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন এবং গাঁটটি পিঠে নিয়ে চলতে লাগলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর বাজারের লোকজন তাঁকে চিনে ফেললে তাঁর চারদিকে একটা ছোট-খাটো ভীড় জমে গেল। সবাই তাঁকে ভারী গাঁটটি পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলতে অনুরোধ করলো। কিন্তু তিনি কারো কোন কথা শুনলেন না। বলতে লাগলেন, আমি জনগণের সেবক। আমার একজন বিপন্ন বিদেশীর সেবা করে পূণ্য অর্জন করতে তোমরা কেন বাধা দিচ্ছ?

এমনি ধরণের অগণিত ঘটনা প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণের জীবনে একান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ইসাবা, উসদুলগাবা, আস-সাফওয়াতুস সাফওয়া প্রভৃতি প্রামাণ্যগ্রন্থে এসব নজীর সযত্নে সংরক্ষিত করেছে।

প্রশাসন যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) বহু ধরণের বিভাগ উপবিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রতিটি বিভাগ পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ মাসউদীর বর্ণনা অনুযায়ী কারেদ ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস ছিলেন রসুলুল্লাহর একজন বিশিষ্ট কাতেব বা করণিক। তার

www.pathagar.com

দ্বারা বিভিন্ন প্রশাসনিক ফরমান লিখে প্রতিটি এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরণ করা হতো। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম এবং সায়াদ ইবনে আকাবার চুক্তিপত্র সম্পাদন, ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি দলীল দস্তাবেজ তৈরী করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হোযাইফাতুল ইয়ামান হেজাযের রাজস্ব আয়ের হিসাবপত্র লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্বে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশে হিব্রু রোমান, কিবতী, হাবশী প্রভৃতি বদেশী ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহানবীর (সঃ) বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব। বিদেশ থেকে আগত পত্রাদির অনুবাদ করা এবং সে সব পত্রের জবাব দেয়ার দায়িত্ব প্রধানতঃ তিনিই পালন করতেন।

এমনিভাবে প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগের জন্য এমন একদল দক্ষ প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিলেন যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁর ওফাতের পরবর্তী মাত্র দশ বছর সময়কালের মধ্যে ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

রসুলুল্লাহ (সঃ) অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচক্ষণতাই মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরাধিকার; এ সব অনুপম কর্মকাণ্ডের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করার সাধনাই আজকের প্রতিটি স্বাপ্নিক তরুণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আকাঙ্খা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

[সীরাত স্মারক '৯৮-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

নবী দিবসের আহবান
বিশ্বাসের ঐক্য গড়ে তুলুন

আবদুল ওয়াহিদ

আরবের নিরক্ষর বেদুঈন জনগোষ্ঠীর মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত পথ নির্দেশ করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হিজরী ছয় শতকের দিকে আরব মরুদ্বীপের মানুষ জাহিলিয়ার আমনিশায় ছিলো নিমজ্জিত। দীর্ঘদিন নবী রাসুলের আগমন বন্ধ থাকায় বনীআদম আল্লাহ তা'য়ালার সঠিক সত্য পথ পরিহার করে মনগড়া পথ চলতে থাকে। বিশ্ববাসী পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থকে বিকৃত করে ফেলে। আসমানী কিতাব তাদের দৈনন্দিন জীবন-চলার গাইড আর থাকেনি। ব্যভিচার, অনাচার, হত্যা, ঘুষ, রাহাজানি, ঝগড়া-বিবাদ ছিলো তদানীন্তন সমাজের প্রাত্যহিক কর্মকান্ড। মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ছিলো না সেই সমাজের বনী আদমের মধ্যে। চারদিকে বেলেল্লাপনা, ভোগ-বিলাস এর সয়লাব বয়ে যাচ্ছিলো। মানুষ একজন ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় ছিলো অধীর আগ্রহে। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করার নিমিত্ত অশান্তি পৃথিবীতে তাঁর হাবীবকে প্রেরণ করেন। সংবিধান হিসেবে প্রেরণ করেন মহাগ্রন্থ আর-কুরআন। দীর্ঘ ২৩ বছরে ৬৬৬৬ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নবী করীমের মক্কা ও মদীনা জীবনে। নবী করীম (সঃ) মানুষকে আহবান জানিয়ে বলেন, মানব সকল! তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তবেই তোমরা সফল হবে। তার আহবানে গড্ডালিকা প্রবাহ এড়িয়ে পড়ে বনী আদম সাড়া দিতে থাকে, অল্প দিনেই তিনি বিশ্বের মানবকূলকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হন। অসভ্য মানুষগুলো সভ্য হয়ে যায়। আনকালচার্ড বনী আদম কালচার্ড হয়ে যায়। মহুর্তেই গড়ে উঠে স্বর্গের আবহ।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কি করে তিনি আরবের এলোমেলো বনী আদমগুলোকে সভ্য মানুষে রূপান্তিরিত করেছিলেন? উত্তর একটাই, তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের মাধ্যমে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি মানুষকে যে তাবলীগ করতেন তার আগে তিনি তাঁর মধ্যে বাস্তবায়ন করতেন। তাঁর চরিত্রই ছিলো কুরআন!

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তথা নবুয়াতের পূবেও নবী করীম (সঃ) ছিলেন আল-আমীন। মানবকল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিত। জাহেলিয়া সমাজে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সেবা সংঘ'। এ সংঘের মাধ্যমে তদানীন্তন সমাজের দীন-হীন নিঃস্ব বনী আদমের সেবায় তাঁরা ছুটে যেতেন। আজকের বিশ্বে

www.pathagar.com

ব্যঙাচির ছাতার ন্যায় গড়ে উঠা এনজিও গুলোর ন্যায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিন্তু তাঁর সেবা দেননি। তাঁদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল একটাই- মানবসেবা।

নবুয়াত-পূর্ব এবং নবুয়াত উত্তর জীবনের রাসুলের চরিত্র-মাধুর্য ছিলো এক ও অভিন্ন। আর সেজন্যই তাঁর শত্রুরাও তাঁকে দেখতো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে। তাঁর সমালোচনা শত্রুতা করতে তাদের পূর্ববর্তী নেতৃত্ব-কতৃত্ব বিলোপ হবার আশংকায়। গোত্রীয় শাসন বিলুপ্ত হবার ভয়ে।

নবী-করীম (সঃ) নির্ভিকচিত্তে অকুতোভয় সৈনিকের ন্যায় আল্লাহর দ্বীন প্রচার-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। কারো কঠাক্ষ চোখ রাঙানি, গাল-মন্দ তাঁকে আপোষ করতে পারেনি, পারেনি দ্বীন প্রচার থেকে বিরত রাখতে। হাতেগোনা ক'জন সাহাবীকে নিয়ে তিনি কুরআনের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই তিনি করেন মহাপ্রস্থান। তাঁর অব্যবহিত পরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কল্যাণ রাষ্ট্রের সব ধরণের ক্রিয়াকলাপ চালু ছিলো খোলাফায়ে রাশেদার সমাজে। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খিলাফত থেকে, আরম্ভ করে অদ্যাবধি তাবৎ বিশ্ববাসী আল–কুরআণের নিখাদ রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে কল্যাণ রাষ্ট্রের সেই স্বর্গীয় আবহ থেকে বঞ্চিত। কখনো কোথাও আল-কুরআনের সমাজের শ্লোগাণ সোনা গেলেও, সেখানে নিখাদ-নিষ্ট আবহ মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। মনগড়া গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র আর জুলুম-নির্যাতনতন্ত্রের যাতাকলে মানুষ হয়েছে নিষ্পেষিত।

যুগে যুগে, দেশে-দেশে মহড়া উঠেছে ইসলামী আন্দোলনের। ইসলামী বিপ্লবের ধ্বনিও মানুষ শুনেছে। মানজিলে মাকসুদে পৌছতে কতটুকু সক্ষম হয়েছে- এ প্রশ্ন করার তো অন্তত আছে?

বলেছিলাম, নবীজীর চরিত্র-মাধুর্যের কথা। তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, সেসব সাহাবীর চরিত্র মাধুর্যও ছিলো অনুরূপ, ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ-লালসা, ক্ষমতালিপ্সা, ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের বেসাতি ছিলো না। আদর ইনসাফ ছিলো তাঁদের জীবনের ব্রত। মদীনার আহলে সুফফার যে কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে, এটা আদৌ কিংবদন্তী নয়। ইয়ারমুকের ময়দানের খবর কেনজানে? সেই বনী আদমই প্রয়োজন কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু সেই বনী আদম পাওয়া যাবে কোথায়? বিজ্ঞানের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আকাশ মিডিয়ার আকজের বিশ্বে বনী আদম বনে গেছে অভিলাষী। কেনা বড় হতে চায়-নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে, শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্যবসায়, বাণিজ্যে বর্ক্ততায়-বিবৃতিতে, মোড়লিপনায়। আজকের সমাজে মনে করা হয় যার হাতে টাকা আছে, সংগঠন আছে, গাড়ী আছে, মোবাইল আছে, ফ্যাক্স

www.pathagar.com

আছে, ই-মেইল আসে সেই সফল মানুষ। সমাজের নেতৃত্বতো তারই প্রাপ্য। ইসলামের ইতিহাসে এ সাক্ষ্য নেই। যার চরিত্র-মাধুর্য অনুপম, তিনিই নেতৃত্বের জন্য যোগ্য। তিনি হবেন নেতা। আজকের প্রেক্ষাপটে আন্ত দলীয়, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এসব নীতিবাক্য হাস্যস্পদেই মনে হবার কথা।

বিজ্ঞানের সুযোগ মানুষ পেটে পাথর বাঁধার কথা চিন্তা করে কিভাবে, তালি যুক্ত জামা কাপড় পরা মানেই আনকালচার্ড। মিথ্যা না বলা ধোঁকা না দেয়া মানেই তো মহড়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। তৈল কে না চায়?

নবী দিবসে এসব কথা কতটুকু সংশ্লিষ্ট-এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। কিন্তু আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে নবী করীম (সঃ) হেরা গুহা থেকে তো এক একথাগুলো নিয়ে এসেছিলেন বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য। অভদ্র মানুষগুলোকে সভ্যতা শেখাবার জন্য। যে সমাজে দারিদ্র ছিলো মানুষের অনুপম ভূষণ। দরিদ্র মানুষ ছিলেন স্মরিত-বরিত। বিত্ত বৈভব ছিলো ইসলামের তথা মানব কল্যাণের জন্য উৎসর্গীত। মানুষের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হতো আল্লাহর দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠায়। নবী জীবনের প্রতিটি আদর্শ বাস্তবায়ন করেছিলেন সে সমাজের বিশ্বাসী মানুষগুলো। তাঁদের মধ্যে ছিলো সীমাটানা ঐক্য। সেই ঐক্য ছিলো বিশ্বাসের। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো আল্লাহ ও নবী করীমের প্রচলিত পথই সরল-সঠিক পথ। আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানই জীবন বিধান মানুষের। মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহর রাহে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার কোন বিকল্প নেই। তারা করেছিলেনও তাই। সে জন্যেই তার করায়ত্ত্ব করেছিলেন বিশ্ব নেতৃত্ব।

আমরা আমাদের আন্তঃর্দলীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের দিকে গভীর অভিনিবেশের সাথে তাকাতে হবে। কসোভো, কাশমীর, ফিলিস্তিন বসনিয়া হারজেগোভিনাসহ আমাদের ৫৫ হাজার বর্গমাইলের উপর আজ যে কালো হাত তা ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে একমাত্র বিশ্বাসের ঐক্যই। তাই নবী দিবসের আহবান-বিশ্বাসের ঐক্য গড়ে তুলুন।

[সীরাত স্মারক '৯৯-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

সুব্যবস্থাপক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও দায়িত্ব পালনকারী সাহাবায়ে কিরাম

আ. ই.ম নেছার উদ্দিন

কুরআনুল করীমে যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, ''আল্লাহর প্রতি তারা রাজী আর আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট''-তাঁরা আর কেউ নয় মহানবী (সঃ) অগনিত সাহাবায়ে কেরাম। মহানবী (সঃ) কর্তৃক যে কোন আদেশ ও দায়িত্ব পালনে তাঁরা ছিলেন সদা প্রস্তুত। এমনকি দায়িত্ব পালনে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিযোগিতার অবস্থা লক্ষ্য করা যেতো। ওজর খাহী করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার অবস্থা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আদৌ ছিল না। দু'একটি ব্যতিক্রম ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেগুলোতে ওজরখাহী বা যুদ্ধে না যাবার জন্য নানা বাহানা খুঁজা হয়েছে বা দায়িত্ব না পালনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এমন ঘটনার সাথে সাথে কুরআন নাজিল হয়েছে। হয়তোবা তাদের চড়ামূল্যের তওবাহ করতে হয়েছে নয়তোবা তারা সাহাবার তালিকা থেকে চির দিনের জন্য বাদ পড়ে গেছেন।

মহানবীর পত্রবাহক ও দূতগণ ঃ রাসুলে করীম (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পন্ন করার পর মনে করলেন, বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের কাছে ইসলামের বাণী পৌছে দেয়া দরকার। কারণ সন্ধির ফলে আপাততঃ যুদ্ধ বিগ্রহ করা লাগবেনা। তৎকালীন পৃথিবীর শক্তিশালী রাজা ও বাদশাহদের কাছে যাঁদেরকে দূত প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে এ কাজের আনজাম দিলেন।

সপ্তম হিজরীতে রাসূলে মাকবুল (সাঃ) ছয়জন রাষ্ট্র প্রধান বা বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র লেখেন। সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট তিনি পত্র নিয়ে হযরত আমর বিন উমাইয়া জামরীকে প্রেরণ করেন। শক্তিশালী রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট রাসুল পত্র নিয়ে হযরত দাহিয়া ইবনে খলিফা কালবী কে (রাঃ) প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমীকে খসরুর নিকট পত্র নিয়ে খলিফা কাবলী কে (রাঃ) প্রেরণ করেন। আবদুল ।লাহ ইবনে হুজাফা সাহমীকে প্রেরণ করেন। খসরুর পুরো নাম ছিল পারবেজ ইবনে হরমুয ইবনে নওসেয়া। এ লোকটি রাসুলের পবিত্র পত্র খানাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। দূত তার সামনে এর প্রতিবাদ জানালেন। সে দূতের সাহসিকতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। শেষে তিনি পত্র টুকরা করার খবর এসে রসুলকে জানালেন। রাসুল (সঃ) এতে

www.pathagar.com

মধ্যে ব্যাখ্যা পেলেন। আল্লাহর নিকট দোয়া করেলেন, হে আল্লাহ! যেমনি করে সে পত্র খানিকে টুকরো টুকরো করল, তুমি তার রাজ্যকেও এভাবে টুকরো করে দাও। তাই হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই তার রাজত্ব টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা ও কিবতীদের অধিপতী মুকাত্তকাসের নিকট পত্র নিয়ে তাতির বিন বুলতা (রাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবে বহু দামী উপঢৌকন রাসুলের দরবারে তিনি প্রেরণ করেছিলেন। মারিয়া (রাঃ) নাম্মী এক দাসী এবং তার দুই বোন সীরিন ও কিসরাকেও রাসুলের জন্য তিনি প্রেরণ করেন। মুজা বিন ওহাব আযাদী (রাঃ) কে বোলকার শাসনকর্তা হারিছ বিন আবি শিমার গাচ্ছানীর নিকট পত্র নিয়ে প্রেরণ করেন। এ চিঠির দূতের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। দাহিয়া কাবলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন বলে এক বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। সালাত বিন আমরকে রাসুল (সঃ) পত্র বাহক হিসাবে হাওজা বিন আলি হানাফীর নিকট প্রেরণ করেন। যিনি ইয়ামামার অধিপতি ছিলেন। এই দূতকে একই সঙ্গে ছুমামা বিন আছাল হানাফীর নিকটও প্রেরণ করেন। ছামামা (রাঃ) পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, আর হাওজা ইসলাম গ্রহন করলেন না।

অষ্টম হিজরী সনের জিলকদ মাসে আমর ইবনুল আস (রাঃ) কে আম্মান সম্রাটের দু'পুত্র জীফার ও আবদুল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন। তারা দু'জনই মুসলমান হয়ে রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা মানজার বিন সাবী আবাদীর নিকট রাসুল (সঃ) আলা বিন হাজরাসীকে পত্র নিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি নবুওতের সত্যতা স্বীকার করে মুসলমান হয়ে যান।

মুহাযির বিন আবু মাখযমীকে (রা) ইয়ামানের শাসনকর্তা হারিছ বিন আবদে কিলাবের নিক পত্র নিয়ে প্রেরণ করেন। তাছাড়া কিছুদিন পর আবু মুসা আশারী (রাঃ) ও মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) কেও ইয়ামেনে দূত হিসাবে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে প্রেরণ করা হয়। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে হযরত আলি (রাঃ) কে ইয়ামেনে প্রেরণ করা হয়। মুসায়লামাতুল কাযযাবের নিকট রাসুল উমর বিন উমাইয়া ও সায়াব বিন আওয়ামকে প্রেরণ করেন। এছাড়া রাসূল (সঃ) তৎকালীন গোত্র শাসক, সরদার অধিপতি বিশিষ্ট ব্যক্তি পণ্ডিত ইত্যাদি লোকদের নিকট পত্রবাহক ও দূত প্রেরণ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে রাসুল একটি সীল মোহর তৈরী করেছিলেন। কারণ প্রথমদিকে কিছু চিঠিতে সীল মোহর না থাকায় তারা দূতদেরকে বিশ্বাস করতো না। পরে গোলাকার আংটি সদৃশ একটি

www.pathagar.com

মোহর তৈরী করা হয়। এক ছত্রে আল্লাহ, এক ছত্রে মুহাম্মদ ও এক ছত্রে রাসুল লেখা ছিল ঐ মোহরে। প্রতিটি পত্রে রাসুল ঐ সীল মোহরাংকিত করে দিতেন।

রাসুলের নিযুক্ত মুয়াযযিন বৃন্দ ঃ

সঠিক তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, হযরত (সঃ) চারজন মুয়াজ্জিন ছিলেন। তার মধ্যে দু'জন মদীনায় আর দু'জন মক্কায়। মদীনার দু'জন মুয়াজ্জিন হলেন- বিলাল ইবনে রিবাহ (রাঃ) ও অন্ধ সাহাবী হযরত আমর বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)। হযরত বিলাল (রাঃ) মসজিদে নববীতে নবীজির আদেশ ক্রমে প্রথম আযান দেন।

মক্কায় দু'জন মুয়াজ্জিন হলেন-আম্মার বিন ইয়াসিরের গোলাম সায়াদ (রাঃ) ও আবু মাহযুরাহ (রাঃ)। হযরত বিলালের আযানে সুর ছিল না। তিনি পৃথক পৃথক শব্দ দ্বারা আযান দিতেন। পক্ষান্তরে আবু মহজুরাহ (রা) সুর করে আযান দিতেন। হযরত সায়াদ (রাঃ) কে ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবার' মুয়াজ্জিন নিয়োগ করা হয়। ইসলামী ফকিহগণ এ চারজন মুয়াজ্জিনের আযানকেই দলিল হিসাবে গ্রহণ করে আযান ও ইকমাতে শব্দ সংখ্যা ও উচ্চারণের স্ব স্ব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহর নবীর (ঃ) প্রহরীবৃন্দ ঃ মুহাম্মদ (সঃ) যখন মকীম থাকতেন তখন তার আশেপাশে সব সময়ই সাহাবায়ে কেরাম ঘোরাফেরা করতেন। আমল সমূহের অনুকরণ করা, সঙ্গলাভ করা এবং বরকত নেয়ার জন্য সবসময়ই ব্যাকুল থাকতেন। কিন্তু সফরে বা যুদ্ধে গমন করলে নির্দিষ্ট সাহাবীগণ দায়িত্ব পালন করতেন রাসুল মাকবুলকে পাহারা দেয়ার জন্য। যাদের পাহারার অবস্থা এমন ছিল যে, "জীবন চলে যাবে তবুও মুহাম্মদ (স) এর কিছু হতে দেবনা।"

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে মহানবীর (সঃ) পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন সায়াদ বিন মায়াজ (রাঃ)। 'আরীশ' নামক স্থানে মহানবী (সঃ) বিশ্রাম নিতে থাকলে তিনি পাহারার দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ওহুদে হযরতের পাহারাদারীতে নিযুক্ত হন মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রাঃ) । খন্দকের যুদ্ধে পাহারাদার নিযুক্ত হযরত যুবাযের বিন আওয়াম (রাঃ)। এক পর্যায়ে যখন "আল্লাহই আপনাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন।"—আয়াত নাজিল হয় তখন থেকে নির্দিষ্ট দেহরক্ষী নিয়োগ করা রাসুল বন্ধ করে দেন। তাঁদেরকে আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করে শোনান।

হযরতের মনোনীত শাসকবৃন্দ ঃ ইয়ামেনে জন্য ইসলামের দাওয়াত পৌছার পর বাজান বিন শাসানকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। রাসুলের জীবদ্দশায় তিনিই

www.pathagar.com

[illegible]সিক [illegible] এর প[illegible] [illegible]ল ইয়ামেনের জন্য একাধিক শাসক নিয়োগ

[illegible]যরত [illegible] বিন উমাইয়া আনসারীকে [illegible]যরামাউত, আবু সুফিয়ানকে [illegible]রানে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এছাড়া মায়াজ বিন যাবাল, আবু মূসা আশয়ারী ইতাব বিন উসায়েদ[illegible] বিভিন্ন এলাকায় শাসনের দায়িত্ব অর্পন করেন। হযরত আমর ইবনুল আসকে (রাঃ) আম্মানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

সদকা আদায়ের দায়িত্ব ঃ হযরত আলি (রা) কে যাকাত, খুমুছ ও অন্যান্য কর আদায়ের জন্য এবং ইয়ামেনের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। সাদাকাত আদায়ের জন্য রাসূল আরও কতিপয় সাহাবাকে নিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে রাসুল মক্কা ও মদীনার এলাকা ও গোত্র প্রতিদের যাকাত ও সাদকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করেন।

অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীগণ ঃ অপরাধী ও শক্রদে যাঁরা কিসাসের বিধান জারী করতেন এবং শাস্তি প্রধান করতেন তাঁরা হলেন হযরত আলি (রাঃ) মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রাঃ), আসিম বিন যিহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ), পারিবারিক খরচ পত্রের দায়িত্ব পালন করতেন। হযরতের সীল মোহর সংরক্ষণ করতেন মুয়ায ইবনে মাসউদ (রাঃ)। এছাড়া আসওয়াদ (রাঃ), উনায়সা (রাঃ), আনাস বিন মালিক (রাঃ), আবু মুসা আসয়ারী (রাঃ) সহ কতিপয় সাহাবীকে নানা দায়িত্ব অর্পণ করেন।

হযরতের মুখপাত্র সভাকবি ও সংগীতকার ঃ হযরত কাব বিন মালিক ও হাসান বিন ছাবিত (রাঃ) রাসুল (সঃ) এর সভাকবি ছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ে মহানবীর বিরুদ্ধে রচিত কাফির ও মু ক কবিদের কবিতার মাধ্যমে জবাব দিতেন। এছাড়া হযরতের সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ কবিতা আবৃতি করতেন। যুদ্ধে উৎসাহমূলক সংগীত ও রণ সংগীতও আবৃত্তি করা হতো। হযরত ছাবিত বিন কায়েশ বিন শিসাস (রাঃ)-এর হুজুর (সঃ) মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) আজসা আমের বিন আবু সালাম বিন আকু প্রমূখ সাহাবীগণ হযরত (সঃ) এর সংগীতকার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শেষকথা ঃ হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সঃ) একজন সফল আদর্শ ও মহাব্যবস্থাপক। উপরের আলোচনার বাইরেও তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখা যায় সুশৃংখলতার মহান নমুনা। সে সাথে অনুসারীদের আনুগত্য অনুপম দৃষ্টান্তও দীপ্তমান দেখা যায়। এ দুয়ের সমাহারের ফলে পৃথিবীর মধ্যে তাঁরা যেমন গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছেন, সে সাথে আখেরাতেও আল্লাহর নিকট থেকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছেন।

www.pathagar.com

মদীনা সনদ ঃ আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ

মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে "আমি আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য করুনা স্বরূপ প্রেরণ করেছি। আল্লাহ পাকের এ অমোঘ ঘোষণার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই তাঁর কিশোর বয়স থেকেই। আরব প্রদীপ মদীনার সূর্য মহানবী ১৪/১৫ বছর বয়সেই গড়ে তোলেন একটি প্রতিরোধ সংগঠন যার নাম 'হিলফুল ফুজুল'। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজ থেকে অন্যায় অত্যাচার দুরিভূত করা এবং জালিমদের প্রতিরোধ করা ও মজলুমদের সাহায্য করা। একইভাবে হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে স্থাপনেও তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। যার ফলে একটি আশুযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া থেকে মক্কার গোত্রগুলো রক্ষা পায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ষষ্ট শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এদেশ শাসনে কোন লিখিত সংবিধান ছিলনা। কিন্তু সপ্তম শতকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে সেখানে লিখিত সংবিধান তৈরি করেন। এ সংবিধান ইতিহাসে 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। আরবী ভাষায় এ লিখিত সনদে ৪৭ টি ধারা ছিল। আওস ও খায়রাজ বারোটি গোত্রে এবং ইয়াহুদীরা দশটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। তাই এ সনদে বিস্তারিতভাবে সকল গোত্রের অধিকার ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ ছিল। বিস্তারিত আলোচনা না করে এখানে প্রধান প্রধান ধারাগুলো উল্লেখ করা হল–

১। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ কারও উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২। সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একই জনগোষ্ঠী বা জাতি বলে গণ্য হবে।

৩। কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত শক্তির দ্বারা উক্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবে।

৪। বহিঃশত্রু কর্তৃক মদীনা শহর আক্রান্ত হলে সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় শত্রুকে বাধা দিবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব-স্ব যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করবে।

৫। কোন সম্প্রদায়ই কুরাইশদের কিংবা বাইরের অন্যকোন শত্রুর সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৬। কোন সম্প্রদায়ের লোক অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য

www.pathagar.com

করা হবে। তজ্জন্য অপরাধী ব্যক্তির সম্প্রদায় বা গোত্রকে দায়ী করা যাবেনা।

৭। মদীনা নগরী পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং এজন্য রক্তপাত, হত্যা, বলৎকার ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ একেবারেই নিষিদ্ধ।

৮। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবগঠিত সাধারণ তন্ত্রের প্রধান হবেন।

৯। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেউ কারও বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১০। সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ফয়সালা -ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১। সনদে স্বাক্ষরকারী লোকেরা কোন প্রকার বিশ্বাস ঘাতকতা না করলে তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে।

১২। দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করা হবে।

১৩। আশ্রয়প্রাপ্ত প্রতিবেশী কোন প্রকার নাশকতামূলক বা বিশ্বাস ঘাতকতা মূলক কাজে লিপ্ত না হলে আপনজন বলে বিবেচিত হবে।

১৪। বন্ধুর দুষ্পকর্মের জন্য কাউকে দায়ী করা হবে না। অত্যাচারিতদের সাহায্য দেয়া হবে।

১৫। এ সনদ যারা ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

এ সনদই প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক এবং সর্বশ্রেষ্ট রাজনীতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কেননা, এই সনদ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আক্রমণ কারীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতি সহযোগিতার সুযোগ লাভ করল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আত্মরক্ষা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন জাতির শান্তি প্রতিষ্ঠায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলীল স্বরূপ।

উক্ত সনদে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ধর্মের ব্যাপারে যে উদার নীতির পরিচয় দেন, তা তৎকালিন দুনিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ সে সময়ে দুনিয়ার অন্য কোন রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। রাজার ধর্মই প্রজাকে মেনে নিতে হত। মহানবী মদীনায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। তিনি এই সনদে মুসলিম এবং অমুসলিম সকলকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করেন।

সে সময়ে বিশ্বের সরকার পদ্ধতি ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদীনার সনদ দ্বারা গোত্র প্রধানের ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং সর্বপ্রথম ইসলাম খিলাফতের বীজ বপন করা হয়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মধ্যে যে সম্প্রতি ও সৌহার্য গড়ে উঠে তা পরবর্তী সময়ে ইসলামের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারনের পথ সুগম করে।

আরবে তখন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। তারা সুদ খেত, যাকাত প্রদান করত না। গরীব দুঃখীদের অধিকারের প্রতি অবহেলা করত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জনগণের দুঃখ দৈন্য লাঘবের এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার বিধান পেশ করেন। তিনি মুসলমানদের বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনার্জন করার অধিকার দেন এবং সদকা ফিতরা ও যাকাতের মাধ্যমে উক্ত সম্প্রদায়ের নির্ধারিত অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণের বিধান প্রবর্তন করেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মহানবী (সাঃ) আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে উপযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও পরিচালক নিযুক্ত করেন। আল কোরআনই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সংবিধান। এই সংবিধানের নীতি ও আদর্শের আলোকেই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় যাবতীয় বিধি বিধান রচনা করতেন। পবিত্র কুরআনুল মজীদের নির্দেশে নিজের বিবেক বুদ্ধি ও সাহাবীদের পরামর্শ অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ফলে তিনি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হন।

এ সনদই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সনদ। হিট্টি, মুইর, সৈয়দ আমির আলি, বর্নাড'শ প্রমুখ ঐতিহাসিক ও মনীষীগণ মদীনার সনদ পৃথিবীর অদ্বিতীয় সংবিধান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেছেন। ফলে মদীনার সনদ তৈরী করন ও এর মাধ্যমে মদীনা ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল রাসুলের তখনকার জন্য প্রজ্ঞাপূর্ন ও এবং যথাযথ পদক্ষেপ। এই মদীনা সনদকে সামনে রেখে অর্ধ পৃথিবী শাসনের বিরাট দায়িত্ব মুসলমানদের মাধ্যমে পালন করা সম্ভব ছিল।

এ পৃথিবীর বর্তমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বনী আদম যারা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক মদীনার সনদের আকরে যদি আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলে, তাতে শান্তি ও সাফল্য আসবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু একাজটিকে বাস্তবায়ন করার ও আনজাম দেয়ার দায়িত্ব মূলতঃ বর্তায় বিশ্ব মুসলিমের উপর। কারণ তারা নেতৃত্ব দেবার জাতি। কিন্তু নানা মত ও পথ পরিহার না করে মদীনার সনদের অনুকরণ তারা কি করে করবে-যার মূল কথাই হলো ঐক্য।

[সীরাত স্মারক '৯৮-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

শান্তি ও কল্যাণমুখী পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে মহানবীর ভূমিকা

এডভোকেট আবদুল মোবিন

তখন ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্ধকার যুগ, অন্ধ মানসিকতা ও আংশিবাদীতা মানুষের মস্তিস্ককে অচিন্তনীয়ভাবে জড় ও পংগু করে দিয়েছিল। মানুষ ভুলে গিয়েছিল স্রষ্টার একত্ব। অগনিত দেব-দেবী, গ্রহ নক্ষত্র অগ্নি, প্রস্তর একটি যাজক পুরোহিতকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে অন্ধমনে তার বিবেক বুদ্ধি ও কল্যাণমুখী চিত্তকে বলি দিয়ে করত পুজা। এমনি সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভূত হলেন। তিনি জগতকে সামনে রেখে ঘোষণা করলেন দুনিয়া জাহানের একমাত্র অধিশ্বর আল্লাহ। মানুষের মারামারি, কাঁটাকাটি, লুঠ, হত্যা ও ব্যভিচার দেখে বললেন ঃ বন্দ করো এই কুকীর্তি, বাড়িয়ে দাও সাম্যের হাত এবং সবার সাথে বন্ধুত্ব করো। কারো সাথে শত্রুতা নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এসেছিলেন শান্তির বার্তা নিয়ে এর জলন্ত প্রমাণ হল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য আফ্রিকার খ্রিষ্টান রাজ্য আবিসিনিয়া, পারস্য সম্রাট খসরুর অীধনে তদানিন্তন ইরাক ইয়ামেন, ওমান, বাহরাইন, শ্রীলংকা এবং মহাচীনের সাথে, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আরবের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক। ইসলামের একত্ববাদ ও শান্তির আদর্শে দীক্ষিত হবার জন্য সবাইকে ভাবলেন তিনি প্রতিবেশী। কোন দেশের সাথেই বৈরী নীতিতে যাননি। বরং তিনি সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানকেই বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। রাষ্ট্রতত্ত্বের ভাষায় ঃ তিনি ছিলেন শান্তিবাদী ও প্রকৃত অর্থেই যুদ্ধ বিরোধী। কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের ওপর যুদ্ধ চাপিয়েছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই। বরং শত্রু পক্ষের আগ্রাসন প্রতিহত করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যুদ্ধ ও হানাহানি সবচেয়ে ঘৃন্যতম অপরাধ। বিনা কারণে মানুষের রক্তপাত হল মহাপাপ। গোত্রে গোত্রে হানাহানি সৃষ্টিকারীরা হল আল্লাহর শত্রু। তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

তিনি আরো বলেন, "আক্রান্ত না হলেও আত্মরক্ষার জন্যই কেবল যুদ্ধ বৈধ হল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ওহুদ, বদর ও পরিখার যুদ্ধ। শত্রুরা এই সব যুদ্ধে নবীর দলকে আক্রমণ করে নিজেরাই ধুলিসাৎ হয়েছে।

কুরাইশদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য নবী করিম (সঃ) ও তাঁর ইসলাম দীক্ষিত অনুসারীগণ মদীনাতে আশ্রয় নেন। তাঁদের চিরকালের মত ধ্বংস করে দেবার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে কুরাইশগণ বিরাট যৌথ বাহিনী নিয়ে মদিনাতে

www.pathagar.com

আক্রমণ করে। আগাম সংবাদ পেয়ে হযরত অস্ত্রে ও লোকবলে বলিয়ান হয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত। অপরদিকে কুরাইশদের যুদ্ধ অস্ত্র, উট, রসদ বর্শা আর সৈন্য সংখ্যা মদিনাদের তুলনায় অনেক বেশি। তা সত্বেও অসীম সাহসে ও নিখুত সমর কৌশল কোরাইশদের বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। এর পেছনে যে, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব ছিল তাহা অনস্বীকার্য। এটাই বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে বিজয় লাভ করেও মহানবী যুদ্ধবন্দীদের উপর কোন অত্যাচার করলেন না বরং নিহতদের আপনজনদের সাক্ষাৎকার ও আহতদের সেবা ও চিকিৎসা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এবং যুদ্ধ বন্দিদের উটের পিঠে উঠিয়ে সৈন্যদের উটের রশি ধরে হেটে যাবার নির্দেশ দেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ নজীর বোধ করি আর খুজে পাওয়া যাবে না। ওহুদ ও পরিখার যুদ্ধে আক্রমণকারী দল ছিল কুরাইশগণ। এইসব যুদ্ধেও নবী করিম (সঃ) বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি গিয়ে আগ বাড়িয়ে কোন যুদ্ধ লাগাননি। কারণ তিনি ছিলেন মানবতার কবি।

Gibb সাহেব বলেছেন,

"If every the opposition of the great societies of the east and the west is to be replaced by co-operation the mediation of Islam is an indespensable condition."

মহানবীর এই অপার শান্তিবাদি নীতির কল্যাণেই অনেক শত্রু ইসলামের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। অনেক লোক ইসলামের দীক্ষিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, সার্বভৌম সমতা, অনাক্রমণ, যুদ্ধের বদলে শান্তি, আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক হোক বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আকাঙ্খা।

[সীলাত স্মারক '৯৮-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ) এর ভূমিকা

অধ্যাপক সিরাজুল হক

মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি। তিনি মানুষকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। প্রথম সৃষ্টি মানব আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আল্লাহ্ তায়ালা-বাস্তব ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই।

প্রথম মানুষ আদম (আঃ) কে সৃষ্টির প্রাক্কালে ফিরিশতাদের সাথে কথোপকথনকালে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা হচ্ছে এইঃ "আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করতে চাই।" এই ক্ষুদ্র বাক্যাংশের মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে তা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেরই ভেবে দেখা উচিত। এখানে বিশেষ অর্থেই খলিফা শব্দটির ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়েছে। খলিফা কখনো মালিক বা নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারেনা। প্রকৃত মালিকের অনুগত্যই তাঁর কর্তব্য। আল্লাহ নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। এই গোটা সৃষ্টিলোকের যেমন তিনি স্রষ্টা তেমনি এর রক্ষনাবেক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরই করতলগত। আর এজন্য যে নিয়ম নীতি, আইন কানুন ও বিধি বিধানের প্রয়োজন তাও তাঁরই সৃষ্টি। এসবের ওপর মানুষের কোন হাত নেই।

আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের ওপর যে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হয়েছে, তা হলো আল্লাহ্‌র এই বিধান তথা তাঁর সার্বভৌমত্বকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে একে শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে তুলবে। প্রথম মানব আদম (আঃ) শুধু একজন মানুষ হিসেবেই পৃথিবীর বুকে পর্দাপণ করেনি, বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "অতঃপর আমার নিকট থেকে পথ নির্দেশ জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে যারা আমার সে পথ নির্দেশ মেনে চলবে তাদের জন্য ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।" (বাকারা-৩৮)

এখানে মূল আয়াতে আরবী- مَنْ ও هُمْ 'সর্বনামদ্বয় বহুত্ব নির্দেশক অর্থাৎ আদম (আঃ) ও পরবর্তী মানবগোষ্ঠী যদি আল্লাহর এই বাণীর অনুসরণ করে, এগুলোকে তাদের জীবন কার্যকরী করে তাহলে তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে ভয়ের কোন কারণ নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তাদেরকে যে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বসহ এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তারা তা পালন করে আল্লাহর সন্তোষ লাভে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির মাধ্যমেই 'মানব সমাজের' যে সূচনা হয়েছে উপরোক্ত আয়াত স্পষ্টভাবেই মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে এ সমাজ ব্যবস্থার চূড়ান্তপরিণতি ঘটে।

'মানুষ সমাজবদ্ধ জীব' এ কথাটি এরিষ্টটলের কিন্তু তারও কত আগে, তা মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বে আল্লাহ্ আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে যে ঐক্যবদ্ধ সমাজের ধারণা পেশ করেছেন আধুনিক মানুষ তা কখনো ভেবে দেখেছেন কি? কাজেই সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হচ্ছে মানুষ সমষ্টিগতভাবেই আল্লাহর পথনির্দেশ বা হোদায়েতের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই তাঁর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্বকে এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ জাতির জন্য অসংখ্য নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল সমসাময়িক যুগের মানুষকে তথা সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান করা। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান স্মরণ করিয়ে দেয়া, তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করা এবং আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করা।

হযরম আদম (আঃ) যখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখন এ গোটা বিশ্বই তাঁর ও তাঁর সন্তানদের বিচরণ ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়। দুনিয়ার সকল মানুষই সে একজন মানুষের তথা আদম (আঃ) এর বংশধর। কাজেই মানুষ হিসেবে সবাই আল্লাহ্র খলিফা। সুতরাং প্রতিনিধিত্বের অধিকারের দিক দিয়ে মানুষ মানুষে কোন পার্থক্য নেই; তবে সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে প্রয়োজনীয় খোদায়ী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ নির্দেশনা (হেদায়াত) ও জীবন ব্যবস্থা মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে এবং বাস্তব জীবনে তা কার্যকর করেছে কেবল তারাই কম বেশি এ মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে অন্য কেউ নয়।

আমরা পুর্বেই বলেছি, হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে যে মানুষ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তা পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছিয়েছিলেন। তাঁর আর্বিভাবের পূর্বে নবী রাসুলদের উপস্থাপিত ঐশী বাণী সত্ত্বেও শয়তানের প্ররোচনায় এক শ্রেণীর মানুষ বিপদগামী ও বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। মহানবী (সাঃ) সেই বিভ্রান্ত মানুষ ও বিপর্যস্ত সমাজকে খোদায়ী নির্দেশনার আলোকে হিজরতের

www.pathagar.com

পরে মদীনার জীবনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এমন একটি সমাজ, যার ভিত্তি তাকওয়া। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে নর ও নারী উভয়ই সমান এবং উভয়ই সম্মানীত। নারী ও পুরুষ ভেদে সে সমাজের মানদণ্ড নির্ণীত হয়নি, বরং প্রথম সৃষ্ট মানব ও তাঁর জীবনসঙ্গিনী হাওয়াকে দিয়েই তো মানব সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং এ উভয়ের মিলনে যে বনি আদমের বিস্তার ঘটেছিল, তাদের মিলিত শক্তিই হলো মনুষ্য সমাজ।

মদীনার জিন্দেগীতে মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা বলেন "হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই এর জোড় তৈরি করেছেন। আর এ উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।"-(সুরা নিসাঃ১)

এই যে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক' এর সকলেই বনি আদম আর এদের সমন্বয়েই তো এ পৃথিবীতে প্রথম থেকে গড়ে উঠেছিল মানবীয় সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা।

*রাসুল (সাঃ) যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন তা হচ্ছে খোদায়ী সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক অভিনব সমাজ ব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ।

* এ সমাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রেসালত। অর্থাৎ খোদার মনোনীত এমন একজন মানুষের নেতৃত্বের অধীন ছিল এ সমাজ ব্যবস্থা যিনি কখনো কোন মনগড়া কথা বলেননি, আল্লাহর নির্দেশিত কর্মপন্থা ব্যতীত কোন বিষয় নিজের পক্ষ থেকে চাপিয়েও দেননি। যেমন এর প্রমান স্বরূপ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

"সে কখনো নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে কোন কথা বলেন না, বরং প্রত্যাদেশ হিসেবে যা কিছু তার ওপর অবতীর্ণ হয় তাই-সে প্রকাশ করে।"

* এ সমাজ ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরকালে বিশ্বাস। পরকালে বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যা মানুষকে স্বভাবতই তাকওয়ার পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যে মানুষ বা সমাজের এই বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুই তার জীবনের শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান হবে এবং এই পৃথিবীতে কৃত তার সমুদয় কর্মের হিসাব দিতে হবে। এ ধরনের একজন বিশ্বাসী মানুষ কখনো আল্লাহর নির্দেশিত পথের বাইরে চলতে পারে না।

*মহানবী (সাঃ) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ের তদানীন্তন ইয়াসরিবে

www.pathagar.com

যে নতুন সমাজ বা রাষ্ট্রের পত্তন হয় তা-ই পরবর্তীতে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে পরিগনিত হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, হানাহানি ও গোত্রীয় লড়াইয়ের অবসান করে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে তাকওয়া ও সততার শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই অসভ্য ও বর্বর আরবদের মধ্যে এমন একদল মানুষ তৈরি হয়ে গেল যাঁরা সর্বকালের জন্য আর্দশ হয়ে আছে।

* মহানবী (সাঃ) যে আহ্বান নিয়ে আসেন তা কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ছিল না। তাঁর এ আহবান বা দাওয়াত ছিল বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি। আর মানব জাতির প্রকৃতির সাথেও দাওয়াত ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ বল হে মুহাম্মদ, ওহে যারা ঈমান এনেছো আমি তোমাদের সকলের নিকটই রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (সুরা আল আরাফ) যে সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এ, সে সমাজের মধ্যে ইস্পাতকঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রাসুল (সাঃ) যে সমাজে জন্ম লাভ করেন সেখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি ছিল বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের চেয়ে জঘন্য। মূর্তিপূজা ছাড়া আরবে কলহ-বিবেদ, চুরি রাহাজানি, গোত্রীয় লড়াই, নারী নির্যাতন, মেয়ে শিশুকে জ্যান্ত পুঁতে রাখা, খাদ্যভাবের আশংকায় শিশু হত্যা প্রভৃতি ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছিল। এমনি এক সমাজকে মহানবী (সাঃ) কি করে একটি শান্তির সমাজ পরিবর্তন করেন তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি? যারা একদিন মূর্তির উপাসক ছিল তারাই হয়ে গেল মূর্তি বিনাশী, যারা একদিন ছিল নারী নির্যাতনকারী তারাই হয়ে গেল নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী, যারা একদিন ছিল কলহ প্রিয় ও চোর-ডাকাত, তারাই হয়ে গেল পরস্পর ভাই বন্ধু ও পরস্পরের সম্পদের হেফাজতকারী, শত্রু হয়ে গেল পরস্পরের পরমাত্মীয় ও বন্ধু।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন ঃ এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধর এর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডে ছিলে আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন। যাতে তোমরা পথের সন্ধান লাভ করতে পার। (আল-ইমরান ঃ১০৩)

একটি খোদাদ্রোহী বা সেক্যুলার সমাজ ব্যবস্থা ও খোদার সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্য এই যে, খোদাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষই সর্বেসর্বা। সে সমাজে মানুষ কোন উর্ধ্বতন নৈতিক শক্তির কাছে। তাদের

www.pathagar.com

কৃতকর্মের জবাবদান জরুরী মনে করে না। এ জগতের পরে তাদের কাছে আর কোন জগতের অস্তিত্ব নেই। তাই এ জগতের ভোগ-বিলাসিতা, লাভ-লোকসান ও আত্মস্বার্থকেই তারা বড় করে দেখে; আর আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব; তাঁর প্রেরিত রাসুলের রেসালত ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সে মানুষে মানুষ যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে স্বার্থপরতা, ভোগবিলাসিতা আল্লাহও তাঁর রাসুল এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। কারণ এটা সেই সৃষ্টিকর্তারই নির্দেশ যার কাছে একজন খাঁটি বিশ্বাসী বান্দাহ আত্মসমর্পনের ঘোষণা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর আনুগত্য করা রাসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। -(সুরা নিসা ঃ৫৯)

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের প্রতি আনুগত্য শর্তহীন হতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাদের আনুগত্য আল্লাহর বিধান কার্যকারী করার প্রেক্ষিতেই কেবল তাদের আনুগত্য করা যেতে পারে। যেমন-রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নেতা যদি সে কোন অন্যায় বা পাপ কাজের আদেশ করে তবে তার কথা শোনাও যাবে না এবং তার আনুগত্যও করা যাবে না। (বোখারী ও মুসলিম)।

সেক্যুলার দর্শন ও মতাদর্শের বিপরীত উপরোক্ত গুণাবলীর উপর ভিত্তিশীল সমাজ ব্যবস্থার ঐক্য ও সংহতি যেমন বিদ্যামান তেমনি এ সমাজ ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ইনসাফও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে তারই নিদর্শন। কারণ তার কারো মনগড়া বা স্বার্থপর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-ন্যীতি, যাতে মানুস সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে- (সুরা হাদীদ ঃ২৫)

একটি নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধার হিসেবে মহানবী (সাঃ) যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তা কোন জ্বিন-পরী দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থা ছিল না। সেই মাটির মানুষ, কুরআনের ভাষায় যারা ছিল, পরস্পর শত্রু' যারা ছিল 'অগ্নিকূণ্ডের প্রান্তে' তাদের মত মানুষের মাধ্যমেই তিনি এ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু মুসলমানরাই ইনসাফপ্রাপ্ত হয়নি; বরং অমুসলিমরাও পরিপূর্ণ ইনসাফের

www.pathagar.com

অধিকারী হয়েছিল, নিরাপদে জীবন-যাপন করেছিল। ইসলামের এই সুমহান ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ন্যায় নীতির ফলেই আরব সীমান্তের বাইরেও অল্প দিনের মধ্যেই দলে দলে লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল।

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমান তথা মুহাজির ও আনসারদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক আল্লাহ বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন আর তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। (সুরা তাওবা ঃ১০০)

আজ সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে এসব গুণ তথা ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির কারণেই মুসলমানরা শতধা বিচ্ছিন্ন। আর এ বিচ্ছিন্নতার কারণেই না তারা কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে আর না তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারছে। বরং সর্বত্রই তারা যেমন নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছে তেমনি মার খাচ্ছে শত্রুদের হাতে অহরহ। মুসলমানদের এ দূরবস্থার কথা স্মরণ করে আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ

"সে যুগে আমরা মুসলমান হয়ে লভেছিলাম সম্ভ্রম ও সম্মান
আর আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছি ত্যাগ করে কুরআন।"

[সীরাত স্মারক '৯৭-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

আমাদের জাতিসত্তার রূপকার মহানবী (সাঃ)

মাসুদ মজুমদার

বাঙ্গালী মুসলমানদের আবাসস্থল বাংলাদেশ। জাতিসত্তার এ স্বরূপ চিহ্নিত হতে সময় নিয়েছে প্রায় হাজার বছর। জাতি গঠনের উপাদানগুলো তো বটেই, অধিকন্তু আরো দুটো মৌল উপাদান এ দেশের জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার স্বরূপ চিহ্নিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। উৎসের যত গভীরে যাওয়া যাবে জাতিসত্তার সেই মৌল উপাদানের পরিচিতি ততই স্পষ্ট হবে।

যে দুটো মৌল চেতনা আমাদরেকে আলাদা জাতিসত্তার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, এর একটি ভূমিপুত্রদের জীবনবোধ আড়ালে আবহমান কাল ধরে বেড়ে উঠেছে– অন্যটি বিকশিত হয়েছে নিখাঁদ জীবনবোধ থেকে। জীবনবোধ উঠে এসেছে আদর্শিক চেতনা থেকে। সেই আদর্শ বহন করেছে ভূমিপুত্রদের। একই ভাবে বাঙ্গালীপনার সাথে জীবনবোধ সম্পন্ন ধর্মাচার একাকার হয়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই একজন মানুষ জনপদ থেকে একই সাথে দুটো মৌল শেকড় দিয়ে জীবন রস সঞ্চয় করে।

এর একটি সাদা মাটির রূপ-রস অন্যটি তৌহিদী চেতনা। অবস্থানগত কারণেই গাঙ্গেয় এ বদ্বীপের মানুষ মাটির গন্ধ গায়ে মাখে প্রাকৃতিক কারণে, প্রয়োজনে এবং নিয়মে। আর চিন্তা-চেতনায় মন মননে ধারণ করে একত্ববাদ। তাও স্বাভাবিকতার পথ ধরেই।

এখানকার ভূমিপুত্রদের ভেতর তৌহীদ চেতনা সঞ্চারিত হয় ঠিক সেই সময়, যখন জাতি-- গোষ্ঠীটি পরিচিতির পথ ধরে সামনে পা বাড়াচ্ছিলো। এর আগে আর্য শাসনের ভেতর আড়ষ্ট এ জাতি কেবলই নিষ্পেষিত হচ্ছিলো। অত্যাচারিত ব্রাহ্মণ হলো; শেষ নাগাদ বিতাড়িত হলো। মৌর্য--গুপ্ত--সেন শাসনে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী এমন একটি পরিবর্তন আশা করলো---যার ভেতর তারা খুঁজে পেতে চাইলো নিজস্বতা-স্বকীয়তা এবং মানবতাবাদের ছোঁয়া।

এ সময় ইসলামের বিজয় যুগ। বিজয়ের সর্বশেষ জয়তিলক এঁকে দিলো বখতিয়ারের ঘোড়া। বারশ' শতকের একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। হঠাৎ আক্রান্ত হলো লক্ষণ সেন, জনতার কাছে অভিশপ্ত এবং প্রভু তুল্য এসব আর্য--ব্রাহ্মণ শাসক বিদেশী শাসক হিসেবে এক দিনের জন্যেও এখানকার ভূমিপুত্রদের হৃদয় বন্দরে ঠাঁই পায়নি। তাই জনতার অভিশাপ নিয়ে বখতিয়ারের ঘোড়ার

www.pathagar.com

আওয়াজেই তাদের হৃদকম্পন বাড়িয়ে দেয়। প্রতিরোধ করার সাহসটুকু পর্যন্ত তারা পায়নি। কারণ জনতার ভেতর জাতিসত্তার জন্যে একটি অদৃশ্য আগ্রহ বেড়ে উঠেছিলো। জনগোষ্ঠীর ভেতর পরিবর্তন প্রত্যাশা ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের।

ইসলামের বিজয় অভিযান সুদূর আরব থেকে সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করেছিলো জনতার আগ্রহে। আর বাংলায় প্রবেশ করেছিলো জনতার আগ্রহে। আর বাংলায় প্রবেশ করেছিলো তা জনতার আকুতির ওপর নির্ভর করে। মজার ব্যাপার যে, ইসলামের টানা বিজয়ের যে অভিযান তা বাংলায় এসে থামলো। মদিনা থেকে সামাজিকায়ণ ও মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর ভেতর আদর্শিক জাতিসত্তার ভিত রচনার যে শুভ সূচনা হয়েছিলো, সেটিকে বিরামহীন বিজয়ে বিনে সুতোর মালার মতো গেঁথে দিলো মদিনার সাথে বাংলাকে, মক্কার প্রভুর সাথে বাংলার বন্দীরূপী গোলামদের। পথে দজলা ফোরাত অতিক্রম করে, পারস্য পাড়ি দিয়ে, খায়বার গিরিপথ ডিঙ্গিয়ে একদল মানুষ এলো। সাথে আসলো মানবতার ভরপুর এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন্ত আদর্শ--যার ভেতর অলৌকিক এমন এক শক্তি রয়েছে– যা ভূমি না পাল্টিয়ে, ভাষা না বদলিয়ে, শুধু জীবনবোধটি পাল্টিয়ে দেয়, রাতারতি অগ্নিপূজক তৌহিদবাদী হয়,। পৌত্তলিক হয় একত্ববাদী।

ছোট একটা উপমা দেয়া যায়-পারস্য বিজয়ের প্রস্তুতি চলছিলো। তৎকালীন পারস্য ছিলো আদি সভ্যতার অন্যতম তীর্থভূমি। পারস্যবাদী বললো, ইসলাম গ্রহণে আপত্তি নেই। আল্লাহ-রাসুল আর পরিশীলিত আরবী কালচার যদি ইসলাম হয়, তাহলে আল্লাহ --রাসুল আর পরিশীলিত পারস্য সংস্কৃতিও ইসলাম। হলোও তাই। তাই ইসলামের বিজয়ে শাসক ও প্রজা পরিবর্তনের প্রসঙ্গ ওঠেনি। এ সূত্র ধরে ইসলাম ইউরোপে পাড়ি দিয়েছে। এশিয়ার বৃহত্তম ভূভাগে ঠাঁই নিয়েছে। বাংলায়ও ইসলামের আগমন এবং স্থিতি একই গাঁথা। এ কারণেই বলা হয় আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের মোড়ক। এর রূপকার খোদ মহানবী। যদিও এই রূপের প্রভাব পরোক্ষ, পরম্পরার সূত্র ধরে।

ইসলামের আর্বিভাব না হলে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এ ভূখন্ডটি আজকের এই অবয়বের বাংলাদেশ হতো কিভাবে? স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ধারণ করতো কিভাবে? এই তো সেই মুসলিম বাংলা আর আদি রূপ বাঙ্গালা সুবে বাংলা বঙ্গভঙ্গের বাংলা, পুর্বে বাংলা, খণ্ডিত সময়ের পূর্ব পাকিস্তান আর আজকের আমাদের গর্বের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ইতিহাসের এ যোগসূত্রতা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। অনেকের

www.pathagar.com

মস্তিষ্ক বিগড়ে যেতে পারে। তারপরও স্বীকার করতে হবে-এটাই রূপান্তর ও অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় আমাদের জাতিসত্তার একমাত্র পরিচিতিবাহী নৃতাত্ত্বিক অবস্থান। ইসলামে মদিনার ভাষা পাল্টায়নি। পারস্যে ভাষায় হাত দেয়নি। ভারতীয় ভাষাগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। ভারতে আঞ্চলিক ভাষায় সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সাত'শ বছরের লাগাতার মুসলিম শাসনের ইতিহাস একটি ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না-শাসক শ্রেণী কোন একটি ভাষাকে অপাংক্তেয় ভাবতে চেষ্টা করেছে। ফারসী এলো ঐতিহ্যের কারণে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও এককেন্দ্রিকতার স্বার্থে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, ভাষাগত দিক, নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ টেনে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নব্বই কোটি মানুষের দেশ ভারতে কোন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নেই। প্রদেশ নেই। রাজ্য আছে একটি মাত্র, তা কাশ্মীর। যারা ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর ভেতর নিজেদের পরিচিতি স্বীকার করে না। তারা কাশ্মীরী মুসলমান হিসেবে স্বাধীনতা চায়। তাদের সেই পরিচিতিকে মহীয়ান করার জন্য তারা লড়াই করছে। বাকি সর্বত্র সবাই সংখ্যালঘু। বৃহৎ ভারতের কোল ঘেঁষে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাত্র দু'টি জনপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মর্যাদা পায় এবং সেই দুটো জনপদই হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। একটি আরাকান, অন্যটি আমাদের প্রিয় জন্মভুমি স্বাধীন -সার্বভৌম বাংলাদেশ। আরাকান ইতিহাসের চলমান ট্রাজেডি হিসেবে পরিচিত। আর বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র।

যারা এ ইতিহাসে সত্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে চাইবেন, তাদেরকে ক'টি প্রশ্নের সঠিক জবাব খুজে আনতে হবে (ক) এ জনপদ মুসলিম বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাসের ভেতর যোগসূত্রের অভাবটা কোথায় (গ) বখতিয়ারের বঙ্গ--নদীয়া বিজয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত মৌর্য, গুপ্ত, সেন শাসন, বৃটিশ বেনিয়া শাসন, খন্ডকালীন পাকিস্তানী শাসন ছাড়া অবশিষ্ঠ সময়কে এ দেশের মাটি মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেছে। (ঘ) সুবে বাংলার ধারণা কেন এলো, (ঙ) পূর্ব বাংলা শব্দটির ধারণক্ষমতা এত ব্যাপক কেন? (চ) বঙ্গভঙ্গকে এ দেশের মানুষ আর্শীবাদ ভেবেছিলো কি জন্যে? (ছ) লাহোর প্রস্তাবের সারসত্তা কি অর্থহীন ছিলো? (জ) দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে '৪৭ সালে দেশ বিভাগ ইতিহাসের অগ্রগতি নয় কেন? এবং আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ভুখন্ডের যে পরিচয়- তা কি পূর্ব পাকিস্তান নামে আমাদের প্রিয় পূর্ব বাংলার পরিবর্তিত নাম ছিলো না?

www.pathagar.com

আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন প্রকৃত ইতিহাসবেত্তা অস্বীকার করবেন না যে, বাঙ্গালী মুসলমানদের জাতিসত্তার পরিচিতি স্পষ্ট হওয়ার পর থেকে সুলতানাত বাংলা, মুঘল বাংলা স্বাধীন নবাব, বৃটিশ বাংলা-পাকিস্তান বাংলা নামে বদলের আড়ালে ইতিহাসের যে কোন ঘোরপাঁচই থাকুক ভূপরিচিতি আসল ও গণআকুতি একই থেকেছে এবং তা সীমিত সময়ের ভিন্ন পরিচিতি গ্রহণ করলেও মুসলিম উম্মাহর সক্রিয় সদস্য হিসেবে বংলার এ জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবেনি, যোগসূত্রহীন থাকেনি। এমন এক সময় ছিলো, এদেশ শাসিত হতো স্বাধীন নবাবদের দ্বারা। নবাবরা দিল্লীর সাথে সম্পর্ক চুকে দিয়ে স্বাধীনভাবে নবাবী করতো। তখনও এখানকার মানুষ ভাবতো দেশ শাসনে আমরা স্বাধীন কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমরা দুনিয়া জোড়া উম্মাহর অংশ। তাই দিল্লীর সাথে সম্পর্কটা শাসক-শাসিতের নয়। ভ্রাতৃত্বের এবং সমঝোতার। ডাইভারসিটির ভেতর ইউনিটির এ সুর বাজাবার মত শক্তি ছিলো বলেই ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে; জীবন-ঘনিষ্ঠ ও প্রভাব বিস্তারকারী জীবন-দর্শন। বাঙ্গালীকে বাঙালীত্বের ভেতর রেখে ইসলামী আদর্শে লীন করে দেয়ার যে শক্তি এবং ক্ষমতা ইসলামের আছে এবং তা প্রদর্শন করেছে--তাতে অন্য কোন মতভেদ নেই। এ কারণেই ইরানী, তুরানী কুয়েতী, ইরাকী পাকিস্তানী-আফগানী আর বাঙ্গালী স্ব-স্ব স্থানে থেকেও একটি স্থানে এক ও অভিন্ন। আদর্শিক ভিত্তিই আমাদেরকে বিদায় হজ্বের ভাষণের অংশীদার করেছে। রাবাত ঘোষণা, লাহোর ঘোষণা ও ঢাকা ঘোষণায় আমরা আমাদের ভূমিকাকে, অবস্থা ও পরিচিতিকে তুলে ধরেছি।

ওআইসি'র জন্ম ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে। প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জেদ্দায় ২২-২৬ মার্চ ১৯৭০ সালে। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আমরা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। এখনো আমরা ওআইসি'র প্রভাবশালী সদস্য। ঢাকা ঘোষনার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভূমিকা ও পরিচিতিকে আরো স্পষ্ট করেছি। এর আগে প্যান ইসলামের যে প্রাণস্পৃহা জেগেছিলো তখনও আমরা ছিলাম উৎসাহী অংশীদার। খেলাফত আন্দোলনে বাংলার মানুষ একাত্মতা প্রকাশ করেছিলো শুধুই আমাদের পরিচিতির সূত্র ধরে, নাড়ীর সম্পর্কটাকে ধরে রাখার স্বার্থে। এছাড়া দুর্বল তুরস্ক খেলাফতের প্রতি আমাদের অন্য কোন মমত্ববোধ ও সম্পর্ক ছিলো না।

মুসলিম বিশ্ব নামে একটি শব্দ নতুন পরিচিতি বহন করে আধুনিক বিশ্বে নতুন একটা ধারণা লালন করে। বিশ্বের মাঝে মুসলিম বিশ্ব এ পরিচিতির সাথে আমরা কেউ কি ভিন্নমত পোষণ করি।

মিল্লাত থেকে উম্মত থেকে উম্মাহ- মুসলিম বিশ্বের ধারণা-এসবই তো একই অঙ্গে এত রূপ। একটির সাথে অন্যটির কোন বিরোধ নেই। শব্দের আধুনিকায়ন করে আমরা জাতিসত্তার পরিচিতির সাথে নিখিল বিশ্বে আমাদের অবস্থান নির্ণয় করি।

শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় কেউ কেউ চেয়েছিলেন আমাদের উৎস মূলের একটা শেকড় কেটে দিতে। স্থায়ীভাবে তারা সাফল্য লাভ না করলেও তাৎক্ষণিকভাবে রুশ- ভারত অপশক্তি আমাদেরকে মুসলিম বিশ্ব থেকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। শাসককূলের অদূরদর্শিতার কারণে তাঁবেদারি করতে গিয়ে তারা এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে যাতে আমরা মক্কা ডিক্লারেশন ও রাবাত ঘোষনা থেকে আলাদা হয়ে যাই। ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড় করবার রুশ- ভারতীয় পরিকল্পনা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ৭৫ পূর্ব পর্যন্ত আড়ষ্ট করে রাখে। ফল দাঁড়ায় আমরা ডাঙ্গায় তোরা মাছের মত ছটফট করতে থাকি। সৌভাগ্যের কারণে মজলুমের আহাজারি শুনে খোদা হয়তোবা অলৌকিক এ অনিবার্য ট্রাজেডির বিনিময়ে প্রেক্ষাপট পাল্টে দিলেন। মৃতপ্রায় জাতিসত্তা তাৎক্ষণিক পরিচিতি খুঁজে পায়, আবার বাঁক ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর থেকে আমাদের যাত্রা শ্লথ হলেও দৃষ্টি ছিলো অবারিত।

আশার কথা যে, জাতি সময়মত সমস্যা- সংকট চিহ্নিত করতে পেরেছে। শাসককূলের ভ্রান্তি তাদের চোখে ধরা পড়েছে। নতুন করে আকুতি জাগতে শুরু করেছে। ১২শ শতকের গোড়ার দিকে আমরা জাতীয় চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে বিজয়মালা গলায় পরেছিলাম হাজারো বাক ঘুরো অজস্র গ্লানি মাথায় বহন করে হলেও আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যপানে এগুতো চেষ্টা করেছি। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ভূপ্রকৃতি ব্যতিক্রমী অবস্থান নিয়েও আমরা যে ঐকতান অনুভব করেছি- তা দিনান্তে শুধু তীক্ষ্ণ-প্রখর এবং আশার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে না- নিবিড় হওয়ার শ্লোগান দিনকে দিন উদ্ভাসিত হচ্ছে।

[লেখকঃ সাপ্তাহিক বিক্রমের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক]

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ) ও যুবসমাজ

এ. জেড, এম, শামসুল আলম

জ্ঞানে প্রবীণ এবং মৃত্যু ভয়ে ভীত বয়োবৃদ্ধদের হৃদয়ে ধর্মের আবেদন গভীরতর। এটা তিন হাজার বছর পূর্বে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনই আছে। নামাযের জামা'য়াতের পর যে কোন মসজিদের তোরণ দ্বারে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের লক্ষ করুন ; এ সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এর ব্যতিক্রম ছিল দুনিয়ার ইতিহাসের একটি ক্ষেত্রে। তা হলো মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আবদুল্লাহর প্রচারিত ধর্মের ইতিহাসে। আজকাল অবশ্য আমরা মহানবী (স) প্রচারিত ধর্মকে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত করে ফেলেছি। এটার এখন তরুণ এবং নবীনদের নিকট আবেদন হারিয়ে সেই সনাতন আদি ধর্মসমূহের রূপ পরিগ্রহ করেছে বলা যেতে পারে।

মহানবীর (সঃ) আদর্শ বিকৃত হলো কিভাবে এবং কেন? কারণ অনেক। তবে মৌলিক কারণ হলো কুরআন এবং সুন্নাহর প্রতি অনীহা এবং সামগ্রিক জীবন দর্শন হিসেবে মুসলমানদের ইসলামের প্রতি উদাসীনতা। মহানবী (সঃ) আমাদের নিকট দু'টি উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। এটা কে না জানে? উক্ত দু'টি মূল্যবান জিনিস হলো– কুরআন এবং সুন্নাহ।

জ্ঞান চর্চার প্রতি উদাসীনতা ঃ লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বীন-আল ইসলাম কায়েমের জন্য মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। পৃথিবীর দরিদ্রতম এ বাংলাদেশে দু'লক্ষাধিক (১৯৯৫) মসজিদ আছে। কিন্তু আল্লাহর এ সমস্ত ঘরে দু'টো জিনিসের যথাযথ চর্চা হচ্ছে বলে মনে হয় না। তা হলো আল্লাহর কুরআনের এবং রাসুল (সঃ)-এর হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ জানার সাধনা।

আমাদের কাছে হাদীস-কুরআন পাঠ করে আল্লাহর দ্বীনকে উপলব্ধি করা অপেক্ষা মোজাইক করা মেঝেতে নফল সালাত আদায়ই যেন যথেষ্ট। অথচ আমাদের নবী (স) শিক্ষা দিয়েছেন, এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়েও উৎকৃষ্টতর।' অন্য কাজ না থকলে নফল নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। জ্ঞানের সন্ধান, নারী পুরুষ সকল মুসলমানের জন্য ফরয। অথচ, আমরা তা তরক করে নফল নামাজে সময় বেশি কাটাই।

আল্লাহর নবীর শিক্ষার এমন অমার্জনীয় অবহেলা ও লঙ্ঘনের পর আমাদের ঔরসজাত সন্তানগণই যদি আমাদের অনুসৃত এবং অনেক ক্ষেত্রে কল্পিত ও পরিবর্তিত ইসলাম হতে বিমুখ হয়, তবে কি আমরা তাদের দোষ দিতে পারি? প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যা অর্জন করতে হলেও সাতটি বই পড়তে হয়। ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দু'টি কিতাব হলো তরজমাসহ কুরআন ও বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

কিন্তু, খুব কম পরিবারেই এ দু'টি কিতাব তরজমাসহ পাওয়া যাবে। আমরা শুনে শুনে সুন্নী মুসলমান। আর যাদের কাছে থেকে শুনি, তাদের অনেকের কাছেও কুরআন এবং বুখারী শরীফ বা ছয়টি সহীহ্ হাদীস শরীফের তরজমা থাকে না।

পূর্ণাঙ্গ আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবন-বিধান এবং মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি বুদ্ধ, ঈসা (আঃ) বা মহাবীরের মত নিরস ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাষ্ট্র প্রধান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, দক্ষ প্রশাসক এবং ন্যায় বিচারক। মসজিদে ইমামতি, দোয়া দরুদ ও ওয়াজ নসীহতের মধ্যে তাঁর কর্মসূচি সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর প্রথম খলীফা-চুতষ্টয়ের প্রধান পরিচিতি ছিল রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে।

রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন ছিল মহানবী (সঃ) -এর সুন্নাত। এই সুন্নাত পরিত্যাগ করে আমরা গ্রহণ করেছি মহানবী (সঃ)-এর জীবনের আংশিক এবং খন্ডিত রূপ। যুব-মন খণ্ডিত, আংশিক দর্শনে তৃপ্ত হয় না। অতৃপ্ত মনের ক্ষুধা মেটানোর জন্য, রাষ্ট্র ও সমাজের সংস্কার এবং পরিচালনার জন্যে তারা ভিন্ন দর্শন, চিন্তাধারা এবং আদর্শের অনুসারি হবে- এটাই স্বাভাবিক। আংশিক আদর্শ নিয়ে পূর্ণ সমাজ সংগঠিত হতে পারে না।

নামায-রোজা বিয়ে শাদীর জন্যে সকল মুসলিমের আদর্শ মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে বহু মুসলিমের আদর্শ প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, লাস্কি, লক হিউম জেফারসান, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ। অর্থনীতির জন্যে আমাদের অনেকের আদর্শ কার্ল মার্কস বা মাওসে তুং।

প্রচার মাধ্যম ও সাহিত্যচর্চার প্রতি উদাসীনতা ঃ মহানবী (সঃ)-এর ইসলামকে যদি জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকব সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে শিক্ষিত যুব-শ্রেণীর নিকট ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরা না হয়, তা'হলে তারা ইসলাম হতে দূরে সরে যাবে, তা নিতান্তই স্বাভাবিক। অশিক্ষিতদের নিকট আল্লাহর দীন প্রচারের মাধ্যমে হলো ওয়াজ-বক্তৃতা। কিন্তু এ যুগে শিক্ষিত সমাজের নিকট যে কোন আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হলো পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন। আমরা এ সব মাধ্যমকে অবহেলা করে শিক্ষিত যুব শ্রেণীর নিকট ইসলামকে পৌছতে দিচ্ছি না।

মহানবী (সঃ)-এর বয়োকনিষ্ঠ সাহাবায়ে-ই কিরাম ঃ ইসলামের ইতিহাসে অবদানের জন্যে যাঁরা অমর হয়ে আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন মহানবীর বয়োকনিষ্ঠ। বিবি খাদিজা (রাঃ) এবং বিবি সওদা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। সাহাবীদের মধ্যে প্রথমেই আমরা পাই হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে তিনি ছিলেন মহানবী

www.pathagar.com

(সঃ) থেকে তিন বছরের ছোট। উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সঃ)-এর আরও ছোট।

সাহাবী তালিকা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মক্কা বিজয়-পূর্বকালের সাহাবীদের শতকরা ৯৫ জনের বেশি ছিলেন তরুণ এবং যুবক। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শের আবেদন মক্কার মধ্য বয়স অতিক্রান্ত বা মৃত্যু ভয়ে ভীত বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষা তরুণ ও যুবকদের নিকটই ছিল গভীরতর পরম পরিতাপের বিষয় অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু কেন?

আত্মীয়, স্বজনদের মধ্যে মহানবী (সঃ)-কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব। আট বছর বয়স হতে তাঁকে তিনি শুধুমাত্র লালন-পালনই করেননি, চরম বিপদের দিনে ঢাল হিসাবে সকল অত্যাচার নিজের পিঠে নিয়ে ভ্রাতৃষ্পুত্রকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন।

একমাত্র আবু তালিব ভিন্ন, মক্কার অন্য কোন অমুসলিমের নামে কোন মুসলিম শিশুর নামকরণ হয় না। মহানবীর (সঃ)-এর আদর্শের সত্যতায় আবু তালিবের ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু আবু তালিবের পুত্র বালক আলী (রাঃ)-এর হৃদয় সত্যের প্রথম আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে উঠে। পুত্র আলীর ইসলাম গ্রহণে আর তালিব ক্ষুব্ধ হননি, বরং খুশীই হয়েছিলেন।

মহানবী (সঃ) -এর আদর্শের যে আবেদন তাঁর সমকালীন তরুণ ও যুবকদের মাঝে ছিল, আজ তা কেন হ্রাস পেল।

অথচ বাম-পন্থীদের সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, মশাল মিছিলের দিকে তাকান, লক্ষ্য করবেন, এসবে বৃদ্ধ বা মধ্যবয়সী অপেক্ষা যুবক, তরুণদেরই ভীড় বেশি।

আমরা জানি, মহানবীর (সঃ) আদর্শে মানব-প্রকৃতির উপরে স্থাপিত এবং এ কারণে অপরিবর্তনীয়। যুব মানসের ধর্ম বা প্রকৃতি চিরন্তন, চির সবুজ। আমাদের বিশ্বাস এবং পদ্ধতিতে কোথায় যেন একটা গোল বেধেছে।

শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন-কল্পনা ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) প্রচারিত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যে, তা যুবকদের আকর্ষণ করতো। যুবমন কল্পনাপ্রবণ, রোমান্টিক ও স্বপ্নাশ্রয়ী। তারা অভ্যবহীন সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে, শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা করে। তাদের সম্মুখে থাকে একটি রঙিন পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে থাকবেনা কোন অত্যাচার-অনাচার, থাকবেনা কোনরূপ শোষণ-জুলুম। যেখানে মানুষ হবে মানুষের ভাই। কেউ হবে না ভৃত্য, কেউ থাকবে না প্রভু। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করবে। সাধ্যমত পরিশ্রম করবে এবং জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথম জীবনে 'হিলফুল-ফুযুল' নামক সংস্থার মাধ্যমে সংস্কারমূলক কিছু কিছু কাজ করেছেন। তা তাঁর বিক্ষুব্ধ আত্ম তৃপ্ত হতে পারেনি। তিনি কল্পনা করতেন শোষণহীন মানব সমাজের। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বপ্ন দেখেছেন জাহেলিয়াত মুক্ত ও কুসংস্কারমুক্ত নতুন পৃথিবীর।

আবদুল মুত্তালিব পরিবার, বনু হাশিম বংশ, কোরেশ গোত্র এবং তৎকালীন আরব সমাজের নেতৃত্ব যুবক মুহাম্মদের (সাঃ) কল্পনা এবং স্বপ্নের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল ছিল না। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, মক্কার সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ মহলে তিনি তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তা ও কল্পনার খোরাক পেতেন না।

যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের মরু প্রান্তের একই ঘুরে বেড়াতেন। দিনের পৃথিবী, রাতের আকাশে কিছুই তাঁর মনের ক্ষুধা মেটাতে পারতেন না। আশ্রয় নিতেন তিনি হেরা গুহার নির্জনতায়। তিনি ভাবতেন, কল্পনা করতেন, সত্য অনুসন্ধান করতেন। বিক্ষুব্ধ চিত্তে মানবতার অবমাননায় এবং সুন্দরতর পৃথিবীর কল্পনায় তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন।

অবশেষে মুহাম্মদ (সাঃ) ওয়াহীর মাধ্যমে পেলেন শাশ্বত সত্যের সন্ধান। বিনা ক্লেশে সত্য তাঁর হৃদয়ের পর্দায় আপনা আপনিই প্রতিফলিত হয়নি। এজন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়েছিল। যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যের আহবান তৎকালীন আরবের যুবকদের মনেই দাগ কেটেছিল বেশি।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে ইসলামপন্থীরা এমন কোন স্বপ্ন যুবকদের সম্মুখে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। তারা অনেকেই সনাতনপন্থী এবং চিরাচরিত বাগদাদী, দামেশকী, মোগলাই ইসলামে বিশ্বাসী। জিহাদে, পরিবর্তনে এবং মদীনার বিপ্লবী ইসলামের প্রতি অনীহা ও ভীতি রয়েছে অনেকের।

অপরপক্ষে বর্তমানে ইসলাম বিরোধীরাই পরিবর্তন এবং বিপ্লবের ধ্বজাধারী। তাদেরই দেখা যায় নতুন পৃথিবীর গড়ার শপথ নিয়ে প্রগতির পতাকা হতে দীপ্ত পদক্ষেপে সম্মুখে এগিয়ে যেতে। তাই যুব মনের অধিকাংশ, স্বভাবতই ইসলামী আদর্শের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনৈসলামিক আদর্শের দিকে ধাবিত হয়।

পরম দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তথাকথিত অনেক ইসলামপন্থীর মন-মগজে রোমান্টিক এবং বাস্তববাদী যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রভাব অপেক্ষা তাদের অবচেতন মনে পশ্চাৎমুখী আবু জাহেল এবং আবু লাহাবের প্রভাবই বেশি। গোঁড়ামিপূর্ণ অযৌক্তিক চিন্তাধারার আবেদন, স্থবির জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধদের নিকট থাকতে পারে; কিন্তু নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে বিভোর যুবসমাজের নিকট তা ব্যর্থ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক এবং হচ্ছে ও তাই।

জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন সমাজগঠনের শুধু স্বপ্নই যুবক মুহাম্মদ (সাঃ)

www.pathagar.com

দেখেননি, একটি গতিশীল জীবন দর্শনের ভিত্তিতে শোষণহীন, নতুন সমাজ তিনি গঠনও করেছিলেন।

প্রতিবাদী চেতনা ঃ মানুষের উপর মানুষের জুলুম-অত্যাচার, শোষণ ও রুচি-বিকৃতির বীভৎসতায় যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর মন বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তদানীন্তন শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তৎকালীন বিশ্বের একটি চরম নিপীড়ন এবং শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। অপর আদম সন্তানের সুখের সংসারে শুধু যে দুঃখ-যাতনার বন্যা প্রবাহিত করা হতো তা নয়, তৎকালীন মানুষ নিজ পরিবারে ও মানবেতর পশুসুলভ কর্মে অভ্যস্ত ছিল। কোন পশু তার সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করে না। কিন্তু তৎকালীন আরব পিতা স্বীয় ঔরসজাত কন্যা-সন্তানকে নিজ হাতে জীবন্ত মাটির নীচে সমাধিস্থ করতে দ্বিধা করতো না। সম্ভ্রান্ত আররদের হেরেমে শতাধিক স্ত্রী স্থান পেতো। পিতার মৃত্যুর পর স্ত্রীদেরকে উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগের অধিকার পেতো ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ।

আরব সমাজে জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। পথে ঘাটে রাহাজানি, লুটপাট হত্যা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। আরব মরুভূমির দেশ। আয়ের জন্য অনেককে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু একসঙ্গে সশাস্ত্র আত্তরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েও বাণিজ্য কাফেলা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিস্তার পেত না। এরূপ রাহাজানি, ডাকাতি চলতে থাকলে কেউ শান্তিতে বাস করতে পারে না।

সারা জীবন যারা এ ধরনের কাজ করে এসেছে বা যাদের সম্পদ মরুর বুকে লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের কাছে ইসলামের বাণী শ্রুতিমধুর মনে হতো না। তবে রাহাজানি, হত্যা, লুট ইত্যাদিতে নবাগত এবং অনভ্যস্ত যুব সমাজের নিকট ইসালামের আবেদন ছিল গভীর। আরবদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত অপরাধ প্রবণতা সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার গুণে।

সংগ্রাম যৌবনের ধর্ম। যুব মন সংগ্রামী চেতনায় উদ্ধুদ্ধ। যুব সমাজ সংগ্রাম করতে চায় সকল অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে। অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে। অন্যায়-অবিচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মন বিক্ষদ। অন্যায়ের প্রতিবাদ, মজলুমের পক্ষে জিহাদ, নিপীড়িতের পক্ষে আত্মত্যাগ নবীনেরা যতটুকু করতে পারে, প্রবীণেরা ততটুকু পারে না। নির্যাতিত মজলুমের ব্যাথা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। যুব মন সংগ্রামী নেতৃত্বের পিছনে কাতারবন্দী হয় এবং নিজেরা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে চায়।

মহানবীর (সাঃ) গোটা জীবনটাই ছিল একটি সংগ্রামী জীবন। তিনি তৎকালীন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সত্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সারা জীবন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জীবনপন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর সারাটা জীবনই ছিল জিহাদী জিন্দেগী।

তেইশ বছরের নবুওতী জিন্দেগীতে তের বছর একাধিক্রমে তিনি আক্রমণ সহ্য করেছেন। প্রতি আক্রমণ দূরের কথা আত্মরক্ষার মত সম্বলও তাঁর ছিল না। দশ বছরের মাদানী জিন্দেগীতে তিনি দুই ডজনেরও বেশি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবীর (সাঃ) সংগ্রামী আদর্শ আরবের যুব-সমাজকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

আরবের কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের বিরুদ্ধে মহানবীর (সাঃ) সাহাবীদের কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। শোষকদের সমর্থনে নয়, মজলুমের মিছিলেই ছিল তাদের স্থান। মজলুম ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া তাদের জন্য ছিল পরম পবিত্র কর্তব্য।

যুব সমাজকে মহানবীর (সঃ) আদর্শের দিকে আকর্ষণ করতে হলে ইসলাম পন্থীদেরকে অবশ্যই মহানবীর (সাঃ) মহান আদর্শ অনুসরণ করে মজলুম সর্বহারাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করতে হবে। সকল অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। বলাবাহুল্য, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই যুব সমাজের সমর্থন হারিয়ে ফেলে।

পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ রিরোধী আদর্শ ঃ কিষাণ ও মজদুর- সমাজের দু'টি মজলুম নিপিড়ীত শ্রেণী। সামন্তবাদ এবং পুঁজিপতিদের শোষণের যাঁতাকলের শিকার হয়ে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করে থাকেন। মজলুম, অশিক্ষিত কৃষক-শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি যুব মন স্বভাবতই অগ্রণী এবং সহানুভূতিশীল।

বিশ্বনবী (সাঃ) যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন তা ছিল কৃষক-মজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জীবনাদর্শন। আরবদেশে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম। মরুদ্যান বা অন্যত্র জায়গা জমি যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটাই ছিল, কিছু সংখ্যক লোকের হাতে।

মুহাম্মদ (সাঃ) প্রচার করলেন যে, জমিতে যারা সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করবে, জমি চাষ করার হক তাদেরই। কারণ, জমি অন্য সব সম্পদের মত নয়। যারা জমি অনাবাদী রেখে দেয়, তিন বছর পর তাদের সে জমিতে কোন অধিকার থাকে না। মহানবীর (সাঃ) এ ঘোষণার পর জমিতে শ্রম নিয়োগকারীরাই জমির অধিকারী হতে থাকে।

শ্রমিকদের অবস্থা দরিদ্র ক্ষেত-মজদুর এবং বর্গাচাষীদের থেকেও খারাপ ছিল। অধিকাংশই দাস সুলভ জীবন যাপন করতেন। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন,

www.pathagar.com

মুনিব যে খাবার খাবে কর্মচারীকেও সে খাবার দিতে হবে। মুনিব যে কাপড় পরবে শ্রমিককেও তাই দিতে হবে। মুনিব যে ধরণের বিছানায় থাকবে, শ্রমিককেও তাই দিতে হবে।

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যাপারে মুনিব কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। ইসলামের সাম্যবাদী এই আদর্শে প্রবীণরা যতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, নবীনরা ততই অনুপ্রাণিত হয়। তাই মহানবীর (সাঃ) কাফেলায় নবীনদের ভীড়ই বেশি ছিল।

মুক্তিবুদ্ধি ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের প্রচলিত তদানীন্তন ধর্মমত অন্ধভাবে মেনে নেননি।পাথরপূজা, মূর্তিপূজা এবং তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে। তাঁর মুক্ত বুদ্ধি ও বিদ্রোহীমন কিছুতেই তৎকালীন নিপীড়ন ও শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনি। মুক্তবুদ্ধি দিয়ে দিতে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন– তৎকালীন জীবন দর্শনের কতটুকু মানবিক, কতটুকু অমানবিক।

যুবসমাজ স্বভাবতই উৎসুক। মন খোলা রেখে অনুসন্ধিৎসু চিত্তে তারা অনেকে বুঝতে চায়। তারা তাদের বিবেক অন্য কারও কাছে বন্ধক দিতে রাজী নয়। খোলা মন দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তারা বুঝতে চায়। আর এটাই নবী করীম (সাঃ) আর আদর্শ।

নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কা মদীনায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন তাঁর দাওয়াতের আবেদন তাদের কাছেই ছিল গভীর, যারা প্রচলিত বিশ্বাসকে একমাত্র সত্য হিসেবে ধরে না নিয়ে নবী (সাঃ) ঘোষিত নতুন বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছিল।

অন্ধ বিশ্বাসী যে সমস্ত লোক নতুন কোন কথা শুনতেই রাজী ছিল না, তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেহেতু রাসুল (সাঃ) নিজেও ছিলেন মুক্তবুদ্ধির মানুষ, তাই তাঁর চারদিকে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ভীড় করেছিল।

[সীরাত স্মারক' ৯৭ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হায়াতুন্নবী (সাঃ) ঃ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

মুহাম্মদ ফরীদুদ্দিন আত্তার

হায়াতুন নবী অর্থ নবীর হায়াত- নবীর জীবন। সাধারণ মানুষের সাথে নবীর সম্পর্ক কি। সাধারন মানুষের জীবন আর নবীর জীবনের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কিনা? আমরা এখানে তা পাক কুরআন মজীদ ও সুন্নাহর মাধ্যমে বিশ্লেষন করে দেখার চেষ্টা করব- ইনশাআল্লাহ।

আরবী 'নাবা' শব্দ থেকে অর্থ সংবাদদাতা। নিয়মিত পত্র-পত্রিকা,রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, আকাশবানী ইত্যাদি থেকে যেসব সংবাদদাতা নানা সংবাদ পরিবেশন করেন, তারা কি নবী? তারা সাধারণ সাংবাদিক সংবাদ পাঠক, সংবাদ সংগ্রাহক। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ থেকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে গবেষনা করে যাঁরা হালাল -হারাম জায়েজ ও নাজায়েজ শরীয়তী মাসায়েল বের করে ফৎওয়া ফারায়েযের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় পরিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সহজ ও সুন্দর সমাধান করেছেন, তাঁদেরকেও কি কেউ কোন দিন নবী নামে আখ্যায়িত করেছেন? তাঁরা ইমাম মুজতাহিদ ফকীহ আলেমে দ্বীন।

নবী যে সব সংবাদ পরিবেশন করেন তা এসব সংবাদাতার তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। সাংবাদিক যেভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে দ্বীনের আলেমগণ পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ঘেঁটে যেভাবে শরীয়তী বিধান প্রকাশ করেন, নবী সে পথের পথিক নন। নবী অজানা অচেনা অদৃশ্য জগতের সংবাদ পরিবেশন করে দৃশ্যমান জগতের সামনে অদৃশ্য জগতের সংবাদ পরিবেশন করা নবীর কাজ। এটা আর কারুর দ্বারা সম্ভব নয়। যে জগতে স্থান কাল পাত্রের বালাই নেই, সেই সূক্ষ্ম জগতের যাবতীয় সংবাদ সুস্পষ্টভাবে স্থুলজগতে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করা নবীর কাজ।

যেহেতু নবীর জীবন নিয়ে আমাদের আলোচনা, তাই আমরা নবীর কাজ কি এখানে এ নিয়ে আর অগ্রসর হব না। স্বতন্ত্র আলোচনায় এসব সঠিক দিক প্রকাশের ইচ্ছা থাকল। এবার আমরা নবী জীবনের রহস্যের বিষয় যৎসামান্য আলোকপাতও করার চেষ্টা করব। বিশেষত আমাদের নবী করীম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া ছাহবিহী ওয়াবারাকা ওয়াছাল্লামা কিরূপ জীবন যাপন করেছেন, তাঁর উম্মত হিসেবে তা আমাদের জানা থাকা দরকার।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নতে বিশ্বাসী ও অনুসারী (আহ্‌লুছ-সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের) সকল ইমাম, মুজতাহিদ ও উলামায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও

www.pathagar.com

বিশ্বাস যে, হায়াতে আম্বিয়া আলাইহিমুছ সালাম (সকল নবী রাসুল) ওফাতের পর নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং নামায ও অন্যান্য ইবাদতে রত রয়েছেন। তাঁদের এ বরযখী (ওফাতের পর থেকে হাশরে উত্থান পর্যন্ত) জীবন আমাদের নিকট সহজবোধ্য নয়; কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁদের এ জীবন দৈহিক অনুভূতি সম্পন্ন সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কেননা, আত্মিক ও মৌলিক জীবনতো সাধারণ মুমিন-মুসলমানসহ সকল কাফির-মুশারিকেরও রয়েছে। বোখারী মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বদরের যুদ্ধে নিহতদের সম্বোধন করে কথা বলেছেন।

মাদারেজুন-নবুয়াত ২য় খণ্ডের ৫৭৬ পৃষ্ঠায় শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলাভী (র) ইবনে আবদুল বার (র) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আপন মুমিন ভাইয়ের কবরের কাছে যায়, যার সাথে জীবিত থাকাকালে পরিচয় ছিল, সে সালাম করলে কবরবাসী তাকে চিনতে এবং তার সালামের জওয়াবও দেয়। আরো বর্ণিত আছে যে, মৃতকে যারা গোসল করায়, খাটিয়ায় উঠায় কবরে রাখে, সবাইকে সে চিনতে পারে। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা পুস্তক যরকানীর ৫ম খণ্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায়ও বর্ণনাটি রয়েছে।

মছনদে আবু ইয়া' লাতে হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসুলুল্লাহি (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "নবীগণ নিজ নিজ কবরে জিন্দা রয়েছেন। তাঁরা সেখানে নামাজ ও দোয়া-মোনাজাতে মশগুল রয়েছেন।"

ইমাম জালালূদ্দীন সয়ুতী (র) এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ জামে 'সগীরের' ব্যাখ্যা 'ফরযুল কদরের' ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদীসখানা 'সহীহ'। আল্লামা সয়ূতী (রঃ) মেরকাতুছ সউদ এর হাশিয়ায় সুনান আবু দাউদ-এ উল্লেখ রয়েছেন যে, নবীগণের হায়াত সম্বন্ধে হাদীসের বর্ননাগুলো 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

'আনবাহুল আযকিয়া' বহায়াতিল আম্বিয়া' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের নবী আকরাম (সঃ) যে তাঁর পবিত্র কবরে জীবিত এবং অন্যান্য নবীগণ যে তাঁদের নিজ নিজ কবরে জীবিত, ইলমে কাওলী ও ইলমে ইয়াকিনী (নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞান) দ্বারা তা প্রমাণিত রয়েছে। অনেক মুতাওয়াতির (অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনা; যা সব যুগেই অব্যাহত সত্য বলে বিবেচিত) এরূপ হাদীস তার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। সম্মানিত নবীগণের দেহ মুবারক যদিও এক জগত

www.pathagar.com

ছেড়ে অন্য জগতে গিয়েছে ; কিন্তু তাঁদের ঐ দেহসমূহ পূর্বের ন্যায় ইবাদতে (নামায ও দোয়ায়) নিমগ্ন রয়েছেন। পূর্ব জীবনের আমলসমূহ এবং জীবনময় যাবতীয় আমল তাঁরা করেছেন সে সব নেক কাজে ব্যস্ত থাকেন। বিশেষত নামাযে মশগুল থাকার কারণ হলো, ইসলামে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। নামায সম্মানিত নবীগণের চোখসমূহের শান্তি।

'তাইছীরুল-কারী' কিতাবের ৩য় খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইদরীছ আলাইহিস সালামের ন্যায় তাদের পরকালীন জীবন দুনিয়ার জীবনের মত; বরং দুনিয়ার জীবনের তুলনায় বরযখী জীবন অধিক শক্তিশালী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। দুনিয়ার জীবনের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। মানুষের স্থূলবুদ্ধি তা আয়ত্তে আনতে সক্ষম নয়।

ইমান গাযযালী (র)-এর ইহইয়াউল্-উলুম, মোল্লা আলী কারী (রঃ)-এর তাইছীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, "পবিত্র আত্মাসমূহ যখন উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাদের সাথে মিশে যায়, তখন আসমান জমিনের বিভিন্ন স্থানে যেখানে ইচ্ছা তাঁরা ভ্রমণ করেন এবং জীবিত ব্যক্তিদের ন্যায়ই তাঁরা সব কিছু দেখতে ও শুনতে পান।" পাখীরা খাঁচার বন্ধনমুক্ত হয়ে যেভাবে মুক্ত বিহঙ্গের মত যথায় ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারে, সেরূপ পবিত্র আত্মাসমূহ ও মুক্ত বিহঙ্গের মতই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত অধিক শক্তি নিয়ে যথায় ইচ্ছা চলাচল করতে পারেন।

[দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে]

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ)-এর মি'রাজ

এম, এস, এম, আঃ কাদের রহমানী

মিরাজ কি? ঃ মি'রাজ আরবী শব্দ। এটা আরবী "উরুজুন" শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অভিধানগত অর্থ হচ্ছে-রাস্তা, সিঁড়ি, সোপান। যাতে ভর করে উপরে উঠা যায়। উর্ধ্বারোহণ, মর্যাদার চরম শিখরে উত্তরণ, উন্নতি, অগ্রগতি ইত্যাদি।

পরিভাষায় মি'রাজ বলা হয় মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে যেই ঘটনায় প্রিয়নবী (সাঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত অতঃপর তথা হতে আরো উর্ধ্বে আল্লাহর আরশে আজীম পর্যন্ত এবং তদুর্ধ্বেও আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ জগত পরিভ্রমণ করেছিলেন।

মি'রাজ সম্পর্কে যেহেতু পবিত্র কোরআনে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়েছে, সে কারণে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করার কোনই অবকাশ নেই।

মি'রাজের সময়কাল ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মি'রাজের সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে নবুয়তের দশম বর্ষে তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর ৬২০ মতান্তরে ৬২১ খ্রীঃ হিজরতের প্রায় এক বছর আগে ২৭শে রজব রাত্রিতে এক শুভক্ষণে মি'রাজ সংঘটিত হয়।

মি'রাজ কেন হয়েছিল ঃ আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কায় কাফির কর্তৃক বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। এ সসয় তিনি কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সঙ্গী সাথীসহ শিয়াবে আবু তালিবে তিন বছর দুঃসহ বন্দী জীবন যাপন করেন। অবশেষে খোদায়ী মদদে বন্দী জীবন হতে মুক্তি পেয়ে বিজয়ের আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। কিন্তু এই আনন্দ তাঁর বেশী দিন স্থায়ী হল না। এর অল্পদিন পরেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী, বিপদের বন্ধু সুখ-দুঃখের চিরসাথী, আদর্শ মহিয়সী, পরম প্রিয়তমা স্ত্রী, হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এবং পরম হিতৈষী, আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিব এ সময় ইন্তেকাল করলেন। ফলে দুঃসহ বেদনা আবারও তাকে ব্যাথিত ও বিমর্ষ করে তুলল। এই পরম হিতৈষী দু'টি মানুষ হযরতের (সাঃ) জীবনে বিপদে আপদে ছায়ার মত শান্তি দানকারী ছিলেন। তাঁদের জীবদ্দশায় হযরতের ওপর চরম কোন আঘাত হানার সাহস পেত না; এবার তাঁদের অবর্তমানে হযরতের (সাঃ) ওপর কোরাইশদের অত্যাচার চরমে উঠল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দয়াল নবী (সাঃ) দ্বীন প্রচার ও আশ্রয় লাভের জন্য মক্কার অদূরে তায়েফ নামক নগরীতে সাহাবী হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। কিন্তু সেখানে

www.pathagar.com

গিয়ে তায়েফ বাসীদের নির্মম অত্যাচার ও প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়ে বিষন্নচিত্তে ক্লান্ত শান্ত দেহে তিনি তায়েফ হতে ফিরে চললেন। তখন সঙ্গী যায়েদ (রা) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার লোকদের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে আপনি তায়েফ গেলেন, কিন্তু তায়েফের লোকেরাও আপনার সাথে পৈশাচিক ব্যবহার করল-এবার আপনি কোথায় যাবেন? প্রিয়নবী (সাঃ) তখন খুব বিব্রতবোধ করেছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর প্রিয় হাবিবকে সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, হে নবী! দুনিয়ার মানুষ যদি আপনার সম্মান না করে, মর্যাদা না দেয়, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি আমার প্রিয় হাবিব, ধূলির ধরায় আপনার মর্যাদাহানি হলে আমি আপনাকে আমার আরশে আজীমে নিয়ে আসব।

তাই আল্লাহ পাক, তাঁর প্রিয় হাবিবকে সান্তনা দেয়ার জন্য তাঁকে আরশে মুআল্লায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু শুধু এতটুকুই মি'রাজের উদ্দেশ্যে ছিল না, মি'রাজের উদ্দেশ্য ছিল আরো ব্যাপক! আল্লাহ বলেন–"অর্থাৎ এটা এই হেতু যাতে তাঁকে আমার কুদরাতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই।" (সূরা বনী ইসরাইল–১)

আগেই বলা হয়েছে যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতে আগে। তাই মিরাজের রজনীতে বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মাবুদ মাওলার দরবারে গিয়ে স্বচক্ষে আরশ কুরশী লওহ-কলম, পুলসিরাত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি দর্শন করে বিশ্ববাসীকে অবগত করালেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা লাভ করে পৃথিবীতে আসেন। পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করে মানব মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বীয় দর্শনলব্ধ জ্ঞান ও আল্লাহর নির্দেশের আলোকে ইসলামের প্রদীপ শিখা জ্বেলে দিলেন। ফলে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে ইসলামের সেই প্রদীপ শিখার অলোকচ্ছটায় বিশ্ব আলোকিত হয়েছিল। মূলতঃ এটাই ছিল মি'রাজের কারণ।

মে'রাজের ঘটনা ঃ হাদীসের বিভিন্ন কিতাব হতে মহানবী (সাঃ)-এর মি'রাজের ঘটনার যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় সে সবের আলোকে মি'রাজের ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

অতঃপর গর্দভ হতে বড় ও খচ্চর হতে ছোট সাদা রঙের বোরাক নামক একটি জন্তু আনা হল। তার গতিবেগ ছিল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্ত এবং তার এক একটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির শেষ সীমানায় ফেলত। জিব্রাঈলের (আঃ) নির্দেশে হযরত (সাঃ) বোরাকে সওয়ার হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই বোরাক তাঁদেরকে নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে উপনীত হল। জিব্রাঈলের (আঃ) ইঙ্গিতে হযরত (সাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্বাকাশ পানে চললেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা প্রথম আসমানে এসে উপনীত

www.pathagar.com

হলেন। হযরত (সাঃ) তথায় হযরত আদম (আ)-এর দর্শন লাভ করলেন। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আসমানে তিনি যথাক্রমে হযরত ইউসুফ (আঃ), ইদ্রিস (আঃ), হারুন (আঃ), মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলো। আর অগ্রসর হতে পারলেন না। অতঃপর বোরাক হযরত (সাঃ)-কে নিয়ে বায়তুল মামুর পর্যন্ত গিয়ে গতি ভঙ্গ করল। অতঃপর সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট রফরফ নামক একটি স্বর্গীয় যানে চড়ে তিনি আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে অনেক কথোপকথনের পর তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে উম্মতের জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার ফিরে আসেন। এটাই হল মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে এবং সুরা নজমের ১হতে ১৯ আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

(মহানবীর মিরাজ সম্পর্কে আরো অধিক জানতে হলে, খাসায়েসুল কুবরা, মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, সালাতুন্নবী, সীরাতে ইবনে হিশাম ইত্যাদি বিভিন্ন কিতাব দেখা যেতে পারে।)

মি'রাজ কি দৈহিক না আত্মিক বা স্বপ্ন ঃ মহানবী (সাঃ)-এর মি'রাজ সম্পর্কে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু তাঁর দৈহিক ভাবে হয়েছিল, না মতে আত্মিক বা স্বপ্নযোগে হয়েছিল এ ব্যাপারেই সব মতভেদ দেখা যায়। একদলের মি'রাজ ছিল আত্মিক বা স্বপ্নযোগে, অপর দলের মতে এটা ছিল দৈহিক। জমহুরে মুহাদ্দেসীন, আহলে সুন্নাত ওয়ালে জামায়াতের আলেমগণের সকলেই দৈহিক মি'রাজে বিশ্বাসী।

দৈহিক মি'রাজ অস্বীকার কারীদের দলীল ঃ রাসুল (সাঃ) এর দৈহিক মিরাজ অস্বীকারকারীদের মূল ভিত্তি হল দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মনগড়া ও ভ্রান্ত কতিপয় মূলনীতি। তাদের বক্তব্য–

(১) উর্ধ্বাকাশে আরোহণের জন্য আকাশ বিদীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আর এটি যেহেতু অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই মি'রাজ দৈহিক ভাবে হয়নি।

(২) মানুষের স্থূলদেহ মধ্যাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করে উর্ধ্বাকাশে গমন করতে সক্ষম নয়।

(৩) হযরত (সাঃ) স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মক্কা হতে বায়তুল মোকাদ্দাস যার দূরত্ব ৫০০ মাইল এবং তথা হতে সপ্তাকাশ ভ্রমণ শেষে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত গমন করে আবার রাতের মধ্যেই মক্কায় ফিরে এলেন। যেমনটা স্বপ্নের মাধ্যমেই কেবল হয়ে থাকে। অতএব মি'রাজ ছিল আত্মিক বা স্বপ্নযোগে।

(৪) যেখানে অক্সিজেন নেই সেখানে গেলেন কিভাবে? কারণ অক্সিজেন ছাড়াতো প্রাণী বাঁচে না।

www.pathagar.com

(৫) হযরতের দৈহিক মি'রাজ অস্বীকারীরা হযরত আয়শা (রাঃ) ও মোয়াবিয়ার (রাঃ) বর্ণিত দু'টি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন মি'রাজ ছিল স্বপ্নযোগে। হাদীস দুটি নিম্নরূপ –

(ক) "হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দেহ মোবারক খোয়া যায়নি বরং আল্লাহ পাক রাতযোগে তাঁর রুহকে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

(খ) হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানকে যখন রাসুল (সাঃ) এর 'আসরা' (নৈশ ভ্রমণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে একটি সত্য স্বপ্ন মাত্র।

(৬) বিরোধীরা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে বলেন মি'রাজ ছিল স্বাপ্নিক –

و ماجعلنا الرؤيا التى ارينك الا فتنة للناس

অর্থাৎ যে স্বপ্ন আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা মানুষের জন্য পরীক্ষা বিশেষ।" (সুরা বনী ইসারাইল–৬০)

(৭) তাদের মতে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়া এবং আল্লাহর দর্শন অসম্ভব। তথাপি আল্লাহর দর্শন দৃষ্টিসমূহ তাকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। (সুরা আনয়াম ঃ১০৩)

ماكان لبشر ان يكلمه الله الا وحياومن رواء حجاب –

অর্থাৎ কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহর তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু অহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে (কথা বলতে পারেন)। (সুরা–আশ–শূরা–৫১)

তারা আরো বলে থাকেন যে, মুসা (আঃ) ও আল্লাহর নবী হয়ে তাঁর কাছে দর্শন প্রার্থী হিসেবে বলেছিলেন–

رب ارنى انظر اليك –

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তোমার দিদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। (সুরা আরাফ -১৪৩) তখন আল্লাহ বললেন لن ترانى – অর্থাৎ তুমি আমাকে কষ্মিনকালেও দেখতে পাবে না।"

তাদের মতে এ আয়াতসমূহ থেকে প্রমানিত হয় যে, আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর আল্লাহকে দেখার কথা অবাস্তব। তাই তাদের মতে মিরাজ ছিল স্বপ্নযোগে বা আত্মিক।

www.pathagar.com

(৮) মি'রাজের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারগণ মি'রাজের নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদঘাটনে ব্যর্থ ও অক্ষম হয়ে বলেছেন যে, মি'রাজ স্বপ্নযোগে বা আত্মিকভাবেই হয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে যদিও তারা কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণ ইসলামী আকীদা বিরোধী এবং প্রিয়নবীর (সাঃ) শানে চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন ঃ মহানবী (সাঃ) এর দৈহিক মি'রাজ অস্বীকারকারী বিরোধীদের উপরোক্ত যুক্তি দলীল সমূহ যে ভিত্তিহীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, মি'রাজ একটি মো'জেযা। আর যে কোন মোজেযাই সাধারণ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা অসম্ভব। নিম্নে কোরআন , হাদীস ও যুক্তির আলোকে তাদের উপরোক্ত দলীলসমূহের জবাব পেশ করা হল–

❒ তাদের ১নং দাবির প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং জোড়া লাগা স্বাভাবিক। কারন এটিও একটি জড় পদার্থ। আর সকল জড় পদার্থই মৌলিকত্বের দিক দিয়ে একই রূপ। সুতরাং একটিতে যা সম্ভব অন্যটিতেও তা সম্ভব হবে। তাছাড়া মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশ ও যমীনসমূহের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইচ্ছা করলে ফাটল ও সৃষ্টি করতে পারেন, আবার জোড়াও লাগাতে পারেন। এছাড়া কোরআনের আয়াত–

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا

অর্থাৎ "আর আকাশের অনেক দরজা খুলে দেয়া হল।" আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশের অনেক দরজা আছে। অতএব, রাসুল (সাঃ) কে যে কোন দরজা দিয়ে নিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তাদের ২নং দাবীর জবাব হচ্ছে–

(ক) মধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একেবারেই অসম্পূর্ণ। যে মধ্যাকর্ষন শক্তির দোহাই দিয়ে তারা দৈহিক মি'রাজকে অস্বীকার করতেন, সেই মধ্যাকর্ষন নীতিকে বৈজ্ঞানিকরা আজ প্রত্যাখ্যান করছেন। গতিবিজ্ঞান বলে, "পৃথিবী হতে কোন একটা ভারী বস্তুকে যদি প্রতি সেকেণ্ড ৬.৯০ অর্থাৎ ৭ মাইল বেগে উর্ধ্বলোকে ছুড়ে মারা যায় তবে মধ্যাকর্ষন শক্তির টানে তা আর পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে না।

[A Bullet fired from the earths surface with a speed of 6.90 miles a scond or more will fly into space."] (The Univers around Us-by-J. Jens-p-216)

www.pathagar.com

নভোচারীদের রকেট যানে চাঁদে গমন এর বাস্তব প্রমান। মহানবী (সাঃ) এর দেহ স্থুল হলেও সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রমকারী বাহন বোরাক আপন পৃষ্ঠে বহন করে উড়ে গেলে মধ্যাকর্ষণ শক্তি তা ঠেকাতে পারে না। অতএব মধ্যাকর্ষণ শক্তির দোহাই দিয়ে দৈহিক মি'রাজকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

(খ) বাহ্যিক দিক থেকে মহানবী (সাঃ) কে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়দেহী ছিলেন না। বরং তাঁর দেহ মোবারক নূর বা জোতি দ্বারা গঠিত ছিল। মহানবী (সাঃ) নিজেই বলেছেন–

اَنَا نُوْرُ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُوْرِىْ

আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট।

অন্যত্র তিনি বলেছেন– اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন তা আমার নূর।

পবিত্র কোরআনেরও ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُبِيْنٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে, এবং সমুজ্জল গ্রন্থ। (সূরা মায়েদাহ– ১৫)

এ সকল তথ্য হতে বোঝা যায় যে, হযরতের (সঃ) দেহ আমাদের মত স্থুল উপাদানে গঠিত ছিল না। তার দেহ গঠিত ছিল নূর বা জ্যোতির দ্বারা। আর নূর বা আলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে যাওয়াইতো স্বাভাবিক। অতএব বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি এখানে অসার।

(ঘ) ছহিহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজের রজনীতে হযরতকে বহন করার জন্য বোরাক নামক স্বর্গীয় বাহন আনা হয়েছিল। মি'রাজ স্বপ্নে হয়ে থাকলে বোরাক আনার কি প্রয়োজন ছিল? কারণ বোরাক কেবলমাত্র স্থুল দেহই বহন করে।

বিরোধীদের ৩নং দাবীর জবাব হচ্ছে, যে সময়ের প্রকৃত অবস্থা সকল জায়গায় একরূপ নয়। কাজেই আমাদের পার্থিব জগতের সময়ের সাথে উর্ধ্বকাশের সময়ের কোন মিল নাই।

এছাড়া যে বিজ্ঞানের কথা বলে তারা দৈহিক মি'রাজ অস্বীকার করে বলেন যে কি করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এতবড় ঘটনা ঘটল-সেই বিজ্ঞানই বলছে সময়ের স্থিরতা বলে কিছু নাই। ইহা আমাদের একটা মনের খেয়াল মাত্র। যে হিসাবে আমরা কোন ঘটনাকে নির্ণয় করি প্রকৃতি সে সময়ের ধার ধারে না। আল্লাহর ঘড়ির সঙ্গে আমাদের

www.pathagar.com

ঘড়ি মিলে না। অন্য গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই আমাদের এ মনগড়া ঘড়ির সময়ের সাথে মি'রাজের সময় নির্ণয় করতে যাওয়া খুবই অন্যায়।

তাছাড়া মহানবী (সাঃ) বোরাক নামক এক দ্রুতগামী স্বর্গীয় বাহনে চড়ে মি'রাজে গিয়েছিলেন যার গতিবেগ ছিল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র এবং সে তার এক একটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে ফেলত। (বোরাক শব্দটি বারক বা বারকুন শব্দের রূপান্তর মাত্র। যার অর্থ বিদ্যুৎ। অতএব বিদ্যুতের গতিই ছিল বোরাকের গতি।) অতএব সময় না লাগাই তো স্বাভাবিক।

❒ তাদের ৪নং দাবীর প্রত্যুত্তর হচ্ছে অক্সিজেন ছাড়া প্রাণী বাঁচে না সত্য; কিন্তু জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে এবং তিনি কখনও কখনও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন। কারণ তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে "হও" বললেই সেটি হয়ে যায়। (সুরা ইয়াসিন-৮৩) এমনিভাবে রাসুলের ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণটিও ছিল তারই ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া বর্তমানে ডুবুরীরা সাগরের তলদেশে অক্সিজেন ছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা ডুব দিয়ে থাকতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যদি এরূপ পারে তাহলে আমাদের বাঁধা কোথায়?

❒ বিরুদ্ধবাদীদের ৫ম দলীলের জবাব হচ্ছে, উক্ত হাদীস দুটি সীরাতে ইবনে হিশাম ও তাফসীরে ইবনে জরীর তাবীলাতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে হযরত আয়শা (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস দুইটির মূল সনদ হচ্ছে- "মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইয়াকুব বিন ওতবা বিন মুগারী বর্ণনা করেছেন, মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের নিকট যখন মি'রাজের ঘটনা জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বললেন এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য স্বপ্ন ছিল।

কিন্তু মোহাদ্দিসগণের মতে এই রেওয়াতটি মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। কারণ, ইয়াকুব হযরত মুয়াবিয়া হতে স্বয়ং শ্রবণ করেননি। সে আমাদেরকে বলেছেন, তার নিকট হতে আসলামা, তার নিকট হতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করে বলেছেন, হযরত আবু বকরের (রা) খান্দানের একজন লোক আমার কাছে বলেছেন-"হযরত আয়শা (রাঃ) বলতেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দেহ মোবারক খোয়া যায়নি; বরং রাত যোগে তার দেহকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

এই বর্ণনাটিতেও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মধ্যবর্তী একজন রাবীর নাম নিশানা কিছুই উল্লেখ নাই। এই কারণেই এই বর্ণনাকেও বিশুদ্ধতার পর্যায়ে আনা যায় না। কাজেই এরূপ দুর্বল বর্ণনার দ্বারা দৈহিক মিরাজকে অস্বীকার করা যায় না।

অথবা বলা যায়, হযরত আয়শা (রাঃ) এর উক্তি-মি'রাজ রজনীতে রাসুলুল্লাহ

www.pathagar.com

(সাঃ) এর দেহ মোবারক খোয়া যায়নি।" এই কথার তাৎপর্য হল, মি'রাজ রজনীতে হযরত (সাঃ) এর দেহ রুহু থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নাই বরং ঐ দুটি একই সঙ্গে ছিল।

এতে করেই তো দৈহিক মি'রাজ প্রমাণিত হয়। তাছাড়া মোয়াবিয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। আর নবুয়াতের দশম বছরে যখন মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল, তখন হযরত আয়শার (রাঃ) বয়স ছিল ৬/৭ বছর। তাঁর দাম্পত্য জীবন তখনও শুরুই হয়নি। আর মোয়াবিয়ার (রাঃ) বয়স ছিল ১০ বছর এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন ৮ম হিজরীতে। তদুপরী এটা হয়ত গবেষণামূলক কথা। কাজেই এটা দলীল হতে পারেনা।

❑ তাদের ৬ নং দাবীর জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহর বাণী

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

অর্থাৎ যে দৃশ্য (স্বপ্ন) আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা মানুষের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। " (বনী ইসরাইল-৬০)

আয়াতোক্ত الرُّؤْيَا বা স্বপ্ন দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ট তাফসীরবিদদের মতে رؤيت(রুইয়াত) বা দেখানো বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ رؤيت عينى (রুইয়াত আইন) বা চক্ষুযোগে দেখাই উদ্দেশ্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং কোরআনের বিখ্যাত তফসীরকার ইবনে আব্বাস(রাঃ) এই অর্থই করেছেন। অতএব তাদের দলীল বাতিল।

এছাড়া আল্লাহ অত্র আয়াতে বলেছেন যে, (মি'রাজের) যে দৃশ্য আমিই আপনাকে দেখিয়েছি তা মানুষের পরীক্ষার জন্য।" অর্থাৎ তদ্বারা ঈমানের পরীক্ষা লওয়া উদ্দেশ্য। যদি বিষয়টি সাধারণ স্বপ্নই হত তাহলে ঈমানের পরীক্ষার কি দরকার ছিল এবং মিরাজের ঘটনা নিয়ে এত জটিলতার সৃষ্টিই বা কেন হল? অতএব, তাদের এ দলীলটিও বাতিল।

❑ অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। তখন ধনুকের 'জ্যা' পরিমাণ ব্যবধান ছিল অথবা এর কম, আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তাই প্রত্যাদেশ করলেন।" (সুরা নজম ৮-১০)

এখানে دَنَا শব্দের অর্থ দুই নিকটবর্তী হল এবং تَدَلَّى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবতী হল। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থাৎ দুই বলা হয় ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার قَابধনুকের ব্যবধান। মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয়। যার দুরত্ব একহাত বা তারও কম।

অতঃপর أَوْ أَدْنَى বলে আরো ইঙ্গিত করা হইয়াছে এই মিলন সাধারনত

প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল; বরং এরচাইতেও গভীর ছিল। অতএব আল্লাহকে দেখাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া রাসুল (রাঃ) বলেছেন–

"যখন আমাকে উর্ধ্বকাশে ভ্রমণ (মি'রাজে) নিয়ে যাওয়া হল তখন আমার প্রভু আমার এত নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে আমাদের মাঝে দুই ধনুকের সম পরিমাণ ব্যবধান ছিল এমনকি তারও কম। এমতবস্থায় আল্লাহ্ আমাকে বললেন, "হে আমার বন্ধু! হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমি বললাম হে প্রভু আমি হাজির।" (কানযুল উম্মাল ষষ্ঠ খন্ড পৃঃ-১১২ হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত) এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ) মি'রাজে আল্লাহর দর্শণ লাভ করেছেন।

বিরোধীদের বক্তব্য, "আল্লাহ কোন মানুষের সাথে কথা বলেন না; কিন্তু অহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল হতে (কথা বলেন)।" এ আয়াত সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ'র আকীদা হচ্ছে, রাসুল (সাঃ) সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং এ বিষয়টি একমাত্র তাঁরই জন্য খাস ছিল। অন্য কারো জন্য নয়। তাই প্রতিপক্ষের এ দাবিও ভ্রান্ত।

❒ বিরুদ্ধবাদীদের ৮নং দলীলের জবাব এই যে, কোন মো'জেযারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কারণ, উজ্জুন অক্ষমতা, ই'জুজুন, অক্ষম করে দেয়া, মু'জিযা বা প্রতিপক্ষকে অক্ষম করে দেয়া, নিরস্ত্র করে দেয়া, এ থেকে বোঝা যায় যে, মু'জিজা হচ্ছে এমন কিছু যা বাস্তব কিন্তু মানুষের জ্ঞানে দুর্বোধ্য। কারণ মানবীয় জ্ঞান দ্বারা যদি তা ব্যাখ্যই করা যায় তাহলে সেই জিনিষের নিকট পরাজিত হল কিভাবে? অতএব, মি'রাজ ছিল একটি মু'জিযা এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রাকৃতিক আইন বিরোধী। এই বিরোধীতা আল্লাহপাক স্বয়ং নিজ কুদরাতেই করেছেন।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মিরাজের প্রমাণ ঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মিরাজ যে কেবল আত্মিক বা স্বপ্নযোগে ছিল না বরং মানুষের সফরের মত দৈহিক ছিল তা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ
لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

অর্থাৎ পরম পবিত্র মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। (ইসরা-১)

আলোচ্য আয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে প্রথমে "সুবহান" শব্দের দ্বারা বাক্য শুরু হয়েছে। "সুবহান"–শব্দের অর্থ পরম পবিত্র। এটি আল্লাহর একটি অন্যতম গুণবাচক নাম। 'সুবহান" শব্দের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ

www.pathagar.com

যেমন পরম পবিত্র তেমনি তাঁর হাবিব মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিরাজের ঘটনাও তেমনি পবিত্র। তাছাড়া সুবহান শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি স্বপ্নই হত তাহলে কখনই এটা আশ্চর্যজনক কিংবা বিরাট হয় না। কারণ স্বপ্ন-তো অনেক মানুষই দেখতে পারে, যে সে আকাশে উঠেছে, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

পরবর্তী বাক্য "আছরা (اسرى) শব্দের অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ নবী (সাঃ) -কে রাতের বেলায়ই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

শব্দটির বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। بعبده "বিআবদিহী" কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং কাউকে নিজের বান্দা বললে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে। এখানে "আবদ" বা দাস শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কেই বুঝানো হয়েছে। এতে কোন দ্বিমত নাই। আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই অলৌকিক ঘটনার কৃতিত্ব একমাত্র আমারই। তিনি "আবদিহী" (স্বীয় বান্দা) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, "আবদ" বা দাস শুধু দেহকেই বলে না। বরং দেহ ও আত্মা উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসুলের (সাঃ) মিরাজ স্বশরীরেই হয়েছিল। স্বপ্নে নয়।

এর পরবর্তী বাক্য "লায়লা" ليلا অর্থ রাত্রি। পূর্বে আছরা اسرى (নৈশ ভ্রমণ) বলার পর পুনঃরায় "লায়লা" (রাত্রি) শব্দটির উল্লেখ স্পষ্টতঃ এ অর্থই ফুটিয়ে তুলেছে যে, রাসুলের (সাঃ) মি'রাজ রাত্রিকালেই হয়েছিলো। আর রাত্রি বেলা বন্ধুর সাথে বন্ধুর গোপন কথাবার্তা হওয়াইতো স্বাভাবিক এবং উত্তম সময়।

অতএব, নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলের (সাঃ) মি'রাজ স্বশরীরে জাগ্রতাবস্থায় রাত্রিকালেই সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, মি'রাজের ঘটনার পরবর্তী দিন হুজুর (সাঃ) উম্মে হানীর কাছে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি পরামর্শ দিলেন যে, "আপনি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করবেন না। কারণ কাফেররা এ ঘটনা শুনলে আপনাকে মিথ্যারোপ করবে এবং কষ্ট দিবে।" (তাবাকাতুল কাবির)

এ থেকে বোঝা যায় যে, যদি মিরাজ স্বশরীরে না হয়ে নিছক স্বাপ্নিক হত তাহলে এটি নিয়ে কোন যুগেই এত মতভেদ সৃষ্টি হতো না। অথচ কাফিররা মি'রাজের কথা তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করেছিল। এমনকি তারা হুজুর (সাঃ) কে পাগল বলেও আখ্যায়িত করেছিল। শুধু তাই নয় মুসলিমদেরও কেউ কেউ এটা অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। যদি মি'রাজ স্বপ্নযোগেই হত তাহলে তাদের অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

www.pathagar.com

কারণ রাসুল (সাঃ) কেন, যে কোন লোকই তো এরূপ আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখতে পারে। যা স্বীকার বা অস্বীকারের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ শারীরিকভাবে হওয়ার কারণেই তারা এরূপ অস্বীকার করেছিল।

অন্যভাবে প্রমাণিত হয় যে,মক্কা থেকে বায়তুল মোক্কাদ্দাস পর্যন্ত হযরতের রাত্রি ভ্রমনতো কোরআনের সুরা বনী ইসারাঈলের প্রথম আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। আর তৎকালে অবৈজ্ঞানিক যুগে এক রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দেসে যাওয়া যার দূরত্ব ৫০০ মাইল এবং আবার তথা হতে রাত্রেই ফিরে আসা শুধু অসম্ভবই নয় বরং কল্পনাতীত। সুতরাং সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এইরূপ অসম্ভব বিষয়কে এক রাতেই সম্ভব করাতে পারেন। তিনি উদ্ধাকাশে আরোহণ করতে পারবেন না এর উপর কি প্রমাণ আছে?

আর তাছাড়া মক্কার সমজিদ হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ তো একাট্য দলীল কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ মাশহুর রেওয়ায়েত দ্বারা এবং আসমান থেকে বেহেশত অথবা আরশ ইত্যাদি খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত।

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীস সমূহ সব মুতাওয়াতির। এ সম্পর্কে ইবনে কাছির ২৫ জন সাহাবী থেকে রেওয়ায়েতকৃত হাদীস যাচাই করে বলেন সারকথা হল মি'রাজ সত্য।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, মহানবীর (সাঃ) মি'রাজ সত্য এবং বাস্তব। এটা দৈহিকভাবেই হয়েছিল। যা অস্বীকার করার কোন পথ নেই। এ মি'রাজ ছিল আসলে একটি মো'জেযা। যা মহানবী (সাঃ) এর নবুয়তের অলৌকিক নিদর্শন। নবী ও নবুয়তের শান সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারাই এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১। সালাতুন্নবী (সাঃ) ৩য় খন্ড-আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী

২। বিশ্বনবী -গোলাম মোস্তফা

৩। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পবিত্র মে'রাজ -আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রহিম মিঞা।

৪। তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন -মাও মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রা) বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প।

৫। তাফসীরে ইবনে কাছির।

৬। মহানবীর সীরাত কোষ-খান মোসলেম উদ্দিন আহম্মেদ

৭। তাবাকাতুল কাবির–ইবনে সাদ।

৮। সীরাতে ইবনে হিশাম– ইবনে হিশাম

৯। আরো অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

[মাসিক মদীনায় প্রকাশিত]

www.pathagar.com

বিশ্বনবী (সাঃ) এর মু'জিযা

মোঃ আবদুল হাই সিদ্দিকী

এই ইহ্ধামে যে সকল নবী-রাসুলের আগমন ঘটেছে, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে কিছু না কিছু আলৌকিক ঘটনা, যেগুলোকে মু'জিযা বলা হয়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় নবী-রাসুলগণের মজিযার প্রকাশ ঘটত। যেমন-হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর ডাকে মৃত পাখির জীবন লাভ করা। হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠির আঘাতে পানির মধ্যে রাস্তা তৈরি হওয়া। হযরত ঈসা (আঃ) এর পবিত্র হাতের স্পর্শে জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া। উল্লেখ্য যে, বিশ্বনবী (সাঃ) ছাড়া অন্যান্য নবীদের মু'জিযা শুধু জীবিত অবস্থায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। ওফাতের পরে তাদের কোন মুজিযা প্রকাশ ঘটেনি। আর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন জুড়ে রয়েছে যেমন অজস্র মুজিযা তেমনি ওফাতের পরও তাঁর অসংখ্য মু'জিযার প্রকাশ ঘটেছে, এমনকি এই মু.জিযা প্রকাশের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মুহাদ্দিসগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিন হাজার মু'জিযার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা সূয়ূতী (রাহঃ) তাঁর খাছায়েছে কুবরা' গ্রন্থে এক হাজার মু'জিযার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রিয়নবী (রাঃ) এর অসংখ্য মু'জিযা থেকে মাত্র কয়েকটির বিবরণ নিম্নে পেশ করছি।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের সফরের সময় সুরাকা ইবনে মালিক আমাদের পশ্চাদ্ধবান করেছিল। আমি তাকে দেখে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, ভয় কর না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। এদিকে সুরাকার ঘোড়ার উদর পর্যন্ত জমিনের অর্ভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। সুরাকা নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। সে আরও বলল, এখন দোয়া করুন, যাতে আমি এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করি, আর আমি শপথ করে বলছি যে, আপনাদের অনুসন্ধানকারীদের প্রত্যাবর্তন করাব। প্রিয়নবী (সাঃ) তার নাজাতের জন্য দোয়া করলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) এর দোয়ার বরকতে সে মুক্তি লাভ করে ফিরে গেল এবং পথে যার সাথেই সাক্ষাৎ হত বলত যে, এই পথে কেউ নেই এই বলে তাদেরকে প্রিয়নবী (সাঃ) এর অনুসন্ধান থেকে ফিরিয়ে নিত।

মক্কা বিজয় শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। তখন ফুযালা ইবনে ওমায়ের প্রিয়নবী (সাঃ) কে অতর্কিত আঘাত হেনে শহীদ করার কুমতলব নিয়ে তাঁর সাথে তাওয়াফ করতে থাকে। তার ঐ কুমতলব

www.pathagar.com

প্রিয়নবী (সাঃ) বুঝে ফেলেন। তাওয়াফরত অবস্থায় ফুযালা প্রিয়নবী (সাঃ) এর খুব নিকটবর্তী হয়। তখন প্রিয়নবী (সাঃ) তাকে লক্ষ করে বললেন, তোমার নাম কি ফুযালা? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ আমিই ফুযালা। প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, তুমি মনে মনে কি চক্রান্ত করছ? সে বলল, কিছুই না। আমিত আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলাম। ধৈর্য ও ক্ষমার মূর্ত প্রতীক রাহমাতুলল্লীল আলামীন অত্যন্ত কোমল ভাষায় তার মনের গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে স্বীয় হাত মোবারক ফুযালার বুকে চেপে ধরে বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। ফুযালা কাল বিলম্ব না করে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহনের পর এই ঘটনা প্রসঙ্গে ফুযালা বলেন, আল্লাহর কসম! প্রিয়নবী (সাঃ) আমার বক্ষ থেকে হাত তুলে নেয়ার পর তিনি আমার কাছে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। যে ফুযালা বিশ্বনবী (সাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র নিয়ে এসেছিল, সে রাহমাতুল্লীল আলামীনের মুহুর্তের সান্নিধ্য লাভের বরকতে নবীপ্রেমিক হয়ে ফিরে গেল।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুতার যুদ্ধে হযরত জায়েদ (রাঃ), হযরত জাফর (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) এর শাহাদাতের প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, হযরত জায়েদ ইসলামের পতাকা হাতে নেয়ার পর শহীদ হয়েছেন। অতঃপর হযরত জাফর পতাকা তুলে ধরেছেন, তিনিও শহীদ হয়েছেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়েছেন, তিনিও শহীদ হয়েছেন। তখন প্রিয়নবী (সাঃ) এর নয়ন যুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, শেষ পর্যন্ত হযরত খালিদ (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়েছেন, অতঃপর জয়লাভ হয়েছে। কিছু দিন পর অনুরূপ সংবাদ পৌছল।

বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হানযালা (রাঃ) এর মাথায় হাত মোবারক রাখলেন, এর বরকত এমন হয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির মুখে ফোঁড়া হত কিংবা কোন বকরীর স্তনে ফোঁড়া হত আর সে ফোঁড়াস্থান হযরত হানযালা (রাঃ)-এর মাথায় লাগিয়ে দেয়া হত তখন সঙ্গে সঙ্গেই তা ভাল হয়ে যেত।

বুখারী শরীফে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে বাড়ি গেলেন; ঘরে এক বাটি দুধ পেয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! আসহাবে সুফফাকে ডেকে আনো। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মনে মনে বলতে লাগলেন, এই দুধটুকু যদি পেতাম। অতঃপর আসি সকলকে ডেকে আনলাম। প্রিয়নবী (সাঃ) আমাকে আদেশ করলেন, তাঁদেরকে দুধপান করাও। আমি দুধপান করাতে

www.pathagar.com

শুরু করলাম। সকলেই তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। অতঃপর প্রিয়নবী (সাঃ) আমাকে বললেন তুমি নিজেও পান কর। আমি পান করলাম। প্রিয়নবী আদেশ করলেন, আরও পান কর। আমি আবার করলাম। প্রিয়নবী (সাঃ) আবার আদেশ করলেন, আরও কর। প্রিয়নবী (সাঃ) এর আদেশে আমি আরও করলাম। অবশেষে শপথ করে বললাম, পেটে আর একটু জায়গাও নেই। অবশিষ্ঠাংশ প্রিয়নবী (সাঃ) পান করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মো'মিনীন হযরত যয়নাব (রাঃ) এর বিবাহের প্রাক্কালে আমার মাতা হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) একটি পাত্রে কিছু খাবারের (খেজুর, ঘি ও আটার সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রকার খাবার) আমার হাতে দিয়ে বললেন, আনাস! এগুলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাআহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে হাজির কর। হযরত আনাস (রাঃ) খাবার নিয়ে রাহমতুল্লীল আলামীনের দরবারে হাজির করে বললেন, আনাস! এদেরকে নিয়ে আস এবং অন্য যাদেরকে পাও তাদেরকেও নিয়ে আসবে। আমি হুযুর (সাঃ) এর নির্দেশানুযায়ী লোকদের দাওয়াত দিয়ে ফিরে এসে দেখলাম যে, হুযুর (সাঃ) এর দরবারে বিপুল লোকের সমাবেশ ঘটেছে। হযরত আনাস (রাঃ)-কে লোকসংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, উত্তরে তিনি বলেছেন, প্রায় তিন হাজার। অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) দেখতে পেলেন যে, হুযুর (সাঃ) উক্ত খাবারের পাত্রের উপর স্বীয় হাত মোবারক রেখে কি যেন পাঠ করলেন। এবং দশ দশ জন করে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খাওয়া শুরু হল। দশ দশ জনের একটি দল আসে এবং খেয়ে চলে যান। সকলেই তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) পাত্রটি উত্তোলন করে দেখেন যে, উহার মধ্যে খাবার রাখার সময় যে ওজন ছিল, এখনও ঠিক তাই অর্থাৎ একটুও হ্রাস পায়নি।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) যখন ক্রীতদাস ছিলেন, তখন তাঁর মনিব বলেছিল যে, আমার বাগানে তিন শত খেজুর গাছ রোপন করব, আর এগুলোতে যখন খেজুর ধরা শুরু করবে তখন তোমার মুক্তি। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তা জানালেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে বললেন, সালমান! তিন শত গর্ত খনন করে রাখবে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি গাছ রোপণ করবে না। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) গর্ত খনন করে রাখলেন। অতঃপর হুযুর (সাঃ) সেখানে তশরীফ নিলেন এবং স্বীয় হাত মোবারক দ্বারা বৃক্ষরোপণ করলেন। হুযুর (সাঃ) এর পবিত্র হাতের বরকতে এক বছরের মধ্যে একটি ব্যতীত সবগুলো খেজুর ধরেছিল। যে বৃক্ষটিতে খেজুর ধরেনি সেই বৃক্ষটি হযরত সালমান (রাঃ) রোপণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা শরীফে ছিলাম। হুযুর (সাঃ) কখনও মক্কার উপকণ্ঠে বিভিন্ন এলাকায় গমন করতেন। তখন আমি হুযুর (সাঃ) এর সঙ্গে থাকতাম। যখন পাহাড় এবং বৃক্ষ সম্মুখে আসত, তখন এগুলো সালাম পেশ করত এই বলে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

বুখারী শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দান করার সময় মসজিদে খুরমা বৃক্ষের স্তম্বের সাথে হেলান দিতেন। যখন হুযুর (সাঃ) এর খুতবার জন্যে মিম্বর তৈরি হল। তখন হুযুর (সঃ) মিম্বরে খুতবাদান শুরু করলেন। এতে ঐ খুরমার স্তম্বটি এত উচ্চস্বরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল যেন তখনই ফেটে যাবে। হুযুর (সাঃ) মিম্বর থেকে নিচে অবতরণ করলেন এবং খুরমার স্তম্বকে আলিঙ্গন করে তাঁর দেহ মোবারকের সাথে মিলিয়ে নিলেন। খুরমার স্তম্ভ তখন হেঁচকি নিতে শুরু করল যেমন ক্রন্দনরত শিশুদের কান্না বন্ধ করাতে চাইলে তারা হেঁচকি নিয়ে কাঁদতে থাকে। অবশেষে স্তম্ভটি কান্না বন্ধ করল। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এই খুরমার স্তম্ভটি সর্বদা আল্লাহর যিকির শ্রবণ করত।

ইমাম তিরমিযি (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দরবারে সামান্য কিছু খুরমা এনে আরজ করলাম, হুযুর (সাঃ) খুরমাগুলোর মধ্যে একত্রিত করে সেগুলোর বরকতের জন্যে দোয়া করে দিলেন এবং আমাকে আদেশ করলেন, এগুলোকে তোমার থলের মধ্যে ঢেলে রাখো।এমন বরকত হল যে, আমি অনেক খেজুর আল্লাহর পথে ব্যয় করেছি এবং সর্বদা আমরা তার মধ্য থেকে নিজেরা আহার করতাম এবং অন্যদেরকেও আহার করাতাম। আর এই খুরমার থলে সর্বদা আমার কোমরে বাঁধা থাকত। হযরত উসমান (রাঃ) যে দিন শহীদ হন, সেই দিন আমার কোমর থেকে থলেটি কোথায় যেন পড়ে গেল। এই বরকতপূর্ণ খুরমার থলেটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কাছে প্রায় ত্রিশ বছর ছিল।

হিজরতের সময় কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহ অবরোধ করে রেখেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রিয়নবী (সাঃ) কে হত্যা করে ফেলা। (নাউজুবিল্লাহ) তখন প্রিয়নবী (সাঃ) পবিত্র হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সুরা ইয়াসীনের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি হাতের মাটি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এবং তদাবস্থায়ই গৃহ থেকে বের হয়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেন, কাফেরার তাঁকে দেখতে পেল না। অতঃপর প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর গৃহে পৌছলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

www.pathagar.com

এদিকে কাফেররা রাত জেগে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর গৃহ যথারীতি অবরোধ করে রাখলেন। একটি লোক এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষা করছেন? কাফেররা বলল, আমরা ভোর হওয়ার অপেক্ষায় আছি। ভোর হলেই আমরা মুহাম্মদকে (সাঃ) হত্যা করব। লোকটি বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) তো একটু আগেই তোমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছেন। একথা শুনে কাফেরদের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। তারা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে হযরত আলী (রাঃ) কে দেখতে পেল।

মদীনায় যাওয়ার পথে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মা'বাদ নাম্নী এক মহিলার বাড়িতে যান। এই মহিলার এক পাল ছাগল ছিল। ঘাসের অভাবে ছাগলুগলো নিত্যন্ত দূর্বল ও কৃশ হয়ে পড়েছিল।

স্তন শুকিয়ে একেবারে পেটের চামড়ার সাথে মিশে গিয়েছিল। হুযুর (সাঃ) মহিলার কাছে দুধপান করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে সে ছাগলগুলোর শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করল।

তিনি ছাগলগুলো আনতে বললেন । অতঃপর মহিলার অনুমতি নিয়ে রাহমতুল্লীল আলামীন নিজেই দুধ দোহন করতে লাগলেন। হুজুর (সাঃ) এর পবিত্র বরকতময় হাতের পরশে ছাগলের স্তন যেন দুধের ঝরনা প্রবাহিত হতে লাগল। অতঃপর হুযুর (সাঃ) দুধপান করলেন।

মদীনা গমনের পথে প্রিয়নবী (সাঃ) কে গ্রেফতার করার জন্যে কাফেররা যে সকল লোক নিযুক্ত করেছিল, তাদের একজন ছিল বুরায়দা আসলামী। তার সাথে চুক্তি ছিল। সে প্রিয়নবী (সাঃ) কে গ্রেফতার করে আনতে পারলে তাকে একশ উট পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের লোভে সে স্বগোত্রের ৭০ জন লোককে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযানে বের হয়ে পড়ে। হুযুর (সাঃ) যখন মদীনার নিকটে পৌছেন, তখন বুরায়দা আসলামী দল বলসহ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। হুযুর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি বুরায়দা। এ নামের অর্থ শীতল হওয়া, নিরাপদ হওয়া। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? সে উত্তরে বলল, আসলাম গোত্রের । তখন প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, কল্যাণ ও নিরাপত্তাই বটে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন কোন আসলাম গোত্রের? বুরায়দা বলল বনু সহমের । হুযুর (সাঃ) কে প্রশ্ন করল আপনার পরিচয় কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও রসুলুল্লাহ। এই পবিত্র নাম শুনামাত্র বুরায়দার অন্তর কালিমামুক্ত হয়ে গেল। সে কালবিলম্ব না করে বলে উঠল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবুদুহু ওয়া রাসূলুহু। অতঃপর তাঁর দলের সবাই কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হল, একদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ্ ওয়াসাল্লাম তদীয় কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ঘরে হাজির হয়ে ফাতেমা (রাঃ) সহ ইমাম হাসান, হোসাইন (রাঃ) এর অনাহারের করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর রহমাতুল্লীল আলামীন ইমাম হাসান, হোসাইন (রাঃ) এর জন্য খাবার সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং জনৈক লোকের কূপ থেকে এক বালতি পানি তুলে তিনটি খেজুর পাবেন –এই শর্তে পানি তুলতে লাগলেন। নবম বালতি তোলার সময় রশি ছিঁড়ে বালতিটি কূপের মধ্যে পড়ে গেল। এতে লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র মুখ মন্ডলে চপেটাঘাত করল এবং প্রাপ্ত খেজুর গুলো তাঁকে দিয়ে দিল। মহানবী (সাঃ) কূপ থেকে বালতিটি তুলে লোকটির হাতে দিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন। এদিকে লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার সে হাত ছুরি দ্বারা কেটে ফেলল। অতঃপর লোকটি কর্তিত হাতটি নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মহানবী (সাঃ) তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। তখন লোকটি বলল, হুযুর! আমার কর্তিত হাতখানা ভাল করে দিন। অতঃপর রহমাতুল্লীল আলামীন কর্তিত হাতখানা স্বীয় মোবারক হাতে নিয়ে তার হাতের সাথ লাগিয়ে দিলেন। মহানবী (সাঃ) এর মোবারক হাতের স্পর্শে তার হাত সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল, যেন হাত কাটেনি। এই মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ায় সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি পাত্রে সামান্য পানি ছিল। তিনি তা দিয়ে অজু সমাপন করলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী (সাঃ) এর খেদমতে আরজ করলেন যে, আপনার এই পাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের নিকট পান করার এবং অজু করার কোন পানি নেই। অতঃপর প্রিয়নবী (সাঃ) স্বীয় হাত মোবারক পাত্রের মধ্যে রাখলেন, আর সাথে সাথে প্রিয়নবী (সাঃ) এর পবিত্র আঙ্গুলসমূহ হতে পানি প্রবাহিত হলে লাগল। বর্ণনাকাররী বলেন যে, আমরা সকলে সেই পানি পান করলাম এবং অজুর কাজ সমাধা করলাম। হযরত জাবির (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনারা কত জন লোক ছিলেন? তিনি জবাবে বললেন, এক লাখ হলেও পানি যথেষ্ট হত, কিন্তু আমরা পনর শত লোক ছিলাম।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমি প্রিয়নবী (সাঃ) কে দওয়াত করার জন্য একটা ছাগলছানা জবাই করলাম এবং তিন সেরের বেশি কিছু গমের রুটি তৈরি করে প্রিয়নবী (সাঃ) এর

www.pathagar.com

খদমতে হাজির হয়ে চুপিসারে আরজ করলাম, হুযুর! আপনি কায়েকজন সাহাবীসহ গরীবালয়ে তশরীফ নিয়ে চলুন। হুযুর (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত সকল সাহাবীকে নিয়ে হযরত জাবির (রাঃ) এর বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। এবং হযরত জাবির (রাঃ) কে বললেন, আমার পোঁছার আগ পর্যন্ত উনুন থেকে পাতিল না নাবে না এবং রুটিও তৈরি করবে না। অতঃপর প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত জাবির (রাঃ) এর বাড়িতে তশরীফ নিলেন এবং মুখ থেকে পবিত্র কিছু থু থু নিয়ে আটাতে এবং পাতিলে মিশিয়ে দিলেন এবং বরকরেতর জন্য দোয়া করলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত জাবির (রাঃ) কে আদেশ করলেন যে, রুটি বানাবার জন্য কাউকে ডেকে নাও এবং পাতিল উনুন থেকে নামাবে না। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এক হাজার সাহাবা তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। তারপরও ততটুকু তরকারী ও আটা অবশিষ্ট রইল, যত গুলো প্রথমে ছিল।

প্রিয়নবী (সাঃ) এর পবিত্র আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া এবং মি'রাজের সময় মহাশূন্য পরিভ্রমন করা ছিল তার মহান মু'জিযা। বৃক্ষলতা তার সালাম করত, তাঁর শরীরের ছায়া হত না, শরীরে মশা-মাছি বসত না। এগুলো ছিল তাঁর মু'জিযা। প্রিয়নবী (সাঃ) এর জীবনে যে আরও কত মু'জিযা রয়েছে, তা লিখে শেষ করা যাবে না। আমি আগে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের প্রিয়তম রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরেও মু'জিযা প্রকাশ হয়েছে। তাঁর ওফাতের পর থেকে এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মু'জিযা প্রকাশ হয়েছে। এমন কি তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকবে।

[মাসিক মদীনার সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী হিজরী সনের ইতিহাস

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান

যে ঘটনা জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিচায়ক, জাতীয় ভবিষ্যতের সম্মানিত দিক নির্দেশনা, জাগরণ ও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, সুখ দুঃখের হাজারো ঘটনায় ভরপুর। মুসলিম ইতিহাসের হিজরী সনের সূচনা মুসলিম জাতীয় রূপের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়।

হিজরী সনের হিসাব রাখা মুসলমানদের জন্য ফরজে কেফায়া। তাছাড়া হিজরী সন মনে রাখা যে আমাদের এক গৌরবময় ঐতিহ্য সেটাও আমরা বিলকুল ভুলে গেছি। মুসলমানদের এ জাতীয় বৈশিষ্টটির প্রতি লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, এর মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর তাবৎ জাতীর মধ্যে একটা স্বতন্ত অস্তিত্বের কথা স্বগর্বে ঘোষণা করতে পারি। বস্তুত সন মাস তারিখ এ গুলো মানুষের প্রতি সুশৃংখল জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ্‌র এক অনুগ্রহ। এর মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় ঐতিহ্য বিদ্যমান এবং হিজরী সন আমাদের গৌবরময় ইতিহাসের এক মাইলফলক। সময়ের গণনা যে আলাহ্‌র অপূব নিদর্শন সেটা আল্লাহ নিজেই কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন "তিনিই সুর্যকে উজ্জ্বল ও চন্দ্রকে দীপ্তমান করেছেন এবং তাদের জন্য এমন সব মঞ্জিল নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বছর ও তারিখ সমূহ জেনে নিতে পার। উদ্দেশ্য ব্যতিত আল্লাহ্‌ এগুলো সৃষ্টি করেননি। তিনি তার নিদর্শন সমূহ এমন সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন যা জ্ঞানবানরা পরিস্কার বুঝতে পারে।" (সূরা ইউনুস-৫) আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেছেন "আসলে আল্লাহ্‌ তায়ালা যখন থেকে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই মাসগুলোর সংখ্যা বার। (সূরা তওবাঃ ৩৬)

হিজরী সনকে ইসলামী সনও বলা হয়। এ ব্যবস্থা কখন থেকে চালু হয় এ প্রশ্ন অনেকের। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর মদীনায় হিজরতের স্মরণে বিশ্বমুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে একটি পৃথক সন গণনা করেন সেটাই এক কথায় হিজরী সন। হিজরতের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকরা সঠিক মতে পৌছতে পারেননি। কেউ নবীজির (সঃ) মক্কা বহির্গমনের দিবসকে, কেউ বা পল্লীতে পৌছার দিন, আবার কেউ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর গৃহে গমনের দিন থেকে হিজরতের তারিখ গণনাশুরু করেন। তবে ৬২২ খৃষ্টাব্দে যে হিজরত হয়েছিল এ ব্যাপারে সবাই একমত।

প্রাক-ইসলামী যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়গুলোতে নানারকম বর্ষবরণ ও পর্ব অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রথা ছিল। রোমী দিবস, ইরানী দিবস, জন্মবার্ষিকী, ইত্যাদি আরব্য যাযাবর জীবনে কোন সুনির্দিষ্ট জীবন প্রণালী না থাকায় তাদের বর্ষবরণ ও

www.pathagar.com

গণনা করা হাতো। যে যেমন পদ্ধতিতে। বহুদিন যাবত আমুল ফিলকে কেন্দ্র করে দিন তারিখের হিসাব রাখা হতো যা ছিল সেই সময়কার ঘটনা পঞ্জিতে বিরল ও ঐতিহাসিক ঘটনা। বাদশা আবরাহা বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে কাবাগৃহ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মক্কা আক্রমণ করলে আল্লাহ্ তায়ালা আবাবিল নামক ছোট ছোট পাখির দ্বারা কাকর নিক্ষেপ করে এদের শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন । এই বিরল আশ্চর্য জনক ঘটনাটি ছিল আরব্য যাযাবরদের যাবতীয় দিন ক্ষণ ও ইতিহাস রক্ষার উৎস। "হরবুল ফুজ্জার"ও ছিলো এমন একটি স্মরণীয় ঘটনা। মানুষের বয়স নির্ধারণে বলা হতো যে "হরবুল ফুজ্জার"এর এত বছর পরে বা পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছে। প্রাক-ইসলামী বর্ষ গণনা ব্যবস্থাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। পরিবর্তন শুধু এতটুকু হলো যে, ইসলাম-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ন ঘটনাবলী প্রাক-ইসলামী আচার অনুষ্ঠানের জায়গায় স্থান করে নিয়েছিল। যেমন -কুরাইশ কাফের শক্তির মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়াটাই ছিল মুসলমানদের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিছু দিন যুদ্ধের নির্দেশ প্রাপ্তির দিনটিকে কেন্দ্র করে দিনপঞ্জি হিসাব রাখার রীতি চালু ছিল। এজন্য এ বছরটিকে "অনুমতি প্রাপ্তির বছর" হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। খাজা আবু তালিবের মৃত্যু ও হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) এর ইন্তিকালে হুজুর (সাঃ) অত্যন্ত ও শোকাহত হয়েছিলেন। তাই এই বছরটিকে "আমুল হুজন" দুঃখের বছর হিসেবে স্মরণ করা হয়।

সুরা বারায়াত অবর্তীণ হওয়ার পর মুসলমানদের পৃথক পরিচিতি, আখেরাতে মুক্ত পয়গামও উচ্চ মর্যাদা শুধু মসলমানদের জন্য ইত্যাদি জানিয়ে দেয়ার জন্য রাসুল (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে হজ্জের মৌসুমে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন , যার ফলে এ বছরকে বলা হতো "সনে বরায়াত"। বিদায় হজ্বও ছিল তেমনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যার পর এই বছরটির নাম হয়েছিল "হুজ্জাতুল বিদা বা বিদায়ী হজ্বের বছর"। সেই বিশ্ব নবী (সাঃ) এর নবুয়ত ও হিজরতের মদীনা গুরুত্ববহ ও অবিস্মরনীয় হওয়ার দরুন এই দুটোকে ভিত্তি করে দিনপঞ্জি হিসাবের প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় যেমন-অমুক ব্যক্তি নবুয়ত প্রাপ্তির এত দিন আগে জন্ম বা মৃত্যুবরণ করেছে অথবা অমুকের হিজরতের এতো বছর আগে বা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে ইত্যাদি। একথা বলা যায়, মহানবী (সাঃ) এর হিজরতের পর পরই ছিল হিজরী সন চালুর বছর। অথচ ইয়াহুদীরা তাদের নবীর আগমনের ৫০০ বছর পর ঈসাই সন চালু করে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ইয়েমেনের গভর্নর সর্বপ্রথম হিজরী তারিখ ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখিত আছে। তবে সরকারীভাবে রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের ৬ বছর পর হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর খেলাফতকালে এ সন চালু হয়। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ও ভাষা এবং সংখ্যা বিজ্ঞানী হযরত আবু রায়হান আল বিরুনী

www.pathagar.com

(৩২৬-৪৪০) বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত সাহাবী আবু মুসা আসয়ারী (রাঃ) ইরাকের গভর্নর ছিলেন। সে সময় তিনি খলিফার নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, "আমিরুল মোমেনীন, আমাদের কাছে আপনার থেকে এমন একটি পত্র এসেছে যাতে তারিখ উল্লেখ নেই"। মাওলানা শিবলী নোমানী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট হিজরী ষোল সনে কিছু দলিল পেশ করা হয়। যাতে সাবান মাসের উল্লেখ ছিল।

এটা দেখে খলীফা বলেছিলেন, এ শাবান মাস চলতি না গত বছরের এটা কি করে বুঝব? এভাবেই বিষয়টি একটি জটিল আকার ধারণ করে। ফলে খলীফা মজলিসে শূরার বৈঠক ডাকেন। এখানে প্রখ্যাত সাহাবীগণসহ প্রাক্তন খুজিস্তানের অধিপতি ও বিজ্ঞানী নও মুসলিম হরমুজানও উপস্থিত ছিলেন। মজলিসে যার যার মতামত ব্যক্ত করলেন। যেই প্রেক্ষিতে হরমুজান বছর মাস ও দিন গণনার একটি নীতিমালা প্রস্তাব করেন যা সকলেরই মনপূত হয়। তবে সমস্যা দেখা দিল প্রস্তাবিত সন কোন সময় থেকে শুরু করা যাবে এ ব্যপারেও বিভিন্ন মত বিনিময় চলল। অবশেষে খলীফা সব মতামত খন্ডন করে বললেন যদি হুযুর (সঃ) এর জম্ম থেকে জম্ম সন গণনা করা হয় তাহলে তা হবে নাসারাদের অনুসরণ। আর যদি ওফাতের সময়কাল থেকে শুরু হয় তবে তা হবে শোকাবহ ও মর্মবিদারক। আর হুজুর (সাঃ)-এর জন্ম থেকে সন গণনার উচিত সময় নয়। এ সময় শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হিজরতের পরই মহানবী (সঃ) পরম ও চরম সফলকাম হয়েছেন। অতএব সকলেই হিজরতের হিজরী সাল গননার প্রথম বছর বলে সমর্থন করেন। কারন এ সময়ের মধ্যে মহানবী (সঃ) মুষ্টিমেয় আত্মোৎসর্গীত বাহিনী নিয়ে ৩৩ টি সামরিক অভিযান, ১৭টি যুদ্ধ , ১০৪টি দস্যু হামলা প্রতিরোধ, ৮১টি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাত; ৫১৩ এরও বেশী বড় মজলিসে ভাষণ প্রদান এবং ৬ শতের বেশী পত্র লিখেন। ২৭৬ টি স্বাধীন রাজ্যকে একত্রিক করে আট লক্ষাধিক বর্গমাইল এলাকার এক আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। এ সময় ইতিহাসের অর্ধপতিত অসভ্য মানবজাতিকে তিনি টেনে তুলে বিশ্বজগতের আধুনিক সভ্যতার শিক্ষক ও স্থপতি রূপে তৈরী করেন। সমগ্র বিশ্ব বাজারে প্রজ্জ্বলিত হলো দীপ্ত মশাল। হিজরতের পর দশ বছরেই তিনি মানুষকে এ কল্যাণময় সুন্দর বিশ্ব উপহার দিলেন। অথচ অতীত বা সাম্প্রতিককালে সে বিশ্ব ছিল সকল দিক থেকেই মহা দুর্বিপাকগ্রস্থ। তাই তার এ সকল মহান কর্মধারাকে অবিস্মরণীয় রাখার জন্যই সরাকারীভাবে হিজরী সন অনুমোদিত হলো।

[সীরাত স্মারক '৯৮ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দর্শন

ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত

এই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট জনপদে যার যার কওমের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবী সরওয়ারে কায়েনাত, সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামান্নাবেয়্যীন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে। সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য সকল সৃষ্টি কূলের কল্যাণের জন্য এবং সর্বকালের জন্য।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

-অর্থাৎ আমি তো আপনাকে সমস্ত বিশ্বের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

– নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। এই আয়াতগুলো অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সমস্ত বিশ্বের রহমত এবং বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন বলেই বিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে সৃষ্টি না করলে, অন্য কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

তিনি যে আল্লাহ তায়ালার কত বড় পিয়ারা বান্দা ছিলেন, তা তাঁকে প্রদত্ত উপাধি "হাবীবুল্লাহ" নাম থেকেই বোঝা যায়। তিনি ছিলেন 'রাসুলুল্লাহ' এবং 'হাবীবুল্লাহ'। বিভিন্ন পয়গম্বরের নামে বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন-আদম সফিউল্লাহ্, নূহ্ নবীউল্লাহ, ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, ইসমাইল জবিউল্লাহ, মুসা কলিমুল্লাহ, ঈসা রুহুল্লাহ্ কিন্তু একমাত্র হয্রত মুহাম্মদকে (সাঃ) বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ্ ও হাবীবুল্লাহ্ এবং আমাদের কালেমাই হচ্ছে, লা-ইলাইহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদোর রাসুলুল্লাহ।

দর্শন ঃ নবী করীমের আলাদা কোন দর্শন ছিল না, ইসলামী দর্শনই ছিল তাঁর দর্শন। একবার এক সাহাবী উম্মাহাতুল মোমেনীন বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুরে করীমের সিফাত সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলুন। উত্তরে বিবি আয়েশা বলেছিলেন "কেন, আপনি কি কুরআন পাঠ করেন না? পবিত্র কুরআনেই

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে সব কিছু লেখা আছে"। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনেই হচ্ছে ইসলামী দর্শন ও ইসলামী দর্শনই হচ্ছে নবী করীমের দর্শন। মহাকবি ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক, জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জর্জ বার্নার্ড'শ এঁদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দর্শন রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর দর্শন রয়েছে একটাই এবং সেটা হচ্ছে ইসলামী দর্শন যার সহীহ এবং পূর্ণ বিবরণ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। এর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী স্থাপন করা, আর সেটা শুধু মুখে না বলে সমস্ত কাজ কর্ম ও বিয়ে-শাদীর ভিতর দিয়ে প্রমাণ করা এবং নিরীহ, গরীব, দুঃস্থ, অসহায়, এতিমদের সাহায্য করা এবং সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি দমন করে ইন্‌সাফ কায়েম করা-এগুলোই হচ্ছে ইসলামী দর্শন এবং এগুলোই হচ্ছে নবী করীমের দর্শন। এসব কথা তিনি শুধু মুখেই বলেননি, বরং প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়ে নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন।

তাঁর দর্শনের ৩টি বিশেষ দিক ছিল-হক্কুল্লাহ,হক্কুল ইবাদ ও রবুবিয়াত। ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, তস্‌বীহ্‌-তাহলীল ইত্যাদি হচ্ছে হক্কুল্লাহ্‌। আর বান্দার হক আদায় করা, যেমন প্রতিবেশীদের দিকে খেয়াল করা, দুঃস্থ-অসহায়-এতিমদের সাহায্য করা, স্বামী-স্ত্রীর হক আদায় করা, পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যার হক আদায় করা,এমন কি গৃহপালিত পশু পাখীর দিক খেয়াল রাখা-এসবই হচ্ছে হক্কুল ইবাদ্‌। হক্কুল্লাহর বরখেলাপ হলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন কিন্তু হক্কুল ইবাদের বরখেলাপ হলে, ঐ বান্দার কাছ থেকেই মাফ নিতে হবে। আল্লাহ্‌ সেটা মাফ করবেন না। মাওলানা ভাসানী এ ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর শ্লোগান ছিলঃ-"কেউ খাবে, আর কেউ খাবে না, তা হবে না।"

রবুবিয়াত সম্বন্ধে মওলানা ভাসানী বল্‌তেন,আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে রবুবিয়াত বা হুকুমতে রব্বানিয়া, অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহর, আমার কিছুই নয়, এসবই হচ্ছে ইসলামের কথা এবং এ গুলোই হচ্ছে ইসলামী দর্শন।

নবী করীমের দর্শনে দাস-দাসী ও প্রভুদের মধ্যে, কালো ও ধলোর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি নিজের দাস জায়েদকে বিনাপণে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাকে আরো আপন করার জন্য, নিজের ফুপাত বোন জয়নবের সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। হাবশী বেলালকে তিনি যোগ্য মর্যাদা দিয়ে মস্‌জিদের মোয়াজ্জিন করেছিলেন, কোন এক যুদ্ধে তিনি কোন লোক আরব কি অনারাব, কালো কি ধলো সে দিকে মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেননি, বরং তিনি তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে সুস্পষ্ট বলেছেন, "কোন আরবের

www.pathagar.com

উপর কোন, ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন আরবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোন কালোর উপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোন সাদার উপর কোন কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাক্‌ওয়া"। বিচার-আচারের ব্যাপারে তিনি এতটা কঠোর ও নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁর দরবার মুসলিম-অমুসলিম কোন ভেদাভেদ ছিল না। একবার এক অমুসলিম তাঁর দরবারে বিচার চেয়ে এক বিখ্যাত মুসলিমের বিরুদ্ধে জিতে যায়। ন্যায় বিচারের খাতিরেই হুজুরে করীম ঐ অমুসলিমের পক্ষে রায়টি দিয়েছিলেন। কিন্তু রায় পেয়ে ঐ অমুসলিম এতোটা খুশি হয়ে যায় যে, সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন।

৬২২ খৃষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর সেখানে তিনি একটি আদর্শ, কল্যাণমুখী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং এই নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান, খৃস্টান ও ইহুদীর মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং প্রথম হিজরীতেই সকল ধর্মের,সকল গোত্রের সবাইকে একত্রিত করে সম-অধিকার দিয়ে,সর্বসম্মতিক্রমে যে চুক্তিটি সম্পাদন করেন, তাই "মদীনার সনদ" নামে পরিচিত এবং এই সনদই হচ্ছে সারা বিশ্বের প্রথম লিখিত 'ম্যাগ্‌নাকার্টা। এর বহু বছর পর, ১২১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে 'ম্যাগনাকার্টা' লন্ডনে স্বাক্ষরিত হয়,তা ছিল মদীনা সনদের অনুরূপ। সারা বিশ্ব এই ম্যাগনাকার্টার কথা জানে, কিন্তু মদীনার সনদ যে এর চাইতেও উন্নত এবং বহু বছর আগে সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় স্বাক্ষরিত এই কথাটি অনেকেই জানেন না। বর্তমান জগতে এসব কথা প্রচারের প্রয়েজনীয়তাও গুরুত্ব রয়েছে অনেক।

আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই আমি এ ব্যাপারটি ইতি টানছি এবং সেটি হচ্ছে "হুদায়বিয়ার সন্ধি"। এই সন্ধিটি ষষ্ঠ হিজরীতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং সাহাবাগণের নিকট এটা এত অপমানের মনে হয়েছিল যে, কেউ এটি সহজভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। কেননা এতে আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্‌র "রাসুলুল্লাহ্" শব্দটিই কেটে দিতে হয়েছিল, যা কাটতে কেউ রাজী ছিলেন না। শেষে নবীজী নিজের হাতে শব্দটি কেটে দেন এবং সন্ধিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির প্রতি নবীজী এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এই জন্যে যে, শুধু তিনিই তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এই সন্ধিই হবে মুসলামানদের জন্য কল্যাণের সন্ধি। এই সন্ধিই হবে মুসলমানদের বিজয় সন্ধি। সত্যিকারেই এই সন্ধি স্থাপনের দু'বছরের মধ্যে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

[সীরাত স্মারক '৯৬-এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ)-এর জীবন ও তাঁর হাদীস চর্চা

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন

তাঁর নাম নু'মান ইবনে সাবিত। উপনাম আবু হানিফায় তিনি অধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। তিনি ৮১ হিজরী মোতাবেক ৭০০ সনে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত করেই তার মাজহাব হানাফী মাজহাবকে হানাফী মাজহাব হিসাবে নামকরণ করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক গণ বলেন, তিনি কাবুল বংশদ্ভুত ছিলেন। কারণ তাঁর পিতামহ কাবুলে বন্দী হয়ে দাসরূপে বসবাস করেন। পরে তিনি মাওলা বা আশ্রিতরূপে তায়াম-আল্লাহ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত হন। কারও মতে তিনি পারস্যের রাজকীয় বংশদ্ভুত ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি উদার দানশীল ও মহৎ প্রানের অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। আল্লামা আলা নাওয়াবী লিখেছেন-হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পিতা ছাবিত ও তাঁর বংশদরদের জন্য দু'আ করেছিলেন-এত মনে হয় তিনি আলী (রাঃ) এর বংশের সাথে কোন ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে অনেকে তাঁকে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত দেখান। তিনি সত্যিকারার্থে একজন জ্ঞান সাধক ছিলেন। এতে কারও দ্বিমত নেই।

আবু হানিফা (রাঃ) সমগ্র জীবন ফিকহ চর্চায় অতিবাহিত করেন। তিনি কুরআন হাদীস আকাঈদ বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর ফিকহী প্রামান্য বিষয়াবলী পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি কুরআন ও হাদীসকে ফিকহী মাসআলার দলীল হিসাবে পেশ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন।

তিনি স্বাধীনচেতা, জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি ইলমে দ্বীনের যেমনি চর্চা করতেন, তেমনি প্রতিটি কুরআনের আয়াত ও হাদীসকে বিশ্লেষণ করে আলিল, ফাজিল, জাহিদ, আবিদ, ফাকীহ হিসাবে পূর্ণতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত আপোষহীন ছিলেন। জানা যায়,কুফায় তৎকালীন কাযীপদবী গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা আল মানুসর এতে রাগান্বিত হয়ে তাকে জেলে পাঠান। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জেলেই অবস্থান করেন। তিনি পৃথিবীর সফল ঝোঁক, প্রবনতা, লোভ-লালসা পরিহার করে আপোষকামীতাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন বলে জেলেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর হাদীসের উপর মুসনাদে আবু হানীফা নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া তাঁর ছাত্রগণ তাঁর আলোচনা দ্বারা অনেক হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। ফিকহের উপরও অনেক কিতাব আছে।

www.pathagar.com

তিনি সাবলম্বী জীবন যাপন করতেন। পরমুখাপেক্ষী হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি জীবিকা হিসাবে ব্যবসাকে বেঁচে নেন। সত্যিকারর্থে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্ণ অনুসরণের চেষ্টা চালান। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) ইলমে হাদীস চর্চা ঃ

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) তাবেয়ী ছিলেন, না তাবে তাবেয়নীর ছিলেন, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা য়ায়। এর কারণ হিসেবে অনেকে উল্লেখ করতে চান যে, তিনি কোন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ননা করেননি। অবশ্য তাদের এসব কথার তথ্য ও যুক্তি খঁজে পাওয়া যায়না। যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষনের কষ্টি পাথরে যদি যাচাই করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তিনি ছোট বেলায় হলেও সাহাবাগণের যুগকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্লেষণ ধর্মী কতিপয় ওলামায়ে কেরাম দাবী করেছেন যে, ইমাম আবু হানফিা (রাঃ) কিছু সাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন।

প্রথমতঃ আমরা তাঁর জন্ম সন নিয়ে এবং সাহাবাদের যুগ-কালকে হিসাব যদি করে দেখি, তাহলে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যাবে যে, তিনি সাহাবাগণের দর্শন পেয়েছেন কিনা। তিনি ৮০ হিজরী সনে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। আর হযরত (সাঃ) এর গুরুত্ব পূর্ণ সাহাবীগণের কেউ কেউ তখনও জীবিত ছিলেন। যেমন আবদুল্লা ইবনে আবু আউফা ৮৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। আল ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে দেখেছেন। কেননা আনাস ইবনে মালেক ৯১ হিজরী সনে বসরায় ইন্তেকাল করেন। আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, তিনি সাহাবাদের এক জামাতকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) মোট ৮ জন সাহাবীর সন্ধান পেয়েছেন। এরমধ্যে সহল ইবনে সায়াদ, আনাস ইবনে মালেক, এবং আবু তোফাইল (রাঃ) বিশেষ ভাবে উল্লেখ। আল্লামা আলা উদ্দিন দররুল মুখতারে লিখেছেন যে, তিনি ২০ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। বিভিন্ন মতামতকে সমন্বয় সাধন করে আল্লামা আনওয়ায় শাহ কাশমিরী (রাঃ) বলেন-সাক্ষাত লাভের দিক থেকে তাবেয়ী, হাদীস বর্ণনার দিক থেকে তিনি তাবে–তাবেয়ীন ছিলেন। মুনীরাতুল মানার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা সাত জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন লিখেছেন, সকল তথ্য প্রমান বিশ্লেষনে বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা একজন তাবেয়ী ছিলেন।

হাদীস শিক্ষায় আবু হানীফা (রাঃ) ঃ

ইমাম আবু হানীফা প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিক্ষা শেষ করার পর যখনি হাদীস শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হন, তখন সমগ্র মুসলিম জাহান হাদীস চর্চায় মুখরিত ছিল। মুসলিম জাহানের প্রত্যেকটি জনপদে হাদীসের বড় বড় দরবার কায়েম হয়ে গিয়েছিল। হাদীস শিক্ষাবিদের সংখ্যা তখন লক্ষ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) প্রথমে কুফা নগরে বড় বড় তাবেয়ী হাদীস বিদগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। কুফা নগরে তিনি ৯৩ জন মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম তাহাবীর (রাঃ) মতে, ইমাম আবু হানীফার কুফা নগরে ওস্তাদ ছিলেন ২৯ জন। যেসব তাবেয়ীগণের নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা করেন, তারা হলেন ইমাম শাবী, সালম ইবনে মুররা, মনসুর ইবনে মামার, আমাশ, ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ, আদী ইবনে মারসাদ প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি কুফা হাদীসের দারস নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন– তা নয়, বরং তিনি বসরা নগরীতে হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষায় গমন করেন। এখানে তিনি হাসান বসরী, শুবা, কাতাদাহ প্রমুখ বড় বড় তাবেয়ী মুহাদ্দিগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। একইভাবে তিনি মক্কা মদীনায়ও গমন করেন। মক্কায় আতা ইবনে আবু রিবাহর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। মদীনায় ইমাম বাকের (রাঃ)-এর নিকট তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষালাভ করেন। ইমাম আবু হানীফা যত মজলিসে হাদীস শুনেছেন এবং দারস নিয়েছেন সবগুলো থেকেই 'হাফেজ হাদীস' নামে প্রশংসা প্রাপ্ত হন। ফলে অনায়াসেই তিনি মুসলিম উম্মতের মধ্যে আল্লাহর কিতাব, নবীর (সাঃ) সুন্নত কঠোরভাবে অনুশীলনের চেষ্টা করতেন। হাফেজ আবু নায়ীম (রঃ) লিখেছেন, তাঁর হাদীসের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি যত্নশীল ও দ্বীনদারীত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ঘরে জমাকৃত হাদীসের কিতাব দেখে জনৈক ইমাম জিজ্ঞসা করলেন এগুলো কি? তিনি বলেছেন এসবই হাদীসের বড় বড় কিতাব। তিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের অন্যতম ছিলেন। এরপর তিনি হাদীস সংগ্রহ করার চেষ্টায় কোন ক্রটি করেননি। আঃ আজীজ (রঃ) বলেন, কোন একজন মুহাদ্দিসের নিকট তিনি তাঁর ছাত্র ছাত্রীদেরকে এরূপ বলে পাঠালেন যে, তোমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখ এমন হাদীস পাওয়া যায় কিনা যা আমাদের নিকট নেই। অর্থাৎ এই আবদুল আজীজ (রাঃ) তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাকে হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁর কোন উস্তাদের কাছে যেতে বলেছিলেন। এতে বুঝা যায় তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন।

হাদীস গ্রহণে তিনি কতিপয় শর্ত আরোপ করতেন ঃ (১) কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি ভুলে গেলে তা গ্রহন করতেন না। (২) প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাদীস গ্রহন করতেন। (৩) বর্ণনাকারীর কাছে লিখিত আছে কিন্তু তাঁর মুখস্ত নেই তাও তিনি গ্রহন করতেন না। এভাবে আরও অন্যান্য শর্তারোপে বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহে অবদান রেখেছিলেন।

তিনি নিজে বলেছেন, আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাবকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করি। যখন তাতে সংশিষ্ট বিষয়ে ফয়সালা পাই তখন সেই অনুসারেই রায় দেই। তাতে যদি না পাই, তবে অতঃপর রাসূলের সুন্নত ও বিশুদ্ধ কার্যবিবরনী যা নির্ভরযোগ্য লোকদের

www.pathagar.com

মারফত প্রচারিত হয়েছে- গ্রহণ করি। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাতেও যদি তা না পাই, তবে তখন আমার নীতি এই হয় যে, সাহাবীগণের কারও কথা গ্রহণ করি। কারও কথা ছেড়ে দেই। তিনি কিয়াস যদি জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হতো তখন হাদীসকেই গ্রহণ করতেন। ইমাম মালেক (রাঃ) বলেছেন, যদি তাকে একখন্ড কাঠকে স্বর্ণে পরিণত করতে বলা হয়, তবে তিনি যুক্তি দ্বারা তাকে স্বর্ণে পরিনত করার মত জ্ঞান রাখেন।

একটি বিভ্রান্তির অপনোদন ঃ

কিছু কিছু লোক থেকে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) সম্পর্কে নানা উদ্ভট কথা বলে থাকেন। এসব কথার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- তিনি হাদীসকে উপেক্ষা করে মাসআলা নির্গত করেছেন। আসলে উপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট যে, তিনি হাদীসকে উপক্ষো করে মাসআলা নির্গত করেননি। তার গৃহিত মাসআলা ইজমা-কিয়াস কুরআন ও হাদীস দ্বারাই প্রবর্তিত। মনগড়া কোন ব্যাপার নয়। ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণতায় একটি সম্পূরক পন্থা হিসেবে এটা উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সংক্ষেপে এভাবে বলতে চাই যে, ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ) ইলমের জগতে যে অবদান রেখে গেছেন, তা পৃথিবীবাসী কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করবে। পৃথিবী জুড়ে তার সর্ববৃহৎ সংখ্যক, অনুসারী তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করেছেন। তার অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত লাভে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আল্লাহ্ তাওফিক দান করুন।

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহ্’র ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব

মূল ঃ অধ্যাপক ইউসুফ আমীন (আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক সিরাজুল হক

মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তার পর্যাচলোচনা করলে এটাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, শুধু মামুলী বা সাধারন মানের পত্র-পত্রিকায়ই ঐক্যের ব্যাপারে অধিকাংশ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে এসেছে। বুদ্ধি বৃত্তিক বা জ্ঞানগর্ভ পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখালেখি খুব কমই হয়ে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, উম্মাহ্র ঐক্যের বিষয়টিকে শুধু কর্থাবার্তা ও বক্তৃতা-ভাষণেই অধিকন্তু সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। একে একটি জ্ঞানগর্ভ বিষয় হিসাবে উপস্থিাপিত করা হয়নি। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ নবীর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ্ আল কুরআনে যে বিষয়টিকে অতীব স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন তা শুধু বক্তৃতার বিষয়ই হতে পারে না, বরং এ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই ঃ উম্মাহ্র জন্য ঐক্য কেন? এ বিষয়টি আমাদের জানতে হবে। এর জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তায়লার সে গুণ ও বৈশিষ্ট যা তাঁর মহাত্ম ও মহত্ত্বকেই ফুটিয়ে তোলে। তাঁর অনুপম সৃষ্টিলোকের এই স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করলে বিদ্রোহও করতে পারে। শুধু তাই নয়, সে ইচ্ছে করলে প্রকৃতির দাবীগুলোকেও এড়িয়ে যেতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যেসব বিধি-বিধান ও পথের দিশা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে এবং তাঁর প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে।

ঐক্য ও সংহতি যা সৃষ্টিলোকের স্বাভাবিক ধর্ম, যা সৃষ্টিকর্তার পূর্ণত্বরই বহিঃপ্রকাশ এবং যার প্রতিফলন ঘটেছে সমগ্র সৃষ্টি জগতে-এ মানব জাতির উপর এ দায়িত্বই অর্পণ করে যে, মানুষ যেন আল্লাহর এই প্রাকৃতিক বিধানকে নিজের জীবনে কার্যকরী করে।

আল্লাহর পরিচিতি বা তাঁকে জানার মূলনীতি, মানুষের আত্মশুদ্ধি ও তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা বিধান এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা-তথা উন্নতি ও কৃতকার্যকতার এসব দিক-সব কিছুই বনি আদমের ঐক্য ও সংহতির উপর সীমাবদ্ধ। এ ব্যতীত যেমন আল্লাহ্র পরিচিতি জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে না, তেমনি যে,পর্যন্ত বনি আদমের মধ্যকার ঐক্য তথা মানবীয় ঐক্যের উপদানগুলোকে পূরণ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বনি আদমের মধ্যকার ঐক্য তথা মানবীয় ঐক্যের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে।

www.pathagar.com

এর আরেকটি দিকও রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের অনুসারীদের উপর এ দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে যে, তারা যেন সত্য ও ন্যায়কে শুধু তাদের জীবন রূপায়ণ করার মধ্যেই যথেষ্ট মনে না করে, বরং তো সমগ্র বিশ্বই সত্যকে বিজয়ী করার জন্য দায়িত্বশীল। আর সত্যের বিজয়ের জন্য যে দায়িত্ব ইসলামের অনুসারীদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে তার সূচনা তো মুসলমানদেরকে তাদের জীবনের প্রথমই করতে হবে। এর পরেই হতে পারে এ ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণদির মাধ্যমে প্রচার ও অপরাপর মানুষকে এ পথে আহ্বানের কাজ। কিন্তু তার পরে হয়েতো দেখা যাবে যে, কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা এবং অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও বার বার সত্যের বিরোধিতা করেই যাচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয়তো ইসলামের অনুসারীদেরকে প্রয়োজনে শক্তিও প্রয়োগ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের সূরা আসরে বলা হয়েছে, যার অর্থ "পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়া"। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ আয়াতে এ মর্মার্থও রয়েছে যে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে শক্তিও প্রয়োগ করতে হতে পারে। আর এ কাম্য শক্তি চাই, তা রাজনৈতিক শক্তিই হোক অথবা পার্থিব তথা যে কোন ধরনের শক্তি-তার উৎস হচ্ছে এই ঐক্য। এ পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সকল নবী-রাসুল ও ইসলামের অনুসারীদের উপর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

নিশ্চয় আমি আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে।" (সুরা হাদীদ ঃ ২৫)

আর এরূপ করা হলেই মানুষ ইনসাফ ও শান্তির সুশীতল ছায়াতলে জীবন যাপন করতে পারবে। সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা এবং তা বহাল রাখা একটি বিশাল মানবীয় দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হলে অনেক শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। এ শক্তি তো উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতির মধ্যেই নিহিত। উম্মাহ্র ঐক্যের প্রয়োজন কেন, সে কথার জবাব আমাদের এ আলোচনার মধ্যেই রয়েছে।

উম্মাহ্র ঐক্যের অনেক দিক ও বিভাগ রয়েছে। তবে এখানে সংক্ষেপে তার কতিপয় দিক মাত্র তুলে ধরা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, উম্মাহ্র ঐক্য বলতে কি আমরা কি জিনিসকে বুঝিয়ে থাকি? উম্মাহ্র ঐক্য বলতে কোন্ সব বিষয়কে বোঝানো হয়ে থাকে? উম্মাহর ঐক্য বলতে কি আমরা শুধু এটাই বুঝবো, আমরা শুধু আমাদের সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবো? অথবা শুধু বাতিলপন্থীদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যারা এ পৃথিবীতে বাতিলের সম্প্রসারণ করছে, সে সব শক্তির বিরুদ্ধে আমরা একাত্র হয়ে যাবো? অথবা আমাদের মধ্যে যে দলীয়, উপদলীয়, ধর্মীয় ও অন্যবিধ মতদ্বৈততা রয়েছে, সে বিষয়গুলো আলোকপাত করেছি, সে আলোকে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, উম্মাহ্র ঐক্যের ক্ষেত্রে এটা কোন নেতিবাচক দিক নয়। শুধু দুশমনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেই উম্মাহ্র ঐক্যের ধারণা পূর্ণ হয়ে যায় না।

উম্মাহর ঐক্যের আরেকটি দিক অর্থাৎ ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, মহান লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্য, সত্যের বিজয়ের জন্য, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজে আধ্যাত্মিক ও পবিত্র পরিমন্ডলসৃষ্টির জন্য, ঐক্যেবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য ইসলাম তাগিদ করে থাকে । উম্মাহর ঐক্যের একটি দাবী হচ্ছে এই যে, সব লোক কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' গ্রহণ করতে পারেনি, মনে করতে হবে যে, তারা কখনো মানবতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে পারেনি. মানবতার ক্ষেত্রে তারা জয়ীও হতে পারেনি । কেননা পূর্ণাঙ্গ মানবতার বুনিয়াদ তো এরই উপর প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং এ ধরনের লোকদের সঙ্গে ঐক্য তো দূরের কথা, বন্ধুত্বও করা যায় না।

• আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ "হে মুমিনগণ! ইয়াহদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচলিত করেন না।" (সূরা মায়দাঃ ৫১)

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, অর্থাৎ উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে নেতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, যারা এই লা--এর গণ্ডিবহির্ভূত, আমরা তাদের কে গ্রহণ করতে পারি না। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারেনা। কিন্তু উম্মাহর ঐক্যের একটি বড় দিক তথা মানবগোষ্ঠীর এই বৃহৎ অংশটি যারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেনি, তাদেরকে আমরা কি উপেক্ষা করবো? না, তা কখনো হতে পারে না। আমরা ইতিপূর্বে সূরা হাদীদের যে আয়াতটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছি সেখানে এ কথাটি রয়েছে যে, যাতে করে সমগ্র মানব জাতি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্টিত থাকে । সুতরাং উম্মাহর ঐক্য মানে বনি আদমের ঐক্য অথবা মানবতার ঐক্যের পরিপন্থী কোন জিনিস নয়, মানবতার ঐক্যের ব্যাপারে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ও নয়। মানবীয় ঐক্য যতটুকু সম্ভব রক্ষা করে চলতে হবে। আর সেটা রক্ষা করাও যুগের দাবী। তবে বিশ্বের সমগ্র মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য উম্মাহর মধ্যে সর্বাগ্রে ঐক্য গড়ে তোলাকেই মূল ও প্রতিপাদ্য বিষয় বলে মনে করতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসায় বলেছেনঃ "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকরে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু জন হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসাঃ১)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই উম্মাহর মধ্যে কিভাবে ঐক্য গড়ে তোলা যেতে পারে? এর সঠিক উত্তর হচ্ছে এই যে, ইসলামের সাথে আমাদের সম্পকের্র দৃঢ়তার উপরই উম্মাহর ঐক্য নির্ভরশীল। যে কালেমা বা বাণী আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, তা হচ্ছে'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র এই বাণী । উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, সাধারণ ও মৌলিক জবাব।

ইসলামের ব্যাপারে আমাদের জানা শোনা যত ব্যাপক হবে, বিশ্বাস ও আমল যত ব্যাপক হবে, ঐক্যও সেভাবেই সংহত হতে থাকবে। আর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আমলকে পরিহার করে উম্মাহর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার পরীক্ষা নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। ইসলাম ও কুরআনকে বাদ দিয়ে মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না- এ মৌলিক ও সত্য বিষয়টি আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামের ব্যাপারে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকতে হবে। কারণ এর উপরই ঐক্য নির্ভরশীল।

ইসলামের ব্যাপারে আমদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া ইসলামের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং সে মোতাবেক আমলও করতে হবে। এটা এমনই একটি জিনিস যা উম্মাহ্‌র ঐক্যের ভিত্তি। সুতরাং বলা যায়, কোন ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী অথবা এমন কোন ব্যবস্থা অথবা এমন কোন কৌশলগত অবস্থান যা ধর্মীয় ময়দানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত তথা আল্লাহ্‌কেন্দ্রিক নয়-এ ধরনের কৌশলগত কর্মপন্থা উম্মাহ্‌র মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে কখনো সফল হবে না।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি বড় দিক হচ্ছে এর স্থায়িত্ব দান অর্থাৎ এমনি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য আমাদের নিকট ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনাবলী রয়েছে। যেমন হজ্বের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য অন্যতম।

কিন্তু বর্তমানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হজ্বকে কি নবী করিম (সাঃ)-এর আদর্শে পালন করা হচ্ছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি হজ্বের উপর এবং হজ্ব পালনকারীদের উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, যাতে করে হজ্ব যাত্রীরা, এমন কি কোন আদর্শিক ধর্মীয় গ্রন্থাদি পর্যন্ত বহন করতে পারেন না। আর পারেন না সেখানে

www.pathagar.com

গিয়ে ধর্মের খোলামেলা আলোচনা করতে। আজকাল হজ্বকে একটি শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে পরিণত করা হয়েছে। আর হজ্বকে এমনিভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে যে, হজ্বের এ অনুষ্ঠানের মধ্যে ঐক্যের সহায়ক যে নিদর্শনগুলো রয়েছে সেগুলোকে বিলোপ ও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আজ যদি আমরা উম্মাহ্‌র মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে হজ্বকে তার যর্থার্থ বিধান মোতাবেকই পালন করতে হবে।

উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আজ আমাদের মধ্যে যে, অনৈক্য বিরাজমান তার ভিত্তি ও কারণ কি? এর একটি দিক হচ্ছে আত্মপুজা অর্থাৎ প্রবৃত্তির দাসত্ব। আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য তো এমনও রয়েছে যা মূলত দূষণীয়ও নয়, তবে এর ভ্রান্ত অনুসরন ও ব্যবহার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যেমন আমাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ভাষাগত ও ভৌগোলিক অবস্থানগত পার্থক্য, আরেকটি হচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ইত্যাদি। আর এগুলো ব্যবহার করে অনেক সময় আমাদের মধ্যে অনৈক্য উসকে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা তুর্কী জাতীয়তাবাদের কথা বলতে পারি যা ওসমানী হুকুমাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পাশ্চাত্য এক শ' বছর পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতীয়তার ধূয়া তুলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের আগুন প্রজ্বলিত করে দেয় অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে একটি পারস্পরিক ঘৃণার জন্ম দেয়। পাশ্চাত্য একদিকে আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের এবং তুর্কীদের মধ্যে তুর্কী জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিল, অন্যদিকে এই দুটি জাতির মধ্যে অন্ধকার যুগের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়েছিল, আর এভাবেই পৃথিবীর মানচিত্র হতে ওসমানী সুলতানাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল।

হ্যাঁ, ইসলাম একথা বলে না যে, সবাই একই ভাষায় কথা বলবে, সবাই একই পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করবে, সবাই একই ধরনের আহার গ্রহণ করবে। ইসলাম বলে যে, এই পার্থক্যটি হচ্ছে একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাপার আর ইসলামী ও মানবীয় ঐক্য হচ্ছে মৌলিক বিষয়। মানুষ তার নিজের পরিচয় ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করবে। আর তাঁর জাতীয়তার পরিচয়ের চেয়ে যে পরিচয় জাতীয়তা, সীমান্ত আমাদেরকে আবেষ্টন করে রেখেছে, তার যে ইসলামী পরিচয় আছে সেটাই হচ্ছে মৌলিক বিষয়-অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আজ যদি হিন্দুস্থান দশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হতো, তা হলে হিন্দু কি এটাকে গর্ব করে বলতো যে, আমাদের তো দশটি দেশ আছে। গর্ব করতো না, বরং পরিতাপ করতো। এটা এজন্য যে, একটি রাষ্ট্রই তো হওয়ার কথা–দশটি নয়। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি

-জ্ঞানের এতোই অভাব যে, আমরা গৌরব ও অহংকারের মাধ্যমে বলে থাকি যে, আমাদের তো পঞ্চাশের অধিক রাষ্ট্র রয়েছে। অথচ এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় নয়, বরং এটা আমাদের জন্য পরিতাপের বিষয় হওয়া উচিত। এটা এজন্য যে, এক উম্মাহ ও জাতির জন্য এতগুলো দেশ কেন? একটি উম্মাহ্ যার জন্য তো একটি রাষ্ট্র এবং একই নেতৃত্ব হওয়া প্রয়োজন-সেখানে এতগুলো রাষ্ট্রে উম্মাহকে বিভক্ত করার কারণ কি? এটা আমাদের জন্য গৌরব নয়, পরিতাপেরই বিষয়। এটা বাতিল পরাশক্তিগুলোর কারসাজিরই একটি বড় দলিল যে, তারা একটি বাস্তবতাকে খন্ডবিখন্ড করে তথা একটি মানবদেহরূপী সামাজকে টুকরা টুকরা করে পঞ্চাশাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিয়েছে-আর এসব রাষ্ট্র নিজ নিজ জাতীয়তার ভিত্তিতে নাম ধারণ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। অবস্থা যদি এরকমই হয় তাহলে উম্মাহ্র ঐক্যের কি হবে?

দ্বিতীয়ত ঐক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। আর তা হচ্ছে, আমাদের মধ্যকার মাজহাবী মতপার্থক্যের ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)। তিনি বলেছেন, "ঐক্যের দাবী এটা নয় যে, কোন শিয়া সুন্নী হয়ে যাবে অথবা সুন্নী শিয়া হয়ে যাবে। ঐক্যের দাবী হচ্ছে এই যে, সুন্নী সুন্নীই থাকবে এবং শিয়া শিয়াই থাকবে।" এ দুটি গ্রুপ বা দল এবং এদের ব্যতীত আর যত দল রয়েছে, তাদের সকলেরই এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, যা কিছু সম্মিলিত রয়েছে, তাই হচ্ছে উত্তম। মাজহাবী মত পার্থক্যের কারণে যে বিভিন্নতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তাকে হ্রাস করার জন্য এর চেয়ে উত্তম নীতি আর কিছুই হতে পারে না যে, প্রত্যেক মাজহাবের অনুসারীকে তার মাজহাব অনুসরণের পূর্ণ আজাদী থাকতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার মতামত বহাল রাখার ইখতিয়ার রাখে। আর তার এই পবিত্র ইখতিয়ারকে স্বীকার করে নিতে হবে-এটা নয় যে, সবাই একই মাজহাবেব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আমাদের কে ভাল করেই উপলব্ধি করতে হবে যে, ধর্মীয় মতপার্থক্য একটি প্রাসঙ্গিক, সীমাবদ্ধ এবং গৌণ বিষয়। আর আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু রয়েছে সবই সম্মিলিত এবং এ ধরনের বিষয়ই বেশী। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে,আর তা হলেই আমরা দেখব যে, দলীয় মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের মাজহাবী ও কর্ম পন্থাগত প্রভেদ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

এছাড়া কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। ইতিবাচক দিকের মধ্যে, বিশেষ করে রয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ইসলামী বিপ্লবর বিজয়ের পরবর্তীতে ঐক্যের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি। আমি বলব, ইমাম খোমেনী হচ্ছেন এ বিংশ শতাব্দীর এমন একজন চিন্তাশীল নেতা, যিনি উম্মাহর ঐক্যের মৌলিক দিকটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐক্য ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা যায় না। উম্মার ঐক্যের কথাতো সকলেই বলেছেন। কিন্তু তার গুরুত্ব উপলব্ধি, নিষ্ঠার সাথে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা, এবং এটা উপলব্ধি করা যে, ঐক্য ব্যতীত ইসলামের বিজয় আদৌ সম্ভব নয়।

তিনি যে ঐক্যের ধরণা পোষণ করতেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ইরানের ইসলামী বিপ্লবে। আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে, বরং এ ছিল সমগ্র ইরানী জাতী বা সমাজের বিপ্লব। ইরানের সকল স্তরের মানুষের বিপ্লব ছিল এটি। ইমাম খোমেনী উম্মাহর এবং মানবতার ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন।

যখন ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয় লাভ করলো তখন তিনি চাইলে বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লবী নেতার মতো নিজ দেশের উন্নয়নের জন্যেই লেগে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু ইরানের স্বাধীনতাই নয়,আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা উম্মাহ, বিশেষ করে বিশ্বের সকল নিঃস্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীরকে আমেরিকার থাবা থেকে মুক্ত করা।

[ভারতের নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'ইসলাম'-এর আগষ্ট '৯৬ সংখ্যার সৌজন্যে]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

মহা নবীর (সাঃ) সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী

৫৪৫ খ্রী: ঃ মহা নবীর (সা) পিতা আবদুল্লাহর জন্ম।

৫৬৯ খ্রী: ঃ পিতা আবদুল্লাহ'র বিবাহ।

৫৭০ খ্রী: ঃ (জানুয়ারী) ঃ মহানবীর (সাঃ) পিতা আবদুল্লাহ'র মৃত্যু। (২১ জুলাই) ঃ ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহার মক্কা অবরোধ। (২৯ আগষ্ট) ঃ মহানবীর (সা) জন্ম। চাচা আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার দুধ পান। ৪ সেপ্টেম্বর-বয়স ৭ দিন। আকীকা ও নামকরণ। হালিমা কর্তৃক প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ। দাদা আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক খৎনা।

৫৭২ খ্রী: ঃ বয়স ২ বছর। হালিমা কর্তৃক মহানবীর (সা) মাতা আমিনার নিকট প্রেরণ। মক্কায় মহামারি থাকার কারণে পূনরায় হালিমার নিকট প্রেরণ। মহানবীর (সাঃ) বন্ধু, শ্বশুর হযরত আবু বকর (রা) জন্ম।

৫৭৪ খ্রী: ঃ বয়স ৪ বছর ।প্রথমবারের মত মহানবীর (সা) বক্ষ বিদীর্ণকরণ।

৫৭৫ খ্রী: ঃ বয়স ৫ বছর। হালিমার ঘর থেকে মাতা আমিনার নিকট প্রত্যাবর্তন।

৫৭৬ খ্রী: ঃ বয়স ৬ বছর ।এ বছরের শেষ দিকে মাতা আমিনার সাথে মদীনায় গমন। মহানবীর (সাঃ) জামাতা ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা) এর জন্ম।

৫৭৭ খ্রী: ঃ মক্কায় ফেরার পথে মদীনার সন্নিকটে 'আবওয়া' নামক স্থানে মাতা আমিনার মৃত্যু। দাসী উম্মে আয়মান-এর সঙ্গে মক্কায় পৌছা।

৫৭৮ খ্রী: ঃ বয়স ৮ বছর ছয় মাস ১০ দিন বয়সকালে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু।

৫৮০ খ্রী: ঃ বয়স ১০ বছর। দ্বিতীয় বারের মত বক্ষ বিদীর্ণকরণ। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা) জন্ম।

৫৮২ খ্রী: ঃ বয়স ১২ বছর। পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া সফর।

৫৮৩ খ্রী: ঃ বয়স ১৩ বছর । মহানবীর (সাঃ) শ্বশুর ইসলামের ২য় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)- এর জন্ম।

৫৮৪ খ্রী: ঃ বয়স ১৪ বছর। আরবের বিখ্যাত ওকাজের মেলা ক্ষেত্রে সংঘটিত ফুজ্জারের যুদ্ধে কুরাইশদের সমর্থনে অংশগ্রহণ।

www.pathagar.com

৫৯০ খ্রী: ঃ বয়স ১৭ বছর। 'হারবুল ফুজ্জার' নামক যুদ্ধের সমাপ্তি। হিলফুল ফুজুল'' নামক শান্তিসংঘে যোগদান।

৫৯৩ খ্রীঃ বয়স ২৩ বছর। খাদিজার সাথে পরিচয়; তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। আসমা বিনতে আবু বকরের জন্ম।

৫৯৪ খ্রীঃ বয়স ২৪ বছর। আবু বকরের সঙ্গে ব্যবসা উপলক্ষ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন। বিশিষ্ট সাহাবী যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা)-এর জন্ম।

৫৯৫ খ্রীঃ বয়স ২৫ বছর। ব্যবসায়িক কাজে তৃতীয় বার সিরিয়া গমন।

খাদীজার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন।

৫৯৭ খ্রীঃ বয়স ২৫ বছর। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা)-এর জন্ম।

৬০০ খ্রীঃ বয়স ৩০ বছর। মহানবীর (সা) জ্যৈষ্ঠ কন্যা জয়নবের জন্ম। "আল-আমিন" উপাধি লাভ। চাচাত ভাই আলী (রা)-এর জন্ম।

৬০৫ খ্রীঃ বয়স ৩৫ বছর। কাবা গৃহ সংস্কার ও মহানবীর (সা) হাজরে আসওয়াদ পূনঃস্থাপন।

৬০৭ খ্রীঃ ৩৭ বছর। আলী (রা) -এর প্রতিপালন ভার গ্রহণ। বিভিন্ন সময়ে চিন্তাযুক্ত ও হেরা গুহায় অবস্থান গ্রহনের নিয়ম পালন শুরু। মহানবীর (সা) জেষ্ঠ্য পুত্র আবুল কাশিমের জন্ম।

৬১০ খ্রীঃ ১ ফেব্রুয়ারী, বয়স ৪০ বছর ১ দিন। সর্বপ্রথম হেরাপর্বতের গুহায় ওহী নিয়ে জিব্রাইল (আ)-এর আগমণ। খাদিজার সাথে বিখ্যাত পণ্ডিত ওরাকা ইবনে নওফলের নিকট গমন। কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকার পর সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত অবতীর্ন। ইসলাম প্রচারের নির্দেশ লাভ।

সর্বপ্রথম খাদীজা, আলী ও আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ইসলাম গ্রহন। গোপনে ইসলাম প্রচার শুরু। যায়েদ বিন হারেসাহ, ইসমান ইবনে আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবুদর রহমান ইবনে আওফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ উবনে আবি ওক্কাস, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, উম্মে আয়মান (রা) প্রমূখ সাহাবীর ইসলাম গ্রহণ।

আরকাম ইবনে আবুল আরকাম, উসমান ইবনে মাজুল, কুদামা ইবনে মাজুল আবদুল্লাহ ইবনে মাজুল, উবাইদা ইবনে হারিছ, ফাতেমা বিনতে কাওওবা, উম্মে ফজল, আসমা বিনেত আনাছ (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ। আরকামের গৃহে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন। পুণাঙ্গ সূরা হিসাবে সর্বপ্রথম সূরা ফাতেহা অবতীর্ণ।

www.pathagar.com

৬১২ খ্রীঃ (২ নবুবী) বয়স ৪২ বছর। আছমা বিনতে আবু বকর, আয়শা বিনতে আবু বকর, সাঈদ ইবেনে যায়েদ, খাব্বাব ইবনে আরাত, উমাইর ইবনে আবু ওক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মাসউদ ইবনে ক্বারী, সালত ইবনে আমর, বিলাল ইবনে রাবাহ, আইয়াশ ইবনে রাবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহন।

৬১৩ খ্রীঃ (৩ নবুবী) বয়স ৪৩ বছর । আবু আহমদ ইবনে জাহাশ, আমর ইবনে রাবিয়া, জাফর ইবনে আবু তালেব, আছমা বিনতে সালামা, খুনায়েস, হাতেব ইবনে হারেস, ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল (হাতিবের স্ত্রী), হাত্তাব ইবনে হারিছ, ফুকাইহা বিনতে ইয়াসার, মামার ইবনে হারেস, আমের ইবনে যুহাইরা, সাঈদ ইবনে উসমান, মুত্তালিব ইবনে আজহার, আবু হুজায়ফা ইবনে উতবা, সালেম মাওলা আবি হুজায়ফা, রামলা বিনতে আবু আউফ, নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহন। বিশিষ্ট কোরাইশ নেতাদের ৪০ জনকে আমন্ত্রণ করে ভোজনান্তে ইসলামের দাওয়াত দান। সুলাইম গোত্রের আমর ইবনে আবাসার ইসলাম গ্রহণ।

৬১৪ খ্রীঃ (৪ নবুবী) বয়স ৪৪ বছর । প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সম্মেলনের মাধ্যমে দাওয়াত দান। কুরাইশদের মাঝে দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া শুরু। খালিদ ইবনে সাঈদ, আমিনা বিনতে খালফ, হাতিব ইবনে আমন, ওয়াকিল ইবনে আবদুল্লাহ, খালিদ ইবনে বুকাইর, আয়াস ইবনে বুকাইর, আম্মার ইবনে ইয়াছার, সুহাইব ইবনে সিনান, হারিস ইবনে আবু হালা, সুমাইয়া (রা) প্রমূখ ইসলাম গ্রহণ করেন। খাদিজার পূর্ব স্বামীর ঔরস জাত পুত্র হারিস ইবনে আবু হালা ও সুমাইয়ার শাহাদাত। সুরা আল আন কাবুতের কিয়দাংশ অবতীর্ণ।

৬১৫ খ্রীঃ (৫ নবুবী) বয়স ৪৫ বছর। মুসলমানদের আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) হিযরতের অনুমতি দান। প্রথম পর্বে ১৬ জনের আবিসিনিয়ার হিযরত।

আবিসিনিয়ার হিজরত কারী ১৬ জন নিম্নরূপ–

১. উসমান ইবনে আফফান (রা) ২. রুকাইয়া (রা) ৩. আবু হুজায়ফা (রা) ৪. সাহলা (রা) ৫. জাবির ইবনে আওয়াম (রা) ৬. মুসআব ইবনে উমাইর (রা) ৭. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ৮. আবু সালামা (রা) ৯. উম্মে ছালেমা (রা) ১০. উসমান ইবনে মাজউন (রা) ১১. আমর ইবনে আমর (রা) ১২. লায়লা (রা) ১৩. আবু সাবরা (রা) ১৪. হাতিব ইবনে আমর (রা) ১৫. সুহাইল ইবনে বায়জা (রা) ১৬. আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)।

দ্বিতীয় দফায় ৮৩ জনের আবিসিনিয়ার হিযরত। আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী (বাদশাহ) আসহামার ইসলাম গ্রহণ।

www.pathagar.com

আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় লোকদের ইসলাম গ্রহনের সংবাদ শুনে ৩৩ জনের মক্কায় প্রত্যাবর্তন। ৪৬ বছর। আবু জাহাল কর্তৃক মহানবীকে (সা) গালমন্দ। মহানবীর চাচা হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণ। বিশিষ্ট কবি লবিদের ইসলাম গ্রহণ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ। প্রথম বারের মত মুসলমানদের প্রকাশ্য মিছিল। প্রকাশ্যে কাবা প্রাঙ্গণে সালাত আদায়। সুরা আন নজম, মরিয়ম, তাহা, আল-ওয়াকিয়া, শুয়ারা অবতীর্ণ।

৬১৬ খ্রীঃ (৬ নবুবী) বয়স ৪৭ বছর। শি'আবে আবু তালিবের অবরোধ জীবন শুরু। মিকদাদ ইবনে আমর আবদুল্লাহ, ইবনে হুযাফাহ, শাম্মাস ইবনে উসমান, শুজা ইবনে ওয়াহাব প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ

৬১৭ খ্রীঃ (৭ নবুবী)। বয়স ৪৮ বছর। সূরা আল আরাফ ও আল ফুরকান অবতীর্ণ। উসামা ইবনে যায়িদ (রা) -এর জন্ম। কাবার ভেতর জন্ম গ্রহণকারী একমাত্র মানব হাকীম ইবনে হাযামের (রা) জন্ম।

৬১৮ খ্রীঃ (৮ নববী) বয়স ৪৯ বছর। মদীনায় আউস ও খাযরায গোত্রর মধ্যে ইতিহাস খ্যাত ' বুআছ' যুদ্ধ সংঘটিত।

৬১৯ খ্রীঃ (৯ নববী) বয়স ৪৯ বছর ঃ (মুহাররম) অবরোধ জীবনের সমাপ্তি। খাদিজার (রা) (৬৫) ইন্তিকাল। চাচা আবু তালিবের ইন্তিকাল। পূনরায় কুরাইশদের অত্যাচার শুরু।

কুরাইশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আবু জাহেলের নিকট উট বিক্রি ও মহানবীর (সা) তার পাওনা আদায় করে দেওয়া।

উতাব ইবনে গাযওয়ান, আবুযর গিফারী, আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল, শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ।

৬২০ খ্রীঃ (১০ নববী) বয়স ৫০ বছর। ইসলামের প্রচারের জন্যে তায়েফ গমন; তায়েফবাসীর ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি ও নির্মম অত্যাচার।তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবীকে (সা) বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা মুতয়িম ইবনে আদীর নিরাপত্তা দান। সাওদার (রা) সাথে বিবাহ বন্ধন। হজ্জ উপলক্ষ্যে তীর্থ যাত্রীদের নিকট ইসলাম প্রচার। মদীনার খাযরায বংশীয় ৬ ব্যক্তির ইসলাম প্রচার শুরু। আবু রাজাহ ইবনে উমাইরের ইসলাম প্রচার শুরু। আবু রাজাহ ইবনে মাখরামা (রা), তুলাইব ইবনে উমাইর, সালাম ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ।

www.pathagar.com

মদীনার প্রথম ৬ জন ইসলাম গ্রহণকারী ঃ

১. রাফে ইবনে মালেক, ২. কোতবা ইবনে আমর (রা), ৩. আওফ ইবনে হারেছ (রা), ৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), ৫. ওকাবা ইবনে আমের (রা), ৬. আমের ইবনে আব্দে হারেছা (রা)।

৬২১ খ্রীঃ ১১ নববী বয়স ৫১ বছর। বক্ষ বিদীর্ণ করণ। (২৭ রজব) মিরাজ। মুসলমানদের উপর ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। আওস গোত্রের প্রধান তুফাইল ইবনে আমেরের ইসলাম গ্রহণ। আকাবা নামক স্থানে ১২ জন মদীনা বাসীদের বাইআত গ্রহণ। মদীনার আউস গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে মায়াযের ইসলাম গ্রহণ।

(১২ নব্বী) বয়স ৫২ বছর। আয়েশার সাথে বিবাহ বন্ধন। মদীনার আমহাল গোত্রের ইসলাম গ্রহণ। হাতেব আবনে আবিবালতায়া, যায়িদ ইবনুল খাত্তাব, শুরাহবিল ইবনে হাসানা, আবু রাফে মিসতাহ ইবনুল উসামা, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ। সুরা বনী ইসরাইল অবতীর্ণ।

আকাবার প্রথম শপথে অংশগ্রহণকারী ১২ জন ঃ

১. আবু ইমামা আসআদ ইবনে যুরারা (রা) ২. সা'দ ইবনে রাবিয়া (রা) ৩. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ৪. রাফে ইবনে মালিক (রা) ৫. বারা ইবনে মারূফ (রা) ৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ৭. উবাদা ইবনে সামেত (রা) ৮. সা'দ ইবনে উবাদা (রা) ৯. মানজার ইবনে আমর (রা), ১০. উসাইদ ইবনে হোজাইর (রা) ১১. সা'দ ইবনে খায়সামা (রা) ১২. আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়িহান (রা)।

৬২২ খ্রীঃ (২৩ নবুবী) বয়স ৫৩ বছর। (১২ যিলহজ্জ) আকাবায় ৭৫ জন মদীনা বাসীর বাইআত গ্রহণ; আব্বাস (রা)-এর ভাষণ দান।

উকাশা ইবনে মিহান, মিহরাজ ইবনে নাদলা, মুকাইরিব ইবনের আবি ফাতিমা , মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ। মুসলমানদের মদীনায় হিযরত শুরু। মহানবীকে (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা।

১ হিজরী, ৮ই রবিউল আউয়াল ঃ মহানবী (সাঃ) ও আবু বকরের (রাঃ) মদীনার পথে যাত্রা। মহানবীকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে সুরাকা ইবনে মালিকের পশ্চাদ্ধবন। মহানবীকে (সাঃ) হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী ৭০ জন আরব দস্যুর ইসলাম গ্রহন।

২৭ সেপ্টেম্বর (১২ রবিউল আউয়াল) ঃ মদীনার উপকণ্ঠ কুবায় অবস্থান। বিখ্যাত কুবা নামক মসজিদ নির্মাণ।

www.pathagar.com

৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মদীনায় গমন। রানুনা উপত্যকায় বনী সালামের পল্লীতে ১০০ জন লোক নিয়ে সর্ব প্রথম জুমার সালাত আদায়। বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইউব আনসারীর বাড়ীতে অবস্থান। মসজিদে নবুবী ও আহলে সুফফার আবাসস্থল নির্মাণ।মদীনার বিশিষ্ট ইহুদী পন্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ। আউস ও খাযরায গোত্রের ইসলাম গ্রহণ। (রমজান) ঃ হামযা (রা) কে একটি অভিযানে প্রেরণ। মদীনার ইহুদী ও পৌত্তলিকদের নিয়ে বিখ্যাত মদীনার সনদ সম্পাদন। আযান প্রবর্তন বিশিষ্ট সাহাবী আসআদ ইবনে যুরারার ইন্তিকাল। জোহর ও আসরের সালাত দু'রাকাতের স্থলে চার রাকাতের বিধান প্রবর্তন। বিশিষ্ট সাহাবী ইরানের সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ।

৬৩২ খ্রীঃ (২ হিজরী) বয়স ৫৫ বছর। পুনরায় কাবা শরীফকে কিবলা নির্ধারণ। আবওয়া নামক স্থানে ইসলামের প্রথম যুদ্ধাভিযান।উবাইদা ইবনে হারিসের নেতৃত্বে অভিযান। আলীর সঙ্গে মহানবীর ৪র্থ কন্যা ফাতিমার বিবাহ। সমুদ্র উপকূলের দিকে হামযার নেতৃত্বে অভিযান।

(রবিউল আউয়াল) ঃ বুয়াত ও গোজওয়ায়ে সাফওয়ানা নামক দুটি অভিযান।

মক্কার কুজ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে একদল সেনার মদীনা আক্রমণ।

মক্কার আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে হিজাজের দিকে সামরিক অভিযান। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার গতিরোধ।

সর্ব প্রথম জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আল কুরআনের সূরা আল হজ্জের একটি আয়াত অবতীর্ণ। মুসলমানদের উপর সাওম ও যাকাত ফরজ করা হয়। মহানবীর চাচাত ভাই নওফল ইবনে হারিস, উকবা ইবনে আমের আল জোহানী, ফদল ইবনে আব্বাস, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, যুলইয়াদইন উমাইর ইবনে আবদি আমর (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহণ। আদম শুমারী।

(রমজান) ঃ সারিরায়ে উমাইর ইবনে আদি সংঘটিত।

(১৭ রমজান) ঃ বিখ্যাত বদর যুদ্ধ সংঘটিত।

(২৫ রমজান) ঃ বনী সুলাইমের বিরুদ্ধে অভিযান ও 'কাদর' নামক একটি জলাশয় অধিকার। ফেৎরা দান ও ঈদের জামায়াতের প্রচলন।

(শাওয়াল) ঃ বনু কাইনুকার সাথে সারিয়ায়ে সালিম ইবনে উমাইর।

(যিলহজ্জ) ঃ আবু সুফিয়ানের দু'শত অশ্বারোহী বাহিনীর পশ্চাদ্ধবনের উদ্দেশ্যে 'সাবিক' অভিযান।

www.pathagar.com

৬২৪ খ্রীঃ (৩য় হিজরী) বয়স ৫৬ বছর। গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান। বনু কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা। ইহুদী কবি কা'ব ইবনে আশরাফের প্রাণদণ্ড।

রবিউল আউয়াল ঃ সারিয়ারে মুহম্মদ বিন মাসলামা আনসারী অনুষ্ঠিত।

জমাদিউল আউয়াল ঃ গাযওয়ায়ে বনী সুলাইম অনুষ্ঠিত। আমর উবনে উমাইয়া উমাইর ইবনে ওয়াহাব (রা) প্রমূখের ইসলাম গ্রহন।

জমাদিউস সানী ঃ আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

১১ শাওয়াল ঃ বিখ্যাত ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত। বনী আমরের প্রবঞ্চনা। হামযার (রা) শাহাদাত। ১৪ জন মুসলিম সৈনিকের শাহাদাত। ৭০ জন কাফির সৈন্যের হত্যা ও ৭০ জন বন্দী। কুরাইশদের বিরুদ্ধে বাহরানে 'ফরু' অভিযান। আজাল ও কারাহ গোত্রদ্বয়ের আমন্ত্রণে ৬ জন সাহাবীর রাজী সফর এবং রাজী সফরকারী শহীদ ৬ জন সাহাবী ঃ

১. মুরসাদ ইবনে আবু মুসসাদ (রা) ২. খালিদ ইবনে বুকাইর (রা)

৩. আসিম ইবনে সাবিত (রা) ৪. খুবাইব ইবনে আদী (রা) ৫. যায়িদ ইবনে দাসানা (রা) ৬. আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রা)।

৬২৫ খ্রীঃ (৪ হিজরী) বয়স ৫৭ বছর। (মুহররম) বনু আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে আবু সালামা (রা)-এর নেতৃত্বে ১৫০ সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ। সারিরায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমাইস সংঘটিত। (সফর) ঃ 'বীর মাউনা' নামক স্থানে ইসলাম প্রচারক ৬৮ জন সাহাবীকে নির্মম ভাবে হত্যা। সারিয়ারে আসিম সংঘটিত। মহানবীকে (সা) হত্যা প্রচেষ্ঠার অপরাধে বনু নাযীর গোত্রকে মদীনা প্রজাতন্ত্র থেকে বহিস্কার। (রবিউল আউয়াল) ঃ সারিয়ায়ে আমার বিন উমাইয়া অনুষ্ঠিত। (রজব) ঃ বনু সালাবার বিরুদ্ধে 'যাতুর রিকা' অভিযান। ঃ মদ পানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী। মহানবীর (রা) নাতি ইমাম হাসান (রা) এর জন্ম। পর্দা প্রথার প্রবর্তন।

৬২৬ খ্রী ঃ (৫ম হিজরী) বয়স ৫৮ বছর। যায়েদ ইবনে হারিসার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশকে বিবাহ।

রবিউল আউয়াল ঃ দু' মাতুল জানদাল অভিযান।

শাবান ঃ বনু মুস্তালিক অভিযান। আয়েশা (রা) এর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ। অজু ও তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন। অপবাদ আরোপের দণ্ড বিধান প্রবর্তন। তালাকের বিভিন্ন আইন প্রবর্তন। সূরা আল মুনাফিকুন অবতীর্ণ।

৩ এপ্রিল ঃ ৫-যিলকদ ঃ বিখ্যাত খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর কুরাইশদের মক্কা প্রত্যাবর্তন। সাদ ইবনে মায়াজের শাহাদাত।

www.pathagar.com

কুরাইশ নেতা আমর বিন আবদুল্লাহ নিহত। বনী কুরাইযার বিদ্রোহ ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান। বনী কুরাইযার লোকদেরকে প্রাণদণ্ড। জুয়াইরিয়া বিনতে হারেসকে বিবাহ। মুগিরা ইবনে শু'বা, সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) প্রমূখ সাহাবীর ইসলাম গ্রহণ। সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন আতিক সংঘটিত।

৬২৭ খ্রীঃ (৬ হিজরী) বয়স ৫৯ বছর। (মুহররম) ঃ কারতার দিকে মুহাম্মদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ। ইয়ামেনের নেতা ছুমামা বিন আছালের ইসলাম গ্রহণ। (রবিউল আউয়াল) ঃ বনু লিহইয়ান অভিযান। গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে "যী-কারাদ" অভিযান। মহানবীর (সা) কন্যা জয়নবের মদীনা আগমন। (রবিউস সানি) ঃ সারিয়ায়ে উকাশা বিন মুহসেন অভিযান। সারিয়ারে যুল কাসসা অভিযান। সারিয়ায়ে বনী ছালাবা অভিযান। বনী সুলাইমের বিরুদ্ধে সারিয়ায়ে যায়েদ বিন হারেসা অভিযান।

জমাদিউল উলা ঃ সারিয়ায়ে 'ঈসা' অভিযান।

জমাদিউস সানি ঃ সারিয়ায়ে 'তরফ' অভিযান।

রাজব ঃ সারিয়ায়ে 'ওয়াদিউল কুরা' অভিযান।

শাবান ঃ আবদুর রহমান ইবনে আউফের নেততে্ব 'দুমাতুল জন্দালে ' একদল সৈন্য প্রেরণ। বনী আসাদের বিরুদ্ধে আলীর (রা) নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ।

রমজান ঃ সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা সংঘটিত।

উমাইনার দিকে কুরয বিন জাবিরের নেতৃত্বে একদল সেন্য প্রেরণ। সারিয়ায়ে আমর বিন সাইয়া অনুষ্ঠিত।

যিলকদ ঃ নামীলা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসীর উপর মদীনার শাসন ভার অর্পন।

২২ মার্চ ঃ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ১৫০০ লোক নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা।

হুদাইবিয়ার বা'ইয়াতুল'রিদওয়ান' গ্রহণ ঃ বিখ্যাত হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর।

বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট মহানবীর (সা) দাওয়াত সম্বলিত চিঠিসহ দূত প্রেরণ শুরু। বনি বকর গোত্রের কুরাইশদের সাথে ও বনী খোজায়া গোত্রের মুসলমানদের সাথে মিত্রতা স্থাপন। মারিয়া কিবতিয়াকে (রা) বিবাহ।আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলের মদীনা আগমন। মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ হয়। আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমানের ইসলাম গ্রহণ।

৬২৮ খ্রীঃ (৭ হিঃ) বয়স ৬০ বছর (মুহররম) ঃ যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে' ওয়াদিউল কুরা' অভিযান। ইহুদীদের সাথে খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত। ৫০ জন মুসলমান আহত। ইহুদী নেতা সাল্লাম বিন মিসকাম নিহত। ইহুদী জায়নাব বিনতে

www.pathagar.com

হারিস কর্তৃক রাসুলকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা। কামুস দূর্গের অধিপতি নিহত। ৯৩ জন ইহুদী ও ১৫ জন মুসলিম সৈন্য নিহত। বিশিষ্ট সাহাবী সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরার ইসলাম গ্রহণ। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর খাইবার বিজয়। ইহুদীদের জিজিয়া কর প্রদানে স্বীকৃতি।

উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান ও মাইমুনা বিনতে হারিসকে বিবাহ। সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে বিবাহ। (সফর) ঃ সারিয়ার উয অভিযান। আলীর নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে ' ফাদাক' অভিযানে প্রেরণ। মুত'আ বিবাহ রহিত ঘোষণা। আবসিনিয়ার হিজরতকারী মুসলমানদের মদীনায় আগমন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর মহানবীর জন্য উপঢৌকন প্রেরণ। দ্রব্যে হালাল হারামের বিধান ঘোষণা। (জামাদিউল উলা) ঃ সারিয়ায়ে হাসমী অনুষ্ঠিত। নুবার দিকে উমরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ।বনী ক্বিলাবের দিকে আবু বকরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ। (রমজান) ঃ বনী মুররা ও বনী ফাযারার বিরুদ্ধে বাগীর বিন সাদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ। জুহাইনার হুরকাতের বিরুদ্ধে উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ।(শাওয়াল) ঃ মিকার বিরুদ্ধে সারিয়ায়ে গালিব অভিযান। (যিলকদ) ঃ বনী সুলাইমের বিরুদ্ধে ইবনে আবি উফার নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ। উমরাতুল কাযা পালনের জন্য মক্কায় গমন ও তিনদিন অবস্থান। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট দাওয়াত নিয়ে দূত হিসেবে দেহইয়া বিন কালবীকে প্রেরণ। সাঈদ ইবনে আমের আল জুহানী ও হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ইসলাম গ্রহণ। ইরান বা পারস্য সম্রাট পারভেজের নিকট দূত হিসেবে আবদুল্লাহ বিন হুযাফাকে প্রেরণ। আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী আসহামাহ্ ইবনে আবহুর নিকট দূত হিসেবে আমর ইবনে উমাইয়াকে প্রেরণ। নাজ্জশীর ইসলাম গ্রহণ। মিশরের রাজা মুকআওকিশের নিকট হাতেব বিন আবি বালতায়াকে প্রেরণ। ইয়ামামার বাদশা ছাওদা বিন আলী ও শুনামার নিকট সালীত ইবনে আমেরকে দূত হিসেবে প্রেরণ। বোলকার বাদশাহ হারিস গাসসানীর নিকট শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদীকে প্রেরণ। ইয়ামনের গভর্ণর 'বাজান' এর ইসলাম গ্রহণ। মক্কার বিশিষ্ট বীরদের মধ্যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস ও উসমান ইবনে তালহার ইসলাম গ্রহণ। বোছরা বা হাওরানের রাজার নিকট উমর ইবনে হারেসকে দূত হিসেবে প্রেরণ।

৬২৯ খ্রীঃ (৮ম হিজরী) বয়স ৬১ বছর। রাহরাইনের রাজা মুনজার ইবনে সাবি এর ইসলাম গ্রহণ ও বাহরাইন বিজয়। ওমান প্রদেশ বিজয়। মহানবীর (সা) পুত্র ইবরাহীমের জন্ম। জৈষ্ঠ্য কন্যা জয়নবের মৃত্যু। (রবিউল আউয়াল) ঃ আতরার দিকে কাব বিন উমাইয়ার নেতৃত্বে একাদল সৈন্য প্রেরণ। যাতুল ইরক' এর দিকে শুজা বিন

ওহাবের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরন। যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে সিরিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরন। (জমাদিউল আউয়াল) ঃ সিরিয়ার খৃষ্টান নেতা শোরাহবীলের বাহিনীর সাথে 'মুতা' নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত।সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাত। খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনাপতির দায়িত্বলাভ। রজব (শাবান) ঃ আবু উবাইদার নেতৃত্বে 'খায়বর' অভিযান। খাযিয়ার দিকে আবু কাতাদাহ ইবনে রবির নেতৃত্বে অভিযান।

৬৩০ খ্রীঃ (৮ হিজরী) ঃ আব্বাসের মদীনায় হিজরত। বনু খোযায়া গোত্রের উপর বনু বকরের আক্রমণ। (১০ রমাজান) ঃ ১০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ মহানবী (সাঃ) এর মক্কা যাত্রা। মারুর যাহরান নামক স্থানে যাত্রা বিরতি। মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ।মক্কা বিজয়।(২০ রমযান) ঃ কাবা ঘর হতে মূর্তি অপসারণ। কাবা ঘরে সালাত আদায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। দলে দলে লোকদের ইসলাম গ্রহণ। নিন্দিত কাফির আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকিয়াস ও হুয়ারিস ইবনে লুকাইদকে হত্যা। খালিদ বিন ওয়ালীদের ভুলবশত বনী-যাজিমার কয়েক জনকে হত্যা। (শাওয়াল) ঃ সারিয়ায়ে তোফায়েল দাওসী অভিযান। হাওয়াজেন গোত্রের সাথে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত। প্রথমে মুসলমানদের বিপর্যয় ও পরে বিজয় লাভ।হুনাইন যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমত বন্টন। বনু সাকিফের আত্মসমর্পন ও তায়েফ বিজয়। জিরানা থেকে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমণ। আত্তাব নামক জনৈক সাহাবীকে মদীনার অস্থায়ী শাসনকর্তা নিয়োগ। বিশিষ্ট কবি কা'ব ইবনে যুহাইরের ইসলাম গ্রহণ। আবু বকরের পিতা আবু কোহাফার ইসলাম গ্রহণ। উসমান ইবনে তালহার ইসলাম গ্রহণ। সুরাকা ইবনে মালিক ও আকিল ইবনে তালিবের ইসলাম গ্রহণ। ৯ম হিজরী বয়স ৬২ বছর। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাবুক অভিযান। বনু গিফার গোত্রের কতিপয় লোকের যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা। কতিপয় মুনাফিকের যুদ্ধে অনুপস্থিতি। রোমান বাহিনীর পলায়ন। মসজিদের জেরার প্রতিষ্ঠা।কন্যা উম্মু কুলসুমের ইন্তিকাল। দুমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা উকাইদের বিরুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ। উকাইদকে জিজিয়া দানের শর্তে মুক্তি দান।বনু সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন। আলীর (রা) নেতৃত্বে ইয়ামনে অভিযান। বিশিষ্ট সাহবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর শাহাদাত বরণ। বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের আগমণ। জালুদের নেতৃত্বে বনু আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের আগমন। মুসইলামাতুল কাযযাব সহ বনু হানীফার প্রতিনিধি দলের আগমণ। আবু বকর (রা) এর নেতৃত্বে মক্কায় হজ্জ করার জন্যে কাফেলা প্রেরন। মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাদী। ইবনে হাতেম তাঈ এর ইসলাম গ্রহণ ও স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচার। আমর ইবনে সাদী কাবের নেতৃত্বে বনু যোবাইদার প্রতিনিধি দলের আগমন। নাজরানের প্রতিনিধি

দলের আগমন। বনী তামিমের বিরুদ্ধে উয়াইনা বিন হারিসের নেতৃত্বে অভিযান। সারিয়ায়ে ওলিদ ইবনে ওকবা সংঘটিত। আসআমের বিরুদ্ধে কুতবা বিন উমরের নেতৃত্বে অভিযান। সারিয়ায়ে ওলিদ ইবনে ওকবা সংঘটিত। খাসআমের বিরুদ্ধে কুতবা বিন আমিরের নেতৃত্বে অভিযান। সারিয়ায়ে ওলিদ ইবনে ওকবা সংঘটিত। খাসআমের বিরুদ্ধে যুহাকের অভিযান। হাবশার দিকে আলকামা বিন মুদাজ্জাজ মাদলাজীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ। ফলাসের বিরুদ্ধে আলীর (রা) নেতৃত্বে অভিযান। বনু হারিস গোত্রের ইসলাম গ্রহণ। জানাবের দিকে উকাশা বিন মুহসিনের নেতৃত্বে অভিযান।

৬৩২ খ্রীঃ (১০ হি) বয়স ৬৩ বছর। আশয়াস ইবনে কায়েসের নেতৃত্বে কিন্দার প্রতিনিধি দলের আগমন। আযদ গোত্রের কতিপয় লোকসহ সুরাদ ইবনে আবদুল্লাহ আযাদীর আগমন ও ইসলাম গ্রহণ। ইসলাম প্রচারের জন্য আলীকে ইয়ামেনে প্রেরণ।

রাসুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট মুসাইলামার চিঠি এবং রাসুলের পক্ষ থেকে জবাব দান। পুত্র ইব্রাহীমের ইন্তিকাল।

যিলকদ (৭ মার্চ) ঃ ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহবীসহ মক্কায় পবিত্র হজ্জব্রত পালন। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দান। সাহাবাদের ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ। আল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত (৫/৩) অবতীর্ণ। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে উহুদের শহীদগণের কবর যিরারত।

১১ হিঃ ৬৩ বৎসর (সফর) ঃ উসামা ইবনে যায়িদের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে সিরিয়া প্রেরণ ও ফিলিস্তিনের বালকা ও দরুম অঞ্চল অধিকারের নির্দেশ প্রদান। এ অভিযানে প্রথম হিজরতকারী সকল মুসলমান অংশ গ্রহন করেন।

ইস্তিগফার কামনার উদ্দেশ্যে মদীনার কবরস্থান বাকউল গারকাতে গমন।

(২৮ সফর) ঃ পীড়ার সূত্রপাত। নামাযে আবু বকরের ইমামতি।

(৭ রবিউল আউয়াল) (১৩ জুন) ঃ পীড়া বৃদ্ধি। সাহাবীদের উদ্দেশ্যে মহানবীর (সা) শেষ নসিহত; কবর পূজার নিষেধাজ্ঞা।

(১১ রবিউল আউয়াল) ঃ সর্বশেষ নামাযের জামায়াতে যোগদান।

(১২ ই রবিউল আউয়াল) ১৮ই জুন (সোমবার, দ্বিপ্রহর) ঃ মহানবীর (সা) ইন্তিকাল। সাদ ইবনে উবাদার উদ্যোগে সাকীফায়ে বানু সায়েদায় উমরের নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে সকলের মিটিং। আবু বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ। ১৪ই রবিউল আউয়াল রাসুলের (সা) দাফন সম্পন্ন।

[সীরাত স্মারক '৯৭ এর সৌজন্যে]

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিবিগণের তালিকা

বিবিগণের নাম	বিয়ের সময় তাঁর বয়স কত ছিল এবং বিয়ের সাল	মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স কত ছিল এবং তা কোন সালে	এসময় নবী করীম (সঃ) এর বয়স কত ছিল	রাসুলুল্লাহ (স সাথে তিনি ব জীবন কাটি
১। খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (বিধবা)	৪০ বছর আগে নবুয়তের ১৫ বছর দশ বছর পরে	৬৫ বছর নবুয়তের	২৫ বছর	২৫ বছর
২। সওদাহ বিনতে জামা'য়া (বিধবা)	৫০ বছর নবুয়তের দশ বছর	৭২ বছর, ২২ হিজরী	৫০ বছর	১৪ বছর
৩। আয়শা বিনতে আবু বকর (রাঃ) (কুমারী)	৯ বছর, প্রথম হিজরী	৬৬ অথবা ৬৭ বছর ৫৭-৫৮ হিজরী	৫৪ বছর	৯ বছর
৪। হাফসাহ্ বিনতে ওমর ফারুক (রাঃ) (বিধবা)	১৮ অথবা ২২ বছর ৩য় হিজরী	৬৩ বছর, ৫৪ হিজরী	৫৬ বছর	৮ বছর
৫। যায়নাব বিনতে খুজাইমাহ (বিধবা)	৩০ বছর ৩য় হিজরী	৩০ বছর, ৩ হিজরী	৫৬ বছর	৩ মাস
৬। উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে খোজাইফাহ (বিধবা)	২৯ বছর, ৪র্থ হিজরী	৮৪ বছর, ৬১ হিজরী	৫৭ বছর	৭ বছর
৭। যায়নাব বিনতে জাহস (তালাকপ্রাপ্ত)	৩৫ বছর, ৫ম হিজরী	৫৩ বছর, ২০ হিজরী	৫৮ বছর	৬ বছর
৮। জুয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস (যুদ্ধবন্দী)	২০ বছর, ৫ম হিজরী	৬৫ বছর, ৫০ হিজরী	৫৮ বছর	৬ বছর
৯। উম্মে হাবীবাহ রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান (বিধবা)	৩৫ বছর, ৭ম হিজরী	৭২ বছর, ৪৪ হিজরী	৬০ বছর	৬ বছর
১০। সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (যুদ্ধবন্দী ও বিধবা)	১৭ বছর ৭ম হিজরী	৬০ বছর, ৫০ হিজরী	৬০ বছর	৩ বা সাড়ে তি
১১। মাইমুনাহ বিনতে হারিস (বিধবা)	৩৬ বছর, ৭ম হিজরী	৬০ বছর, ৫১ হিজরী	৬০ বছর	৩ বছর
১২। মারিয়া কিবতিয়া	২০ বছর, ৭ম হিজরী		৬০ বছর	৩ বছর

www.pathagar.com

প্রিয় নবীর পুত্র-কন্যাগণ

ছেলেমেয়েদের নাম	জন্ম ও মৃত্যুর সাল	মায়ের নাম ও ইন্তেকালের সাল
১। কাশেম	নবুয়তের ১১ বছর আগে নবুয়তের ৯ বচর আগে	২ বছর খাদিজা (রাঃ)
২। যায়নব	নবুয়তের ১০ বছর আগে ৮ম হিজরী	৩১ বছর খাদিজা (রাঃ)
৩। রুকাইয়া	নবুয়তের ৭ বছর আগে ২য় হিজরী	২২ বছর খাদিজা (রাঃ)
৪। উম্মে কুলসুম	নবুওতের ৬ বছর আগে ৯ম হিজরী	২৮ বছর খাদিজা (রাঃ)
৫। ফাতেমা (রাঃ)	নবুওতের ৫ বছর আগে ১১ জিরী	২৯ বছর খাদিজা (রাঃ)
৬। ইবরাহীম	৮ হিজরী সালে ১০ম হিজরী	১ অথবা দেড় বছর মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ

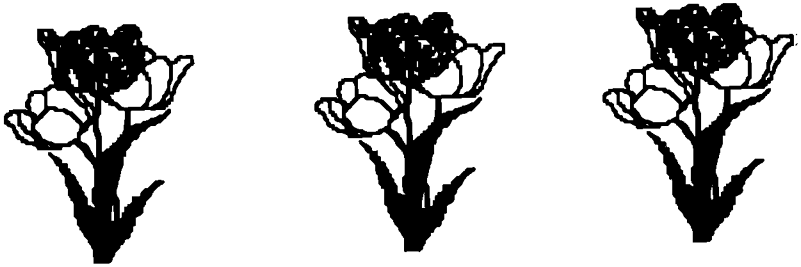

www.pathagar.com

হুযুর (সঃ)-এর বংশ পরিক্রমা

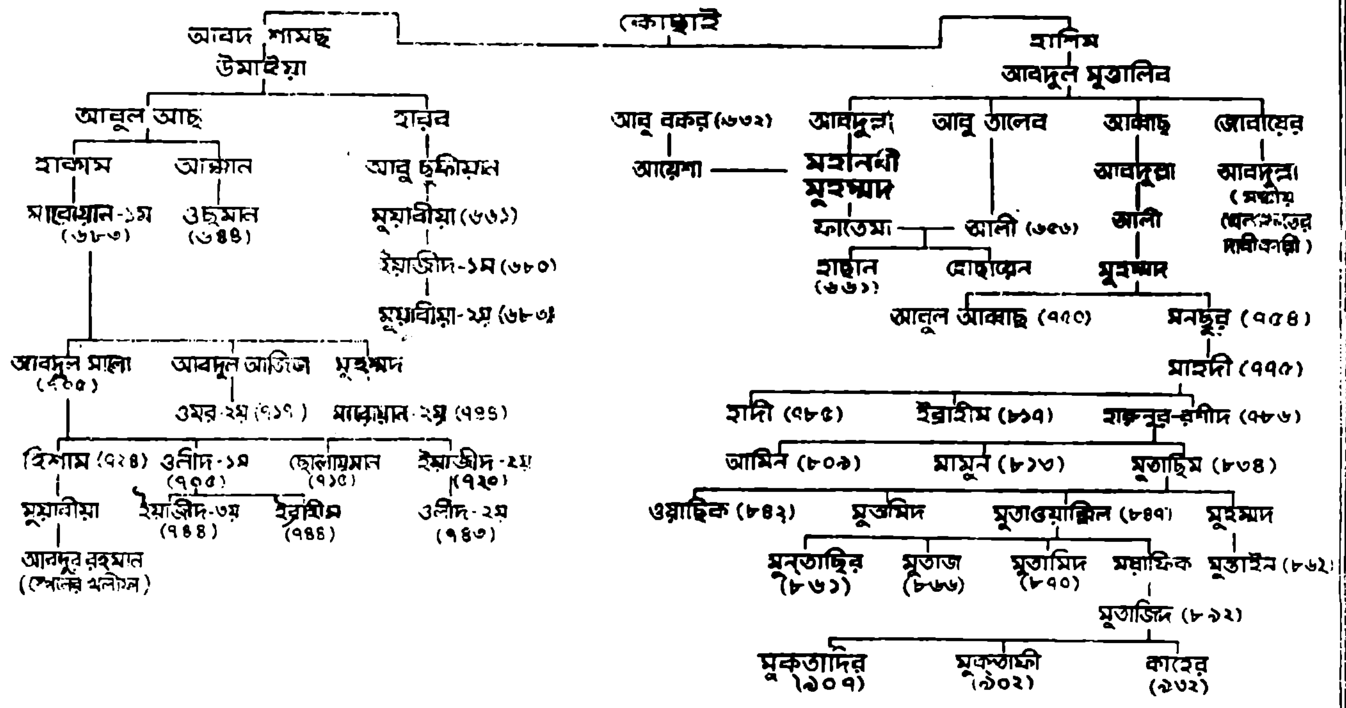

www.pathagar.com

মহানবীর যুগে আরব দেশ

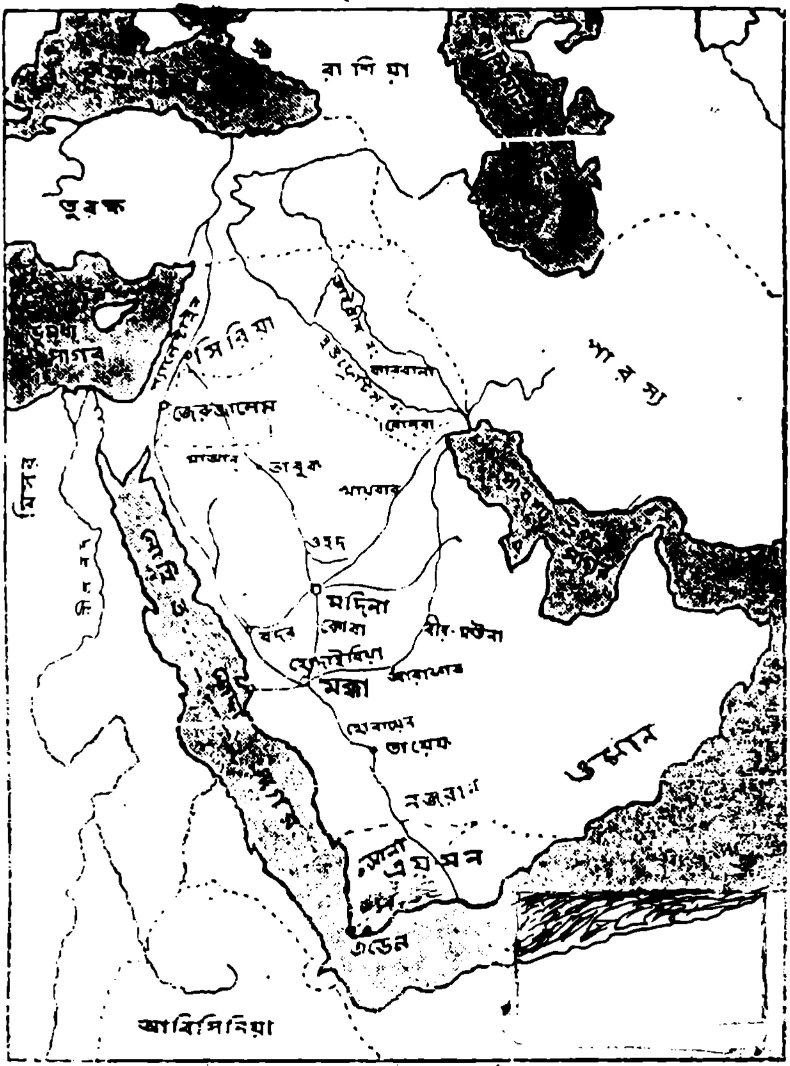

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

- **ইখওয়ান লাইব্রেরী**
  ৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড
  বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
- **আল-হেরা বিজনেস**
  ১২৯, ডিআইটি এক্সঃ রোড
  ফকিরাপুল, ঢাকা।
- **বিপুল বুক্স এণ্ড পেপার হাউস**
  দাগন ভূঞা, ফেনী।
- **আইডিয়াল লাইব্রেরী**
  আমানুল্যাপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
- **আল-বারাকা লাইব্রেরী**
  আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- **নিউ এমদাদিয়া পাবলিকেশন**
  হাজী কুদরত উল্যাহ মার্কেট, সিলেট।